ব্যক্তিজীবন

অমলেন্দু চক্রবর্তী

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : কুশধ্বজ মান্না : মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

এই লেখকের অন্যান্য বই

অবিরত চেনামুখ
গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন
আকালের সন্ধানে
গৃহে গ্রহান্তরে
রাধিকাসুন্দরী

প্রয়াত অগ্রজ
অরুণেন্দু চক্রবর্তী
একজন শান্ত নির্জন ভালো মানুষের স্মৃতিতে

পূর্বপর্ব

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়।
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা।

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান,
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

শহর জুড়ে ঘুমের নিশীথে, অন্ধকারে, পাখাটা ঘুরছিল। মিহি একটা ধাতব ধ্বনিই একমাত্র সচলতা এ-রাত্রির।

রাতে ঘুম-না-হওয়া আজব ব্যাধির চোখে সেই অন্ধকারই দেখছিলেন সত্যসাধন। রিটায়ারমেন্টের পর পাঁচ বছরের অলস জীবনে যখন দিনগুলি একটু একটু করে কুঁচকনো চামড়ার মতোই শিথিল হয়ে আসে, রাতগুলি ভয়ঙ্কর। হাজার মাইল ট্রেনযাত্রার শেষে স্টেশন থেকে রিকশ বা টাঙাতে ঠিকানার দিকে এগোনোর মতোই মন্থর। তখন ঘুমের-ওষুধ অথবা ট্র্যাঙ্কুলাইজার। আরো বেশি ভয়।

রাতের নিশুতিতে ঘরের অন্ধকার নয়, অপলক তাকিয়ে থাকার ক্লান্তিতে যখন চোখ জোড়াকেই মনে হয় দৃষ্টিহীন, বিছানা ছেড়ে উঠতেই হয় বারকয়েক। বুড়োটে হাড়গোড় ভেঙেচুরে উঠে বসলেন। তার পরও পা দুটোকে নিচের দিকে মেঝেতে ছুঁয়ে রেখে চুপচাপ বসে থাকা। কোনো রকম পরিশ্রম ছাড়াই যেন ক্লান্তি অগাধ। দু-চার ফোঁটা ঘুমের জন্য প্রহরের পর প্রহর জেগে কী নির্মম তপস্যা প্রতিটি রাত! ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে প্রাচীন পালঙ্কে বড়-ছেলের-ঘরের নাতনীকে মধ্যবর্তী শূন্যতায় রেখে ওরা মা আর মেয়ে। সমর্পিত বালিশে ঘুম!

আহা, ঘুমোক, ঘুমোক। যদিও অবসাদ, অন্যের সুনিদ্রায় ঈর্ষা নেই তাঁর! বিশেষত ওদের, যাদের ভালো-মন্দের ভাবনায় গোটা জীবনব্যাপী তাঁর একার নিশিযাপন। পা ঘষে ঘষে মেঝেতে স্লিপারটা খুঁজলেন। স্বগত-ভাবনার ছোট একটা নিশ্বাস। মাত্র আড়াই বছরের একটা বাচ্চা তার মায়ের কাছেই থাকবে—যখন এটাই নিয়ম, নিজের ধকলই সামলাতে পারে না, সাধ করে এই বুড়ি বয়সে নাতনীকেও লেপটে নিয়েছে রেণুবালা। সংসার হেঁসেল ঠাকুরের-আসনে জপতপ পুজোআচ্চার এত হাঙ্গামার পরও একটা বাড়তি ঝঞ্ঝাট! কিংবা ওরও পেনশন। ঝাড়া-হাত-পা বুড়িবয়সের জীবনে দ্বিতীয় পর্বের প্রথম জ্যান্ত পুতুল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়। ওপাশের মস্ত পালঙ্কটাকে অর্ধেকটা জায়গা ছেড়ে দেবার পর আরেক প্রান্তে তাঁর নিজের জন্য সিঙ্গল-বেডের নতুন খাট। তদুপরি ছোট মেয়ে কৃষ্ণার পড়ার-টেবিল চেয়ার, জামাকাপড়ের আলনা, একটা আলমারি। পালঙ্কের তলায় জং-ধরা গোটা কয়েক ট্রাঙ্ক—পুরনো কাঁসার-বাসন থালাঘটিবাটি কলস ছাড়াও বুড়ির স্মৃতি-জড়ানো আবোলতাবোল হরেক জঞ্জাল।

মেয়ে বড় হলে ওকে একটু নিরিবিলি দিতে হয়। কলেজের ছাত্রী কৃষ্ণার কোনো আলাদা ঘর নেই। মায়ের শয্যায় ঘুম, বাপ-মায়ের সঙ্গে একই ঘরে ওর চলাফেরা বসবাস।

অথচ এই বাড়িটাই কী বিশাল ছিল একদিন। বৌবাজারের দুর্গা পিথুরি লেনের অন্ধকার খুপরি থেকে উত্তর কলকাতার এ-বাড়িতে সপরিবারে উঠে আসার সময়, সেই ঊনপঞ্চাশ সালে, তাঁর নিজেরও সাবালকত্বে অভিষেক। বুড়ো বাপ তখনো বেঁচে। ভাইবোনদের বিয়ে হয় নি। জ্যেষ্ঠের দায়িত্বে অথবা গৌরবে নাতিবৃহৎ সংসারের অভিভাবক। দোতলা বাড়ির ওপরে-নিচে মোট আটটা ঘর। আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা নেই বলে একতলায় দোতলায় দুটো ঘর ছেড়ে দিলে ঘরের সংখ্যা ছয়। একতলার খোলা জায়গায় একমাত্র কলতলা হলেও ওপরে-নিচে দুটো পায়খানা। ভাঙাচোরা চিলকোঠাশুদ্ধু পুরো একটা ছাদ। নিরবচ্ছিন্ন মালিকানায় সম্পূর্ণ একটা বাড়ি মাত্র নব্বই টাকা মাসিক ভাড়ায়। বাড়তে বাড়তে এখন ইলেকট্রিসিটিশুদ্ধু শ-দেড়েকের মধ্যে। কোথায় মিলবে এমন স্বর্গসুখ! মাঝে মাঝে হতভাগা বাড়িওলাটার জন্যই দুঃখ হয়। রেল কোম্পানির আপিসে মোমের মতো গলতে গলতে এ-বাড়িটাকে সত্যসাধন প্রাসাদই ভাবতেন একদা। আজও তাই ভাবেন।

অন্ধকারে চলতে গিয়ে মচ্ করে কী একটা শব্দ হলো পায়ের তলায়। মেজাজটা খিচড়ে গেল। বাচ্চাটার কোনো খেলনা নয়তো? প্লাস্টিক কিংবা টিনের মোটর এরোপ্লেন! ভঙ্গুর। কিন্তু বড্ড আদরের।

উবু হয়ে, প্রায় বসে পড়ে অন্ধকার মেঝেতে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজেন সত্যসাধন। ছোট্ট দিদিমণির খেলার পুতুলটা। যদি পেনশনের টাকায় কিনে দেওয়া সেই রেলগাড়িটাই হয়। আজীবন রেলের-কেরানি দাদুকে নিয়ে এই রেলগাড়িতে চেপে দিদিমণি আন্দামান যাবে। আধো-আধো বোলে বাচ্চাটা যখন বলে, বাড়ির সবাই হাসে। ছোট পিসি, অর্থাৎ কৃষ্ণা শিখিয়েছে।

কী একটা খোঁচা লাগল হাতে। রেলগাড়ি নয়, রঙচঙে টিন বা প্লাস্টিকেরই একটা কিছু।

আপাতত পালঙ্কের তলায় ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এত ঘন ঘন ওঠা-বসাটা আর পোষায় না শরীরে। বিশেষত অন্ধকারে। মালপত্তরে ঠাসা এই গুদোমে। যেন সকলের সব কিছু এখানেই ঠেসতে হবে। বুড়োবুড়ির ঘর।

টাল সামলে পালঙ্কের বাজুটা আঁকড়ে ধরলেন। পৈতৃক সম্পদ, প্রাচীন মেহগনির পালঙ্কে জীবনের বত্রিশটা বছর। মধ্যবর্তী সময়ে ভেজা কাঁথা আর অয়েলক্লথে কারা এল একের পর এক, বছরের পর বছর! প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে বৈধ টিকিট দেখিয়ে যে-যার মতো নিজেদের বৃত্তে চলে যাওয়ার পর, আজ এত বছর পর, নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ একা মনে হয়! ফুরিয়ে যাবার ক্লান্তি। কিংবা ওরাই ভিন্নতর কেউ। চারাগাছ থেকে ক্রমান্বয় বৃদ্ধির পর পরিণত সবল বৃক্ষ। রোপণে, যত্নআত্তির জলসেচনে পল্লবিত হলে বৃক্ষ সমীপে ছায়া চায় মানুষ। নিজেকে নিংড়ে নিংড়ে আত্মক্ষরণে যখন লোলচর্মে অবশতা—দাঁতের কনকনানি, চোখের ছানি, পেটের গণ্ডগোল, অথবা যখন, আরামকেদারায় গা এলিয়ে আলস্যবিলাসের সময়—সুখের হাওয়া লাগছে গায়ে কিন্তু ছায়া পাচ্ছেন না কোথাও। সুখের যমুনায় খলবলাচ্ছে ওরা। সবাই চেনামুখ। জীববিজ্ঞানমতে রক্তেরই অংশীদার। কিন্তু নিশ্চিত প্রতিষ্ঠায় ওদের নিরাপদ জেনেও, নিস্পৃহতায় কেমন দূরে সরে যাচ্ছেন তিনি, কিংবা ধরাছোঁয়ার মধ্যে থেকে ওরাই দূরবর্তী আপনজন।

আসলে এককালের বিশাল বাড়িটাই কী রকম কুঁচকে আসছে আস্তে আস্তে! মা গত হয়েছেন অনেক আগেই। বুড়ো বাপ মারা গেলেন এ-বাড়িতে আসার পর। দুটো বোনের বিয়ে হলো। বছর তিনেক আগে নিজের বড়-মেয়ে শুভ্রারও বিয়ে দিলেন। সুরাহা হলো না কিছুই। ভাই দুটো বিয়ে করেছে। ছেলেপুলে নিয়ে ওদেরও সংসার বাড়ছে। একতলায় দু-দুটো উনুন পেতে ঠোকাঠুকি করে ওদের বাঁচা। অল্প আয়। ছেলেগুলো অমানুষ। ঈর্ষা মাৎসর্য খেয়োখেয়ি কামড়াকামড়ি নিত্য অশান্তির ঊর্ধ্বলোকে দোতলায় দাদার সংসারে মা-লক্ষ্মীর অপার করুণা! অঢেল সুখ।

অথচ বাড়বাড়ন্ত সুখের খাঁচায় বড় ক্লান্ত সত্যসাধন। অন্ধকারে পথ হাতড়ে ঘুমের-ওষুধ খোঁজেন। ডাক্তারের বারণ—'খাবেন। কিন্তু খুব বেশি নয়। রোজ তো নয়ই। শেষে দেখবেন এ-ছাড়া রাতই কাটছে না। বয়স হয়েছে তো। অভ্যেস হয়ে গেলে খারাপ। হার্টটা খুব সুবিধের নয় আপনার...'

প্রেসার হাই। ই সি জি রিপোর্টে প্রথম হার্ট-ব্লক ঘটে গেছে কিছুদিন আগে। সুগার অল্পস্বল্প। অমোঘ কালস্রোত। শরীর ভেঙে বয়সের ঢল নামছে। নিজের ঋজুতায় শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চান সত্যসাধন। কিন্তু তেমন করে আর জোর পাচ্ছেন না হাঁটুতে, কব্জিতে। মাথার চুল ঝরে ঝরে নিঃশেষ হলেও, যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তার প্রায় সবটাই শাদা। গায়ের চামড়া নরম হয়ে আসার পর মানচিত্রের পাতায় শাখানদী উপনদীর ছবির মতো রক্তবাহী শিরা-উপশিরা ফুলে ফুলে স্পষ্ট হয়ে উঠছে অথবা বুকের হাড়পাঁজর বা ভাঙাচোয়ালে—শবের দৃশ্যে ভেতরে ভেতরে কঙ্কালটা চাগিয়ে উঠছে। তখন ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতে হয়। পরিণত সন্তানরা। বংশস্রোত।

স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ঘরের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। সিলিং-ফ্যানটার ঠিক নিচে, ফুরফুরে বাতাস গায়ে মেখে, আরামে। ঠিক এভাবেই, প্রতিরাতে, ঝুরঝুর বালি খসে পড়ার মতো মগজ থেকে

আবোলতাবোল অকারণ ভাবনাচিন্তাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। তখন দুঃসহ। কী ভীষণ, কী অমানুষিক! কেন যে এত যন্ত্রণা ছাই! তখন লার্গাক্টিল, ফিফটি মিলিগ্রাম। একটা ট্যাবলেটে কুলোয় না, নিদেন দুটো চাই। ডাক্তারেব সতর্কীকরণ, ছেলেমেয়েদের শাসন। মধ্যরাত পর্যন্ত নিজের সঙ্গে লড়াইয়ের পর উঠতেই হয় একসময়। তখন টেবিলে, টেবিলের ড্রয়ারে কুলঙ্গিতে হাতড়ে হাতড়ে ট্যাবলেট খোঁজা, অনেকটা নিশাচর চোরের মতোই লুকিয়ে লুকিয়ে। ছেলেরা বারণ করেই নিরাসক্ত। ভয় প্যায় রেণুবালা। কোথায় যে লুকিয়ে রাখে কখন! ছোট মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে সাট করে প্রেসক্রিপশনটাও হাফিজ মাঝেমধ্যে। বোঝে না ওরা—কী ভীষণ কষ্ট! কী অসহ্য যন্ত্রণা! তখন খাটের বাজুতে মাথা ঠুকে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। পাগল, পাগল করে দেয়। ট্রামবাসের ঠেলাঠেলি ভিড়, আপিশের কাজকর্ম খাটাখাটুনিতে এত দীর্ঘদিন কাটিয়ে আসার পর দিনগুলি অবসরের দিন হয়ে গেলে, ধারণাই নেই ওদের—রাতগুলি কী নির্মম!

হাত বাড়িয়ে টেবিলটার দিকেই এগোলেন। আলোটা থাক। যদি অন্ধকারেই খুঁজে পাওয়া যায় টর্চটা! কৃষ্ণার খাতাপত্তর বইয়ের গাদা হাতড়াতে হাতড়াতে যখন হাতে ঠেকল না কিছুই, হঠাৎ মনে পড়ল, শোবার আগে টর্চটা একবার নিয়েছিল রেণুবালা। বাপের কাছে আদর খেতে খেতে ওদের ঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বাচ্চাটা। অন্ধকার বারান্দা ডিঙিয়ে ওকে কোলে বয়ে আনার দায়। বৌমা বড্ড ব্যস্ত। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা এসে গেছে। গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কুলের ইতিহাসের দিদিমণি। বৌমাকে দুপুরের স্কুল-করা ছাড়াও সকালে বিকালে রাত্তিরে টানা খাতা দেখে যেতে হচ্ছে কদিন ধরে। ওদের ঘরে টি.ভি-টা নাকি খোলাই হচ্ছে না কদিন।

'বসে থেকে-থেকে বোর না হয়ে টি.ভি-র কাছে গিয়ে তো বসতেও পারো সন্ধেবেলা। কত কিছু হয়। মনটা ভালো থাকবে...' বড় ছেলে শ্যামল বলেছিল একদিন।

সত্যসাধন নিঃশব্দে হেসেছিলেন। মাঝেমধ্যে যে যান না ওঘরে, এমন নয়। প্রায়ই গিয়ে বসেন। কিন্তু বড্ড ছোট ঘর। বাড়ির লোকজনেই এত ভিড়, পাড়াপড়শির বৌ-ঝিরাও এসে যায় দুচারজন। তখন নিজেরই অস্বস্তি। ভালোও লাগে না সবসময়। বায়োস্কোপ ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর!

টর্চটা যখন নিশ্চিতভাবেই পাওয়া গেল না, এবং যখন, হাতড়ে হাতড়ে ট্যাবলেট খুঁজে বেড়ানোটা অন্ধকারে কালো বেড়ালের তল্লাসি চালানোর মতোই এক তস্কর-আচরণ, ঘাড়ে শিরদাঁড়ায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে রাতটা। ট্যাবলেটটা খুঁজে পেতেই হবে তাঁকে। ঘুম হয় না কোনোদিনই। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটা রাত ভয়ঙ্কর। সুইচবোর্ডের দিকে ফিরলেন। আলোটা জ্বালবেন। ওরা যদি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে, তবু।

শুধু বায়োস্কোপ কেন, বছর দুয়েক হলো টেলিফোন এসেছে বাড়িতে। রান্নাঘরে দুধের রঙে ধবধবে ফ্রিজ। রেণুবালার ভাষায়—ঠাণ্ডা আলমারি। ক্যাসেট না ফ্যাসেট কী-সব বলে ছাই ওটাকে! আরেক উৎপাত। গানে গানে কান ঝালাপালা। সবশেষে মায়ের জন্য গ্যাসের উনুন। ডবল সিলিন্ডার। অ্যাপলিকেশন করাই ছিল। ঘরে এল ক-মাস আগে। একেবারেই কাঠবাঙাল বুড়ি। অত সুখ পোষাল না। প্রায়ই চেঁচায়—'মাথায় থাক বাবা তোদের গ্যাস। আমার ওই ধোঁয়াই ভালো। দে বাবা, আমাকে ওই ঘুঁটেকয়লাই ফিরিয়ে দে। তোদের আপিশের ভাত ঠিক সময়েই

পাবি...'

ছেলেমেয়েরা হাসে—'তোমাকে আর মানুষ করা গেল না মা। তুমি সেই ঠাকুরমা হয়েই রইলে। বেশ, মা নয়, আমরাও না হয় ঠাকুরমা বলেই ডাকব কাল থেকে...'

এ-রকম রসরসিকতা ঠাট্টায় ঘর ভরে থাকলে ভালোই লাগে বেশ। প্রসন্নতায় কাঁপে চারপাশটা। রেলের আপিশে জীবনটা বন্ধক রেখে এ-রকমই তো একটা কিছু চেয়েছিলেন জীবনে! মোটা ধুতি আর শস্তা মার্কিন থানের ঢলঢলে পাঞ্জাবিতে কেরানি-কেরানি চেহারাটা, আজ মনে ভাবলে, নিজের কাছেই কেমন বিদঘুটে। পুরনো মলিন কতগুলো ফোটো আছে দেয়ালে। ছেলেমেয়েদের কাছে সেই বোকা-বোকা মুখচোখ! ওরা বোঝে না, ওই নিঃস্বতার চোখে ওদেরই নিয়ে একটা স্বপ্ন ছিল। ওই মুখের আদলেই ওদের বড় হয়ে ওঠা।

আবার সেই পাখার তলায়, অন্ধকারের বাতাসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। মগজের ভেতরটা শক্ত হয়ে উঠছে। চোখে জ্বালা। চোয়ালের হাড়গোড় ভেঙে হাই ওঠাটাও কি ভীষণ মিথ্যে! ঘুমের উপসর্গগুলো সব আছে, শেষ পর্যন্ত ঘুম নেই। অথচ আশ্চর্য, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা বিশাল কলকাতা জুড়ে এখন ঘুম। জানালার গরাদ ভেঙে স্ট্রিটলাইটের যেটুকু আলো ঘরের ভেতর, তারই বিচ্ছুরণে পালঙ্কের নিদ্রায় ছোট মেয়ে আর নাতনীকে নিয়ে রেণুবালা। ঈর্ষা নয়। ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। দুঃসহ যন্ত্রণায় সত্যসাধন নিজের মধ্যেই পাক খেতে থাকেন বারবার। গোটা জীবনটা বিশ্রাম পেয়ে গেলে এক ফোঁটা ঘুমের কাঙালপনা কী নির্মম, কী নিষ্ঠুর জীবনে।

শরীরটা টানতে টানতে আবার নিজের বিছানায়ই এসে বসে পড়লেন। একটা শব্দ হলো। টের পেল না কেউ। হাঁপাতে লাগলেন। এর জন্যে তো দোষও দিতে পারেন না কাউকে। অপরাধ তাঁর নিজেরও নয়। একটা ব্যাধি। অসুস্থ বাপের জন্য ছেলেরা ডাক্তার ডাকে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ আসে। সেখানে ঘুমের-ওষুধও থাকে। এ-নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই অকারণ ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি। ক্রোধের অছিলায় সান্ত্বনাও কিছুটা, প্রশান্তি বুকের খাঁচায়—ভালোবাসায়, ওরা সকলেই তাঁর দীর্ঘায়ু চায়।

বসে-থাকা অবস্থাতেই পাশবালিশটা টেনে নিয়ে, দু হাতে আঁকড়ে, দেবমন্দিরে প্রণামের আকুলতায় অথবা পাথরে মাথা কোটার ভঙ্গি—যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন সত্যসাধন। অসহ্য জ্বলুনিটা হাড়েমজ্জায় চারিয়ে গিয়ে গাঁটে গাঁটে ব্যথা। ক্রূর ভালোবাসায় তাঁর এই একাকিত্বের, রাতনিশুতির মর্মান্তিক ক্লেশপীড়ার সঙ্গী নয় কেউ। অথবা যখন, ভরাট এই সুখের ঘরে সিলিং-ফ্যানটার ফুরফুরে বাতাসের স্নিগ্ধতাই প্রত্যাশিত ছিল দেহেমনে।

ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। দুঃসহ দাহ স্নায়ুকেন্দ্রে, শিরায় শিরায়। শেষ পর্যন্ত কর্মফলই বুঝি সত্যি। কৃতকর্মের পাপ জমা ছিল কোথাও! এখন শাস্তি। নইলে এমন নরকযন্ত্রণা কেন মানুষের! দোষই বা দেবেন কাকে? কেন দেবেন? অতিরিক্ত ভাবনাচিন্তা টেনশনের চাপ নিজের মধ্যেই! কোনোদিন বেইমানি করে নি সন্তানরা। আজও নয়। তাঁর স্বপ্নের আদলেই ওদের বড়-হয়ে-ওঠা। কড়ায়-গণ্ডায় প্রত্যাশা মিটিয়েই ওরা আজ সাবালক। যাদবপুর থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে বড় ছেলে শ্যামল গার্ডেনরিচে মস্ত কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। ছোট ছেলে খোকন, ইকনমিকস্-এ এম. এ.। দুটো বছরও হয়নি পুরোপুরি, ন্যাশনালাইজ্ড ব্যাঙ্কে

ডায়রেক্ট রিক্রুট মোটা-মাইনের অফিসার। বৌমার রোজগারের টাকা হিসেবে না-ধরলেও মাসের শেষে ওরা দু-ভাই ঘরে আনে হাজার চারেকের বেশি। তবু কেন ঘুম থাকবে না তাঁর?

কত রাত হলো? মেঝের ওপর শক্ত পায়ে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। বুড়ো বয়সের রাতগুলোয় সময় হাঁটে কেন্নোর মতো কিংবা হাঁটেই না মনে হয়। অথচ এ-ঘরেই, অন্ধকারের দেয়ালে মরা মানুষের মমির মতো বিশাল ঘড়িটা ঝুলছে এখনো। চকচকে পেতলের পেন্ডুলামটা আজ কতকাল, কত বছর ধরে নিষ্কম্প স্থির। একদিন সচল ছিল। চন্দ্রসূর্যের নিয়মে বাঁধা যুধিষ্ঠির-সময়। রেলের চাকরির সেই প্রথম দিকে, যুদ্ধের সময় এক সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিলেন। এখন নাকি এসবের পার্টসটার্টস পাওয়া যায় না ঠিকমতো। ট্যাকসির পয়সা গচ্চা দিয়ে ফালতু বয়ে নিয়ে যাওয়াই সার—খোকন বলেছিল। আসলে গাফিলতি। এবং এখানেই সত্যসাধনের চড়চড়ে ক্রোধ বা অভিমান। ওদের সকলেরই কব্জিতে কব্জিতে একটা করে ঘড়ি। শ্যামলের আপিশ, বৌমার স্কুল, খোকনের ব্যাঙ্ক। এমন-কি ছোট মেয়ে কৃষ্ণাও একটা ঘড়ি বেঁধে কলেজে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরি পেয়ে খোকন ওর বোনকে কিনে দিয়েছিল ঘড়িটা। তা দিক। সেদিন বড় খুশিই হয়েছিলেন তিনি। ছেলের গর্বে রেণুবালা ডেকে ডেকে দেখিয়েছে একে-ওকে-তাকে। কিন্তু বুড়োবুড়ির দেয়ালঘড়িটা? শ্যামল আর বৌমা না-হয় এপাশ-ওপাশ তাকাতে ভুলে যাচ্ছে। কিন্তু খোকন? ব্যাঙ্কের অফিসার গ্রেড-এ এত বড় চাকরি? অল্পবয়সের খোলামেলা মন বলেই হয়তো বাপ মা বোনের দিকে এখনো টান কিছুটা। কিন্তু সে-ছেলেও কি বিশ্বাস করে না—সময়ের কাঁটা বুড়োবুড়ির জন্যেও এগোয়। বিশেষত ওষুধপথ্যির বিধিনিয়মটা সময়ের ওজন মেনেই চলে।

দেয়ালের দিকে হাত বাড়ালেন। প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো আস্তানা। আর্শির দিকে না তাকিয়েই যেমন নিজের নাককানচোখঠোঁট বা নির্দিষ্ট আঁচিলটা অনায়াসে ছুঁয়ে ফেলা যায়, আঙুলটা পৌঁছে গেল সুইচবোর্ডে। আলোটা জ্বাললেন না। থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। একই দেয়ালে কিছুটা নাগালের উর্ধ্বে সেই বোবা ঘড়িটা। পরিবারের সকলের প্রয়োজনে যেটা কিনেছিলেন একদিন। আজ আর পৃথিবীর সময় সর্বজনীন নয়। যে-যার-মতো ভেঙে ভেঙে অসংখ্য টুকরোয় সময়কে আলাদা করে নিয়েছে সবাই।

'দ্যাখো, দ্যাখো। কি করে রেখেছে, দ্যাখো। উঃ, আর তো পারি নে বাপু...'

সত্যসাধন চমকে তাকালেন। ঘুমোয় নি বুড়ি। কিংবা খোকাখুকুর স্বপ্নে না-ঘুমোনোর পুরনো অভ্যাসটা নাতনীর জন্যে লালিত ছিল বলেই হয়তো আজও জেগে উঠতে হয়।

'সেই কখন থেকে যে হিসিতে ভাসিয়ে ভেজা-কাঁথায় শুয়ে আছে। একেবারে ভিজে একসা। তাই তো বলি, এত করি, রোদে গা পুড়িয়ে দুপুরবেলা এক ঘণ্টা ধরে গরম তেলের মালিশ, সকাল সন্ধ্যেয় মধু তুলসীপাতার রস গেলানো, সব যায় কোথায়? সর্দিকাশি সারে না মেয়ের! অ্যাই, অ্যাই খুকু কী পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস? সর না ছাই। তুইও তো ভিজে গেলি...'

সুইচটা টিপলেন সত্যসাধন। আচমকা ঘর ভরে আলো।

অতর্কিত আলোর ঝলকই হোক অথবা রাতদুপুরে মা-র চেঁচামেচি, ঘুম থেকে জেগে উঠে কৃষ্ণার ঝামটা—'এই, এই আবার শুরু হলো তোমাদের মাঝরাত্তিরে হল্লা। উঃ, এটা কি

ভদ্রলোকের বাড়ি? সারাদিনের পর রাত্তিরবেলা নিশ্চিন্তে যে ঘুমোব একটু, তারও উপায় নেই।'

'তোর কী! ঘুমো না তুই।' গলার-স্বরে পাল্লা দিয়ে ঝাঁঝানি রেণুবালার। ঘুমে ন্যাতান্যাতা নাতনীকে কোলে তুলে নিয়ে ভেজা কাঁথার শুকনো অংশে পিঠ-পাছা মুছে কাঁথাটা ছুঁড়ে মারলেন পালঙ্কের তলায়, মেঝেতে, যেখানে ইতিমধ্যে আরো গোটা কয়েক জমে গেছে। কাল সকালে ধোওয়া হবে। শিয়রে নিজের বালিশের কাছে ডাঁই করা শুকনো কাঁথা। কোলে বাচ্চা রেখে হাত বাড়িয়ে নতুন কাঁথা টেনে আনতে কষ্ট অনেক। তবু গজগজ গজগজ—'ঘুম। সাধের ঘুমই তো খেল তোদের। একজন তো সেই তখন থেকে ঘুম-ঘুম করে ঘরময় চরে বেড়াচ্ছে। দেখছি তো সবই। এখন আবার তুই! ঘুমো না তোরা। কে বারণ করছে তোদের?'

ঘুম-কাতর চোখে ছোট একটা হাই। কৃষ্ণা আরো তিরিক্ষি—'হ্যাঁ ঘুমোব! চোখের সামনে ড্যাবড্যাব আলো জ্বেলে বকবক করে যাবে, ওভাবে ঘুমোতে পারে কেউ?'

'সে-আমাকে বলছিস কেন? আলো কি আমি জ্বেলেছি? সে-যে জ্বেলেছে, বল্ না তাকে।'

'আমার ওষুধগুলো কোথায়?'

ঘরের ভেতর গর্জে উঠল কণ্ঠস্বর। মা মেয়ে চমকে তাকাল।

ওপাশে বুক-উঁচু আলমারিটার ওপর সংসারের টুকিটাকি হাবিজাবি অনেক কিছু। উদোল গায়ে লাল লুঙি পরে পাগলের মতো তখনো হাতড়ে যাচ্ছেন সত্যসাধন। বিবিধ কৌটো বাকসো, টেবলক্লথের তলা।

নির্বিকার রেণুবালা, নীল অয়েলক্লথের ফ্রেমে ক্ষুদে বালিশ পাশবালিশ শুকনো-কাঁথা পেতে নাতনীকে শুইয়ে দিতে দিতে—'ওসব ওষুধফষুধ জানি না আমি।'

'আমার জিনিসপত্র কেন ধরা হয়?' ভাঙা চোয়াল, লম্বা গলায় কৃশ শরীর। সত্যি সত্যি উদ্‌ভ্রান্ত সত্যসাধন—'বললেই তো হবে না। কাল রাত্তিরেও দেখেছি, আরো একটা ট্যাবলেট ছিল...'

'থাকে তো আছে ওখানেই। কে ধরতে যাবে? সাতঝামেলায় আমার তো আর কাজ নেই, পয়সায়-কেনা ওষুধগুলো ফেলতে যাব...'

চোখ নয়, গোটা শরীর ভরে তখন কাঁচা ঘুমের প্রায় সবটাই জমে আছে। তবু উঠতে হয়। বিছানা ছেড়ে মেঝেতে নামল কৃষ্ণা। গোড়ালি আর বুকের কাপড় সামলাতে সামলাতে আরো একটা ছোট হাই এবং বিরক্তি—'কী ওষুধ বাবা?'

'লার্গাক্‌টিল...'

'সে-তো ছিল না।'

'ছিল।' অসম্ভব জোর সত্যসাধনের গলায়।

'অফিসে যাবার আগে ছোড়দা তোমার প্রেসক্রিপ্‌শনটা চাইল...'

'কে? খোকন?' সত্যসাধন ফিরে তাকালেন—'আমার প্রেসক্রিপশনে ওর কি দরকার?'

'তুমি নাকি বলেছ, তোমার ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে।'

'আমি বলেছি?' বুড়ো আরো ক্ষিপ্ত—'পঞ্চাশ পয়সার দুটো ট্যাবলেটের জন্যে আমি ছেলেদের কাছে হাত পাতব? এমন দুরবস্থা হয় নি আমার। কী ভেবেছিস তোরা? আরো কত

কি বলবি?'

ঘুমে-ঘুমে অবশ, ভাঙা শরীরটা নিয়ে খাটের বাজু ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণা। আঁচল টেনে মুখকপালগাল ঘসল—'সে-তো আমি জানি না। ক'দিন আগে তুমি যে ডাঃ ঘোষের কাছে গিয়েছিলে, সেই প্রেসক্রিপশনটা দিলাম। ছোড়দা বলল—ওটা না। যাতে লার্গাক্টিলের নাম আছে। তার পর নিজেই খুঁজে খুঁজে পুরনো প্রেসক্রিপশনটা বের করে নিয়ে গেল।'

সত্যসাধন বিচলিত, বোঝা গেল ভ্রূকুটিতে—'ওরও কী আমার রোগ ধরল নাকি এ-বয়সে?'

'হবে না! বাপেরই তো ছেলে। কী যে অত ব্রহ্মাণ্ডের ভাবনা ওটুকুন ছেলের মাথায়? ক-দিন ধরে কথাও বলে না ভালো করে। গুম মেরে থাকে...' নাতনীর সেবাধর্মের পর নিজের বালিশে এলিয়ে পড়েছেন রেণুবালা।

পিছিয়ে এসে টেবিলের ড্রয়ার খুলেছে কৃষ্ণা। ওর নিজস্ব হাতঘড়িতে রাত তখন একটা দশ-বারো। এবং ড্রয়ার বন্ধ করেই চমকে উঠল—'এ-কি, বাবা কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

দরজার খিল তুলে ফেলেছেন সত্যসাধন। কোনো আমল দিলেন না।

কৃষ্ণা ছুটে এল—'তুমি কি ছোড়দাকে ডাকাডাকি করবে নাকি এখন? জানো কটা বাজে? একটা বেজে গেছে।'

'বাজুক...' গোঁয়ার সত্যসাধন বীভৎস আরো—'বাবু ওষুধগুলো নিজের পকেটে রেখে নাক ডেকে ঘুমোবেন আর আমি পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি ওগুলো। ইররেসপনসিবল। এ-জন্যে, এ-জন্যেই কিছু হয় না আজকালকার ছেলেদের...'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন সত্যসাধন। বাইরে, অন্ধকারে। নির্দিষ্ট দেয়ালে সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললেন। অপরিসর বারান্দাটা ফর্সা হতেই বিশাল একটা ধেড়ে ইঁদুর ছুটে গেল দ্রুত। হাতে-পায়ে মগজে রগ ফুলিয়ে প্রচণ্ড একটা ক্রোধ আপাদমস্তক। লম্বা লম্বা পা ফেললেন। বছর দশেক আগে হলেও লাঠিটা বাগিয়ে নিতেন হাতে। ছালচামড়া তুলতেন ছোঁড়ার। ইয়ারকি! ফাজলামো নাকি সব! এই দায়িত্ববোধ নিয়ে এত বড় একটা ব্যাঙ্কের অফিসারগিরি! নইলে আর এমন হাল হয় দেশের? এবং এগোতে এগোতে বাঁ দিকে, বন্ধ জানালাদরজার বোবা ঘরটার সামনে চোখ পড়তেই ভেতরের চড়চড়ানি রাগের ঝাঁঝটা ঝাঁ করে গিয়ে ধাক্কা মারল ব্রহ্মতালুতে। ওই আরেক হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! এম. এ. পাশ রোজগেরে বউয়ের পাল্লায় পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন বাবু। সোফাকোচ ফেলে, রঙিন পর্দা আর ফুলের তোড়ায় মনের মতো একটা ড্রয়িংরুম সাজাবার জন্য বাড়তি ঘর নেই এখানে! এখনো মাটিতে পিঁড়ি বা আসন পেতে খাওয়া! ছুঁচো ইঁদুর আরশোলা উই কী নেই? কলতলায় রোজ রোজ চিৎকার চেঁচামেচি। নিচের তলায় ষণ্ডাগুণ্ডা অশিক্ষিত খুড়তুতো ভাইগুলো। এটা নরক? এভাবে থাকা যায় না এখানে? দশ কাঠা বারো কাঠা সরকারি জমি নিয়ে কী নাকি সরকারি অফিসারদের বিরাট কো-অপারেটিভ গড়ে উঠছে সল্ট লেকে। অনেকগুলো ব্লক হবে। দেড় লাখ পৌনে দুলাখ টাকায় ঝকমকে আধুনিক ফ্ল্যাট। এরই মধ্যে হাজার ষাটেক ঢেলে ফেলেছেন বাবু। বাকিটা কুড়ি বছরের ইনস্টলমেন্টে। কনস্ট্রাকশনও চলছে। বাপ্-মাকে ফেলে বুড়োবুড়ির চোখের ওপর নিজের নিজেব আস্তানায় গিয়ে ঘরসংসার পাতার কেতা হয়েছে নতুন। বাবুরাও শিগগিরই যাবেন।

মিথ্যা আক্রোশে কাল্পনিক লাঠিটা হাতের মুঠোয় কাঁপে। বেসামাল সত্যসাধন। চোখে ভাসে শৈশবের কৈশোরের কচি কচি সন্তানদের মুখ। লাঠি বেত অবশ্য মারেন নি কোনোদিন। ধমকধামক শাসনে কান মলেছেন অনেকবার।

এখন ওরাই শোনায়—এই-ই নাকি চলছে আজকাল। নিয়ম। ঘরসংসার বড় হতে হতে যখন আর কুলোয় না, একই আয়তনে পুরনো ঘরগুলি ছোট থেকে ছোট হতে থাকে। একান্নবর্তী ট্রাডিশন রক্ষার খাতিরে রাজপ্রাসাদ কোথায় আধুনিক শহরে? তখন পুরনো সম্পর্ক আর ভালোবাসাগুলোকে অটুট রাখতে নিজেদেরই ভেঙে ভেঙে নিতে হয়। আসলে ভাঙা নয়, ছোট জায়গায় ঠোকাঠুকি করে নিজেদের ছোট করে তোলার চেয়ে এই তো ভালো। নিজেদের স্বাবলম্বন বিশ্বাস। কারেক্ট অ্যাপ্রোচ টু মডার্ন লাইফ।

তোদের মাথা আর মুণ্ডু। লম্বা লম্বা বাৎ। লাঠিটা তুলে বন্ধ দরজার গায়ে সজোরে ঘা কতক মারতে চাইলেন সত্যসাধন। পারলেন না। আসলে লাঠিফাটি কিছুই হাতে নেই। শুধু গা চিড়বিড় রাগের জ্বলুনি। কো-অপারেটিভে নাম লেখাবার সময় পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট কিনতে চেয়েছিল শ্যামল—সবাই এক জায়গায় একই সঙ্গে থাকব। তিনি রাজি হননি। জীবনের সব দায়দায়িত্ব কর্তব্য পালনের পর তিল তিল সঞ্চয়ের যে-হাজার কয়েক টাকা এখনো ধরে রেখেছেন ব্যাঙ্কে, একটা পয়সাও দেবেন না তিনি। আরো একটা ফ্ল্যাট মানে আরো লাখ দেড়েক টাকা! মানে কী! মানে কী এ-সবের? তিন লাখ চার লাখ টাকা ঢেলে বাড়ি করবি তো পায়ের তলায় মাটি কই? পরের জমিতে নিজের ঘর গড়ার মানে? অপদার্থ। মূর্খ সব। রোজগারের টাকা হাতে এলেই গা চুলকোয় বাবুদের। বাউণ্ডুলের মতো ওড়াতে পারলেই সুখ। বাড়ি করবি তো কেন্ না জমি। তোদের ওই শখের সল্ট লেকেই পেয়ে যাবি। না হয় আমিও দেব কিছু। তোদের ফ্ল্যাট কেনার চেয়ে অনেক কম পয়সায় জমিশুদ্ধু বাড়ি। কিস্তির কথা বলিস? ব্যাঙ্কের অফিসার হয়েছে খোকন। এত বড় চাকরি! বাড়ি তৈরির জন্য ভালো টাকা লোন পায় ওরা। সবে সাতাশ বছরের তাজা জোয়ান ছেলে। ওটাকা খোকন একাই শোধ দিতে পারবে সুদের অঙ্কসমেত।

তা নয়। আমার সংসার ভাঙবি বেয়াদপ? আমার ঘরসংসার ভাঙার কোন্ অধিকার আছে তোদের? আবার বক্তিমে শোনাবি—মডার্ন লাইফ!

একতলায় সিঁড়ির মুখে একটা ছুঁচো ডাকছে। নিশুতির রাতে চিৎকারটা বীভৎস। সত্যসাধনের সর্বাঙ্গে ক্রোধ।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ছোটছেলের দরজায় এসে-দাঁড়ালেন। অবাক হলেন। এত রাত। এখনো আলো জ্বলছে ঘরে! ভেতর-বারান্দার দিকে একটাই দরজা, একটাই জানালা। দুটোই ভেতর থেকে খিল-তোলা। পুরনো কাঠ আর মরচে-পড়া কব্জায় ভাঙাচোরা কাঠের দরজা-জানালায় ওপরে নিচে অনেকটা ফাঁক। সেখানেই স্পষ্ট বোঝা যায়—ঘর ভরে আলো। হয়তো ঘুমোয় নি এখনো। বাপের সঙ্গে একই যন্ত্রণা নিয়ে কাতরাচ্ছে বিছানায় অথবা বই পড়ছে রাত জেগে অথবা ঘুমের ওষুধ গিলে ঘুমোচ্ছে বেহুঁশ। রঙচঙে ছবিওলা ইংরেজি-বাংলা পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভুলেই গেছে আলোর কথা। বেড-সুইচ করবে, বলেছিল ক-দিন আগে।

মৃদু কড়া নাড়লেন।

সাড়া নেই।

নিশুতিতে খুব জোরে শব্দ তুলতেও কেমন একটু বাধে। নিজের বিরক্তিতে অন্যদের বিরক্ত করার ভয়। তবু কড়াটা নাড়লেন। আরও একটু জোরে। ডাকলেন দরজায় কান রেখে—'খোকন।'

গভীর রাতের নৈঃশব্দ্য কাঁপল। সন্তান বধির।

ওপাশের ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে কৃষ্ণা। নাতনীকে ঘরে একা রেখে আসার ঝুঁকি নিয়েও পিছু পিছু শ্লথ রেণুবালা।

'এ-তোমার কী হচ্ছে বাবা! মাথাটাথা খারাপ হলো নাকি?'

সত্যসাধন বিব্রত এবার। কিছুটা বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। বোকা-বোকা ভঙ্গিতে নিজেকে সামলে—'ন্‌না, এত রাত্তিরে আলোটা জ্বেলে রেখেছে...'।

'আলো জ্বালানো থাক কি ছাই নেভানো থাক তাতে তোমার কী? তাই বলে এই রাত দুপুরে ওকে জাগাবে তুমি?'

'জানলাটা বন্ধ কেন রে?'

রেণুবালার বাক্যে দু-জনই সচকিত। ওধারে রাস্তার দিকের খোলা জানালায় দিনের আলো রাতের বাতাসের অবাধ প্রবেশ। ভেতরের দিকের জানালাটাও খুলে রাখতে হয়। ঘুম-কাতুরে ছেলে অনেক বেলা অব্দি ঘুমোয় বলে এই জানালায়ই চায়ের-কাপ হাতে নিয়ে রেণুবালার প্রথম হাঁক পড়ে প্রতিদিন ভোরে।

মধ্যবর্তী ঘরে খিল তোলার আওয়াজ। খালি গায়ে পায়জামা পরে বেরিয়ে এসেছে শ্যামল। অকারণ ঘুম ভাঙানোর তিক্ত ঝাঁঝে ধমক, সোজাসুজি কৃষ্ণাকে—'কী করছিস তোরা? ঘুমোতে-টুমোতে দিবি না কাউকে? কেন, হয়েছেটা কী তোদের?'

'দেখো না বাবার কাণ্ড...'কৃষ্ণার কৈফিয়ত নেই—'ছোড়দা আলো জ্বেলে ঘুমোচ্ছে কেন?'

'মানে?' এবার মাকে—'এই ভূতের বাড়িতে রোজ রোজ একটা না একটা অদ্ভুত কিছু খুঁজে বের করতে পারোও তোমরা। আলো জ্বেলে রেখেছে তো কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হলো? তার জন্যে বাড়ির আর সবাইকে ঘুম থেকে জাগাতে হবে এত রাত্তিরে?'

গভীর রাতে স্বামীর পিছু-পিছু একসঙ্গে বেরোতে পারে নি সুনন্দা। গোছগাছ সেরে বেরোতে সময় লাগে। পেছনের আলোয় সিলিউট, লণ্ডভণ্ড চেহারায় বৌমার উপস্থিতিতে অথবা ছেলের কাছে তিরস্কৃত হবার সংকোচে সত্যসাধন বিব্রত যদিও, কিন্তু লজ্জা বা জড়তা নয়—এবার ভয় এবং সংশয়। প্রচ্ছন্ন ভাবনাটাই প্রবল হলো—কেন ঘুমের ওষুধ! বেশ কিছুদিন ধরেই খোকনের মুখেচোখে কেন বিষাদের ছায়া? আলতো করে বললেন—'আমাদের কথাবার্তার আওয়াজে ওঘর থেকে তোরা উঠে এলি, খোকন জাগছে না কেন? কী হলো ওর?'

'ঘরে ডাকাত পড়লেও কি ঘুম ভাঙে এ-বাড়ির কারুর? এমন বেহুঁশ ঘুম...' রেণুবালা।

কী খেয়াল হলো, জানালায় বারদুয়েক ধাক্কা মারল শ্যামল। ছুটে গেল দরজায়। কড়াটা নাড়ল। প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই জোরে। একরাশ ক্রোধ আর বিরক্তিতে রাত-কাঁপানো ধাতব চিৎকার।

অশেষ জ্বালাতন থেকেই যেন ক্রোধটা বেড়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে ভাঙা জানালার ফাঁকে ভেতরে উঁকি দিতেই চকিতে দিশেহারা।

'সে-কি!' আবার দরজায়। কড়া ছেড়ে এবার ঘুসি। ঘুসির পর ঘুসি মেরে জটিল উন্মাদনায়—'খোকন, খোকন...'

লাথি। দরজায় লাথির পর লাথির ধাক্কায় আচম্বিতে উথালপাথাল নিশুতির রাত। যেন আগুনের ঘরে, সোরগোলে পাঁচজন মানুষ।

দরজায় ভেঙে পড়ে রেণুবালার আকুল আর্তনাদ—'খোকন খোকন, বাবা আমার, দরজা খোল...'

অন্যদিকে গোড়ালি উঁচিয়ে, দুপায়ের দশ আঙুলের ওপর শরীরের ভর রেখে দাদার অনুসরণে বন্ধ-জানালার ফুটোয় একবার মাত্র উঁকি দিতে পেরেছিল কৃষ্ণা, বুঝতে পারেনি কিছুই। তবু একই ব্যাকুলতায় দরজায় ঘুসির পর ঘুসি—'ছোড়দা, ছোড়দা...'

বিদীর্ণ হচ্ছে মধ্যরাতের স্থবির কলকাতা। একতলায় দরজাগুলি খুলে গেল। পর পর বেরিয়ে পড়লেন হরিসাধন, শিবসাধন এবং তাঁদের বৌ-ছেলেমেয়েরা। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে সকলেই তড়তড়িয়ে উঠে আসছে ওপরে।

তখন আর কড়া নেড়ে দরজা খোলার চেষ্টা নয়। লাথিতে লাথিতে অক্ষম ঘর্মাক্ত শ্যামল দরজাটা পুরোপুরি ভেঙে ফেলার উদ্যোগে মরিয়া যখন, কলকাতা চৌচির হলো। ভাঙা বাড়ির পুরনো দরজা যখন তার ভেতরের রহস্যকে আগলে রাখার কঠিন জেদে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে, একতলা থেকে কয়লা ভাঙার পাথরের চাঁইটা তুলে নিয়ে এল প্রতাপ আর শিবাজী, খুড়তুতো ভাইরা, যার আঘাতে, হৈচৈ হট্টগোলের মধ্যে অচিরেই ফাটল ধরল নড়বড়ে কাঠের পাল্লায়। ডাকাতের মতো যখন নিজেদের ঘর ভাঙল ঘরের মালিকরাই এবং দলবদ্ধ প্রবেশে ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্যের মুখোমুখি আপনজনেরা। বিস্ময়ে মুহূর্তের বিহ্বলতা

'খোওও...ক অ ...ন...' দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে, ছুটে গিয়ে ছেলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রেণুবালা। যখন

ছেলে তার ঘুমোয়নি তখনো। কী এক গাঢ় যন্ত্রণায় দু-হাতে পেটটা আঁকড়ে ধরে গোটা শরীর নিয়ে ঠিক তখনই গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। নকশাকাটা রঙিন বেডশিটে জড়িয়ে গিয়েছিল দেহ, যেন বিছানার চামড়াটা টেনে ছিঁড়ে এনে নেমেছে ঢালুতে এবং টুকরো টুকরো লার্গাক্টিল-এর উজ্জ্বল রাংতাগুলি ছড়ানো ইতস্তত। শাদা রঙের কয়েকটি ট্যাবলেট। শূন্যপাত্র জলের গ্লাসটা চাদরের টানে গড়িয়ে নামতে নামতে বিছানার ধার ঘেঁষে আটকে রইল সার্কাসে ট্রাপিজের কায়দায়।

কান্নাকাটি সোরগোলের ভিড়ে কে যেন বলল—'ডাক্তার শ্যামলদা, ডাক্তারবাবু...

দায়িত্ববোধে একমাত্র সজীব অভিভাবক শ্যামল তার অতিব্যস্ততায়—'যা তো কৃষ্ণা, তুই যা এক্ষুণি। ডাঃ ঘোষ, বুড়োকে ধরে আনতেই হবে যে-করে হোক। মেয়েরা কেউ গেলেই আর্জেন্সিটা বেড়ে যায়। ওঠ্, ওঠ্ শিগগির..'

মায়ের পাশে, ছোড়দাকে ধরে কান্নায়, দাঁতে ঠোঁট চেপে ছিল কৃষ্ণা। ঝটকায় উঠে দাঁড়াল।

আঁচলে মুখচোখ চেপে বেরিয়ে যাচ্ছে সে।

উনিশ বছরের পূর্ণ যুবতী রাত প্রায় দুটোয় ঘরের বাইরে যাবে ডাক্তার ডাকতে? প্রস্তর স্থবিরতা থেকে নাড়া খেয়ে সত্যসাধন যখন পা বাড়ালেন মেয়ের সঙ্গে, ছোটভাই শিবসাধন বললেন—'আপনি থাকুন বড়দা, আমি যাচ্ছি কৃষ্ণার সঙ্গে...'

'বুড়ো ডাক্তার এত রাতে যদি না আসে শ্যামলদা! এলেও কখন আসবে...'

অ্যাম্বুলেন্স। ছিটকে বেরিয়ে এল শ্যামল। এবং কোনো দিকে, কারুর দিকেই ভ্রূক্ষেপ না রেখে উন্মাদবেগে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে, দ্রুততায় টেলিফোনের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে ডায়াল...ওয়ান জিরো টু—'কাম শার্প, প্লিজ, সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট, অলমোস্ট ডাইং...এইট-বি বাই ওয়ান কানাই মল্লিক লেন। হাতিবাগান, অরবিন্দ সরণি দিয়ে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে ঢুকলে বাঁ-হাতি প্রথম গলি দিয়ে কিছুটা এগোলে ডানদিকে...'

'অ্যাম্বুলেন্স নয় শ্যামলদা। ব্যাটারা আদৌ আসবে কিনা! তার চেয়ে বরং একটা ট্যাক্সি...'

শিবাজী বেরিয়ে গেছে আগেই। এমনি না আসে, পেট্রল-পাম্পের স্ট্যাণ্ডে ড্রাইভারের ঘুম ভাঙিয়ে হল্লা বাঁধিয়ে ধরে আনতেই হবে একটাকে। কিছুই যখন বড় নয় একটা জীবনের চেয়ে।

কানাই মল্লিক লেনের নিরিবিলি রাত্রিটা ভীষণভাবে নাড়া খেল। উত্তাপ বা ধোঁয়ার গন্ধে যেমন, খুপরি ছেড়ে ঘুমের চোখে বেরিয়ে এল মক্ষিকারা, নানান বয়সের হরেক মানুষ। এইট-বি বাই ওয়ান বাড়ির সদরে জটলা। ভেতরেও ঢুকলেন কেউ কেউ। পায়ে পায়ে উঠে এলেন ওপরে—'সে কি! খোকন! আমাদের খোকন! জম্মো থেকে তো দেখে আসছি ওকে। পাড়ায় এমন-একটা ভালো ছেলে! ব্রাইট ইয়াং ম্যান...'

ট্যাক্সিই এল প্রথম। প্রায়-মৃত অচেতন দেহটাকে ঘর থেকে বের করার মুহূর্তে রেণুবালার গলায় কান্নার স্বরটা হঠাৎ যে-সুরে যে-ভাষায় বদলে গেল, প্রতীক্ষার মানুষগুলো আনত হলেন সমবেদনায়। বলা তো যায় না কিছুই—বিধিরনতিক্রম্য।

পাঁচজোড়া হাতের ভেলায় ভাসছে শরীরটা। ঘর থেকে বাইরে, দোতলা থেকে একতলায় অবতরণ চেষ্টায় সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির ধাপে ধাপে পাঁচজন সবল যুবক ঘর্মাক্ত যখন, প্রতিবেশীদের বেদনাঘন নীরবতায় জননী উন্মাদিনী। পিছু পিছু ছুটে আসতে চাইছেন রেণুবালা। প্রায় অপ্রতিরোধ্য। তাঁর আর্তনাদে, আড়াই ফুট তিন ফুট দূরে ঘনিষ্ঠ দেয়ালে দেয়ালে আহত প্রতিধ্বনি দৃশ্যের গভীরতায় দুর্ঘটনার চেয়ে যখন আরো মর্মঘাতী, চোখের জল সংক্রামিত হলো। কাঁদলেন অথবা নীরবে চোখ মুছলেন দূরবর্তী মানুষজনেরাও।

এবং তখন, প্রতিবেশী গুঞ্জন বা সোরগোল থেকে দূরে, ছাদে ওঠার সিঁড়ির একান্তে, দু-হাতে মাথা চেপে বসে পড়েছিলেন সত্যসাধন। বধিরতায় নিঝুম—জল যেখানে ফ্রিজিং পয়েন্টে শাদা পাথর হয়, এমন কি চোখের জলও। ঘুম চেয়েছিলে বুড়ো? ঘুমের লোভ।

অ্যাম্বুলেন্স এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওদের এভাবে বিব্রত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন সকলেই। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যবর্তী ফারাকটা এত সঙ্কীর্ণ মাঝে মাঝে, অটোমবাইলের তীব্র গতিও ঈশপের গল্পের সেই খরগোশ। অনুমান সূত্রে, সংশ্লিষ্ট রোগী তখন হয়তো পৌঁছে গেছে হাসপাতালে।

এরও পরে জরাগ্রস্ত পাড়ার-ডাক্তারকে নিয়ে ফিরল কৃষ্ণা। চিকিৎসাও হলো। আত্মঘাতীর নয়, আহত মাতার। ওদের ট্যাক্সিটা গর্জন তুলে বেরিয়ে যাবার পর সদরের চৌকাঠে সেই যে লুটিয়ে পড়েছিলেন রেণুবালা, দু'হাতের শক্ত মুঠোয় আর দাঁতের কামড়ে তখনো চোখ খোলেন নি। তাঁকেও বয়ে আনতে হয়েছে তিন-জোড়া হাতের ভেলায়। ঘর থেকে বাইরে নয়, বাইরে থেকে ঘরে। জলের পর জল ছিটিয়ে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেবার পরও দানবশক্তির ভর বুড়ির দাঁতে আর হাতের মুঠোয়। শুধু মাঝে মাঝে প্রেসার-কুকারে স্টিম-ছাড়ার শব্দে রুদ্ধশ্বাস উগরে তোলার ধ্বনি। বুড়ো ঘোষ-ডাক্তার নাড়ি টিপে ধরলেন, বুকের স্পন্দন শুনলেন স্টেথিসকোপে—'মায়ের মন! এ-তো হবেই। গার্ডিনাল দাও আট ঘণ্টা পর পর একটা করে। কিন্তু এ-সব কাগজে লিখে দেওয়াও বিপদ আজকাল। কোত্থেকে ত্রিশ-চল্লিশটা কিনে এনে লজেন্সের মতো টপাটপ মুখে পুরে বসবে কে! সে-আরো মারাত্মক। আরে বাপু, এ-কি আর ক্ষুদিরাম ভগৎ সিং-এর মরণ?'

একা ঘরে গড়াতে গড়াতে বাচ্চা মেয়েটা কখন পড়ে গিয়েছিল পালঙ্ক থেকে। ইতিপূর্বে সে পড়েওছে বারকয়েক। কিন্তু এবারের কান্নায়, বড়দের ক্রন্দনপ্রলয়ে তাকে ধরার ছিল না কেউ। কোলে তুলে নিয়েছিল প্রতিবেশী এক যুবক। বৌদির হাতে তুলে দিতেই সুনন্দা তার সন্তান নিয়ে নিজের ঘরে।

কলকাতা তখন এক মৃত নগরী। দুরূহ কল্পনাতেও যখন অবাস্তব মনে হয়, ঘণ্টা দশেক, ঘণ্টা পাঁচেক আগেও সুপ্রাচীন দ্বিপ্রহরে অথবা সন্ধ্যায় এই নগরী লক্ষ লক্ষ মানুষের পদচারণার কলরবে প্রাণময়তায় সজীব ছিল, সেখানে, অবলুপ্ত নগরীর নৈঃশব্দ্যকে দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে ধাবমান গতিবেগে বাকসো-ভর্তি তিনজন মানুষ মৃত্যুকে কোলে নিয়ে বিষাদে নির্বাক। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি মাপের স্বাস্থ্যবান এক যুবকের দেহকে যেখানে শায়িত রাখার পরিসর নেই, অথবা চেতনাহীন বলেই যা সম্ভব—বিবিধ কায়দায় ভাঁজ করে পেছনের দিকে পিঠ আর মাথাটা দু হাতে আগলে রয়েছে শিবাজী, হাঁটু-ভাঙা পায়ের অংশে প্রতাপ।

দুপাশের নির্জন এবং স্থাবর প্রাসাদশ্রেণীকে ডানে বাঁয়ে রেখে নিঝুম আলোকমালার মধ্যবর্তী সোজা সরলরেখায়, প্রশস্ত রাজপথের শূন্যতায় ট্যাক্সিটা ছুটছিল। যেন অবাঙ্গালি বয়স্ক ড্রাইভারও বুঝে গেছে—একটি জীবনের জীয়নকাঠি তার পায়ের তলার অ্যাকসিলেরেটর।

ড্রাইভারের সঙ্গীসহ সামনের সিটে শ্যামল সিগারেট নিয়ে শান্ত। আকস্মিক দুর্বিপাকে যা হয়, হতচকিত প্রাথমিক চঞ্চলতার পর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে স্থিরতায় স্বাভাবিক হতে সময় লাগে। মেনে নেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই, এমন-কোনো সর্বনাশা সিদ্ধান্ত খোকনের! ওর প্রথম অথবা সর্বশেষ, হয়তো-বা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জীবনের।

হাতের সিগারেটটা তখন আর নেশার টানে নয়, ভেতরের অস্থিরতায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখার খেলনা। দুরন্ত ট্যাক্সির সঙ্গে পাল্লায় সেই অস্থিরতা আরো, আরো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। প্রায়-আধাআধি জ্বলন্ত সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে লক-করা ট্যাক্সির

দরজায় দু-হাতের ভাঁজ রেখে মাথা লুকোয়। প্রগাঢ় নিশ্বাস—নিজেদের পারিবারিক বৃত্তে আঁতিপাতি খুঁজেও এমন কোনো অনুপুঙ্খ হেতুর সন্ধান নেই। এ-হেন একটা ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কিত সুদূরতম কোনো ঘটনার সূত্র।

মাসখানেক ধরে নাকি ভীষণ বদলে যাচ্ছিল ছেলেটা—মন-মরা উদাসীন। মা বলেছিলেন। সুনন্দাও। কিন্তু কেউই কিছু আমল দেয়নি তেমন।

প্রায় মরুভূমির শূন্যতায়, প্রশস্ত রাজপথে অ্যাকসিলেরেটরে আরো বেশি চাপ বাড়ে। লজঝর কলকব্জায় বীভৎস চিৎকার। অচেতনকে কোলে নিয়ে পেছনের সিটে নিঝুম প্রতাপ আর শিবাজী।

শ্যামল মাথা তুলল। ঘাড়ে ব্যথা ধরে যায় এভাবে উবু হয়ে থাকলে। গাড়িটা প্রচণ্ড বেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে হাসপাতালের দরজায়, যখন শেষ মুহূর্তে ডাক্তারসমীপে সমর্পণের পর সহোদর সম্পর্কে শেষ বাক্য শ্রবণের প্রতীক্ষা।

খোঁচা লাগে। অথবা ভয়। সল্ট লেকে তার ফ্ল্যাটের কাজকর্ম অনেকদূর এগিয়ে গেছে। গৃহনির্মাণের তৎপরতায় প্রায় আধাআধি পৌঁছে গেছে কো-অপারেটিভ। সুনন্দা আর বাচ্চাকে নিয়ে তার আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা যখন প্রায় পাকা, খোকন কি অন্য কিছু ভেবেছিল? তাই বা কেন হবে? ফ্ল্যাট-কেনার ব্যাপারে সে বৌদিকে উৎসাহ দিয়েছে প্রতিদিন। এক বছর ধরে বাবা-মার সঙ্গে বিবাদে দাদার দিকে তার অকুণ্ঠ সমর্থন।

তবে কি শিপ্রা? ত্বরিতে ভাবনাটা মোচড় খায়।

বেপরোয়া ড্রাইভার চড়া-স্পিডের মাথায় ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘোরাতেই হাসপাতালের বড় ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছে গাড়ি। জড়বৎ দেহটাকে সামলাতে গিয়ে যখন একই সঙ্গে পেছনে চেঁচিয়ে উঠল প্রতাপ আর শিবাজী।

নির্বিকার শ্যামল এত বড় একটা ঘটনার উৎস খুঁজে পাবার চেষ্টায় মরিয়া। রক্তে রক্তে দাহ। একটি মেয়ের সঙ্গে ওর আজ প্রায় বছর কয়েক প্রতিদিনের ঘোরাঘুরি। বাড়িতেও এসেছে। গান শুনিয়েছে বৌদিকে। গান তেমন আহা-মরি কিছু না হলেও মেয়েটি নাকি সত্যি ভালো। সুনন্দা বলছিল। দর্শনে এম. এ. পাশ করার পর চাকরি খুঁজছে। কলেজেই বাসনা, তবে যদি বৌদির স্কুলেই একটা দিদিমণিগিরি জুটে যায়, দারুণ মজা।

প্রবল গর্জনে গাড়িটা এসে হুমড়ি খেল এমার্জেন্সির দরজায়। দেহরক্ত কাঁপিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি আচমকা এবং দরজা খুলে দমকা বেরিয়ে আসার পর দরজাটা ঠেলে দেবার বীভৎস আওয়াজে শ্যামলের সুতীব্র ক্রোধ। তার চেতনায় একটাই শব্দ তখন—কাওয়ার্ড, স্কাউন্ড্রেল নাম্বার ওয়ান...

কৃপণতা ছিল না কোথাও। চারপাশে অজস্র আলো ছড়িয়ে প্রকাণ্ড ছায়াচ্ছন্ন ম্যানসনগুলি। আলোকোজ্জ্বল এমার্জেন্সির পাদদেশে অভাবনীয় এক রাতের অভিজ্ঞতা—জীবন আর মৃত্যুর আশ্চর্য সহবাসে মানুষ যেখানে সত্যি কাঙাল।

গভীর রাতের হাসপাতালে সে আসে নি কোনোদিন। প্রথম অভিজ্ঞতাই বড় নির্মম—সংশয়বিদ্ধ সহোদর।

অথচ পাড়ার সমাজসেবী, নিজেরই খুড়তুতো ভাই প্রতাপ শিবাজী বড়ই অভ্যস্ত সেক্ষেত্রে।

চকিতে, ট্যাক্সিটা থেমে যাবার পর, প্রতাপ একাই হাসপাতালের ভৌতিক নীরবতাকে লণ্ডভণ্ড করে ভেতর থেকে নিয়ে এল জনাতিনেক তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষ। অচেতন শরীরটাকে স্ট্রেচারে তুলতে তুলতে ঘুমের চোখে চোয়ালভাঙা লম্বা হাইয়ের মুখে আঙুলের তুড়ি বাজিয়ে ওদেরই একজন—'কী কেস দাদা? খতম না সুইসাইড?'

শ্যামল ভ্রূকুঞ্চিত।

'এ-শ্‌শালা বালাড নেই। ফলিডল না ট্যাবলেট?'

'আবে শালা, দেখচিস না তসবির? ট্যাবলেট কেস। আজ শনিবার। তাই ত ভাবচি, রাত কাবার শালা, একটার বেশি কেস নেই?'

যদিও বিরক্তি, বলার কিছু নেই। নিখুঁত কায়দায় বডিটাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়েছে ওরা। শিবাজী ঝাঁঝিয়ে উঠল—'কী হচ্ছে তোদের? মানুষটা মরছে। আর তোরা...'

ভ্রূক্ষেপ নেই। হাসছে ওদের একজন—'তাই ত দেখচি দাদা। শনিবার হল কি বাবুদের বিষ গেলার হিড়িক। পিরিত মহব্বৎ কি কসম। মেয়েছেল্যার কেস হয় ত, ব্যস, রগড় বহুৎ। কিস্যা, কিস্যা দাদা। মজাদার সব কিস্যা কহানি...'

লোকগুলো তাদের রসমশকরায় ঠিকঠাকই করে যাচ্ছে সব কিছু এবং সময়ের অপচয় হচ্ছে না জেনেও যখন সক্রোধে ফেটে পড়ার মুহূর্ত, কোনোভাবেই নিজের লাঞ্ছিত শরীরটাকে ক্ষেপিয়ে তোলার সুযোগ পেল না শ্যামল। স্ট্রেচারটা তুলে নিয়ে ওরা ভেতরে চলে যাচ্ছে। এবং পেছনে পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে ভাইয়ের মুখ দেখল সে। অন্য এক ভাই। স্যান্ডো গেঞ্জি আর পায়জামায় যেমন ছিল, সেভাবেই শায়িত দেহ। প্রতিদিনের নিয়মে শেভ করেছিল আজও। পরিচ্ছন্নতায় নিষ্পাপ। স্ট্রেচারের দোলায় দুলছে মৃদু মৃদু। ঘুমোচ্ছে মনে হয়। ঘুমই তো। ঘুমের ট্যাবলেটে ঘুমই তো থাকবে চোখে। কিন্তু সে ঘুম

অবশেষে এই প্রথম, পলকহীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে শক্ত রাখার ভণ্ডামিটা ভেতর থেকে ভেঙে ভেঙে পড়ে। পেট আর বুকের দুর্দম খিঁচুনি থেকে টনটন চোখের পাতায় সিক্ত প্রলেপ।

ভেতরে, এমার্জেন্সির লাউঞ্জে কোমর-উঁচু একটা ট্রলির ওপর স্ট্রেচারশুদ্ধু খোকনকে শুইয়ে দেবার পর, কোথায় ছিলেন অতি তরুণ দুজন ডাক্তার, হয়তো হাউস-স্টাফ, হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সেখানে।

পকেট থেকে রুমাল বের করেও যখন একই স্থবিরতায় চঞ্চলতা নেই, আলোয় আলোয় উজ্জ্বল ঝকঝকে শাদা দেয়াল বা অদূরবর্তী ট্রলিতে খোকনকে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার দৃশ্য সবই ঝাপসা। তাকিয়ে থাকে শ্যামল এবং নিষ্কম্প তাকিয়ে থাকার মৌনে ঝাপসা থেকে আরো ঝাপসা হতে হতে খোকন যখন পুরোপুরি মিথ্যে হয়ে যাবার সত্যে পৌঁছে যেতে থাকে, ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ে না সহোদরকে। দীর্ঘ সাতাশ বৎসরব্যাপী পাশাপাশি বড়-হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ায় আলাদাভাবে মনে পড়ে না বিশেষ কোনো দিন বা রাত্রি, যেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মিনিট-সেকেন্ডের সমাহারে একটাই মুহূর্ত এখন, বিবর্ণ অতীত।

বাঁ-হাতের কব্জি টেনে, চোখের পাতা আর বুক-পিঠের হিসেব নিয়ে কয়েক মিনিট মাত্র

ওঁদের দেখাদেখি। হঠাৎ ত্রস্ততা। ট্রলিটা ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওপাশে দেয়ালের দিকে। এপাশে ফিরে তাকালেন একজন হাউস-স্টাফ—'কী খেয়েছে বলতে পারেন?'

শ্যামল আগাপাশতলায় ধাক্কা খেল। গোটা শরীরের ঝাঁকুনি নিয়ে ব্যস্ততায়—'লার্গাক্টিল্...'

'কত?'

'ফিফ্‌টি মিলিগ্রাম..'

'ঠিক বলছেন?'

'কয়েকটা লেবেল এনেছি...' দ্রুত পকেটে হাত। খুঁজেপেতে গোটাতিনেক সোনালী রাংতা। লেবেলগুলো হাতে নিয়ে কী দেখলেন যুবক। পকেটে রাখলেন—'কটা খেয়েছে জানেন?'

'ওর বিছানায় অনেকগুলো ছেঁড়া লেবেল ছিল...'

'তবু অ্যাপ্রক্সিমেটলি...'

'ত্রিশ চল্লিশ...'

'কখন খেয়েছে?'

'সে-তো বলতে পারব না...' শ্যামল ঘামছে। রুমালে কপাল মুছতে হয়—'আমরা যখন টের পেলাম রাত তখন প্রায় দুটো...'

'কেন?'

শ্যামল বিব্রত—'জানি না।'

পুরো ট্রলিটা লিফটের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে। তদারকি সেরে ডাক্তাররা চলে যাচ্ছিলেন। আকুলতায় দ্রুত ছুটে গেল শ্যামল—'ডাক্তারবাবু...'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন তরুণ ডাক্তার।

'কী বুঝছেন ডাক্তারবাবু?'

'ডিস্টার্ব করবেন না। ওদিকে যান। নামধাম লেখান। কার্ড করুন।'

লিফটের দরজা বন্ধ হলো। ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে খোকন। চারদিকের গাঢ় শীতলতায় যখন সামান্য ধাতব ধ্বনিটুকুও বুকে-পাঁজরে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে, আলোকিত লিফটের শূন্যতায় কলাপ্সিবল-গেট-টানা অন্ধকার গুহা মৃত্যুর চেয়েও কালো, এক জটিল গহ্বর। দুদিক থেকে ছুটে এসে প্রতাপ আর শিবাজী ধরল তাকে—'বড়দা, বড়দা আসুন এদিকে, বসুন...'

তখনো কান্না নয়। দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল শ্যামল। কিছুটা অপ্রতিরোধ্যতায়। এবং লিফটের শূন্যতায় সম্মুখবর্তী অন্ধকার গুহার দিকে নির্নিমেষ চোখ রেখে রুমালে ঘাম মোছার অছিলায় আসলে চোখজোড়াই ঘষে নিল। শরীরে মোচড় দিয়ে টলতে টলতে পিছু ফিরল, যেখানে অনেক মানুষের বসার আসন। অসংখ্য বেঞ্চি। হয়তো উদ্বেগ কাতরতায় কুশলকামীদের মস্ত ভিড় দিনের বেলায়। গভীর রাতে ফাঁকা। আলোর পতঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো চঞ্চলতা নেই। হয়তো-বা একটা টিকটিকি ডাকলেও এ-মুহূর্তে কৃতজ্ঞ থাকা যেত প্রকৃতির কাছে।

'আপিশে যান আপনারা। নাম লেখান।'

শ্যামল চমকে তাকাল। ক্লাশ-ফোর-স্টাফ, হাসপাতালের কর্মী। কিছু একটা বলল মনে হয়। শব্দগুলো আউড়েই লোকটা চলে যাচ্ছে।

ভীরুগলায় ডাকল শিবাজী—'বড়দা...'

'হুঁ...'

প্রতাপ আর শিবাজীই পৌঁছে দিল। কাগজপত্র-ফাইলের স্তূপ সত্ত্বেও তিনটে টেবিলে লোক নেই। অদূরে পাখার তলায় দাবা খেলছেন দু-জন ভদ্রলোক।

'আসুন আসুন, বসুন...' প্রতিপক্ষকে কিস্তিতে কোণঠাসা করতে পারার সুখে হয়তো একটু খুশিই ছিলেন নাইট ডিউটির কেরানিবাবু। অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাঁ দিক থেকে রেজিস্টার টানলেন। জিভে আঙুল ঠেকিয়ে দ্রুত পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে দাবার দিকেই চোখ।

টেবিলেব এপাশে পাশাপাশি বসল ওরা তিনজন।

নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলে টেবিল-চাপা দিলেন ভদ্রলোক। দু ছিলিম নস্য নাকে গুঁজলেন বিকট গর্জনে। অতঃপর কলম টেনে—'বলুন এইবারে, পেশেন্টের নাম?'

'উৎপল দাশগুপ্ত।'

'ফাদার?'

'সত্যসাধন দাশগুপ্ত।'

'ঠিকানা?'

'এইট-বি বাই ওয়ান কানাই মল্লিক লেন। কলকাতা সাতলক্ষ ছয়।'

'মেল না ফিমেল?'

ইচ্ছে হলো, খেঁকিয়ে উঠে আচ্ছাসে একটু সমঝে দেয় লোকটাকে—ইয়ার্কিরও সীমা আছে একটা। নিজেকেই সামলে নিয়ে শ্যামল আস্তে বলল—'মেল...'

'জানি জানি মশাই, আকার নেই। সে-আমার লেখা হয়ে গেছে...' খাতা থেকে মাথা তুলে তাকাল লোকটা। নাকের লোমে নস্যির ড্যালা ঝুলছে, ওপরে-নিচে গোটা কয়েক দাঁত নেই। সুতরাং হাসিটাও অদ্ভুত—'আমার ন'দার মেজমেয়ের আবার ঐ নাম। বুঝলেন কিনা, বড্ডো খাসা মেয়ে। খড়্গপুরে থাকে। বাবাজির আবার রেলের চাকরি। হ্যাঁ বলুন, বয়েস?'

'সাতাশ।'

'কী হয়েছে? কেন এনেছেন এখানে?'

গলার স্বরে কিঞ্চিৎ জড়তা। শ্যামল রুমালে কপাল মুছল, ঘাড়গর্দানা—'ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল।'

'সে-ত সবাই খায় মশাই আজকাল। ঘুম কি আর আছে নাকি দেশে? বলুন, অ্যাটেম্পট টু কমিট সুইসাইড...'

শ্যামল চুপ।

'দেখে ত বেশ উঁচু বংশের লোকই মনে হয় আপনাদের। সাতাশ বছরের ছেলে সুইসাইড করল কেন, কী হয়েছিল?' দাবার পার্টনার দ্বিতীয় ভদ্রলোক এবার কৌতূহলী।

'জানি না।' শ্যামলেরও ঝাঁঝালো গলা! কিন্তু সংযত। নানা কাজে এ-লোকগুলোকেই তো দরকার এখন।

'কোন্ থানা?'

শ্যামল অনুজদের দিকে নীরক্ত তাকাল—'থানা। থানা কেন?'

'পয়জনিং কেস মশাই। এ-শালা মরলেও মরণ, বাঁচলেও মরণ। পুলিশ যাবে বাড়িতে। খোঁজখবর নেবে...'

হ্যানোতেনো আরো গোটাকয়েক প্রশ্নের পর প্রথম ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিলেন। অ্যাডমিশনের তারিখের সঙ্গে সময়ও নথিভুক্ত হয় হয়তো—'পেশেন্ট কে হয় আপনার?'

'ভাই।'

'নিজের মায়ের পেটের ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'নিন সই করুন।' রেজিস্টার এগিয়ে দিয়ে আবার নস্যির কৌটো টেনে নিয়েছেন ভদ্রলোক এবং কলম বাগিয়ে শ্যামলকে স্বাক্ষরের জন্য কুণ্ঠিত দেখে ক্ষেপে গেলেন—'কী মশাই! কী হল? করুন সই...'

নিরক্ষর কেড়ে নিয়েছে উচ্চশিক্ষিতের জমি। শ্যামল বেকুব। যেখানে, যে-লাইনে তার দস্তখত দেবার কথা, ঠিক তার ঊর্ধ্ববর্তী পংক্তিতে বড় কালো জামের আকারে একটা টিপসই রেখে গেছেন কোন্ অভিভাবক, যার প্রায় অনেকটাই শ্যামলের জায়গা।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে, উবু হয়ে ভদ্রলোকও চটে গেলেন দেখে—'অ্যাই, এ-হল সব ওই ফলিডলওয়ালাগুলোর কাণ্ড। জাতমুখ্যু গেঁয়ো কতগুলো। এই ভরসন্ধেবেলা গোসাবা না কোত্থেকে মশাই, বছর পনেরর একটা বাচ্চা বউকে নিয়ে এসে হাজির। বউটা ফলিডল খেয়েছে...'

'ফলিডল।' শ্যামল চমকে উঠল—'মেয়েটা কোথায়?'

'সে-কি আর থাকে...' লোকটা নিরাসক্ত—'নৌকা বাস রেলগাড়ি সব ঠেঙিয়ে এখানে এল সন্ধেবেলা। অ্যাডমিশনের পর-পরই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অক্কা...'

যেন মর্গের শীতলতায় ওরা তিনজন, তিন ভাই স্তব্ধ।

'ডোম মশাই, শ্মশানের ডোম সেজে বসে আছি এখানে। দেখছি তো সব...'

নাইট ডিউটির চাকুরে সঙ্গত হাই তুললেন। লম্বা হাইয়ের মুখে আঙুল বাজিয়ে তিন তুড়ি—'রক্তফক্ত থাকে ত মার্ডার-কেস। কেউ কাউকে খুন করল। ও-শালাদের বুঝি। রক্ত না থাকে ত সুইসাইড দাদা, ব্লাডলেস্ মার্ডার। এ-যে কী করে হয়...'

'এরকম কেস কত আসে আপনাদের কাছে?' গাবদা টিপসইয়ের পাশে নিজের স্বাক্ষর রেখে শ্যামল মাথা তুলল।

'হরবকৎ। দিন-দিন ত বেড়েই যাচ্ছে...'

'এরা তো বেঁচেও যায় কেউ কেউ?'

'নসিব, বুঝলেন, সব এই কপাল...' ভদ্রলোক কপালে আঙুল ঠুকলেন—'সাধ করে নিজেরাই নিজেদের খুন করছে। আমি আপনি করবটা কী? ডাক্তারের চৌদ্দপুরুষের সাধ্যি নেই, এমন-সব কেস...'

দস্তখতটা পরখ করে ভদ্রলোক মোটা খাতাটা বন্ধ করলেন। নিঝুম ঘরে শব্দটা ভীষণ জোরে বাজল। নস্যির কৌটোটা টেনে, কৌটোর মাথায় তর্জনীর টোকা মারতে মারতে দাবার দিকে চোখ ফিরিয়ে কিছুটা আলগাভাবে—'এখানেই থাকবেন। যাবেন না কোথাও।'

'কেন?' উৎকণ্ঠ শ্যামল।

'ডাক্তারবাবুরা ডাকবেন। স্টেটমেন্ট দিতে হবে।'

নৈরাশ্যে দীর্ঘশ্বাস। ফিরে যেতে যেতে শ্যামল কী ভেবে থমকে দাঁড়াল—'একটু উপকার করবেন?'

'বলুন।'

'পেশেন্টকে ওপরে নিয়ে গেল...'

'তাই তো নেবে।'

'এখন কেমন আছে? ডাক্তারবাবুরা কী মনে করছেন?'

'সে-কি মশাই! ট্রিটমেন্ট চলছে। বাঁচবে কি মরবে তাই নিয়ে যুদ্ধ। এখন কে যাবে খোঁজ করতে? ভালো কথা ত মশাই আপনাদের...' দাবার ওপর ওত-পাতা চোখ দুটো খেঁকিয়ে উঠেছে এবার এবং আবার ঘুঁটির রণসজ্জায় চোখ ফেলে—'ডাঃ কে পি ভাদুড়ির আন্ডারে অ্যাডমিশন। যান, যান, ভাগ্যি ভালো আপনাদের। খুব নামজাদা বড় ডাক্তার। চেম্বারে গেলে চৌষট্টি টাকা ভিজিট...'

দাবার পার্টনার বেখাপ্পা ভারিক্কি লোকটা—'বাইরে অপেক্ষা করুন। খারাপ কিছু হয় তো এক্ষুনি খবর পাবেন। তলব পড়বে আপনাদের...

'আর?'

'আর কী! ভগবান করুন, তেমন কিছু যদি না হয়, রাত জেগে বসে থাকতে হবে। ভোর হলে ভালো মন্দ কিছু একটা শুনতে পাবেন।'

বোঝা গেল না কিছুই। ধোঁয়া। আস্তে আস্তে পিছু ফিরল শ্যামল। প্রতাপ আর শিবাজীর পাশাপাশি পা ফেলে নিঃশব্দে, আবিষ্টের ঝোঁকে। কাঁধের দু দিক থেকে ঝোলানো হাত দুটোকেই যেন বড় বেশি বাহুল্য মনে হচ্ছে আপাতত। এত রাতে, ঘুম-ছুটে-যাওয়া চোখে সিগারেটও বিস্বাদ। পেটের মধ্যে একটা খিঁচুনি, যাকে হয়তো-বা অসম্ভব একটা ক্ষিধে বলেই ভ্রম। অথবা বুকের পাঁজরায়, স্নায়ুতে অসহ্য যন্ত্রণা! ভয় ভালোবাসা অথবা শুধুই উদ্বেগ! নিজের কাছেই নিজের শরীরটা দুর্বোধ্য যখন, অস্থিরতা বাড়ে। নানাভাবে স্মৃতিময় হয়ে উঠতে চায় খোকন। খোকনের মুখ! টুকরো-টাকরা ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো ছবি। পারিবারিক টানাপোড়েনে ইদানীং যে-সব ঘটনা, সেখানে নিজের বা সুনন্দার ভূমিকাকে যত বেশি স্বার্থভাবনা বলে মনে হতে থাকে, আরো নিবিড় হয়ে ওঠে একমাত্র সহোদর। ঝুটঝামেলায় কোথাও ছিল না ছেলেটা। ধুম্‌ধাড়াক্কা গোছের একটু অতিরিক্ত রকমের বেপরোয়া। মাঝেমধ্যে দু-চার দিন মুখে রুমাল চেপে গন্ধ নিয়ে ফিরেছে রাতের দিকে। কবুলও করেছে বৌদির কাছে—'ও-কিছু না। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে শখে একটু-আধটু। ভয় পেয়ো না। খুব খারাপ লোক নই। আই নো মাই ব্যালেন্স...'

আসলে আততায়ী ছলনার মতো হাসপাতালের উজ্জ্বল আলো আর ভৌতিক স্তব্ধতা, অথবা

রঙচঙে প্রসাধনে উৎকট মহিলারা যেমন, চারপাশের অফুরন্ত আলোর জেল্লায়, বারান্দার সুদীর্ঘ প্রসারে, উঁচু উঁচু দেয়ালে রঙের গন্ধে, পরিবেশের রমণীয়তায় ভয় বাড়ে।

দুঃসহ ভুতুড়ে বাড়িটা। মর্গের শীতলতা।

ভয়ঙ্কর বীভৎস একটা চিৎকার চাই কোথাও। মৃত্যুর যন্ত্রণায় সেটা যদি শেষ আর্তনাদও হয় কারুর, তবু।

শ্যামল থমকে দাঁড়াল। দেয়ালের সঙ্গে মাখামাখি সেই অন্ধকার কালো গুহায় লিফটটা নেমে এসেছে কখন! বাইরে দেয়াল ঘেঁষে লম্বা ট্রলিটা আবার কারো প্রতীক্ষায়। কেউ আসবে, আসবেই জেনে ত্রিকালজ্ঞের মতো স্থির।

এই শয্যায় সর্বশেষ শায়িত ছিল খোকন। এখন ওপরের দিকে দোতলায় তিনতলায় চারতলায় কোথাও! চিকিৎসা চলছে। মরতে চাওয়ার আর মরতে-না-দেবার দ্বন্দ্বে মানুষে-মানুষে লড়াই। অসুখ নয়, কোথাও অসুখী ছিল সে-যুবক।

অতিবৃদ্ধের মন্থরতায়, আনত ভঙ্গিতে দাঁতে বুড়ো-আঙুল কামড়াতে কামড়াতে শ্যামল আপন মনে হাঁটে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস সত্ত্বেও যখন দম বন্ধ হয়ে আসে, বাইরে যদি নিশ্বাস থাকে কোথাও! প্রতাপ আর শিবাজী আসে না। বিড়িসিগারেটের জন্য ওদেরও নিভৃতি প্রয়োজন। ওদেরও রাত-জাগা।

এক্ষুনি যদি কোনো সংবাদ নেমে না আসে ওপর থেকে, যদি এই রাত-জাগার ক্লান্তি আর অবসাদে, স্নায়ুচাপে আরো বেশি সহনশীল করে তোলা যায় নিজেদের, তবেই নাকি ঊর্ধ্বে, তিনতলা চারতলার কোনো ওয়ার্ডে কোথাও আস্তে আস্তে জীবনে ফিরে আসতে পারে খোকন। এ-রকমই কী যেন একটা বলেছিলেন হাসপাতালের কেরানিবাবু, বুড়ো লোকটা! ত্রিকালজ্ঞ লিফটটা তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। ওর উঠে যাওয়ায় ভয়, নেমে আসায় একই ভীতি। রক্তে রক্তে, শিরায় শিরায় কাঁপুনি। যে-কোনো মুহূর্তেই নেমে আসতে পারে সংবাদ—মুছে গেছে নাম। প্রায় দু-হাজারী মাসমাইনের ব্রাইট ইয়ংম্যান উৎপল দাশগুপ্ত নেই...

অসম্ভব। হয় না, হতেই পারে না, ইম্‌পসিবল...

কেউ যেন পেছন থেকে জোর করেই ঠেলে দিল বাইরে। বড় দরজাটা পেরিয়ে হাসপাতালের বিশাল প্রাঙ্গণে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই, এক ঝলকে মনে হলো, কিছুটা স্বস্তি। কলকাতা ঘুমোয় এখানে। ধ্বনিহীন স্পন্দনহীন জনমানবশূন্যতায় নিজের নির্জনে আরো একবার সিগারেটের কথা ভাবল সে, যখন, অদূরবর্তী ছায়াচ্ছন্ন পামগাছগুলি, বিপুল অন্ধকারে দগদগে পোড়া ঘায়ের মতো আলোয় আলোয় হাসপাতালের প্রাসাদ-ম্যানসনচূড়া তাকে ঘিরে আরো বেশি রহস্যময়। কলকাতার বিরল দৃশ্য—নক্ষত্রময় আকাশ ভিন্ন এই মুহূর্তে বামদক্ষিণে অন্য কোনো চিত্র নেই, শুধুই ঊর্ধ্বলোক।

অথচ এই ঘ্যাম্‌-মারা নৈঃশব্দ্যকে একদম সইতে পারত না খোকন। হৈচৈ-হল্লার বাইরে ভব্যতা-সভ্যতার কেতাবিপনায় ওর গা-ঘিনঘিন রাগ।

চাকরি পাবার পর একটিই শখের জিনিস কিনেছিল ছেলেটা—দামি স্টিরিও সেট। অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে বাছাই-বাছাই কিছু হিন্দী ফিলমী গানের রেকর্ড। শ্যামল নিজেও বিরক্ত

কখনো-সখনো। বাবা-মা সাবালক ছেলের দৌরাত্ম্যে অসহায়। ছুটে যেত সুনন্দা আর কৃষ্ণা। এমন-কি, শিপ্রাও নাকি ওদের দলে। তর্ক বিতর্ক, ভয়াবহ বাকযুদ্ধ। সেখানেও কিছু তত্ত্ব থাকত খোকনের—'এককালে গ্রামের সঙ্গে যোগ ছিল মানুষের। এই ধরো না, এই কলকাতা শহরেও গাছ ছিল অনেক। গাছে গাছে পাখি ছিল। ঢালাও অবসর ছিল, স্তব্ধতা ছিল। একটা 'সেন্স অব সায়লেন্স' ডেভেলপ করত মানুষের। কোমল গান্ধার, শুদ্ধ পঞ্চম না নিষাদ-ফিষাদ মাথামুণ্ডু কী সব বলো তোমরা, ও-সবের একটা মানে ছিল। সেতার-সরোদের টুং-টাং, তোমাদের ওই রবিঠাকুরের প্যানপ্যানানি চলতে পারত। এখন আর চলে না ওসব। নয়েজ-পলিউশন বোঝো! বোমা-পটকা মিটিং-মিছিল টেক্‌নলজির তুমুল হল্লা। স্রেফ আওয়াজ। আওয়াজে আওয়াজে কানের পর্দা এমনভাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে তোমাদের বাচ্চাদের, সায়লেন্স-ফায়লেন্স থাকছে না কিছু। কেনেস্তারা না পেটালে মিউজিক-ফিউজিক বলে কিছু ঢুকবেই না কানে। মেয়েকে নিয়ে তুমি কোথায় পালাবে বৌদি? সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে?'

এলোমেলো স্বভাবের মাথামুণ্ডু নেই কোথাও! এ-বাজারে এখনও নিয়মিত বই পড়ত ছেলেটা! রাত জেগে বই-পড়ার নিয়মিত অভ্যাসে ঘরের আলো জ্বালা থাকতেই পারে! আশ্চর্য! তবু যে কেন হঠাৎ খটকা লাগল বাবার! রক্ষে কিছুটা! হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে আসা গেল তবু! তারপর

শ্যামল সর্বাঙ্গে মোচড় খেল। ঘর্মাক্ত শরীরে দাহ

মোহনবাগান রক্তে, ক্রিকেটটা অ্যাকাডেমিক, ফিল্ম-সোসাইটিতে সাম্প্রতিক উৎসাহ

'ফিল্মোৎসবে যাবে বৌদি? শাহানশা এক পার্টি আসে আমাদের ব্যাঙ্কে। টিকিট দেবে বলেছে। গদারের নাম শুনেছ? ত্রুফো ফেলিনি বেয়ারম্যান? ধ্যাৎ, কী যে তোমাদের মেয়েদের লেখাপড়া! কোনো মানেই হয় না। উত্তমকুমার, অমিতাভ বচ্চনের বাইরে ইন্টারন্যাশনাল হতে পারো না। ঝানুসি কে জানো? বলো তো, কোন্ দেশের লোক? শুনের নামটা অবিশ্যি আমিও জানতাম না। নতুন শুনছি...'

হঠাৎ, যেন অবচেতনের তলায় চকিত বিদ্যুৎ—কোথায় যেন একটা পাবলিক টেলিফোন দেখলাম এক্ষুনি! এই মাত্র

টেলিফোনটাই স্মরণ করিয়ে দেয় টেলিফোনটা এই মুহূর্তে সর্বাধিক জরুরি। দায়িত্ববোধেই আবার ফিরতে হলো এবং খুঁজেও পাওয়া যায় তাকে। এমার্জেন্সির প্রবেশমুখে বাঁ পাশের দেয়ালে। কিন্তু নতুন সংকট। টেলিফোন-বাকসোটার গায়ে কাগজ সেঁটে বড় বড় লাল কালির হরফ—আউট অব অর্ডার।

কোত্থেকে ছুটে এল শিবাজী প্রতাপ—'টেলিফোন করবেন? আসুন আমার সঙ্গে। চলে আসুন...'

বাবরি-চুল লম্বা জুলপির দাপট। আবার সেই ঘরে নিয়ে গেল ওরা, যেখানে প্রায় সব শাদা আর কালো, জীবন আর মৃত্যুর ঘুঁটি ছকের চৌকো থেকে সজীবতা হারিয়ে পরিত্যক্ত। প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে গা এলিয়ে কাত হয়ে নাক ডাকছেন। ঘাড়টা ছটা-বেজে-পাঁচ-মিনিট গোছের ঘড়ির কাঁটার মতো। অন্য জন টেলিফোনের অনুমতি দিয়ে টেবিলে দু-হাতের কনুই রেখে মাথা

নুইয়ে পড়লেন।

'মানে কী?' মানে কী এসবের? এখানে মাকে পাঠানো মানে? এটা একটা হাসপাতাল...'

অস্পষ্ট দূরভাষে সুনন্দা—'কী করব! রাখা যাচ্ছিল না। পাড়ার ছেলেরা ট্যাক্সি ডাকতে গেছে...'

'রাখা যাচ্ছিল না! ইয়ার্কি নাকি? এখানে ওসব কান্নাকাটির প্যালা সামলাবে কে?'

'আঃ, যা জিজ্ঞেস করছি, বলো না! খোকন?'

'ট্রিটমেন্ট চলছে। হতাশ হবার মতো কিছু ঘটেনি এখনো। আশ্বস্ত হবার মতোও কোনো খবর নেই...'

'একটা চিঠি পাওয়া গেছে ওর...'

'চিঠি! কার চিঠি? খোকনের?'

'ওর বালিশেই, ওয়রের ভেতর গোঁজা ছিল...'

'কী লেখা আছে ওতে?'

'কিছু না। তিনটে মাত্র শব্দ। মাকে লেখা—মা ক্ষমা করো।'

অবশ রিসিভারটা ঝপ করে খসে পড়ল স্বস্থানে। ঝনঝন শব্দ বাজল বোবা ঘরটায়। তন্দ্রাচ্ছন্ন দুটো মানুষ শুনল কিনা, বোঝা গেল না। প্রতাপ শিবাজীও উদ্‌গ্রীব। ওদের সাহস নেই প্রশ্ন শুধোবার।

বধির শ্যামল। শাদা দেয়ালের স্তব্ধতায় অপলক তাকিয়ে থেকে এবার সত্যি-সত্যি সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের আগুনটুকু হাত ঝেড়ে নেভাতে নেভাতে, মৃদুতায় পা ফেলে এগোবার নির্জন ভাবনায়...এত কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত সেই তো প্যাচপেচে বাঙালিপনা! ইডিয়ট। চিঠিটা মাকে লেখা। শিপ্রাকে নয় কেন? বিট্রেয়ার...

প্রত্যাশিত ছিল—বুনো মোষের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ছুটে এসে আরো একটা গাড়ি হুমড়ি খাবে হাসপাতালের দরজায়। এবং গাড়ির শব্দে, কতগুলো মানুষের চঞ্চল কোলাহলে বোবা রাতটা আরো একবার নাড়া খেতেই কৌতূহলে ছুটে গেল প্রতাপ শিবাজী। শ্যামল সংক্ষিপ্ত পা ফেলে কিছুদূর অব্দি।

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। সমগ্র অস্তিত্বের কাঁপুনিতে স্তব্ধ বনে যেতে হয়।

ট্যাক্সি নয়, অ্যাম্বুলেন্স। শাদা গাড়ির গায়ে করুণাঘন খৃষ্ট-প্রতীক লাল যোগচিহ্নকে পরিহার করে রক্ত, অনর্গল রক্তস্রোত। স্ট্রেচারবাহিত রমণীদেহকে পাশ ঘেঁষে নিয়ে যাবার মুহূর্তে শ্যামল সইতে পারল না। ছিটকে সরে এল ফাঁকা বেঞ্চিগুলোর দিকে। কোনোরকমে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে, মাথায় হাত রেখে নিজেকে সামাল দেওয়া। এক পলকে মুখটাকেও দেখে নেওয়া যায় নি। সিঁথির সিঁদুর আর পায়ের আলতায় কত আর লাল হতে পারেন একজন মহিলা! যদি গোটা শরীরে ফিনকি তুলে রক্তাক্ত হতে হয়?

লিফটের আলোটা জ্বলে উঠেছে। একই ভাবে একই স্ট্রেচারে রক্তাক্ত মহিলা উঠে যাচ্ছেন ওপরে। সিঁড়ির যেদিকে ফিমেল-ওয়ার্ড। যার বিপরীতে কোথাও খোকন, কোনো বারোয়ারি শয্যায়, যেখানে শুয়ে শুয়ে আজই অথবা গতকাল অথবা ইতিপূর্বে অন্যান্য দিনে ধুঁকে ধুঁকে

মরে গেছে অনেক পুরুষ।

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রতাপ এল—'বড়দা দেখেছেন? উঃ, কী জানোয়ার...'

শ্যামল উত্তাপহীন। ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকাল।

'ঘুমোচ্ছিল মেয়েছেলেটা। একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কুপিয়েছে ওর হাসব্যান্ড। বুকে পেটে পিঠে যেখানে পেরেছে। ভাগ্যিস গলাটা ছেড়ে দিয়েছে।'

'ও-শ্-লা...' উত্তেজনা সামলাতে পারে নি শিবাজী। ছোট্ট করে জিভ কাটল প্রতাপের দিকে তাকিয়ে। লজ্জায় বিনম্র হলো—'পালাতে পারে নি হারামি লোকটা। রামপ্যাঁদানিতে বাপের নাম ভুলিয়ে পুলিশে দেবে বলে আটকে রেখেছে পাড়ার লোক। বাদবাকিরা বৌটাকে নিয়ে এসেছে এখানে। ও বাঁচবে না। বছর পাঁচেকের একটা মেয়েও নাকি আছে...'

'হুঁ...' সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে নড়ে উঠল শ্যামল! উঠে দাঁড়াল—'তোরা তো অনেকক্ষণ ধরে আছিস। বাড়ি যাবি নাকি?'

'বাড়ি!' ওরা দুভাই-ই অবাক—'কী বলছেন? খোকনের কী হলো, জানাই গেল না এখনও...'

'কী আর হবে! হবে এদিক ওদিক একটা কিছু...' খুড়তুতো ভাইয়ের কাঁধে নিস্পৃহ হাত রেখে শ্যামল—'মাকে নিয়ে ওরা তো এসে পড়বে এক্ষুনি। ইচ্ছে করলে ওই ট্যাক্সিতেই তোরা ফিরে যেতে পারিস।'

ওদিকে অফিস ঘরের সামনে তখনও আহত মহিলার হিতৈষী প্রতিবেশীদের হৈচৈ। শ্যামল সেদিকেই এগোল পায়ে পায়ে। মরা-মানুষের মতো ঠাণ্ডা রাতটা ভাঙছে। জনাকয়েক মানুষ। কিছুটা উত্তাপ। কিঞ্চিৎ স্বস্তি।

সুতরাং প্রত্যাশার ট্যাক্সিটা এসে পৌঁছল, যখন কোনো নাটকীয়তা নেই, অথবা গাড়ি থেকে নেমেই উদভ্রান্ত রেণুবালা যেভাবে ছুটে এসে সেই মুহূর্তের নরকের প্রহরী, জ্যেষ্ঠসন্তানকে জড়িয়ে ধরে আকুল হলেন, খুব একটা বিসদৃশ তাণ্ডব মনে করল না কেউ। পারিপার্শ্বিকতায় রক্তের চিৎকার তখনও সজীব।

'খোকন কোথায়? আমার খোকন? কী হলো, কিছু বলছিস না কেন তোরা?'

শ্যামল শান্তভাবে—'ট্রিটমেন্ট চলছে। যাও, ভেতরে গিয়ে বোসো...'

'ওকে দেখেছিস তুই? বল্, আমাকে বল্...'

'আঃ, অত কথা হয় না এখানে! বলছি তো, চিকিৎসা চলছে। ডাক্তারবাবুরা বেরোননি এখনও...'

'মিথ্যে বলছিস না তো রে! বল্, আমার দিকে চেয়ে বল্—খোকন ভালো হয়ে উঠছে? ঠাকুর ঠাকুর...' অনির্দিষ্ট ঊর্ধ্বে করজোড় তুলে প্রার্থনা রেণুবালার। ছেলে বাঁচলে বাবা তারকনাথের মাথায় জল দেবেন শেওড়াফুলি ঘাট থেকে বাঁক বয়ে নিয়ে।

আরো একটা স্ট্রেচারই প্রয়োজন হয়তো, কিন্তু এমত প্রস্তাবে সরকারি অনুমোদন নেই জেনে শ্যামল দুহাতে ধরল তার মাকে। ছোটবোন কৃষ্ণার সঙ্গে ধরে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইল দূরের বেঞ্চিগুলোর দিকে, যেখানে শেষ রাতের নির্জনতায় কেউ নেই, থাকার কথাও নয় কারুর।

পশ্চাদবর্তী সত্যসাধন নির্বাক। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার অবসাদে হুমড়ি খাবার ভয়। অপরিচিত দেয়ালের গায়ে সবগুলি সুইচ জ্বালিয়ে-নিভিয়ে প্রতীক্ষার ঘরে গোটা তিনেক পাখা সচল করল শিবাজী। পাখার তলায়, বাতাসের স্নিগ্ধতায় ঘরের-বৌ সুনন্দা ছাড়া পুরো পরিবার। রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে খবর দেওয়া হয় নি বড় মেয়ে শুভ্রাকে। ভোর হলে সুনন্দা টেলিফোন করে সাবধানে তাপসকে জানাবে। ওদিকে বিপদ, তৃতীয় কিস্তিতে শুভ্রা এখন চার-মাসে।

যে-যন্ত্রণায় ঘরে তিষ্ঠোতে পারছিলেন না রেণুবালা, হাসপাতালে পৌছনোর পর সেটা আরো বিস্তৃত হলো। নিশ্বাসে নিশ্বাসে ভেতর থেকে প্রতিটি শব্দকে টেনে তোলার কাতরতায়, ধ্বনির উচ্চারণে লম্বিত ঝোঁক—'খোকন এমন করল কেন রে শ্যামু? তোরা জানিস? বল্ না আমাকে, বল্। কিসের দুঃখু ওর?'

অনেকটা প্রলাপ বিবেচনায়, যেন শব্দগুলোর কোনো অর্থ নেই, জেনে, পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে মানুষগুলি মাছের মতো সরে সরে যেতে চায়। অথবা সেই একই প্রশ্নের ধাক্কায়, ধাঁধায়, দিশেহারা সকলেই ভিজিটর্স রুমের বাইরে বা ভেতরে এলোমেলোভাবে নির্বাক।

টানা-টানা বিলম্বিত প্রশ্বাসের মন্থরতায় রেণুবালা আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়েছেন বেঞ্চির দৈর্ঘ্যে। দেখল সবাই। বলল না কিছু। সতর্ক এবং নিবদ্ধ দৃষ্টিগুলি—যেন হাতের পাতায় আঙুলগুলো বেঁকে বেঁকে মুঠোয় এসে না পড়ে। চোখ বুজে এলে ঠোঁটের ভেতর আঙুল ঠেলে পরখ করতে হবে দাঁতের পাটি। বুড়ির শরীরে তখন পালোয়ানের জোর। অস্থানে সামলানোর দায়।

শুধু কৃষ্ণা, কন্যা বলেই হয়তো অথবা উপস্থিতদের মধ্যে একমাত্র মেয়ে বলেই মায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভেজা-কাপড়ের আঁচলটা বুক ঢেকে টেনে দিল পরিপাটিতে। সংসারে সন্তানদের সামনে ব্লাউজফ্লাউজ খুব একটা পরেন না রেণুবালা। ট্যাক্সিটা চলে আসার আগে ভেজা-কাপড়টা পাল্টে দেওয়া যায় নি কিছুতেই এবং যিনি গা-ঢাকার স্বভাব ভুলেছেন, তাঁর ব্লাউজফ্লাউজ বড় সহজে খুঁজে পাওয়াও যায় না আলনায়-আলমারিতে। তাড়াহুড়োয় যেটা এল, ছেঁড়াফাটা বড্ড পুরনো।

এবং কৃষ্ণা, সেই একই ভাবে আটপৌরে শাড়ি-শায়া-ব্লাউজে, যেভাবে ঘুমিয়ে ছিল মায়ের পাশে। অথচ বুকের ছোটজামা ছাড়া বাইরে চলতে-ফিরতে এত অস্বস্তি একজন উনিশ বছরের যুবতীর—অবকাশ ছিল না ভাববার। বেরোবার আগে চুলে একটু চিরুনি অব্দি সম্ভব হয়নি। প্রায় পুরো ঘরটাই তখন ঘরের বাইরে, ঘরের চেহারায়।

ট্যাক্সিতে ওদের সঙ্গে এসেছে পাড়ারই দুজন যুবক—মান্তা আর বিজয়। কিছু পরে আরো জনা পাঁচেক এল পায়ে হেঁটে। হঠাৎ-ঘটনার অদ্ভুত একটা মজা বলে নয়—স্তম্ভিত বেদনায়। ওরা খোকনের সমবয়সী, পাড়ার বন্ধু।

কান্নাকে বুকে নিয়ে রেণুবালা, এই প্রথম, ছেলেদের দিকে তাকিয়ে গোপন ঈর্ষায় নিজেকে লুকোতে চাইলেন, যা কান্নার ভাষায় উদাত্ত করে তোলা যায় না কখনো। শুধু নিজে নিজেই দগ্ধে মরতে হয়—এত এত তাজা জোয়ান ছেলে। কারুর তো এমন সব্বোনেশে ভীমরতি লাগে নি মাথায়। এমন বুকপোড়ানি জ্বালায় জ্বালায় জ্বলতে হচ্ছে না অন্য কোনো মাকে। তবে কেন

খোকন, শুধুই খোকন...

হয়তো-বা এমনি এক আত্মপীড়নে নিঃসঙ্গ সত্যসাধন। মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়লে পার্থিব ঐশ্বর্যে নির্মোহ মানুষ যেমন শুধু প্রাণের কথাই ভাবে, শুধু আত্মরক্ষার—লাল লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবিটা চড়িয়েই কোনোরকমে চলে এসেছেন এবং আসার পর কণ্ঠস্বর ভুলেছেন। মানসিক ধৈর্য আর দেহের সচলতায় বিচ্ছেদ। হীন অপরাধবোধে কুণ্ঠিত বিবেক—ঘুমের ওষুধের প্রেসক্রিপশনটা তাঁর জন্যই এসেছিল ঘরে।

চারপাশটা অতর্কিতে চঞ্চল হয়ে উঠতেই ছেলেরা দল বেঁধে কোথায় চলে গেল। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার ঘরে 'তুমি মা-র কাছে একটু থাক বাবা, আমি আসছি...' বলেই যখন কৃষ্ণাও দ্রুত সরে যাচ্ছে, স্থাণু সত্যসাধন, যেন মেয়ের চলে-যাওয়ার টানেই চৌকাঠবিহীন দরজা পর্যন্ত এগোলেন। অদূরে লিফটের কাছাকাছি জটলায় কোটপ্যান্টের কোনো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে শ্যামল। হয়তো ডাক্তার।

সুতরাং দুরন্ত টান! কিন্তু এগোতেও পারেন না। এদিকে শরীর ভেঙে উঠে বসতেও রেণুবালার পিঠে কোমরে হাড়গুঁড়োনো ব্যথা। বেঞ্চিতে দু হাতের ভর রেখে কোমরের ভিতের ওপর শরীরটা তুলে নিতে যখন দেহের ভাঁজটা কৌণিক, চারপাশের বিহ্বলতায় আলুলায়িত জননী

ছুটে গিয়ে ধরতে হয় তাঁকে এবং বার্ধক্যের শিথিলতায় দুহাত বাড়িয়ে দিতেই, যেন ছুঁয়ে বা ছোঁয়া পেয়ে দু-জন বাতিল মানুষ, প্রজন্মের অতীতে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে, একজনের চোখের আলোয় অন্যজনের চোখের পর্দায় নিজেদেরই অন্বেষণে ভিন্নতর এক বেদনায়, সর্বাংশে মিথ্যে হয়ে যাবার দুঃখে বা কাতরতায় আস্তে আস্তে শীতল থেকে শীতলতর হতে হতে শক্ত বরফ হয়ে আসে। তখন কান্না। নতুন করে আছড়ে পড়ে রেণুবালার দিশেহারা আর্তনাদ। হাসপাতালে পাতালে মৃত্যুর শীতলতা তছনছ হয়ে উঠলেও ওপাশ থেকে ছুটে এল না কেউ। ডাক্তারের সঙ্গে সংলাপ বুঝি এখন, এই মুহূর্তে, অনেক বেশি জরুরি।

স্ত্রীর প্রতি সান্ত্বনায় অথবা সেবায় অসহায় সত্যসাধন এক নিকৃষ্ট অপরাধীর দীনতায়। বুঝি তাঁর মগজের মধ্যে ক্রিয়াশীল ভাবনাতরঙ্গগুলি বিচিত্র গতিতে সঞ্চারিত হয়ে চলে গিয়েছিল রেণুবালার স্নায়ুতে, গভীরে। ঠিক এই হাসপাতালেরই ওদিকে কোথাও, মেটার্নিটি ওয়ার্ডে অন্য একদিন। গ্রীষ্মকাল। দারুণ গরম। বৈশাখ মাস। ইংরেজির এপ্রিল। আঠারই এপ্রিল, উনিশশো পঞ্চান্ন। খোকন বলত—লেনিনের মাস। আমি লেনিনের চেয়ে চার দিনের বড়।

'সিস্টার তাড়াতাড়ি একটা রাইল্‌স্‌ টিউব...একটা ফিফটি সি সি...'

রাতের শেষ প্রহরে অচেতন শহরের সমস্ত ঘনীভূত স্তব্ধতা এখন এখানে। একটি নিশ্বাসের ধ্বনিও দীর্ঘায়িত হলে বাতাস কেঁপে উঠতে পারে। দু জন ডাক্তার, যেন যাদুকর, এবং একজন নার্স জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী এক নিস্পন্দ দেহকে ঘিরে। কুঞ্চনহীন শাদা বিছানায় শায়িত সেই মানবদেহের আপাতত কোনো ধর্ম নেই, জাত নেই, জাতিসত্তা নেই, শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য নেই। নামহীন

পরিচয়হীন নিতান্তই একটি যুবক, একজন মানুষ।

এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সারিবদ্ধ রোগীরা নিদ্রিত যারা, জানল না কেউ। যারা বিনিদ্র, সজাগ চোখে কৌতূহলী।

যাদুকরের আঙুল যেমন, দ্রুতলয়ে খেলছিল ডাক্তারদের হাত—'জল, জল সিস্টার। গামলা, কই?'

শশকের সচলতায়, যেন মুহূর্তের অবকাশ নেই, নার্স চকিতে ছুটে গেলেন। গ্যাস-সিলিন্ডার জ্বলছে। জল ফুটছে অবিরাম। তাকে শীতলতায় সহনশীল করে তুলতে যতটুকু সময়।

তরুণ হাউস-স্টাফ ডাঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি বন্ধু সহকর্মী ডাঃ কৃষ্ণেন্দু মাইতিকে পাশে নিয়ে যখন আরো ঘনিষ্ঠ মনোযোগে লম্বিত দেহে অবশিষ্ট প্রাণের সঞ্চয় পরখ করছেন

প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। নার্স ভদ্রমহিলা একটা বড় গামলায় ঠাণ্ডা জল রেখেই, একই ত্বরিতব্যস্ততায় শাদা উঁচু ট্রেতে লম্বা প্লাষ্টিকের নল, একটি ফিফটি সিসি সিরিঞ্জসহ অয়েন্টমেন্টের টিউব নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যখন

অভিজিৎ চট করে এক পিস পরিচ্ছন্ন গজ হাতে নিয়েছেন। গজের ওপর টিউব থেকে কিছুটা জেলি মেখে নিতে নিতে —'ফ্লুইড-সেট রেডি করুন সিস্টার। ডিপ্‌ক্যাথ দেবেন। মনে রাখবেন, বেশ কয়েকদিন ফ্লুইড চলবে এখন।

'পিয়ারু...'

ওয়ার্ড-বয় পিয়ারু ছুটে এল।

'অক্সিজেন নলটা লাগাও জলদি। হারি-আপ্‌...'

এবং জরুরি নির্দেশের সঙ্গেই নিঃশব্দে হাতের সুচারু সতর্ক কারুকলা। জেলি-মাখানো গজটা রাইল্‌স্‌ টিউবের প্রান্ত ধরে টেনে আনলেন অভিজিৎ

এককালীন বেগবান প্রাণতপ্ত মানবযৌবন এক্ষণে ল্যাবরেটরির গিনিপিক। তরুণ ডাক্তার কৃষ্ণেন্দু বেডের বাঁ-দিকে ঘুরে গিয়ে শায়িত দেহের থুতনি চেপে ধরলেন নিষ্ঠুর বাঁ-হাতে এবং অন্য হাতে মাথাটা চেপে রইলেন টান-টান সজোরে

সাদরে, নির্মম মমতায় ডাঃ অভিজিৎ পিচ্ছিল নলটা নাকের ফুটোয় ঠেলে গুঁজে দিতেই মরণকামী সেই যুবক, কী এক দুঃসহ যন্ত্রণায় কেঁপে উঠার সঙ্গে সঙ্গে খকখক কাশির গমক

এবং খননকর্মে দেহাভ্যন্তরে প্রাণের শব্দ ধ্বনিত হবার পর অভিজিৎ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন মাত্র এবং পরক্ষণেই, অর্ধচেতন সেই যুবক কিছুটা শান্ত হয়ে এলে একই অনুরাগে আবার ভালোবাসার নির্যাতন। দ্বিতীয় প্রয়াসে নলটা ঢুকতে থাকে নাসারন্ধ্রের ভেতর দিয়ে কণ্ঠনালীর সুরঙ্গ ভেদ করে, আস্তে-আস্তে বুক পেরিয়ে একেবারে পাকস্থলীর অন্তঃপুরে। বেশ সহজেই ঢুকে গেল লম্বা নলের তিন-চতুর্থাংশ। রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠার হলঘরে সচল পাখার বাতাসও নিশ্চল মনে হয়। প্রতিদিনের অভ্যস্ত চোখে অল্পবয়সী যুবতী নার্সও কী মুগ্ধতায় অথবা মর্মান্তিক মৌন আর্তনাদে দেখছিল একজন যুবকের মুখ। কাজের মধ্যেও ঘাড় ফিরিয়ে একবার তার দিকে তাকিয়েছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি। মেয়েটি কেঁপে উঠেছিল। আসক্তি নয়, আরো একটা বাজি খেলার নেশা? প্রতিদিন দেখতে হয়। এত নিষ্ঠা এত চেষ্টার পরও জীবন অথবা মৃত্যু! কিন্তু এই যুবক

কেন জন্মেছিল তবে? জীবন যদি এতই বিষাদ!

যথাস্থানে নলের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পরীক্ষায় বড় সিরিঞ্জটায় খানিকটা হাওয়া ভরে নলের মুখে এঁটে দিয়েছেন অভিজিৎ, এবং কৃষ্ণেন্দু স্টেথোটা রাখলেন বুকের কিছুটা নিচে, ডানদিকে। নলের বাতাস ঠেলতেই কৃষ্ণেন্দুর ভ্রূ-নাচানো ইঙ্গিত—অল রাইট, ঠিক আছে। পৌঁছেছে ঠিক জায়গায়...

এবার সিরিঞ্জে টান। উঠে এল কিঞ্চিত ঘোলাটে কালো জল। বিষ।

'টেস্টটিউব, টেস্টটিউব সিস্টার...'

নার্স তৈরিই ছিলেন। দুটো টেস্টটিউব এগিয়ে দিতেই সিরিঞ্জের অন্তর্বর্তী তরল পদার্থকে দুটো ভাগে সাজালেন অভিজিৎ। নার্সকে—'স্ট্যান্ডে রাখুন, আমি গিয়ে লেবেল করছি।'

এর পর সিরিঞ্জ-ভর্তি জল গামলা থেকে তুলে নিয়ে নলের ভেতর চালান দিলেন দেহের গভীরে, পাকস্থলীতে। সহকর্মী কৃষ্ণেন্দুকে—'একেকবারে দুশো আড়াইশো সি সি জল নিয়ে তবে টানবি...'

নিবিড় মমতায় আরো কিছু কাজ, যেন ফুল ফোটানোর কারিগর অভিজিৎ এবং কৃষ্ণেন্দু নিজেদেরই বয়সের সীমায়, নিশ্চিতভাবে দুচার বছরের কনিষ্ঠই হবে হয়তো, যুবককে তার পৃথিবীর ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার চেষ্টায়, প্রাণান্ত শ্রমে যখন সব কর্মকৌশল পূর্ণ করে চিকিৎসার প্রতিক্রিয়ার দিকে উন্মুখ

রাত্রিশেষে বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। শুধু দৈহিক অবসাদ নয়, হাসপাতালের বারান্দায় খোলামেলা বাতাসে দাঁড়িয়ে কিছুটা নিশ্বাস নেবার তাগিদ। অভিজিৎ তার সহকর্মীর কানে কানে—'এমার্জেন্সি ডিরেকশনগুলো ঠিকমতো দিয়ে দিবি। আর শোন্, নার্সকে বরং দুটো অ্যাম্পিউল্ লাসিক্স শট-এ দিয়ে দিতে বল্...'

কৃষ্ণেন্দু ঘাড় নাড়ে। এমার্জেন্সির বহুবিচিত্র কাতরতাকে দুপাশে রেখে বেরিয়ে এলেন অভিজিৎ, বারান্দায়, যেখান থেকে গোটা হাসপাতাল তথা কলকাতার আদিগন্তে অন্ধকারের কালোয় ইতস্তত আলোর ফুল। নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। হাতে সিগারেট ফুরোয়।

ডাঃ কৃষ্ণেন্দু এসে দাঁড়ালেন পাশে—'কি করবি? তুই যাবি নাকি নিচে? না, আমি যাব?'

'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কিছু একটা বলে আসতে হয় ওদের।'

কৃষ্ণেন্দুই নেমে এলেন। শ্যামল এবং অন্যান্যরা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল ব্যাকুল ত্রস্ততায়।

'এখন বেশি ডিস্টার্ব করবেন না। চেষ্টা তো চলছে। সাধ্যমতো চেষ্টা করছি আমরা...'

'তবু ডাক্তারবাবু, তবু...'

'আর কিছুক্ষণ দেরি করে ফেললে আমাদের কিছু করারই থাকত না...'

'কিন্তু এখন! এখন কী বুঝছেন?'

'বলছি তো, চেষ্টা চলছে। উই আর ট্রায়িং আওয়ার বেস্ট। আটচল্লিশ ঘণ্টা না কাটলে ডিসাইডেডলি কিছু বলা যাচ্ছে না...'

আটচল্লিশ ঘণ্টা? স্তম্ভিত বিস্ময়ে মানুষগুলো যখন সমবেতভাবে মূঢ়তায় নির্বোধ, যেন আটচল্লিশ ঘণ্টার বিকল্প শব্দ—নিরবধি কাল। ডাঃ কৃষ্ণেন্দু মাইতি জানালেন—'খুব বেশি ভিড়

করবেন না। দু-চারজন, পেশেন্টের খুব ক্লোজ যাঁরা, মা বাবা কি ভাইবোন ওপরে উঠে আসুন একটু বাদে। কথা আছে।'

কিন্তু তখনই প্রতীক্ষার ঘরে রেণুবালার আর্ত চিৎকার। ছুটে গেল সকলেই এবং ভিন্নতর এক রোগিনীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হলো। নাভিমূলে যেন সেই একই যন্ত্রণা। অনেক, অনেক বছর আগে এই হাসপাতালেরই কোথাও, অন্য কোনো ওয়ার্ডে গ্রন্থিতে মোচড় খেয়ে খেয়ে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনো এক চরম মুহূর্তের ঘর্মাক্ত শ্রমে যেভাবে এ-শিশুকেই সূর্য উপহার দিতে চেয়েছিলেন একদিন

অদূরে, প্রায়ান্ধকার বেঞ্চিতে পিঠ ঠেসে স্থবির ভাস্কর্যে সত্যসাধন। আঁতুড়ের বাইরে অসহায় স্বামী যেমতি নির্বোধ।

রাত্রিশেষে ভোরের আলোয় কিছুটা প্রাণের উত্তাপ পেল মরা মানুষগুলি। রেণুবালাকেই পাঠালেন সত্যসাধন। সঙ্গে শ্যামল আর কৃষ্ণা।

'কী হয়েছিল বলুন। কেন?'

'জানি না।'

'উনি কে হন আপনার?'

'ভাই। ইনি আমাদের মা। এ ছোট বোন...'

'বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

'বাবা। আমার স্ত্রী, বছর তিনেকের একটি মেয়ে...'

'আপনাদের ফ্যামিলি হ্যাজার্ডের এমন কিছু, যা থেকে...'

'ইমপসিবল্...' শ্যামল একটু অতিরিক্ত জোর দিল শব্দটার ওপর—'ছোটখাটো ট্রাবল যদি কিছু হয়, সেখানে খোকন...মানে উৎপল নেই। ভেরি মাচ ইনডিফারেন্ট...'

'চাকরিবাকরি বন্ধুবান্ধব কোথাও কিছু...'

'বিশ্বাস করুন...' মাথার এলোমেলো চুলে আঙুল বুলিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত শ্যামল। অস্থির—'প্লিজ ডু বিলিভ, এ-রকম সিরিয়াস কিছু যে ঘটতে পারে, ভাবতেই পারি না আমরা কেউ। আমি ঠিক এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না...'

'বিহেভিয়ারে কানো রকম অ্যাবনর্মালিটি দেখেছেন কখনো?'

'কক্ষনো না। কিছুদিন থেকে কেমন একটু গম্ভীর। সে-ও তেমন কিছু না...'

'কতদিন? রাফলি...'

শ্যামল বিপাকে। তাকাল বোনের দিকে। কৃষ্ণা—'এই ধরুন মাসখানেক...'

'জিজ্ঞেস করেন নি কিছু?'

'বড্ড ইনট্রোভার্ট। এমনিতে তো বলে না কিছু। জিজ্ঞেস করলেও এক কথা —কিছু হয় নি...'

'সাইকিয়াট্রিস্ট কন্‌সাল্ট করেছেন কখনো?'

দিশেহারা শ্যামল চঞ্চলতায়—'না না, তেমন-কোনো ঘটনাই ঘটে নি...'

'মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা?'

মায়ের ডানে বাঁয়ে ওরা ভাইবোন পরস্পরের দিকে তাকাল।

এবং রেণুবালা—'না, ডাক্তারবাবু না...' গলার স্বরটা নিঝুম রাতে চিৎকৃত কাংস্যধ্বনি। বিনিদ্র রাতের উৎকণ্ঠায় তিনি নিজেই অসুস্থ তখন। তাঁকে বসতে দেওয়া হয়েছিল একটা চেয়ারে। ভেঙে পড়লেন—'খোকন আমার তেমন ছেলে নয়। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা কি বলছেন? চোখ তুলে তাকায়ই না কারুর দিকে...'

ডাঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি এবং ডাঃ কৃষ্ণেন্দু মাইতি দুজনই ব্যস্ত হলেন—'আপনি উতলা হবেন না ওভাবে। আমরা তো চেষ্টা করছি। আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি...'

এবং সরাসরি চোখ পড়তেই শ্যামল—'ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি সি কামস্ টু আস। অ্যাট লিস্ট ওয়ন্স অর টোয়াইস্ এ মান্থ। এ নাইস গার্ল...'

'নাথিং রং উইথ দেম' ...অতর্কিতে, মনে মনে ইংরেজি বাক্যটা মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে কৃষ্ণা চাপা উত্তেজনায়—'আই উড হ্যাভ নোন ইট, হ্যাড দেয়ার বিন এনি...'

'কী বলছিস রে তোরা? ইংজিরিতে...' রেণুবালা ভয় পেলেন। কম্পিত স্বরে, চোখের চাউনিতে আতঙ্ক—'কী হয়েছে ডাক্তারবাবু? কী হলো আমার খোকনের?'

'ভাববেন না। নিজের শরীরটা আরো খারাপ করবেন না ওভাবে...' ডাক্তাররা ঘনিষ্ঠ আরো—'বলছি তো, চেষ্টা করছি। সাধ্যমতো চেষ্টা চলছে আমাদের...'

'না বাবা, আমার খোকন...' আবার কান্না। আঁচলে মুখ ঢেকে রেণুবালা যখন হেলে পড়েছেন বাঁ দিকে, চেয়ারের হাতলে

'মা আ আ আ...' নুয়ে পড়ে, মাকে দুহাতে জাপটে ধরে কৃষ্ণার অনুচ্চ আর্তি অথবা নিজেরই কান্না

ডাক্তাররা বিমর্ষ হলেন—'ঠিক আছে। আর বেশি ডিস্টার্ব করব না আপনাদের। বাকি দু-চারটে কথা ওঁর সামনে বলাই ভালো...'

দেহমনের অবসাদে শ্যামল তখন ঘোরতর নাস্তিক। উদাস ভঙ্গি।

'উনি চাকরিবাকরি কিছু করেন?'

'ব্যাঙ্কের অফিসার...'

'মাই গুডনেস! সে-তো দারুণ চাকরি...'

'হ্যাঁ, টোটাল ইমোলুমেন্ট আঠার শো-র কাছাকাছি...'

পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়ে স্তম্ভিত দু জন ডাক্তার বদলে গেলেন নিজেদের মধ্যে—' সংসারে অশান্তি নেই, মাইনেও প্রায় দু-হাজারের মতো! অ্যান্ড এ গ্রেসাস লেডি অ্যাজ গার্ল ফ্রেন্ড। তাহলে?'

'জানি না।'

'কোনো পুলিশ কেস? লোকাল মস্তান কিংবা ধরুন হাই স্যোশাল পজিশনের কোনো ভি. আই. পি.-র সঙ্গে ইন্‌ভল্‌ভমেন্ট?'

'জানি না।'

'পলিটিকস করতেন?'

'শুনি নি কখনো। বাইরে থেকে তো মনে হতো না কিছু...'

'তাহলে তো বোঝা গেল না কিছুই। এ-তো শুধু আপনাদের জন্যেই নয়, আমাদেরও জেনে নেওয়া দরকার, ভদ্রলোক আদৌ আমাদের পেশেন্ট কিনা। আমরা তো শেষ পর্যন্ত আছি। অবশ্যই আছি। তবু একবার বুঝে নিতে হবে হোয়েদার ইট ইজ এ কেস অব মেন্টাল ডিসঅর্ডার, না-কি শুধুই কোনো স্যোশাল কজ। এনিওয়ে, লেট আস ড্রপ ইট হিয়ার...' কৃষ্ণেন্দু রেণুবালার দিকে তাকালেন—'উনি বড্ড সিক্ ফিল করছেন।'

অভিজিৎ বললেন—'ওষুধ লিখে দিচ্ছি। এনে দেবেন। এক্ষুনি নয়, দোকানপাট খুলুক...'

ডাক্তাররা যখন নিজেদের প্রত্যাহার করে নিতে উদ্যত, শ্যামল তার নির্জীবতা থেকে ত্বরিত সচলতায় আরো একবার—'এখন কি রকম বুঝছেন ডাক্তারবাবু?'

কৃষ্ণেন্দু ঠোঁট ভাঙলেন। ঠিক হাসি নয়, দোকানির খদ্দের-ভুলোনো প্রসন্নতার ভঙ্গিতে পেশাগত আচরণ—'দেখুন এটা এমার্জেন্সি ওয়ার্ড। এখানে যাদের নিয়ে আসা হয়, সবই খুব সিরিয়াস কেস। চট করে বলা যায় না কিছু। তবে আপনারা যা বলছেন, যদি লার্গাকটিলই খেয়ে থাকে, আর যদ্দুর মনে হচ্ছে, এখানে আনার ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের আগে খায় নি। অল্প বয়স, হার্ট কন্ডিশনও ভালো। মনে তো হচ্ছে, লড়ে যেতে পারবে। তবু হোপ ফর দ্য বেস্ট। আমরাও লড়ে যাচ্ছি। দুটো দিন অন্তত সময় দিন আমাদের। কোঅপারেট করুন...'

দুটো দিন! হিসেবটা আবার সেই আটচল্লিশ ঘন্টার! নিরবধি কালের ব্যাপ্তি! নতুন কোনো আশ্বাস জুটল না যখন, ওরা দাদা আর বোন দু-হাতে দু-দিকে ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলল ওদের মাকে। যেন খুনের আসামী, এদেরই ভাই বা দাদা বা সন্তানকে কাঠগড়া থেকে আরো একবার জেল-কাস্টডিতে ফিরিয়ে দিলেন হাকিম। রায়-দান এখনো স্থগিত।

বাইরে তখন ভোরের আলো। সেলোফেন কাগজে মোড়া কলকাতা। হাসপাতালের গাছে গাছে প্রথম কাকের ডাক। দূরে গ্রীক স্থাপত্যের ঋজুতায় বলবান ম্যানসনের চূড়ায়, কার্নিশে কার্নিশে সারি বেঁধে কয়েক শো পায়রা।

বিস্তীর্ণ করিডরে, মসৃণ মেঝেয় পা হড়কে যাবার ভয়ে, সাবধানে, জরাজীর্ণ রুগ্ন মাকে ধরে ধরে ওরা এগোয়। যেন একই ভাবে একই ভাষায় একটা ভাবনাস্রোত ওদের অন্তর্গত নৈঃশব্দ্যে। আজকের দুর্দৈব এ-সকাল কেন কালকের মতো নয়? আচম্বিতে কেন এমন অঘটন! এ-কোন্ অলক্ষ্মীর কোজাগরী!

দাঁত চেপে অঘটনকে মোকাবিলার সাহসেই ওরা আরো নিবিড় করে মাকে জড়িয়ে হাঁটে দুজন। স্বাধীনতার ক-বছর আগে মাস-পাঁচেকের শ্রমে নিষ্ঠায় শাদা মার্কিন থানের ওপর নানা রঙের শাড়ির-পাড়-তোলা সুতোয় তাদের মা বহুবিচিত্র মস্ত একটা কাঁথা সেলাই করেছিলেন যৌবনে। সন্তানরা কেউই শুতে পায়নি কোনোদিন। নিজের সৃষ্টিকর্মের প্রতি মমতায় ট্রাঙ্কে রক্ষা করেছেন। বহুকাল। পোকায়-খাওয়া ন্যাতান্যাতা সে-কাঁথা বাতিল হয়ে যাবার পর এই তো সেদিন, মাসকয়েক আগেও খাননি, শোকে দুঃখে কথা বলেন নি কতদিন।

সকালে প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ এলেন ডাঃ কৃষ্ণপদ ভাদুড়ী। রাউণ্ডে বেরোলেন। অথবা ডাঃ

অভিজিৎ ব্যানার্জি ডাঃ কৃষ্ণেন্দু মাইতি নিজেরাই ডেকে নিয়ে এলেন প্রাজ্ঞকে। মাস্টারমশাই একপাক ঘুরে গেলে নিজেদের ঝুঁকি কমে। সাহস বাড়ে। ষাট-বাষট্টির প্রৌঢ় পুরুষ, পলিত কেশে অসংখ্য জীবন-মৃত্যুকে ডিঙিয়ে নিস্পৃহ অনুরাগে আজও নিরাময় খোঁজেন মানুষের। স্বভাবে মিতবাক, কী এক দুর্বোধ্য বেদনায় প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব ডাঃ ভাদুড়ী ঘুরতে ঘুরতে একশো সাঁইত্রিশ নম্বর বেডের প্রান্তে পৌঁছে হঠাৎ স্থবির হয়ে গেলেন। নিস্পলক দৃষ্টিতে স্থির।

শায়িত যুবকের দেহ, ভাস্কর্যের রমণীয়তায় তখন এক করুণাঘন খ্রীস্টমূর্তি।

কিছু-একটা ঘটেছে কোথাও। ডাঃ ভাদুড়ীর স্থবিরতার দিকে সম্ভ্রমে তাকিয়ে থেকে অভিজিৎ কৃষ্ণেন্দু এবং নার্স বিচলিত। আতঙ্কিতও বটে। নিবদ্ধদৃষ্টি থেকেই ডাঃ ভাদুড়ী তাঁর গাম্ভীর্যে, প্রায় অশ্রুতকণ্ঠে—'কত বয়স হবে বলো তো।

'হবে স্যার, বিলো থার্টি। সাতাশ আটাশ... ..

'নিয়ার্লি অব ইয়োর এজ...' স্থবিরতা থেকে নিজেকে ভেঙে এগোলেন ডাঃ ভাদুড়ী। দীর্ঘ মনোযোগে দেখলেন অসার দেহকে—তার পাল্স্-বিট, মুদিত চোখের-পাতা টেনে চোখের লাল, হাতের পাতা এবং যন্ত্রপাতির আয়োজন। তাকালেন জুনিয়ারদের দিকে—'ইনপুট আউটপুট চার্ট করেছ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কতটা আউটপুট হচ্ছে?'

'কাল রাত থেকে ফোর হাণ্ড্রেড সি. সি...'

'হুঁ...' যন্ত্রপাতির নানাবিধ বিন্যাস এবং শায়িত দেহের স্তব্ধতা আরো একবার অনুপুঙ্খ পরখ করে নিয়ে আস্তে আস্তে সরে এলেন ডাঃ ভাদুড়ী—'সেল্ফ্-অ্যানিহিলেটর! সাতাশ আটাশ কি ত্রিশ বছরের একজন যুবক আত্মঘাতী? ওকে তোমরা ফিরিয়ে আনতে চাইছ?'

সকালের আলোয় শয্যায় শয্যায় কাতর রোগীরা আনত ভক্তিতে বড় ডাক্তারবাবুর দিকে কৃপাপ্রার্থীর দৃষ্টিতে উন্মুখ। স্বমহিম ঈশ্বরের প্রতিরূপ। দৃক্পাতহীন ডাঃ ভাদুড়ী অনুগামী অভিজিৎ-কৃষ্ণেন্দুর দিকে শান্ত চোখ রেখে খুবই লঘুস্বরে—'ডু ইউ রিমেম্বর দ্য ডেজ অব সেভেনটি সেভেনটি-ওয়ান? না, তখনও তোমরা ডাক্তার হও নি। ছাত্র অথবা সবে পাশ করেছ। একের পর এক আসত ছেলেরা। কেউ কেউ পুলিশ কাস্টডিতে, অনেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে। দে ডায়েড হিয়ার লাইক র‍্যাবিটস্। যারা সার্ভাইভ করল তারাও যে আজ কোথায় সবাই...'

অস্বস্তিতে বিনম্র অভিজিৎ। এত বড় একজন মানুষ। শহরের ডাকসাইটে স্পেশালিস্ট সার্জেন! একশো সাঁইত্রিশ নম্বর বেডের সামনে এসে কোনো এক অপরিচয়ের যুবকের জন্য এভাবে বদলে যাবেন, ভাবা যায়নি বলেই হয়তো অথবা তাঁর ইন্টার্নাল্ হ্যামারেজের গোপন অতীতটা কিছু কিছু অনুমেয় যেহেতু, সে আরো বিনত ভঙ্গিতে—'দে ওয়্যার অল রিবেল্স স্যার, একটা বিপ্লব চেয়েছিল...'

'আমি রাজনীতি বুঝি না অভিজিৎ। শুনেছি, ওরা নাকি সেল্ফ্ ডেস্ট্রাক্টর নয় কেউ।

বিপ্লবী। প্রতিদিন রক্তের বন্যা বয়ে যেত হাসপাতালে। এত মৃত্যু, এত স্যাক্রিফায়েস এত প্রোটেস্ট সব গেল কোথায়?'

অভিজিৎ চুপ।

'বাট দিস নাইস-লুকিং ইয়ং চ্যাপ? বিপ্লব মানে না। নিজেই নিজেকে খুন করতে চেয়েছে! ইস্‌কেপিস্ট, আগ্‌লিয়েস্ট সিনার...'

একটা সিগারেট ধরালেন ডাঃ ভাদুড়ী। উত্তর-দক্ষিণের লম্বিত বারান্দায় সকালের রোদ আসেনি তখনও। কোরা-কাপড়ের রঙে প্রসন্ন প্রভাত। হাসপাতালের গাছে গাছে কোরাসের কাক-ডাকা! ওপর থেকে দেখা যায় ভিড় বাড়ছে নিচে। আর্তদের সন্ধান নিতে সাতসকালেই চলে আসছেন আত্মীয় হিতৈষীরা কিংবা আউটডোরে নাম লেখানোর তাড়া। পূর্ণ অবয়বে বিশাল মানুষটা যেহেতু এত কাছাকাছি, অভিজিৎ নীরব শ্রোতামাত্র। কোনো কথা বলা যায় না এতটা শ্রদ্ধার ব্যবধানে। কিংবা যখন জানাই আছে, অন্তর্বর্তী কাতরতায় মানুষটা মাঝে মাঝে ব্যাধিগ্রস্ত নিজেই।

'হি ডিস্‌ওনড্‌ ইয়োর সোসাইটি। আবার ওকে ফিরিয়ে আনতে চাইছ উইদাউট নোয়িং হিজ কজ অব অ্যাঙ্গার হেট্রেট অ্যান্ড সাফারিং...'

কৃষ্ণেন্দু পাশে এসে দাঁড়ালেন। নাড়া খেলেন ডাঃ ভাদুড়ী—'না না, তোমরা যাও, কাজ করো। অল রাইট, ফ্লুইড চলছে, চলুক। তোমরা আছো তো কিছুক্ষণ?'

নির্দ্বিধ আনুগত্যে ঘাড় নাড়ল দুজন তরুণ।

'ওর বাড়ির লোকজন সব কোথায়?'

'নিচেই।'

'ডেকেছিলে কাউকে?'

'হ্যাঁ। মা দাদা ছোট বোন এসেছিলেন।'

'হিস্ট্রিটা নিয়েছ?'

'ইকনমিকসের এম. এ, প্রায় হাজার দুয়েক টাকা মাইনের ব্যাঙ্ক অফিসার...'

'স্ট্রেঞ্জ...' স্তম্ভিত ডাঃ ভাদুড়ী। নাড়া খেলেন—'কিন্তু জানতে পারলে কিছু? এ-দুর্মতি কেন?'

'কিছুই বোঝা গেল না ঠিক। কোনো পলিটিকাল ইন্‌ভলভ্‌মেন্ট নেই। গার্ল ফ্রেন্ড আছেন একজন। কিন্তু বেশ জোর দিয়েই বললেন ওরা, সি ইজ এ নাইস লেডি।'

অদূরে, প্যাথলজি-বিল্ডিংয়ের লাল দেয়ালের চূড়ায় রোদ ছুঁয়েছে। স্থির পলকে সেদিকেই তাকিয়ে থাকার পর ডাঃ ভাদুড়ী চকিত সচলতায়—'কুইয়ার দ্য ওয়ার্ল্ড, কুইয়ারার দ্য মেন। অলরাইট তোমরা যাও। ঘন্টা খানেক বাদে আমি আসব আরো একবার। দেখে যাব।'

তাৎক্ষণিক বৈক্লব্য থেকে নিজেকে অনেকটা চাঙ্গা করে নিয়েছেন ডাঃ ভাদুড়ী। ওয়ার্ডে আরো দুটো সিরিয়াস কেস এসেছে শেষ রাতের দিকে। জীবন মৃত্যুর টাগ-অব-ওয়র সেখানেও। ফিরেই যাচ্ছিলেন। যাবার আগে, হেসে মৃদু হাত রাখলেন কৃষ্ণেন্দুর কাঁধে—'এ ইয়ং বয় উড ডাই অ্যাট হিজ টুয়েন্টিজ! নো নো নেভার। বিয়িং মেডিকেল মেন উই ক্যান

নট পারমিট ইট। কিন্তু যখন ওরা বেঁচে থাকে, ওদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বে আমরা কেউ নই। দে কাম টু আস ওনলি হোয়েন দে কাম নিয়ার ডেথ...'

এবং শ্রদ্ধেয় চলে যাবার ছায়া বারান্দা থেকে অপসৃত হলে কৃষ্ণেন্দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিস্ময়ে—'কী ব্যাপার? এই সক্কাল বেলাই হঠাৎ এত ফিলসফিকাল জ্ঞান?'

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস নিয়ে সিগারেট ধরাবার অবকাশ পেয়েছে অভিজিৎ—'কী আর! ভাইপোর কথা মনে পড়ে গেছে বোধ হয়...'

ডাঃ কৃষ্ণপদ ভাদুড়ীর ভাইপো। কাহিনীটা হাসপাতালে বা কলকাতার চিকিৎসক সমাজে কিছুটা কিংবদন্তি। কেন না, ঘটনাটা শুধু একটা মৃত্যু নয়, প্রখ্যাত এক সার্জেনের পুরো ব্যক্তিত্বকে বদলে দেবার ক্ষেত্রে নিদারুণ অঘটন। কবে এক যুগ আগে, চিকিৎসক পরিবারের একমাত্র ছেলে, মেডিক্যাল কলেজের ভালো ছাত্র মরে গিয়েছিল গুলিবিদ্ধ হয়ে। ধনী পরিবারের অজস্র টাকা, শহরের অসংখ্য স্পেশালিস্ট, এমন কি বাবা-কাকার হাতযশও বাঁচাতে পারেনি। জীবনভর অনেক, অনেক মৃত্যু অকাতরে মেনে নিয়েও ওই একটি মাত্র মর্মান্তিক মৃত্যুর আঘাত জীবনে। কী ভাবে ছেলেটাই নাকি বিগড়ে গিয়েছিল। পলিটিকস!

একই দেশলাইর কাঠিতে সিগারেট ধরালেন দুই বন্ধু। রুমালে ঘাড়গর্দান মুছতে মুছতে কৃষ্ণেন্দু—'নাও, প্যালা সামলাও এবার! শালা, একটু গড়বড় করেছিস তো ভাইপো এসে ঘাড় মটকাবে দুজনেরই...'

'ধ্যাৎ, আমি এখন কাটব...' ক্লান্ত অভিজিৎ রেলিংয়ে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়াল। সত্যি অবসাদ—'এত ধকল গেছে কাল গোটা রাত...'

'কাটব তো আমিও...'কৃষ্ণেন্দু একই ভগ্নতায়—'ডাঃ মজুমদার এসে গেছেন। চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ঘন্টা খানেক তো থাকতে হবে আরো। বুড়ো আসবেন বলেছেন...'

ভোরের আলো স্পষ্টতর হতে হতে কখন সকাল! আসলে সূর্যোদয় নেই কলকাতায়। সূর্যোদয়ের সমারোহ নেই। হাসপাতালের গাছে গাছে কাকের ডাক নিস্তেজ হতে হতে স্তিমিত এখন।

আত্মীয় পরিজনের ব্যাকুলতা থেকে বেরিয়ে এসে, বিচ্ছিন্নতায়, এবার একটু নিরিবিলি বিশ্রাম চায় শরীর। দুহাতে চুলের গোছা মুঠোয় চেপে শ্যামল গুটি গুটি বেরিয়ে এল এমার্জেন্সির বাইরে। রাত-জাগা তেতো মুখে সিগারেটটা নেহাৎ-ই অকারণ। এবং স্বার্থপরের মতোই নিজের একার জন্য এক কাপ চায়ের ভাবনা। একমাত্র চায়ের দোকানগুলোই তো খোলা থাকতে পারে এখন। তৃষার্তের ভিড়।

ভিড় বাড়ছে হাসপাতাল চত্বরেও। সদ্য-ঘুম-ভাঙা সকালে বহিরাগতরা আসতে শুরু করেছেন। অনির্দিষ্ট পা ফেলে এগোতে এগোতে, ঢেউ-খেলানো টিনের চালের আচ্ছাদনে হাসপাতালের এক বাড়ি থেকে আরেক সৌধে পৌছোনোর যে-সঙ্কীর্ণ গলিপথ, তারই একটা পেরোনোর পর, অদূরে, সবুজ ঘাসের উদ্যান লোভ ছড়াল। একটা গাছের তলায় চিৎপাত পড়ে থাকার প্রলোভন। ঠাণ্ডা বাতাস, আকাশের প্রথম রোদ্দুর, বিভিন্ন মানুষজনের চলাফেরায় যখন

প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়, মেনে নিতে কষ্ট ভীষণ, ভীষণ মিথ্যেটা—খোকন মৃত! এখনও শেষ কথা বলেন নি ডাক্তাররা। বলে দিতে পারেন।

কান্না। একান্ত নির্জনে তখন সত্যি সত্যি কান্না বুকের হাহাকারে।

'শ্যামলদা...'

শ্যামল চমকে তাকাল—'তুমি?'

'বৌদি টেলিফোন করেছিলেন ভোরবেলা। আমি তো ভাবতেই পারছি না...'

কথা থেমে যায়। যেন সত্যি-সত্যি মৃতের প্রতি আনত শ্রদ্ধায় মৌনপালনের স্থবিরতা। বিস্বাদের সিগারেটটা শ্যামল ক্যারমের স্ট্রাইকার মারার ভঙ্গিতে দু-আঙুলে ছুঁড়ে ফেলল দূরে, শান্তভাবে। যেভাবেই হোক, অতি দ্রুত ভাস্কর খবর পেয়ে যাবে এবং পেলেই ছুটে আসবে—সে জানত। অথবা মনে মনে ভাস্করকেই সে চাইছিল হয়তো। খোকনের ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ বলেই নয়, কৃষ্ণার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা, এমন-কি বাবা-মায়ের অনুমোদনেই, কালক্রমে স্বীকৃত হয়ে উঠেছে সংসারে। ভালো ছেলে, সচ্ছল পিতার দ্বিতীয় পুত্র, ফিজিক্স-এ এম. এস. সি.-র পর রিসার্চফিচার্স কী-যেন একটা কিছু করে ইউনিভার্সিটিতে। কৃষ্ণা হায়ার সেকেন্ডারিতে সায়েন্স নেবার পর বাবা-মা-র সংশয় সত্ত্বেও নির্দিষ্ট মাসোয়ারার শর্তে প্রাইভেট টিউটর একদা। এখন, কৃষ্ণার বি. এস. সি.-তে ওর বেতন নেই, বাবা-মা-ও দ্বিধাশূন্য। শুধু কৃষ্ণার নিজেরই সঙ্কোচ। পড়াশুনার চেয়ে আজকাল নাকি ওদের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেই দেখা যাচ্ছে বেশি। লোকনিন্দারও পরোয়া নেই। কেন না ভাস্কর সংসারে অঘোষিত আপনজন।

হাসপাতালের সদরের দিকে এগোতে এগোতে শ্যামল বলল—'কেন! এমন একটা কাজ ও কেন হঠাৎ করে বসল, তুমি...তোমরা বন্ধুরাও কিছু জানো না বলছ?'

'ন্‌নাহ্‌, তেমন কিছু না...' হতচকিত, প্রাথমিক ভয় বা বিস্ময়ের আচ্ছন্নতা থেকে ভাস্কর আত্মস্থ নয় এখনো। আতঙ্কিত মুখেচোখে—'মাসখানেক ধরে, কী বলছিল একদিন, অফিসে দারুণ গণ্ডগোল। কোন্ এক পার্টি লাখ টাকার ওপর একটা চেক নিয়ে ব্যাঙ্ককে ঠকিয়েছে। তাই নিয়ে...'

'সে-কি! ওর ইন্‌ভলভমেন্ট কিছু আছে নাকি ওতে? ডিটেল সব জানো?'

'কি-যেন সব বলেছিল একসময়। এখন ঠিক মনে নেই...'

কয়েকজন মানুষ এগিয়ে আসছে। একজনের কাঁধে বাঁশ-দড়ির খাটিয়া, অন্য জনের হাতে শ্বেত পদ্মের বৃত্তাকার মালা। ভাস্কর তাকিয়ে থেকে প্রচ্ছন্ন ক্ষোভে—'ওটা বোধ হয় তেমন কিছু নয় শ্যামলদা। চাকরি তো আপনিও করেন, আমাদের অনেক বন্ধুই করে! ঝুটঝামেলা গোলমাল আখছাড় হয় অফিসে। তাই বলে তো সুইসাইড করে না কেউ...'

'এত ইন্‌ট্রোভার্ট ও নয় ওর চরিত্রে। কাউকে যে কেন বলল না কিছু। যদি বলত...' অনিদ্রার অবসাদে ঘাড়টাকে পেছন থেকে দু-হাতের মুঠোয় চেপে শ্যামল আকাশের দিকে তাকাল। শিরদাঁড়ায় টান। অনেকটা শ্রোতা-নিরপেক্ষ স্বগত বিলাপে—'অফিসের গণ্ডগোল! তবু তো একটা কিছু হদিস পাওয়া গেল। আজই একবার ওদের ব্যাঙ্কে যেতে হবে। বুঝলে! কিন্তু কখন যে যাই...'

'না, আপনি যাবেন কী। ওদিকে তো হুলুস্থুল চলছে। শুভ্রাদি জামাইবাবু এসে গেছেন। মাসিমাকে সামলানো যাচ্ছে না।'

খাটিয়া আর মালা নিয়ে লোকগুলো পাশ কেটে চলে যাচ্ছে হাসতে হাসতে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। ভাস্কর বলল—'আপনি এখানেই থাকুন। আমিই উৎপলের ব্যাঙ্কে যাব দুপুরবেলা...'

'তোমার ইউনিভার্সিটি?'

'ওটা কোনো কথা হলো?'

চলতে চলতে, চেতনায় অবচেতনে উথালপাথাল ভাবনার ঝড়ে শ্যামল কখন কোন্ অজ্ঞাতে পৌঁছে গেছে হাসপাতালের বাইরে, রাস্তায়। ট্রামবাস মোটর লোকজন কলরব গুঞ্জনে কলকাতা প্রস্ফুটিত হচ্ছে। এক কাপ চায়ের আকাঙ্ক্ষা তীব্র।

বলার মতো কথা ছিল না কারো অথবা স্তম্ভিত বেদনার অব্যক্ত বাক্যগুলি উৎপল বা খোকন-সংক্রান্ত অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের আবর্তে অবরুদ্ধ। ফুটপাথের অস্থায়ী চায়ের দোকানে একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে শ্যামল বলল—'আরো একটা বড় কাজ বাকি থেকে যাচ্ছে ভাস্কর...'

ভাস্কর জিজ্ঞাসায় তাকাল।

'শিপ্রা তো এখনো জানে না খবরটা। ওকে জানানো দরকার। ডাক্তাররা খুব একটা ভরসা দিচ্ছেন না তেমন। যদি খারাপ কিছু ঘটে-টটে যায়...'

ভাস্কর ঝলসে উঠল সাময়িক। শিপ্রা-উৎপল সম্পর্কের নিভৃত প্রসঙ্গ অগ্রজের মুখে!

'কৃষ্ণা আর তোমার বৌদিকে পাঠানো যায়। কিন্তু...'

'না না, তা কেন? আমি যাব। এক্ষুনি যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, যাও একবার। কিন্তু সাবধানে। সি ইজ দ্য ওয়র্স্ট ভিকটিম্ অব দ্য হোল সিচুয়েশন। তা ছাড়া...'

একটা ট্রাম গড়িয়ে যাচ্ছে পাশে। চায়ের-ভাঁড় হাতে নিয়ে দুজনই চুপ। আরো ভারি গলায় শ্যামল—'তোমার কাছে খোকনের অফিসের একটা গোলমালের খবর পাওয়া গেল। শিপ্রা যদি কিছু জানে! ইট্ ইজ লাইক্‌লি সি নোজ...'

তারপর সত্যি-সত্যি কথা ফুরিয়ে যায়। গুঞ্জন থেকে চারপাশের কলকাতা যখন গর্জনে-চিৎকারে দামাল হয়ে উঠছে, স্তিমিত মৌনে ওরা নিস্তেজ হয়ে আসে। চায়ের পর সিগারেট-মগ্নতায় শ্যামলের চোখে বা কপালের ভাঁজে দুর্ভাবনার পর্দা। ভাস্কর নির্নিমেষ স্থবিরতায় তাকিয়ে থেকে দেখে হাসপাতালের ফটকে মানুষের ভিড়। জনস্রোত ঢুকছে আউটডোরে। তাকিয়ে থাকার অন্যমনস্কতায়, হঠাৎ কি ভেবে, বিষাদ-প্রলাপ—'জানেন শ্যামলদা, ক-বছর আগেও যখন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, কবিতাটা এত ভালো লাগত আমার, উৎপলের, আমাদের সকলের। এখন মনে হচ্ছে এত বাজে...'

ভ্রূ-কুঞ্চনে তাকাল শ্যামল। হঠাৎ আবার কী হলো ছেলেটার! কবিতা-ফবিতা? কাব্যি করার এই কী সময়?

ভাস্কর আপনমনে—

'বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল ;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল কোন ভূত?
ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয় নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমোয় এবার
এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!'

হাড়েমজ্জায় চিড়বিড় জ্বলুনি যদিও, তড়িঘড়ি সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে শ্যামল উঠে দাঁড়াল—'এখন এসব বরং থাক ভাস্কর। চলো উঠি। ওদিকে কী যে হচ্ছে আবার! খোকনের নতুন কোনো খবরটবর...'

ভোরটা সকাল হয়ে ওঠার আগেই চেনা-মানুষের সংখ্যা আরো বাড়ল। খবর পেয়ে সুদূর বেহালা থেকে ট্যাক্সি চেপে সস্ত্রীক চলে এসেছে বড় জামাই তাপস। নিজের স্কুটারে আসেনি। কেন না, শুভ্রা গর্ভবতী। বাড়ি থেকে দুই কাকা এসে গেছেন। কাকিমাদের কাছে মেয়েকে জিম্মা রেখে সুনন্দাও। এছাড়া আরো কেউ কেউ—উৎপলের বন্ধু।

শিপ্রাও এসে পৌঁছল বিহুল ভীরুতায়। একা নয়, সঙ্গে তার দাদা কাঞ্চন এবং ওদের প্রতিবেশী আপনজন, বয়স্কা কাকিমা—অণিমা জানা। ট্যাক্সিতে ভাস্করই নিয়ে এল ওদের।

গুঞ্জনে বেদনায় ব্যাকুল নিশ্বাসে একটাই শব্দ চোখে-চোখে। পাক খাচ্ছে প্রতিটি বুকের খাঁচায়—কেন? জোয়ান বয়সের অমন একটা জলজ্যান্ত তাজা ছেলের কেন এ-মরণখেলা?

নিজের টানেই এসে পড়েছে শিপ্রা। বুকের তোলপাড়ে ঝড়। অতর্কিত দুর্বিপাক! যন্ত্রণাকে বুকের তলায় ভাঁজ করে রেখে ক্ষমাহীন একটা ক্রোধে অথবা সজল চোখের বাষ্পে ভয়ঙ্করকে মানতে না-চাওয়ার মূঢ় আশ্বাসে হাসপাতালে পৌঁছনোর পর যখন মেনে নিতেই হয় নির্মমকে, হিতৈষী-সমাবেশে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই তার। কুণ্ঠিত একা। উৎপলের বন্ধু হয়েও উৎপলের অন্যান্য বন্ধুদের মতো সে নয়। অথচ তারই প্রতি নিষ্ঠুরতম বেইমানি লোকটার।

সুনন্দাবৌদি এগিয়ে এসে টেনে নিলেন বুকে। কৃষ্ণা পাশে এসে দাঁড়াল। চেনা-চেনা মেয়েটিকে দেখে আরো একবার কঁকিয়ে উঠলেন রেণুবালা। তিনি তখন যথার্থই শয্যাশায়ী। শিয়রে বসে শুভ্রা মায়ের সেবায়। চেনাজানার তোয়াক্কা না করেই অণিমা জানা যেচে পাশে গিয়ে বসেছেন। শ্যামল-ভাস্করের সঙ্গে কাঞ্চনও কোথায় চলে গেল। ঘন ঘন ভেতর থেকে খবর আনার চেষ্টা চলছে। নতুন কোনো সংবাদ নেই। ডেক্সট্রোজ স্যালাইন চলছে। ডাক্তারদের ভাষায় আশঙ্কামুক্তি এখনও ধোঁয়াটে। এখনও আটচল্লিশ ঘণ্টার অঙ্ক...

বৌদির বুকে কান্নাটা মুখরতা পেল। দাঁতে ঠোঁট চেপে অবদমনের চেষ্টায় যখন আরো বেশি কষ্ট, চোখজোড়া ঝাপসা হয়ে ওঠে। অথবা একই বেদনার কেন্দ্রে কান্নাটা সংক্রমিত হবার পর হাসপাতালের সকালে, মানুষের ভিড়ে যখন হালকা হবার অবকাশ কম, ওরা তিনজন, যেন সত্যি সত্যি সমাধির পাশে নীরব।

'বেইমানি! এত বড় বেইমানি বৌদি?'

কিছু একটা বলতে চাওয়ার চেষ্টায় সুনন্দার অনুভব, গলাটা কামড়ে ধরে আছে কেউ। আঁচল টেনে চোখ ঘষতে ঘষতে, ভাঙা কণ্ঠস্বরে—'কী জানি, কী থেকে যে কী হয়ে গেল হঠাৎ! বাড়ির কারুর সঙ্গে কথাবার্তা তো প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিল এক রকম। ক-দিন ধরে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরছিল। কালও এল প্রায় সাড়ে এগারটার পর। এসেই দরজায় খিল। বলল—খাব না। খেয়ে এসেছি। মা গেলেন, আমিও গিয়ে জানলা দিয়ে এত করে বললাম। দরজা খুলল না। তখন তো বুঝি নি। এখন মনে হচ্ছে, বিহেভিয়ারটা নর্মাল ছিল না। এ-রকম মুখঝামটা দিয়ে খোকন কোনোদিন কথা বলে নি আমার সঙ্গে...'

'তুমি কিছু জানো শিপ্রাদি? বলো, বলো দোহাই তোমার...' হঠাৎ, একেবারে অতর্কিতে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠল কৃষ্ণা।

হাসপাতালের নিয়মকানুন বিধিসৌজন্য কিছুই না মেনে অকস্মাৎ যুবতী মেয়ের অঝোর কান্নায় পারিপার্শ্বিক ভীষণভাবে নাড়া খেল। ভিজিটর্স-রুমে বহিরাগতের সংখ্যা এখন অনেক বেশি। আপনজনদের সঙ্গে আরো অনেকেই যখন ছুটে এসে ঘিরে ফেলছে, অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে শিপ্রা তার সর্বাঙ্গের ক্রোধে—'এসব কী হচ্ছে বৌদি?'

শব্দগুলো আওড়াবার সময় যতটুকু, তারও চেয়ে দ্রুত ঝটকায় কৃষ্ণাকে গা থেকে সজোরে ঝেড়ে ফেলে চেনা-অচেনা মুখের ভিড়কে দুপাশে সরিয়ে করিডরের আরেক প্রান্তে, ফাঁকায় বেরিয়ে এল সে।

কৃষ্ণা কাঁদতে পারে। বোন, তার সামাজিকতায়

দিশেহারা সুনন্দা ঠিক সেই মুহূর্তে কিছুই না বুঝে, চকিত প্রেরণায় শিপ্রার পিছু পিছু

দূরে, দেয়ালে পিঠ ঠেসে শিপ্রা হাঁপাচ্ছে তখন। চোখের মুখের মলিনতায় ক্রোধের তপ্তমূর্তি

'কী হলো তোমার?'

'কী আপনারা ভেবেছেন বলুন তো বৌদি?' সীমাহীন দুঃখভার, গোটা শরীরে আগুনের হলকা—'উৎপল কেন বিষ খেল, আপনারা ঘরের মানুষ কেউ জানেন না। আমি জানব? এসব প্রশ্ন আমাকে কেন?'

সুনন্দা দুর্বিপাকে—'এটা তোমার কী হচ্ছে শিপ্রা? আজ, এ-রকম একটা ঘটনার পর কেউই ঠিক নর্মাল নয় এখানে। এত সামান্য কথাকে তুমি...'

'না না বৌদি, সামান্য নয়...' এবার বাঁধ ভাঙে। সজল চোখ ফেটে দাঁতে দাঁতের কামড়ে রাগের জ্বলুনি, বিষাক্ত জ্বালা—'একটা বিট্রেয়ার আমাকে এতবড় বিট্রে করল, তখন আমাকেই জিজ্ঞেস করছেন আপনারা...'

অনুচ্চারে, আরো এক যুবতীর ক্রন্দন। কিন্তু হিতৈষী সমাবেশ থেকে তফাৎ থাকার অনুভবে যখন সে কাঁদতেও পারছে না ঠিকমত, রেণুবালার শুশ্রূষা ফেলে এগিয়ে এলেন অণিমা জানা—'কী ছেলেমানুষি করছিস শিপু? তুই একটু বোস্, একা একা একটু বসে থাক্ কোথাও...'

কাকিমাই একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠল এরপর এবং আশ্রয় পেয়ে কান্নাটা আকুল হতে চায়—'না, চলো কাকিমা, আমরা চলে যাব।'

'চলে যাবি। এ-অবস্থায়। ঘরে গিয়ে থাকতে পারবি তুই?'

কাকিমার পাশে নিবিড় থাকে শিপ্রা। কাকিমা আত্মজন কেউ নন, ঘনিষ্ঠ আপন। দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের অন্ধকার গলির ভেতর পাশাপাশি তিনটে ঘরে দুটো শিকড়-উৎপাটিত পরিবার। বছর দশেক আগে বাবা মারা যাবার পর বাইশ বছরের দাদা যখন মা আর বোনকে নিয়ে নাজেহাল, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝায় ওদের আগলে রেখেছেন অণিমা জানা এবং তাঁর স্বামী—অখিল জানা।

জীবনের হাজার ঝঞ্ঝাটে অনুকাকিমা অনেক শক্ত মানুষ। পেছনের দিকে তাকিয়ে, কী ভেবে সুনন্দাকে বললেন—'ওকে একটু একা থাকতে দিন ভাই।'

'নিশ্চয়ই...' সুনন্দা আদরে ধরল শিপ্রাকে—'তুমি এসো, এসো আমার সঙ্গে...'

পেছনে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছেন রেণুবালা। সঙ্গে গর্ভিণী কন্যা শুভ্রা মন্থর। ভঙ্গিতেই চেনা যায় ওদের বিরক্তি—এমন দিনে নিজেরাই জ্বলছে-পুড়ছে সবাই। কে এই আবাগী মেয়েটা? কোত্থেকে এল? কেন?

হাসপাতালে কোলাহলে কোথাও নিভৃতি নেই। ওয়ার্ডের বাইরে খোলামেলা রোদ্দুরে পৌঁছে শিপ্রা ফিরে তাকাল। ভেজা গলায়—'আপনি আর কোথায় যাবেন বৌদি?'

'তুমিই বা যাচ্ছো কোথায়?'

'কোথাও না। এখানেই থাকব। ঘুরব একা একা...'

ওর একার দুঃখে মেয়েটাকে বাধা দিতে নেই। সুনন্দা থমকে দাঁড়াল।

এবং শিপ্রা, অতিবিশাল হাসপাতালের ভুলভুলাইয়ায় হারিয়ে যাবার সহজ সুযোগে বিপন্ন বোধ করল। নিজের মধ্যে হারিয়ে যাবার যন্ত্রণা কী দুঃসহ! সকালের রোদে উজ্জ্বল কলকাতা, যেন এক সূর্যোদয়েই, হঠাৎ নিরাকার। বছর দশেক আগে বাবা মারা যাবার পর জীবনে প্রথম শিকড়-কাঁপানো মৃত্যুর আঘাত! তারপর

হাসপাতালের অতিকায় প্রাসাদচূড়াগুলির ঊর্ধ্বে মস্ত আকাশে, রোদের ঝালরে সব ঝাপসা হয়ে আসে। তারপর থেকে একটানা এতদিন, স্বজনহীনতায় জীবনের ভার বয়ে বয়ে যদি এতদূর এগোনো গেল, তবে কী নির্মম, কী নিষ্ঠুর গত তিন-চার বছরের দিনগুলি রাতগুলি! আলাদাভাবে কোনো ঘটনা নয়, অসংখ্য দৃশ্যের স্মৃতি-সমাহারে শূন্যতা। কী মিথ্যে! কী মিথ্যে!

তখন শুধু অর্থহীন দুটো চোখের আধারে অনন্ত বিষাদ

মেঘপুঞ্জ : বিগত বর্ষায়

শহর জুড়ে সেদিন অবিশ্রান্ত জলধারা।

কোনো মানেই হয় না খেলনা-গোছের লেডিজ-ছাতাটার। বাস থেকে নেমে বোতাম টিপতেই স্প্রিংটিংয়ে গড়বড় কোথাও, ঝাঁকাঝাঁকিতেও খুলল না যখন, দৌড়। এবং পলকে রঙিন সিন্থেটিক শাড়ি জলে জলে গায়ের চামড়ায় লেপটে বিতিকিচ্ছিরি কুৎসিত। শায়াব্লাউজ, অন্তর্বাস মাথার-চুল, পুকুরঘাটে ডুব দিয়ে ওঠার পরিপূর্ণ অবগাহনে ন্যাতান্যাতা।

যখন গা ভরে রাঙা, নিজেও শার্টপ্যান্টে ভিজে উৎপল হাসছে—'বাঃ ফ্যান্টাস্টিক।'

ফুটপাথে উঠেও দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। দোকানে দোকানে, গাড়িবারান্দার তলায় গা-বাঁচানো শুকনো মানুষের ভিড়। জায়গা ছাড়তে রাজি নয় কেউ। তবু এক জায়গায় মাথা-গোঁজার পর হাঁপাতে হাঁপাতে, শাড়ির আঁচল নিংড়োতে নিংড়োতে শিপ্রা ক্ষেপে উঠেছিল—'কী যে ছেলেমানুষি করো মাঝে মাঝে! কোনো মানেই হয় না।'

নিজের চুলে রুমাল ঘষতে ঘষতে উৎপল তখনও হাসছিল। যেন মজা, দারুণ মজা। উচ্ছল হাসির গমকে—'বৃষ্টি পড়ছে তো আমি কী করব?'

'নামলে কেন খামোকা?'

'নামার জায়গায় পৌঁছে গেলে কোন্ আহাম্মক বাসে বসে থাকে?'

'উঃ...' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভেজা-আঁচল নিংড়োনোর কসরত। গা-ঠাসাঠাসি মানুষের সামনে মুশকিল, কাঁধের আঁচল পিন্-করা নেই—'এভাবে এখন থাকি কী করে বলো তো। যাওয়া যায় কোথাও? কী উদ্ভট লোক তুমি?'

'কী হলো? এক বৃষ্টিতেই প্রোগ্রাম বাতিল?'

'ধ্যাৎ, নিকুচি করেছে তোমার প্রোগ্রাম। মাথায় থাক সাবিরের রেজালা। তোমার মতো বীভৎস একটা লোকের সঙ্গে রাস্তায় বেরুনো? ইমপসিবল্। সম্ভব নয় আমার পক্ষে...'

'কেন কেন?' একই উচ্ছলতায় উৎপল। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে—'অ্যাম আই এ ব্যাড চয়েজ? টল্ ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। তোমরা যা চাও। অনেকটা অমিতাভ বচ্চনের মতো...'

'সেই তো ভয়। মারদাঙ্গার হিরো...' আঁচল ঘষে ঘষে মুখ-গলা, দুটো হাত, কনুই মুছতে মুছতে শিপ্রা—'তোমাকে দিয়ে বিশ্বাস আছে? কখন যে কী করে বসবে হুটপাট। মাথামুণ্ডু নেই...'

'অ্যাডভেঞ্চার, বুঝলে অ্যাডভেঞ্চার। এক থালা ভাত আর পুঁই-ডাঁটার চচ্চড়ি গিলে চিৎপাত দিবানিদ্রা আর লম্বাচওড়া বাৎ—ছাড়ো তো ওসব বাঙালিপনা। ডেস্‌পারেট হতে হবে। রেকলেস। মাস ছয়েক বাদে স্কুটার নয়, মোটরবাইকই কিনে ফেলব একটা। পেছনে চড়তে ভয় পাবে না তো? বাইকটার পুলিশ-লাইসেন্স থাকবে, তোমার লাইসেন্স পেতে আরো অন্তত, হ্যাঁ ধরো, আরো বছর দেড় দুই...'

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ছিল সেদিন। থৈথৈ বন্যায় কলকাতা ভেসে গিয়েছিল।

বুকের গভীরে কান্না। মুখর হতে ভয়।

'কী ব্যাপার? তুমি এখানে? তখন থেকে খুঁজছি তোমাকে।'

শিপ্রা শান্তভাবে তাকাল।

'এত বড় হাসপাতালে হারিয়ে যেতে চাইলে খুঁজে পাওয়াও তো কঠিন কাউকে...'

ভাস্কর আর কাঞ্চন এগিয়ে এসেছে কাছে। নিরুত্তাপ। শিপ্রা একই ভাবে নিজের গভীরে নিঝুম। জীবনের রঙে সবুজে সবুজে চারপাশ সাজিয়ে তোলার বিপুল আয়োজন নিয়েও এটা একটা হাসপাতাল। মনোলোভা উদ্যানে ঘাসের গালিচা। বড় বড় ম্যানসন আর দিঘি গাছপালার অরণ্যে দুর্বহ মৃত্যুর ভাবনায় ঘুরতে ঘুরতে যেখানে অনায়াসেই লুকিয়ে রাখা যায় নিজেকে।

একটা চারতলা সৌধের পাদভূমিতে, দীর্ঘ সিঁড়ির একান্তে শীতল ছায়া খুঁজে পেয়েছিল সে। চেনা-মানুষের জটলা থেকে দূরে, অচেনা মানুষজনের ইতস্তত যাতায়াতের পথের ধারে, একা।

'আমি ভাবলাম, তুই বুঝি বাড়িই চলে গেছিস।'

'সেই ভালো দাদা...' শিপ্রা চকিতে উঠে দাঁড়াল—'চলো, আমরা বরং চলেই যাই।'

পি অ্যান্ড টি-র কেরানি, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের যুবক কাঞ্চন তাকাল ভাস্করের দিকে। বড়ই নরম মানুষ। দুর্ঘটনার আকস্মিক সংবাদে ছুটে আসার পর সকলের মধ্যে আলগাভাবে থেকে মৃত্যুর বিভীষিকায় কিছুই করে উঠতে পারছিল না বেচারি। উৎপলকে সে ঘনিষ্ঠভাবে জানে। অনেকটা বন্ধুর মতো হলেও, এক্ষণে উদ্ভূত সঙ্কটটা তার ভগ্নীসংক্রান্ত।

'তুমি চলে যাবে মানে?' দেহেমনে শ্রান্ত ভাস্কর বিস্ময়ে—'এরকম একটা টেনশনের মধ্যে?'

'ওতে আমাদের কী করার আছে? উৎপলের বাবা মা দাদা বৌদি বোন সবাই আছেন। তোমরা বন্ধুরা...'

'বলছ কী তুমি?'

'ঠিকই বলছি।'

'শুভ্রাদিকে টেলিফোন করাটা যেমন, শ্যামলদা নিজে কিন্তু তোমাদের খবর দেবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছিলেন ভোরবেলা...'

'সেটা শ্যামলদার উদারতা। থ্যাঙ্কস টু হিম...'

ভাস্কর চুপচাপ এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। দীর্ঘ সিঁড়ির প্রান্তে, কালভার্ট গোছের চকচকে জায়গাটা মসৃণ বেদীর মতো। আস্তে আস্তে সেদিকেই পায়ে-পায়ে ভাস্করের এগিয়ে যাবার দিকে চোখ রেখে শিপ্রা—'একটা মানুষের বেঁচে থাকতে ভালো লাগেনি। বিষ খেয়েছে। ভালো কথা। সেখানে আমি কি করব? আমি তো কারুর ভালো-না-লাগাগুলোকে সুন্দর করে দিতে পারি না। ম্যাজিসিয়ান নই।'

সিঁড়িতে পা রেখে কালভার্টে বসে পড়েছিল ভাস্কর। ভ্রূ টেরিয়ে তাকাল। কাঞ্চন তার বোনের দু-ধাপ নিচে কাছাকাছি।

এবং যন্ত্রণা। নবনির্মিত টিউবারকুলোসিস্ ব্লকের একতলায় একই ভাবে পীড়িত দুজন যুবক এবং একজন যুবতী তাদের নীরোগ রুগ্নতায় নির্বাক। মধ্যবর্তী শূন্যতায় যথার্থই নিরবয়ব একজন মানুষ—অন্য এক যুবক, ইতিমধ্যেই স্মৃতি।

মাথার ঘন চুল দুহাতের মুঠোয় চেপে ঝিম মেরে ছিল ভাস্কর। ঝামটা মেরে উঠে দাঁড়াল—'ইম্পসিবল। হয় না, হয় না, এ-হতেই পারে না...'

ওরা ভাইবোন সচকিত। কাঞ্চন তার স্বাভাবিক ভীরুতায়—'কী হলো ভাস্কর?'

'শেষ অব্দি উৎপলটা যে এভাবে সুইসাইড করে মরবে, ভাবতেই পারছি না। ভোরবেলা খবরটা শোনার পর থেকে এখানে চলছি ফিরছি ঘুরছি ঠিকই, কিন্তু...কিন্তু কী বলব, ঘটনাটার সঙ্গে কোনোভাবে অ্যাডজাস্টই করতে পারছি না এখনও...'

আচম্বিতে, 'দুজন সমর্থ যুবককে কাঁপিয়ে তোলার দাপটে শিপ্রা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, ক্ষিপ্রতায়—'ন্যাকামো করবে না। বুঝলে। বেশি খোকামি করবে না অত...'

কাঞ্চন এবং ভাস্কর মূঢ়তায় আরো এক দুর্বোধ্য ধাঁধার দিকে।

ডান কাঁধের আঁচল টানে শিপ্রা। উগ্রতায় আরো বেশি হিংস্র—'আহা-উঁহু দুঃখু করে যাচ্ছো! রাগ হচ্ছে না তোমাদের? তুমি তো অনেক দিনের বন্ধু ওর। শুনেছি সেই স্কুল থেকে। আজ তোমার খারাপ লাগছে না ভাবতে, এরকম কুচ্ছিত ইররেসপনসিবল বাজে একটা লোক...একটা কাওয়ার্ডের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছ এতকাল...'

অতর্কিতে ঘাবড়ে গিয়ে কাঞ্চন হাত বাড়াল বোনের দিকে—'শিপু কী করছিস? কী বলছিস তুই?'

আরো এক ঝামটা—'ধ্যাৎ সরো তো। যাও এখান থেকে...'

প্রথম ধাক্কায় ভাস্করও বিহ্বল কিছুটা। ক্ষুব্ধ—'উৎপল কিন্তু এখনও মরে যায়নি শিপ্রা...'

'মরে গেছে কি বেঁচে আছে এখন আর কোনো খবর নয় সেটা। ইররেলিভেন্ট। বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছে। ব্যস, সেটাই যথেষ্ট। হি ইজ এ ডেড ম্যান নাউ...'

'কিন্তু কেন বিষ খেল, কেন মরতে চাইছে সেটাই তো বুঝতে চাইছে সবাই। কেউই তো বলতেও পারছে না কিছু...' ভাস্কর এবার অধৈর্য তীক্ষ্ণতায়—'তুমি জানো? পারবে বলতে? ক্যান ইউ হেলপ আস?'

'না, জানি না। জানার প্রয়োজনও বোধ করি না...' সর্বাঙ্গে কাঁপছে শিপ্রা। চোখজোড়া ভীতিকর—'শুধু জানি, সাতাশ আটাশ বছরের একটা ছেলে, এমন কিছুই ঘটতে পারে না তার, যার জন্যে বিষ খেতে হবে। কাপুরুষ। চুরিচামারি খুনখারাপি তো করেনি। অত মুরদ নেই তোমাদের। তাহলে? তাহলে এমন আর কি ঘটতে পারে একজন ভদ্রলোকের ছেলের? ইচ্ছে হলো, মরে গেলাম। বাঃ, কী সুন্দর। কী বীরপুরুষ।'

হাসপাতালের এদিকটা যদিও নিরিবিলি, দুপুরের নিঝুম ভাঙছে শিপ্রার কর্কশ চিৎকার। চলতে চলতে পথচলতি দুজন মানুষ থমকে দাঁড়িয়েছেন সামনের রাস্তায়। শিপ্রাও সংযত কিছুটা। ধপ করে আবার বসে পড়ল সিঁড়িতে।

'তুমি কি এখানেই বসে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'এখানেই থাকবে তো? যদি দরকার হয়...'

'কোনো দরকার হবে না। আর এখানেই থাকব কিনা, তাই-বা বলব কী করে। ভালো না লাগলে উঠে যাব...' হঠাৎ কাঞ্চনকে...'কাকিমাকে নিয়ে তুমি চলে যেয়ো দাদা। অখিলকাকু বোধ হয় অফিসে যাবেন না আজ। মা একা আছেন। তোমাদেরও স্নান খাওয়া...'

'তুই?'

'আঃ, বলছি তো, আমার যখন ইচ্ছে হবে আমি এখান থেকেই বাড়ি চলে যাব। আর কথা বলো না। বিরক্ত করো না। য্যাও...'

কাঞ্চন এবং ভাস্কর আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে গিয়েছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। এ-মেয়েকে তার নিভৃতি ফিরিয়ে দিতেই হবে, বিবেচনায়, যখন তারা ফিরেই যাচ্ছিল

সহোদর অগ্রজ এবং বন্ধুর চলে-যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে শিপ্রা তার নিজের সহনে

শাড়ির আঁচল দাঁতে কামড়ে স্থির দৃষ্টিতে অপলক থাকার জেদে, যখন আর ওরা দৃশ্যমান নয়, তখনও, ক্ষুব্ধ অভিমানের চোখজোড়াকে সংস্থাপনের আধার খোঁজে

পুড়ছে শরীর। ক্ষমাহীন আক্রোশের জ্বালা—এই হাসপাতালেরই সীমানায়, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কোথায় কোন্ অভিশাপের শয্যায় ধিকিধিকি নিভে যেতে যেতে হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে ভরাট দুপুরটা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে একজন মানুষের জীবনে, এবং তখনই, সজল চোখে প্রথম অশ্রুপতন। নাকের দুপাশ বেয়ে মসৃণ ত্বকের ঢালুতে দ্রুত গড়িয়ে নেমে সমান্তরাল প্রপাতরেখা স্ফটিক বিন্দুতে এসে আটকে থাকে। যেন স্খলিত হবার দ্বিধায় নীরব

হাঁটুর ওপর দুহাতের ভাঁজে তখনই মাথা লুকোতে হয়। পরিজনের শূন্যতাবোধে মহৎ হয় একজনের মৃত্যু, মেঘের রিক্ততায় যেমন অজস্র জলধারা। স্বপ্নে ভাসে স্মৃতি, টুকরো টুকরো খণ্ড খণ্ড মেঘের মতোই ভাসমান বিচ্ছিন্ন ঘটনা—নিভৃত এ-বেদনার কোনো সাক্ষী নেই উৎপল। সাক্ষী থাকবেও না কোনোদিন। স্মৃতিভারে ক্রোধ আজীবন

ঘন কুয়াশায় একদিন

ভালোবাসার নিভৃতি নেই কলকাতায়। পচাই-চোলাই আর জুয়ার আড্ডায় বীভৎস সন্ধ্যেবেলার পার্কগুলি। বুড়োধামড়া খোকাদের ফুটবল-দৌরাত্ম্যে ঘাস থাকে না কোথাও। লাইটপোস্টের বালব-তার, বেঞ্চির-কাঠ কারা চুরি করে নিয়ে যায়। এরই মধ্যে আজাদ-হিন্দ-বাগের দিঘি ঘিরে কিছু গাছপালা, বসার বেঞ্চি, ঘাস, লাইটপোস্টে আলোকমালা। উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জিতে তবু কিছুটা নিশ্বাসের উঠোন।

ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের ঠাণ্ডায় যখন বিকেল গড়াতে গড়াতেই ধোঁয়া আর কুয়াশার অন্ধকার, গাছপালার শুকনো পাতা ঝরে যায়, দিঘির জল তলিয়ে নামে অনেক নিচে। কনকনে বাতাসের সুবিধে এই—সন্ধ্যার পর একেবারেই ভিড়ভাট্টা থাকে না স্বাস্থ্য-ভিখিরি বুড়ো আর বয়স্ক অবাঞ্ছিতদের। শিশিরে শরীর ভিজিয়ে তখন শুধু রঙিন কোটপ্যান্ট কার্ডিগানে জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতীরা। বড়ই খোলামেলা।

'এখানে এলে কেন?'

'কেন? কী হয়েছে?'

'দেখছ না চারপাশ? ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের এভাবে দেখতেও তো খারাপ লাগে। অশ্লীল।'

ঘন ধোঁয়াশার আস্তরণে ভরে ছিল চারদিক। কাছে দূরে লাইটপোস্টগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দৃশ্যমান নয়। সরাসরি আলোর তলায় ফাঁকা বেঞ্চিগুলোকেই এড়াতে চেয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকারা। তবু সেখানেও ওরা আছে। আছে চারদিকেই। গাছগাছালির ছায়ার নিচে বরং ঘুপচি খুঁজে অন্ধকারে ঘাসে। একই চাদরে গা মুড়ে জড়াজড়ি করে দুজন-দুজন। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কথা নেই। ইতস্তত সিগারেটের আগুন।

আলোর নিচে ওরা একটি বেঞ্চিতে বসেছিল। নিঝুম পার্কে ভূতের মতো কার গলার

স্বর—'গ্‌গরম চা...'

'প্রেমিকার গালে থাপ্‌পড় মেরেছিল বলে কদিন আগেই নাকি এখানে বেধড়ক মার খেয়েছে একটা ছেলে।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠেছিল শিপ্রা।

'শ্রীমতীও কম যান না! লোকজন আড়ালে ফিট করাই ছিল। রক্তারক্তি কাণ্ড।'

'সে-কি! তার পরও তুমি এখানে এসেছ?'

'ভয় কী?'

'যদি এক্ষুনি ওরকম আবার কিছু হয়?'

উজ্জ্বল নেভি-ব্লু সোয়েটার গায়ে, রঙ-মেলানো টেরিউলের প্যান্ট। নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে বসেছিল উৎপল। ডান হাতে অঙ্গুলিবদ্ধ ঘুষির উত্তোলনে—'দেখছ? চোয়াল-থুত্‌নি উড়িয়ে একসঙ্গে বত্রিশ পাটি দাঁত ফেলে রেখে দেব।'

কলকল হেসে উঠেছিল শিপ্রা—'বীরপুরুষ! তোমার ওই বীরত্বটা কবে দেখব বলো তো? ভারি দেখতে ইচ্ছে করে।'

'তেমন কিছু ঘটলেই দেখতে পাবে।'

'সে-কি! আমাকে গুণ্ডারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর তুমি হিন্দী ফিলমের হিরোর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছ! ওরে বাপস্‌, আমি তো ভাবতেই পারছি না। না বাপু, অতটা পারব না। তোমার বীরত্ব দেখব কী? তখন তো নিজেকে সামলাচ্ছি। আগে তো পালাব...'

নিরিবিলি শান্ত নিঝুমে জোরে, আরো উচ্চকিত হিল্লোলে শিপ্রা হেসে উঠেছিল।

'আস্তে দিদি, আস্তে। ঢেউ খেলাবেন না বেশি। বুড়ো মাস্টারমশাইরা আছেন ওদিকে।'

সত্যি-সত্যি গা ঘিনঘিনানি রাগে আর ঘেন্নায় থরথর কাঁপছিল শরীর। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল বেপরোয়া মানুষটা—'কে রে? কোন্‌ শালা? বল্‌, আবার বল্‌। দেখি মুখটা।'

শীতের কুয়াশায় বিষাদ-আচ্ছন্ন পার্কের সান্ধ্য কোণ। ছোট্ট চাদরের গুটিসুটি শিপ্রা ভয়ে আরো কুঁচকে গিয়ে খাবলে ধরেছিল হাত—'থাক থাক, ছেড়ে দাও। চলো, বরং আমরাই চলে যাই...'

উৎপলের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উঠে আসেনি কেউ। ডানদিক থেকে এসেছিল আওয়াজটা। বাঁদিকে বিচ্ছিরি ধরনের হাসি। কিন্তু চারপাশটা থমথমে হয়ে যেতেই বড় কষ্টে, অনেক মেহনতে মানুষটাকে ঠেলেঠুলে টেনে শিপ্রা সেদিন বেরিয়ে এসেছিল রাস্তার ভিড়ে, সত্যিকারের আলোয়। সর্বাঙ্গে কাঁপুনি তখনও—'কক্ষনও না। জীবনে আর কোনোদিন আসব না এখানে। নরক নরক। মনে থাকবে তো? কথা দাও...'

'কোথায় পালাবে ম্যাডাম? লাভ অ্যান্ড ইন্‌ফ্যাচুয়েশন...প্রথমটা তো শুধু আর ইংরেজিই নয়। শব্দটা বাংলায় পেয়ে যাবার পর দ্বিতীয়টার বাজার খুব রমরমা...'

বিধান সরণির ফুটপাথে, কোলাহলে হাঁটতে হাঁটতে শিপ্রা—'এঁদো গলির অন্ধকার খুপরিটার ভেতর পচে পচে একটু যে বাইরে এসে দাঁড়াব, তারও উপায় রইল না...'

'মেয়ে হয়ে জন্মেছ! তোমার আর ভাবনা কী?'

'মানে?'

চটজলদি অদ্ভুত বদলে গিয়েছিল মানুষটা। সহজ কৌতুকে—'ট্রান্সফারেবল লাইফ। একটা বয়সের পর স্টেশন বদলে নতুন জায়গায় গিয়ে যদি সুন্দর কিছু পাও! তোমার তো আবার সেখানেও কপাল খারাপ।'

'খারাপ বলে খারাপ!' হেসে ফেলেছিল শিপ্রাও—'সে-যে কী ভোগান্তির দিন হবে, তাই ভেবে তো এখন থেকেই ঘুম নেই আমার।'

'হ্যাঁ, অধম বড়ই বেয়াদপ।'

নির্নিমেষ চোখের পাতায় জালবন্দী বনস্পতির চারা। টান-টান সোজা হয়ে বসল শিপ্রা। উৎপল কি বেঁচে আছে এখনও? না-কি সব শেষ করে কপালের ঘাম মুছে নিয়েছেন ডাক্তারবাবুরা?

ভরাট দুপুরে প্রাসাদচূড়ার লম্বিত ছায়াটা খাটো হয়ে আসছে সিঁড়ির দিকে। পথ-চলা পাকা সড়কটার ওপাশে রেলিং-ঘেরা সবুজ ঘাসের উদ্যান। বড় বড় গাছ আছে কিছু। আরো আরো গাছ চাই মানুষের সুস্থ নিশ্বাসের জন্য।

সরকারি বনমহোৎসবের উদ্যোগই হয়তো-বা। রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে একটু দূরে দূরে নতুন বৃক্ষরোপণ। বৃত্তাকার জালের বেড়ায় বনস্পতির চারা।

স্থির পলকে তারই একটার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল, জানে না। বুক-টানা দীর্ঘশ্বাসে সোজা হয়ে বসার পর সময় চেনার আকুতি। কটা বাজে এখন? সর্বনাশা খবরটা পাবার পর তাড়াহুড়োয় কব্জিতে ঘড়িটা বেঁধে আসতেও ভুল হয়ে গিয়েছিল। হয়তো-বা ওদিকে মাসিমাকে নিয়ে আরো তোলপাড় এখন! উৎপলের সর্বশেষ কোনো সংবাদ!

উঠে দাঁড়াতেও ভয়। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ভেঙে টলতে টলতে রাস্তায় নেমে আসার পর সমস্ত আকাশের শূন্যতাটা বুকের খাঁচায়। পাশাপাশি পা ফেলে হাঁটার নিরাকারে একজন সবল পুরুষমানুষের ভ্রম।

গোয়াবাগানে দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের আড়াই-হাত তিন-হাত চওড়া অন্ধকার গলির ভেতর আমাদের ঘরদোর তুমি জানো উৎপল! জানালা খুললে আকাশ দেখা যায় না সেখানে। ছাদে ওঠার সিঁড়িটা বাড়িওলা বন্ধ করে দিয়েছে আজ প্রায় তিন বছর। দিনের বেলাও সারাক্ষণ আলো জ্বেলে পড়াশুনো রান্নাবান্না বাথরুম। সেই অন্ধকার কৌটোটার ভেতর গলে পচে হেজে যেতে যেতেও কলেজ ইউনিভার্সিটি ডিঙিয়ে এতটা এলাম। মহীয়সী কেউ নই, একটা বড় জায়গায় পৌঁছোনোর আকাঙ্ক্ষায় যখন তুমি তোমরা তোমার বন্ধুরা...আস্তে আস্তে তুমি একমাত্র হয়ে উঠলে...বড় বেশি নিশ্চিন্ত হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাসকে আঘাত করার কোনো পাপ নেই উৎপল? কোনো শাস্তি?

কাঁপতে কাঁপতে আরো একবার উঠে আসতেই হয় বেদনার কেন্দ্রে। এমার্জেন্সির একতলায় ভিজিটর্স রুমের ভিড়টা এখন অনেক হালকা। আলুলায়িত মাসিমার দুপাশে অনুকাকিমা আর শুভ্রাদি। পেছনের দিকে একটা বেঞ্চিতে ভাঙা ন্যাতানো ভঙ্গিতে মেসোমশাইকে নিয়ে কৃষ্ণা। শিপ্রাকে দেখলেন সবাই। বললেন না কিছু। এখন, এখানে কেউ

কারুর জন্যে নয়। একটা বৃত্তাকার ঘড়ির দিকেই একাগ্র দৃষ্টিগুলি। সেকেন্ডের কাঁটাটা ঘুরছে বলেই মনে হয়। ঘণ্টা-মিনিট এখনও সচল। ঝপ করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে যে-কোনো সময়। যবনিকা পতনের ভয়।

উঠে দাঁড়াল সুনন্দা। এগিয়েও এল—'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'কেন বৌদি! কোনো খবর?'

ঠোঁটে ভাঁজ কাঁপিয়ে এপাশ ওপাশ মৃদু মাথা নাড়া সুনন্দার—'কোথায় আর খবর? অনেকক্ষণ আগে শুনেছিলাম, সেন্স ফেরেনি। আর তো বলছেও না কেউ কিছু।'

বৌদির ছলছল চোখের সংক্রমণে অথবা মর্গের বিভীষিকায় যখন কঠিন নিজেকে সংযত রাখা, দেহমনের স্তব্ধতায় শিপ্রা অস্থির হলো। তবু তো একটা সংবাদ—শেষ হয়ে যায় নি উৎপল। এখনও কিছু আশা।

'শ্যামলদা ভাস্কর সবাই কোথায় বৌদি?' ফ্যাসফেসে ভেজা গলাটা নিজের কানেই অদ্ভুত।

'ছিল তো এখানেই। আছে কাছাকাছি কোথাও।'

শিপ্রা আরো একবার পালাতে চাইল। উৎপলের শব ছুঁয়ে দাঁড়াতেও তার লোকচক্ষুর পীড়ন। মাসিমা মেসোমশাই শুভ্রাদির সপ্রশ্ন চোখের সামনে বড়ই বিপন্ন সে। অজ্ঞাতকুলশীল।

কিন্তু পালাবে কোথায়? অজ্ঞাতপরিচয় যদি ভেতর থেকে নিজের কাছেই। তখন শুধু শোক নয়, নাকচ হয়ে যাবার অপমান আর আক্রোশে ফেটে পড়তে না-পারার বন্দীত্বে আরো বেশি যন্ত্রণা

একদা বসন্তবেলায়

কফি হাউসে যাওয়া যায়। পুরনো কলেজের দিন থেকেই চেনা-জানা জায়গা। কিন্তু এত বেশি পরিচিত-মানুষের জটলা, বসতে বসতেই বারোয়ারি হয়ে ওঠে টেবিলটা। রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় কত আর চা চপকাটলেট গেলা যায় রোজ-রোজ? কাপপ্লেট ফুরোবার আগেই পর্দা সরিয়ে বিলশুদ্ধু মৌরির প্লেট রেখে যাবে, নয়তো মাথার ওপর পাখাটা বন্ধ। আরেক অসম্মান। কাঁহাতক হেঁটে বেড়ানোও সম্ভব। লাখো লাখো মানুষের ভিড়। ময়দান বা নদীর ধারে প্রতিদিন? অ্যাবসার্ড।

অগত্যা নতুন পরিকল্পনা। মগজে অদ্ভুত আর আজব সব বুদ্ধিও খেলত মানুষটার!

হাঁটতে হাঁটতে মাইল খানেক পিছিয়ে গিয়ে বাগবাজারে টু-বি বা তিন নম্বর বাসস্ট্যান্ড। কোনো ডবলডেকারের দোতলায় একেবারে সামনের দিকে পুরো একটা সিটের দখল। বাস ছুটত। পেছনে একতলায় দোতলায় হাজার হাজার মানুষের ওঠা-নামা কোলাহল ধস্তাধস্তিতে ভ্রূক্ষেপ না রেখে নির্বিকার বসে থাকা। গোটা কলকাতা ঘুরে ঘুরে বালীগঞ্জ স্টেশন অথবা খিদিরপুর অরফানগঞ্জ মার্কেট। দু কিস্তি ভাড়ায় দুটো সিটের মৌরসিপাট্টায় উত্তর-দক্ষিণে কলকাতাকে এফোঁড়-ওফোঁড় প্রতি সন্ধ্যায়।

দুদিনেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল শিপ্রা। তাছাড়া নিয়মিত কন্ডাক্টর ড্রাইভার স্টার্টারদের কাছেও

স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ঘটনাটা। ওদের মুচকি হাসি, চোখের কৌতুক বিঁধত শরীরে।

'দুচ্ছাই এ-হয় না। কাঁধে পিঠে ব্যথা ধরে গেল আমার। এতক্ষণ বাসে বসে থাকা যায়? সে-ও আবার রোজ রোজ!'

'কোথায় আর যাবে ম্যাডাম! এর পর তো তাহলে চটপট বিয়েটাই করে ফেলতে হয়। নয়তো...'

'নয়তো!'

'গঙ্গার ধারে শ্মশান ছাড়া আর জায়গা দেখছি না কোথাও। হাসিঠাট্টার মেজাজ থাকে না ওখানকার লোকজনের। নদী আছে, আকাশ আছে, ওপারের দিগন্ত আছে। বেশ রোমান্টিক। নির্জনতাও পাবে।'

'উঃ অসহ্য। কি যে বলো তুমি মাঝে মাঝে! মুখেও আটকায় না?'

'কেন! কী এমন অশ্লীল কথা বললাম?'

'বিয়ে নয়তো শ্মশান! দুটোই অলটারনেটিভ? আশ্চর্য! একজন নর্মাল লোকের মাথায় আসে কী করে এসব? আবার দাদাকে ঠাট্টা করো কবিতা লেখেন বলে!'

'কে কাঞ্চনদা? ওঃ, হি ইজ এ নাইস ম্যান। ধরেবেঁধে শ্মশানে নিয়ে গেলে নির্ঘাৎ কেঁদে ফেলবেন। এদিকে মহিলা দেখলেও ওভারটেক করেন। করবেন কী ভদ্রলোক? ঘরে বসে কবিতা লেখা ছাড়া!'

ভালোমানুষ দাদাকে নিয়ে ঠাট্টায় অত সহজে কাউকে ছেড়ে দেয় না শিপ্রা। কিন্তু সেদিন, 'শ্মশান' শব্দটার খোঁচায় বড় বেশি এলোমেলো হয়ে পড়েছিল সে। অনতিঅতীত বাবার মৃত্যুদৃশ্যটা! ওই একটি মানুষের মৃত্যুতে তছনছ একটি সংসার এবং তিনজন মানুষের নিরাপত্তা। শান্ত গলায় বলেছিল—'জানো, শ্মশান আমি দেখিনি কখনও। যাইনি কোনোদিন।'

'ওটা কেরানিবাবুর কাছে বড়সাহেবের ঘর। কিংবা ধরো, আমার তোমার কাছে থানা-পুলিশের দরজা। ওখানে যায় না কেউ। যেতে হয়।'

'মাঝে মাঝে এত সুন্দর কথা বলো তুমি! কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'কী যে সব আবোল-তাবোল কাণ্ডকারখানা তোমার! সব কিছুকে কী করে যে মেলাও ছাই! একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'ন্‌নাহ্ কিছু না...'

'বলোই না শুনি।'

'বলছি তো, কিছু না। এমনি...'

'কী! একা বসে আছো? ক্ষিধে পায় নি তোমার?'

ঘাড় ফিরিয়ে, চমকে, লাফিয়ে উঠল শিপ্রা।

নৈঃশব্দ্য মুহূর্তের। শ্যামল নির্বাক। গোটা পরিবারের তরফ থেকেই যেন মেয়েটির কাছে

জবাবদিহির দায়। কব্জিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, আস্তে, কণ্ঠস্বরের লঘুতায়—'সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। ওদিকে তো অনেকেই বাড়ি চলে গেল। খেয়েদেয়ে দুপুরের দিকে আসবে। তুমি...'

'আমি খাব না।'

'সে-কি হয় নাকি!' স্নেহে, কাঁধে হাত রাখল শ্যামল। স্কাউড্রেলটা বেঁচে থাকলে, এখনো যদি বেঁচে ওঠে, এ-মেয়েই কত আপন হয়ে উঠতে পারত ঘরে! আর্দ্রতায় আরো ঘন হয়ে আসে গলার স্বর—'সকালে চা খাবার সময় পেয়েছিলে তো? নাকি তা-ও হয় নি?'

গোটা শরীরের কুঞ্চনে, মুখচোখের তিক্ততা নিয়েও বিরক্ত না-হবার নম্রতায় শিপ্রা—'আমি বরং বাড়িই চলে যাব। এখানে ভালো লাগছে না আমার।'

'একটা কথা শুনবে?'

'বলুন।'

'আমার সঙ্গে চলো।'

'কোথায়?'

'কাছাকাছিই কোথাও। সামান্য যা-হোক খেয়ে নেবে।'

জ্যেষ্ঠের নির্দেশ। সসম্ভ্রম মান্যতায় যখন এগোতেই হয়, পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে—'ভাস্কররা কোথায় শ্যামলদা?'

'ওকে আমিই পাঠিয়েছি একটু।'

'কোথায়?'

'খোকনদের ব্যাঙ্কে...' রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে শ্যামল দীর্ঘশ্বাসে—'কেন যে এত বড় একটা কাণ্ড করে বসল ছেলেটা? কেউই জানে না কিছু। কোনো হদিস নেই। দেখা যাক, যদি ওর অফিসের কোনো কিছু...'

নিঃশব্দে অনেকদূর হেঁটে এসে, কোনো হোটেল নয়, মাঝারি একটা রেস্তোরাঁয়, শিপ্রার প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন পাউরুটি আর চিকেন কারি, কুঞ্চন থেকে কুঞ্চনে সঙ্কুচিত হতে হতে শিপ্রা আরো বেশি গুটিয়ে যেতে থাকে নিজের মধ্যে।

খাদ্যে এত বিস্বাদ! এক সময় মাথা তুলল শ্যামল—'একটা কথা বলব শিপ্রা। জানি তুমি শার্পলি রিঅ্যাক্ট করবে। তবু...'

'আমি জানি না শ্যামলদা। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন। আমি...'

ভরাট যৌবনের মেয়ে, টেবিলের ওপাশে এত কাছাকাছি ভেঙে পড়ে উবু হয়ে কাঁপছে থরথর। শ্যামল বিব্রত তার নিজের মূঢ়তায়।

অথচ ঘড়ির কাঁটায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ফুরোতে এখনো অনেক, অনেক বাকি। বাইরের মানুষগুলি সুস্থতায় ফিরবে কিনা, এখনো জিজ্ঞাসা।

মধ্যপর্ব

এই প্রায়-নির্বাপিত বংশগতির
ধারে কাছে
নিয়ম ও অনিয়ম, প্রথা-পরিণাম
পড়ে আছে
মস্ত আয়তন জুড়ে পাঁচিলের তর্জনীর পাশে
মহাপঞ্চকের অস্থি, বাঁচে

চারিদিকে পৃথিবীর আয়ু, চারিদিকে
জলবায়ু, লোভ—
এইখানে হীন,
প্রপিতামহের থেকে পরম্পরা বেয়ে এসে, বসে
অধমর্ণ এক, তার আমন্তক ঋণ।

একজন খাতক : সিদ্ধেশ্বর সেন

আটচল্লিশ ঘণ্টা নয়, দুপুর গড়িয়ে বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ চোখ খুলল উৎপল। জানালার ফ্রেমে তখন পড়ন্ত বেলার রোদ ছিল। বিকেলের তামাটে গোধূলি। জলের তলায় ডুবে যেতে যেতে এক ঝটকায় মাথা চাগানোর পর আলোকিত পৃথিবীটা যেমন, প্রথম পলকপাতে তেমন দৈহিক শক্তি ছিল না বলেই হয়তো, নববিস্ময়ের বাস্তবটাকে মেনে নিয়ে, চোখে চোখ রেখে অপরিচয়ের নারীপুরুষদের অথবা ঝকঝকে শান্ত ঘরের দেয়াল, দুপাশের শয্যায় শয্যায় বিকল সব মানুষ বা অতিঘনিষ্ঠ যন্ত্রপাতিগুলোকে কিঞ্চিৎ বুঝে নেবার কঠিন লড়াইয়ে সে ক্লান্ত হলো।

মগজের ঘুলঘুলি খুলে প্রথমই সে তার স্মৃতিলুপ্তির ছেঁড়া সুতোটাকে খুঁজে পেয়ে, সেই বীভৎস রাতের দুঃস্বপ্ন থেকে আজকের, এই মুহূর্তের সকাল অথবা দুপুর অথবা বিকেল, দু-দিন দশদিন অথবা পনের দিন, অথবা মাস-কয়েকের এপার-ওপার—সময়ের হিসেব নেই, যেন দীর্ঘ, দীর্ঘতর নিদ্রাশেষে নতুন করে নিজেকেই ফিরে পাবার পর, যখন, কুঞ্চনহীন শাদা বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে-থাকা দুর্বল আর অবশ শরীরটাকে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর কোনো-এক অজ্ঞাতস্থানে স্থিরজলে ভাসমান নির্ভার

হঠাৎ-ই অনুভব—কোথাও সে ক্রুশবিদ্ধ। কেননা, নাকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা। ঘাড়গর্দান শিরদাঁড়ায় টনটন ব্যথা। এপাশ-ওপাশ নড়তে না-পারার বন্দিত্বে পেটের তলার খিঁচুনি থেকে

গলায় আটকে-থাকা কুৎসিত বমির উদ্গার। ডেটল-আয়োডিন গোছের পচা রাসায়নিক দুর্গন্ধে অবরুদ্ধ উদ্গারের চাপ আরো তীব্র যখন, বুকের ভেতর জ্বালা

তাঁবুর দড়ির মতো বিছানার দু পাশে টান-টান হাত রেখে, প্রায় বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোট-প্যান্ট-টাইয়ের এক চকচকে প্রৌঢ় পুরুষ—'কেমন মনে হচ্ছে এখন?'

কথা বলার বাসনা নেই। শূন্যতার চোখ তখনও ঝাপসা। উৎপল তাকিয়ে থাকে। ভদ্রলোক অবশ্যই ডাক্তার এবং সে এখন হাসপাতালে। বোঝা গেল, কেননা, তাঁর ডান দিকে শাদা অ্যাপ্রনে অনতিবয়স্ক আরো দু জন পুরুষ এবং সহজেই চেনা যায়, একজন নার্স।

'চিয়ার আপ, চিয়ার আপ ইয়ংম্যান। কী হলো, কথা বলছেন না কেন?'

স্নেহময়তায় অথবা যথার্থই ধমক, প্রৌঢ় ডাক্তার মৃদু হাসলেন—'কী অসুবিধা হচ্ছে এখন?'

আচ্ছন্নতায় শ্রুতি ছিল। স্থির দৃষ্টিতে অবিচল তাকিয়ে থাকার ক্লান্তিতে উৎপল কিছু একটা বলতে চাইল। গলাটা টিপে ধরে আছে কেউ। বড়ই দুর্বল—'পিঠে বড্ড ব্যথা।'

'হুঁ, ওটা কিছু নয়। দেখছি...' সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার—'সিস্টার, এই বোতলটা শেষ হয়ে গেলে ফ্লুইড বন্ধ করে দেবেন। কথা বলছেন। রেসপিরেশান অলমোস্ট নর্মাল। বেডস্যোরটাও দেখবেন একটু...'

চকিতে, সহচর জুনিয়ারদের নিয়ে সরে যাবার মুহূর্তে—'এর বাড়ির লোকজনেরা কোথায়?'

'বাইরে।'

'থাক, এখনই নয়। ওকে একটু সামলে নিতে দাও। এসব পয়জনিং কেসে একটু অ্যালার্ট থাকা দরকার। হঠাৎ কোনো ইমোশনাল আউটবার্স্ট ঘটে গেলে পেশেন্ট হয়তো সার্ভাইভ করল, দেখবে আরেক ভিজিটরকে নিয়ে নতুন ট্রাবল...'

উৎপল শুনতে পেল। আটান্ন কেজি ওজনের মোটামুটি ভারি শরীরটাকে যখন আর নিজের বলে মনে হচ্ছিল না কিছুতেই, মগজের কেন্দ্রেও এক নির্ভার শূন্যতা। নদীর ব্যবধান পেরিয়ে এপারের ঘাটে পৌঁছনোর পর ওপারের গাছপালা ঘাসমাটি যেমন বিলীন দিগন্ত, মুদিত চোখের গভীরে, স্নায়ুতে, শিরায় শিরায় পুরনো আর বাতিল জীবনের স্মৃতিপুঞ্জ কৃমির মতো হাঁটে।

তখন যন্ত্রণা। ডানে বাঁয়ে অদৃশ্য শেকল বাঁধা গোটা শরীর জুড়ে হাড়ে হাড়ে টান-টান ব্যথা। বাঁ হাতের কনুইটা অনড় পাথর। প্রবল অস্বস্তিতে সে তার চারপাশ বুঝতে চাইল। বালিশের ওপর মাথার চাপ রেখে, কুঞ্চিত ললাটে চোখের মণিটা উর্ধ্বে তুলে নার্স ভদ্রমহিলাকে দেখল। শিয়রের ডান পাশে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে কী করছেন মহিলা। এবং তখনই, বাঁদিকে, বাঁ হাতের যন্ত্রণার উৎসে লোহার স্ট্যান্ডে ঝোলানো উল্টো বোতলটার দিকে চোখ। ওই বোতলের সঙ্গে একটা স্বচ্ছ নলের সূত্রে তার সংযোগ। এই বোতলের পর আর নয়। ডাক্তারের নির্দেশ সে শুনেছে।

বোতলটা ফুরিয়ে আসছে। প্রায় তিন-চতুর্থাংশই নিঃশেষ। যেন সম্ভাব্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চোখের মণিটা উল্টে, ভ্রূ আর কপাল ছুঁয়ে দৃষ্টিকে অপলক ছড়িয়ে রাখা।

চুঁইয়ে চুঁইয়ে, অনেকক্ষণ ধরে ফোঁটাটা তৈরি হচ্ছে বোতলের মুখে। উঃ, কী অসহ্য! ছো
একটা তরল বিন্দু জমে উঠতে এত, এত দীর্ঘ সময়! উর্ধ্বমুখী তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে
শিরায় টান লাগে। দুটো কানের ওপর দিয়ে মস্তিষ্কের রগে রগে টনটন যন্ত্রণা। তখন রাগ। গোট
শরীর মুচড়ে বীভৎস চিৎকারে নলটা দু হাতে উপড়ে ফেলার সাধ।

'এ কি! কী করছেন আপনি?' নার্স ছুটে এলেন।

উৎপল বন্দীদশায় নিঃশব্দ গর্জনের চোখে তাকাল।

নার্স তাড়াতাড়ি নলটাকে ধরলেন সাবধানে। আরেক হাতে রোগীর অস্থির হাত দুটোকে সামলে রাখার দায়—'ওভাবে টানাটানি করবেন না। মরে যাবেন যে...'

মরে যাব! আগ্নেয় দৃষ্টি বদলে গিয়ে যখন প্রশান্ত বিস্ময়, হতচকিত নার্সও নিজেকে সামলে নিয়েছেন মুহূর্তে। ফ্লুইডের নল এবং রোগীর স্বচ্ছন্দ শয়নকে বিন্যস্ত করতে করতে, পেশাগত কর্তব্যপালন অথবা সেবাধর্ম, মৃদু হাসলেন—'কি যে আপনারা ছেলেমানুষি করেন মাঝে মাঝে...'

ভালো লাগছে না কথা বলতে। চোখ টেরিয়ে শিয়রের উর্ধ্বে আবার সেই বোতলটার দিকে চেয়ে থাকা। চার্জ শিট হাতে এলে যেমন, চিড়মিড় রাগে বা উৎকণ্ঠায় অক্ষরগুলো এগোতে চায় না। প্রতিটি অক্ষর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। একই নিয়মে ফোঁটায়-ফোঁটায় জমছে জলবিন্দু পড়ে যাচ্ছে টুক করে। যেন তার হাড়মজ্জা শুষে শুষে জন্ম নিচ্ছে প্রতিটি জলের ফোঁটা এবং নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার ক্লান্তিতে যখন অবিরাম চাপ, দাঁতে দাঁত চেপে তখন অঙ্কের হিসেব—একটি একটি করে গুনলে কত সহস্র, কত লক্ষ, কত কোটি বিন্দুতে অবশিষ্ট জলটুকুর পূর্ণ পরিমাণ? ব্যাঙ্কের লেজারে ফোলিওর পর ফোলিও জুড়ে প্রতিটি তুচ্ছ পয়সা জমে জমে জমে জমে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মিনার? কীর্তিসম্পদ জগৎ-প্রভুদের? তখন মরণ প্রভুকীর্তির কারিগর, রাজমিস্ত্রি উঁচু থেকে স্খলিত হলে যেমন ধ্বসে পড়ে গুঁড়িয়ে যেতেও পারে। এবং মৃত্যু। অবধারিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া ছাড়া যদি কোনো বিকল্প নেই

উৎপল শূন্যতায় তাকিয়ে থাকে। দুঃস্বপ্নের ধূসর বর্ণে পুরনো আর বাতিল পৃথিবীটা প্রতিরোধ ঠেলে ফিরে ফিরে আসতে চাইছে—ব্যাঙ্কের আলোকিত কর্মচাঞ্চল্যে ফাইল লেজার রাজপুত্র-রাজকন্যাশোভায় উজ্জ্বল মানুষেরা, ঘরের খাঁচায় নির্বোধ ভালোমানুষ মা-টা গোবেচারি বাপ, মাছের মতো ঠাণ্ডা আর চঞ্চল কৃষ্ণা, 'এস্টাব্লিশমেন্ট'-এর চেহারায় সংসারের বড়বাবু দাদা-বৌদি, আড্ডার হুল্লোড়ে বন্ধুরা এবং

শিপ্রা! মরে-যাওয়া আর বেঁচে-থাকার মধ্যবর্তী একমাত্র হাইফেন।

ঘরের আলোগুলি জ্বলে উঠেছে কখন? জানালায় বিকেলের রঙ মুছে গিয়ে ঘরের ভেতর নিশুতি। চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিং-ফ্যানটার দিকে নিষ্পলক থেকে, যখন তিনটি ব্লেডের কোনো আলাদা চেহারা নেই, ঘূর্ণ্যমান পাখাটা তার ভাবনার খাপে খাপে অদ্ভুত মিলে যায়—যেন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ একাকার মিশে গিয়ে পূর্ণবৃত্তে স্বচ্ছ, তখন ভাবনাও দুর্বহ। তবু তাকিয়ে থাকে—ধাতব বস্তুর স্বচ্ছতায় স্পষ্ট দেখা যায় সিলিংয়ের শাদা রঙ, যান্ত্রিক পাখার বৃন্ত—প্রচণ্ড ভারি আর দীর্ঘ শিরদাঁড়া।

'কী ভাবছেন?'

উৎপল ম্লান চোখে তাকাল। প্রবীণ ডাক্তারবাবুর বিকল্পে দু জন তরুণ ডাক্তার বেডের পাশে। সহাস্যে—'কেমন ফিল্ করছেন এখন? এনি ট্রাবল?'

বোধ হয়, এদেরই হাউস-স্টাফ বলে। উৎপল কাতর চোখের ইশারায়, নিঃশব্দে হাতের নলটা দেখাল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-তো খুলে দেওয়া হবে এক্ষুনি। দিচ্ছি খুলে। বোতলটাও ফুরিয়ে এসেছে...'

অন্য ডাক্তার—'এত বড় ভিক্টরি আপনার! এ-আর কতটুকু সময়? এটুকু সইতে পারবেন না?'

ভিক্টরি! কার ভিক্টরি? যদি সারা দেহের দুঃসহ যন্ত্রণায় শুনতে বা বলতে কোনো কিছুই ভালো লাগছে না তার, তখনই অস্তিত্বের শিকড়-কাঁপানো একটা শব্দের খোঁচায় ধমনীর চঞ্চলতা বাড়ে, অস্থিরতা আরো।

একজন ডাক্তার ডানদিক থেকে ঘুরে গিয়ে বেডের বাঁ পাশে দাঁড়ালেন—'সেই রাত থেকে কি কম ভুগিয়েছেন আমাদের? অ্যান্ড অল ফর গুড, ইউ আর সেভড...'

শব্দগুলোর আসলে কোনো অর্থ নেই। মূঢ়তার প্রলাপে শ্রবণ মাত্র। কেননা, মহাশূন্যের ওপার থেকে পৃথিবীর দিকে নতুন করে ফিরে আসার অত্যাধুনিক গৌরব নেই কোথাও। চাঁদের তথ্য হাতে নিয়ে প্রত্যাবর্তন নয়। হাতের মুঠোয় চাঁদ না-পাবার পরাভব

'আপনার মা বাবা বাড়ির লোকজন অপেক্ষা করছেন বাইরে। আসবেন একটু বাদে...'

রক্তস্রোতে শিহরন। সেই পুরনো বাতিল পৃথিবীটা? দুঃসহ শারীরিক পীড়ন সত্ত্বেও মগজের কেন্দ্র থেকে শীতল রক্তপ্রবাহ নদীর মতো শাখা-উপশাখায় সঞ্চারিত চতুর্দিকে। বিস্মৃত এবং একদা বাতিল মুখগুলি

অসহ্য ক্লেশ। বিস্ফোরণে ফেটে পড়ার উন্মাদ বিভ্রমে মরে-যাওয়া আর অতর্কিতে বেঁচে-ওঠার মধ্যে কোন্‌টা যথার্থ দুর্ঘটনা নিজের কাছে বুঝে নেবার তাগিদেই যখন মরিয়া আক্রোশ

বাঁ-হাতের কনুইয়ে কাদের শক্ত হাত! তাকে ঘিরে কর্তব্যে সচল ডাক্তার এবং নার্স। কী হচ্ছে, জানে না সে। শুধু বোঝে, যন্ত্রপাতিগুলো খুলে নিচ্ছে ওরা। অস্বস্তি থেকে হয়তো এবার সত্যি রেহাই। দাঁতে চেপে সহ্য করলে হয়তো বা সেবাশুশ্রূষার পিরিত থেকেও ছেড়ে দিতে পারে। জীবনটা দ্রুত ফিরছে জীবনে

এবং এক সময় যন্ত্রপাতির খপ্পর থেকে যথার্থ মুক্তির পর যখন ঘাড়গর্দানের তীব্র যন্ত্রণা নিয়েও কিছুটা স্বস্তি, হাসপাতালের কৃপণ আলোয় এপাশে-ওপাশে, ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আদলে, সারি সারি শয্যার সে ভাঙাচোরা মানুষের মূর্তিগুলি দেখল প্রথম। পাশের বেডের এক বৃদ্ধ বিকট গর্জনে কাশতে কাশতে, কী বীভৎস সে-কাশি, বিছানার প্রান্তে উবু হয়ে মেঝের পিকদানি তুলে দলা দলা কফ ফেলছে উজবুকের মতো। গা ঘুলোয়। পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে একটা ঘেন্নার কাঁপুনি শরীরের গাঁটে গাঁটে। অসুস্থ আর বিকল মানুষের রুগ্নতার আবহে নিশ্বাস নিয়ে টিকে থাকার অভিজ্ঞতা কী নির্মম। কী নোংরা, কী জঘন্য চারদিক। অথচ সে, যেন সেই সংশয়-পীড়িত যুবক—উন্নতির মোহে বিদেশের দীর্ঘ প্রবাসে ক্লান্ত হবার পর ঘরের টানে প্রত্যাবর্তন-

পথে যেমন ভাবে—ফেরাটা ঠিক হচ্ছে কিনা! ভাবনাটা ঘুলোতে থাকে মগজে

তখন ঘুম। দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জাগরণ-অবসাদে আবার ঘুমের কাঙালপনা। বালিশে মাথা রেখে, কাত হয়ে ঘুমোতে চায় সে

অবাস্তব ঘুমের স্বপ্নে কারা আসে! ছায়া-ছায়া বিবর্ণ মানুষগুলি

চোখের পাতায় উজ্জ্বলতা ছিল না। অবশ দুর্বল শরীরটাকে শায়িত রেখে উৎপল, ঘরের নীরক্ত শূন্যতায় দেখতে পেল নদীর ওপার থেকে এসে পৌঁছে গেছে কয়েকজন মানুষ। আবেগ নেই, চঞ্চলতা নেই। বিন্দুমাত্র কম্পনশূন্য তার এক জোড়া চোখ অচল ঘড়ির পেণ্ডুলাম

এবং নিবদ্ধ দৃষ্টির পরিসীমায় ওরা পাঁচজন বিগ্ ক্লোজ-আপে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলে, তদারকির নার্স ভদ্রমহিলাও নাকচ হয়ে গেলেন। ঘরটা সত্যি-সত্যি স্থবিরতায় প্রস্তরীভূত হয়ে ওঠার পর, অপার নৈঃশব্দ্যে কথা নেই শব্দ নেই, অথবা দুরন্ত ঘূর্ণিপাখার বাতাসই যখন একমাত্র ধ্বনি, জোড়া জোড়া কতগুলি নীরব চাহনির ব্যূহে এক জোড়া বাক্যহীন চোখ শোকদুঃখতাপ বা কৈফিয়ত নয়, আকাশের নক্ষত্রের মতোই আরো অনন্তকাল এই একইভাবে অপলক থাকার শক্তিতে অটল

রুদ্ধশ্বাস অধৈর্যে যখন রেণুবালা গোটা শরীরে কাঁপতে কাঁপতে, আস্তে আস্তে গালথুতনি কুঁচকোতে কুঁচকোতে আঁচলে মুখ চেপে ভেঙে পড়ার উপক্রম—কান্না নয়, একটা বিস্ফোরণই হয়তো-বা, কৃষ্ণা আর সুনন্দা এসে জাপটে ধরল মাকে

এবং তখনও, মরা-মানুষের ফোটোর মতো এক জোড়া শায়িত চোখ ঠাণ্ডা নিষ্পলক। কুঞ্চিত ভ্রূরেখার কটাক্ষ নেই, সিক্ত আবেগের অশ্রু নয়

যেন শনাক্ত করতে এসে রক্তের অংশীদার আপন মানুষকে চিনতে না-পারার বা নিজেরাই শনাক্ত হতে না-পারার বিহ্বলতায় ওরা পাঁচজন কান্নাকে বুকে চেপে নিজেদেরই ছায়াকে কাঁপাতে চাইছিল অথবা নিশুতির ঘরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণই কাঙ্ক্ষিত যখন, দূরত্বটা দীর্ঘতর হলো। বিস্ফোরণ নয়, একটা অপ্রতিরোধ্য গোঙানি তলা থেকে উচ্চারিত হয়ে ওঠার সূচনাতেই রেণুবালাকে নানাভাবে জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা।

শয্যায় শয্যায় উৎসুক রোগীদের পাশ কেটে যেতে যেতে শ্যামল একবার তাকাল পেছনের দিকে। সত্যসাধন ফেরেন নি এখনও।

একমাত্র সত্যসাধন, আচ্ছন্ন ভীরুতায় বেড ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে পাথরের চেয়েও দয়াহীন সন্তানের গায়ে হাত রেখে নিজেও পাথর। পায়জামা আর গেঞ্জির ফাঁকে এক ফালি পেটের চামড়ায় নিশ্বাসের ওঠা-পড়াটা যখন নিঃসন্দেহে স্পষ্ট এবং বাস্তব, সজল চোখের আবরণে যেন তাঁর নিজেরও সান্ত্বনা। আনত হলেন। ঘাড় পিঠ মাথা ভেঙে পাথরের চোখজোড়ার দিকে চোখ রেখে শান্ত লঘু ভঙ্গি। হাতটা বাড়ালেন। হাতটা রাখলেন শায়িতের মাথায়। বাহু থেকে কোমর অব্দি প্রলম্বিত স্নেহ। স্মৃতিময় ভাস্কর্যে, ব্রোঞ্জে বা পাথরের শীতলতায় সন্তানের স্বাদে-গন্ধে বুঝি আরো একবার নিজেকেই খুঁজে পাওয়া। শুধু একবার, হাতটা ফিরিয়ে নেবার মুহূর্তে শায়িত দেহটা মোচড় খেল। পাশ ফিরে উল্টোমুখো হয়ে শোবার বাসনায় মৃদু দীর্ঘশ্বাস ধ্বনি।

আহত হলেন না সত্যসাধন। সন্তানের মাথায় আরো একবার আদর নিকোনোর পর

নিজেরও সাধ নেই কুশল প্রশ্নের—'ঘুমো বাবা, ঘুমো। বিশ্রাম নে। ধকল তো কম গেল না সেই রাত থেকে একটানা সারাটা দিন। তবু তো ভাগ্যি আমাদের, ফিরে পেলাম তোকে। দয়াময় ভগবান...'

নীরব করজোড় ললাট স্পর্শ করল—মৃত্যু কেন এমন করে কড়া নেড়ে গেল ঘরের দরজায়? জীবনপ্রান্তে, সভক্তি গীতা-উপনিষদ নিয়ে বেঁচে থাকার বয়সে যখন ওদের ভরপুর সংসার দেখার সাধ!

যেন অন্ধকার খনির ভেতর নিয়ে গিয়েছিল কেউ। দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ প্রহর কাটিয়ে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক থেকে ওপরে উঠে আসার পর মুক্ত আকাশ, আলো আর বাতাস। ঘরে ফিরতে রাত হলো। শরীরে মনে বিপর্যস্ত মানুষগুলি টলছে অবসাদে। বিপদের মেঘ পুরোপুরি কাটল কিনা, সংশয় যদিও।

ভাস্কর শেষ পর্যন্ত সঙ্গে ছিল। রাত যতই হোক, শ্যামলদার সঙ্গে কিছুটা নিভৃতের সংলাপ তার বড়ই জরুরি। ঘটনাটা সে জেনেছিল দুপুরবেলাই। নিজের কাছে উৎপল নামক অস্তিত্বটা হঠাৎ এভাবে মিথ্যে হয়ে যাবার পর হাসপাতালের অনিশ্চয়তায় বলে নি কাউকে। উৎপলের বেঁচে-থাকা অথবা মরে যাওয়ার মধ্যে কোনটা বাঞ্ছিত—এবম্বিধ সংশয়ে জ্বলেপুড়ে অনেক রাতে, হাসপাতালের কালো পাথরটা গলে গলে ভারমুক্ত হবার পর যখন কিছুটা শান্তি বা স্বস্তি, অন্তরালে টেনে নিয়ে অগ্রজকে সব কিছু জানিয়ে, অর্থাৎ মস্তিষ্কের দুর্বহ ভার যথাস্থানে পৌঁছে দেবার পর নিজেরও পরিত্রাণ।

এবং খোকনেরই পরিত্যক্ত ঘরের নির্জনে, সেই অভিশপ্ত শয্যায় বসে ইতিবৃত্ত শ্রবণে শ্যামল তার অস্তিত্বের কাঁপুনিতে নতুন করে সর্বশূন্যতায় বধির হলো—'কী বলছ। বলছ কী তুমি?'

ভাস্কর কুণ্ঠিত বেদনায়—'কিন্তু মুশকিল, ওদের ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ ধড়িয়া এখন কলকাতায় নেই। বোনের বিয়েতে লখনউ গেছেন। দিন সাতেকের ছুটি। উৎপলের ফাইলটা এত সিক্রেট, সে-নাকি দেখেও নি কেউ। ঠিকমত জানেনও না কেউ কিছু...'

সঙ্কটের নতুন স্তরে বিধ্বস্ত শ্যামল সর্বাঙ্গের ক্রোধে চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। পাখার তলায় থেকেও ঘর্মাক্ত হাঁসফাস—'বাট ইট ইজ এ ডেফিনিট কেস অব ফর্জারি! আর তাতে কোনো-না-কোনোভাবে খোকন ইনভলভড?'

'ও-রকমই তো বললেন বাসুদেববাবু। ওদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।'

'তিনিও ফাইলটার কিছু জানেন না?'

'ওই তো, ঘটনা যেটুকু ঘটেছে, সে-অব্দি। সাস্‌পেনশান অর্ডার সার্ভড হবার পর ম্যানেজমেন্ট কী লিগাল অ্যাকশন নেবে, জল কতদূর গড়াতে পারে, এসব কিছুই বললেন না। মানে, জানেন না বলছেন...'

তীব্র বেগে, গোটা শরীরটাকে মোচড় দিয়ে ঝাঁ করে উঠে দাঁড়াল শ্যামল। শোকতাপদুঃখের নিহিত ভালোবাসা যদি চকিতে বাঁক ফেরে ঘৃণায় বা ধিক্কারে এবং সেই ঘৃণার আধারে যদি

থাকে নিজেরই সহোদর!

অথচ স্মৃতিময় শূন্যতায় নির্বাক বধির এ-ঘর। হাসপাতালের শয্যায় মৃত্যু ছুঁয়ে ফিরে-আসা ছেলেটা যেমন বাস্তব, ঘরের আসবাব—খাট বিছানা টেবিল চেয়ার হ্যাঙারে-ঝোলানো শার্টপ্যান্ট স্টিরিও স্ট্র্যানজিস্টার...খোকনেরই বিনষ্ট প্রতীকে দেয়াল ঘেঁষে পর পর দুটো আলমারি আর বুক-সেলফ পরিকীর্ণ অজস্র বই। রাত জেগে বই-পড়ার নিত্য অভ্যাসে সংসারের চিৎকার-চেঁচামেচি থেকে নিজেকে সংগোপনে আলাদা রাখত যে-ছেলে—মেলে না, মেলানো যায় না তাকে...অথবা এই তালগোলটাই হয়তো সত্যি, একমাত্র খাঁটি। অঙ্কটা মেলে কোথায়?

খোকন জালিয়াৎ! মস্ত একটা জটিল চুরিচামারির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে দিন সাতেক হলো সাস্‌পেন্ডেড!

'তাহলে! তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে এখন। সুইসাইড ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ওর...' অস্থির পায়চারিতে ঘরের কোণে টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শ্যামল, যেখানে কিছু বইপত্রের সঙ্গে স্তূপীকৃত বাংলা ইংরেজি মাসিক-সাপ্তাহিক। অর্ধনগ্ন মেমসাহেবের হাসি-উচ্ছল প্রচ্ছদশোভায় একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা অকারণেই ছুঁড়ে ফেলে ফেটে পড়ল প্রচণ্ড ক্ষোভে—'নাউ ইট ইজ ক্লিয়ার। চুরিজোচ্চুরি ঠগবাজির মধ্যে যদি ইনভলভডই না থাকবে, তাহলে এরকম একটা কাণ্ড করল কেন হঠাৎ? কেউ কিছু জানল না, বুঝল না! মরে যাওয়াটা কি অতই সোজা?'

ঘরের মধ্যবর্তী খাটে বসে থেকে ভাস্করও আনত নির্বাক। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় একই ভাবে তার মধ্যেও মানবজীবন নামক এক অতীব দুর্জ্ঞেয় রহস্য অকস্মাৎ বীভৎস জটিল। যদি উৎপলও, তার আবাল্য সুহৃদ এত বড় ক্রিমিনাল! চিট!

'ব্যাঙ্কের আর কারুর কাছে তুমি বলেছ এসব কথা?'

'কোন্ কথা?'

'এই যে, বাবু যে-মহৎ কাজটা করেছেন। যার জন্যে আমরা এতগুলো লোক সবাই মিলে নৃত্য করে বেড়াচ্ছি।'

নড়ে বসল ভাস্কর—'ব্যাঙ্কে পুরোদমে কাজ চলছিল তখন। খুব ভিড়। উৎপলের কথা বলতেই কী-রকম গম্ভীর হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আমারও আর উপায় ছিল না। বলতেই হলো। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। দেখলাম খুব চালাক লোক। তক্ষুনি ডাকাডাকি করে হৈচৈ তুললেন না কিছু। নিজে নিজেই ধাক্কাটা সামলে খোঁজখবর নিলেন ডিটেলে। তারপরই বললেন ঘটনাটা। ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেন। ওদের ব্যাঙ্কের প্যাঁচগোছ তো আমিও বুঝি না ছাই। শুধু মোদ্দা কথাটা বুঝে নিলাম। কোন্ এক খাস্তগীর না কে, লোকটা অনেকদিন ধরেই ইল্‌লিগাল্ কাজকম্মো চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদের পুরনো ব্র্যাঞ্চম্যানেজারও বোধ হয় আছেন এর মধ্যে। দুজনের খপ্পরে পড়ে কী করে কী করেই যেন উৎপল ফেঁসে গেছে...'

কপালে ভাঁজ তুলে নিষ্কম্প শ্যামল। সিগারেট ধরাল।

'বাসুদেববাবু তো আজ হাসপাতালেও এসেছিলেন সন্ধেবেলা।'

'সেকি!' শ্যামল চমকে তাকাল—'কখন?'

'আপনারা তখন ওপরে উৎপলকে দেখতে গেছেন। ওর জ্ঞান ফিরেছে শুনেই খুশি। আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে বললাম। থাকলেন না। দেখা হলে এক্ষুনি যদি ওসব কথা উঠে পড়ে! এত বড় একটা ধাক্কার মধ্যে আপনাকে ডিস্টার্ব করা...'

'ডিস্টার্ব কী! আমাকে তো কালই যেতে হবে ওদের ব্যাঙ্কে...'

দরজার একদিকের পাল্লাটা পুরোপুরি ভাঙা এখনও। খিল তোলাও সম্ভব নয়। দুজনই ফিরে তাকাল। পিঠ দিয়ে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকছে সুনন্দা। রাত দশটায় মুড়ি আর পাঁপড়ভাজা, চা।

দুজন মানুষ তখন ঘরে-ফেরা শ্মশানবন্ধুর ভঙ্গিতে ম্রিয়মাণ। আরো এক দুর্যোগের গন্ধে সুনন্দা সংশয়ে তাকাল। হাতের ট্রে-টা রাখতে রাখতে খুবই নরম গলায়—'এই এত রাতে তো আর কিছু সম্ভব নয়। খিচুড়ি হচ্ছে। তুমি বরং খেয়েদেয়েই যাও ভাস্কর...'

হাতের সিগারেটে নিবিষ্ট শ্যামল কুঞ্চিত ভ্রূরেখায় উদাসীন। সুনন্দা স্বামীর দিকে চোখ ফেরালো—'ওদিকে দেখো, মা কী করছেন! এত রাতে স্নান করে আবার রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন। যত বলছি, যাহোক আমি আর কৃষ্ণা এ-বেলাটা চালিয়ে দিচ্ছি, শুনতেই চাইছেন না। ওদিকে টুনটুনিও নাকি নিচে কাকিমার কাছে কান্নাকাটি করেছে খুব। দুপুরেও ঘুমোয়নি। এখন ঠাকুমাকে ছাড়তেই চাইছে না...'

নিতান্তই কুৎসিত, বিচ্ছিরিভাবে খেঁকিয়ে উঠল শ্যামল—'হোয়াট ইজ দিস্! তোমাদের ওই খিচুড়ি না ভাত! তার সমস্যাও কি আমাকে ভাবতে হবে নাকি? যাও তো, যাও। ডিস্টার্ব করো না। রাঁধতেফাঁধতে না পারো, মুড়ি-চিঁড়ে খেয়ে শুয়ে পড়ো ঘরে...'

আসলে যন্ত্রণা দুঃসহ। এত বড় একটা ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে যদিও-বা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম, সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঝাপটা। একেবারে ভূমিসাৎ। ঘরের ছেলে হঠাৎ-কুলাঙ্গার। অথচ বলা যাবে না কাউকেই। উৎপল দাশগুপ্ত নামে এক যুবক, ওরফে খোকন, মৃত—এই ভয়ঙ্কর আর গোলমেলে বাস্তবটাকে আপাতত সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখতে হবে, অন্তত আরো কিছুদিন, যতদিন না নিরাময়ের পর মৃতের প্রেতাত্মা নিজেই উঠে এসে কৃতকর্মের সাফাই গাইছে। কেন না, বিষয়টা জটিল এবং সংবাদ অসম্পূর্ণ।

পরদিন সকাল থেকেই বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল। এমার্জেন্সির ফ্রি-বেড থেকে পেয়িং-বেডের কেবিন। চব্বিশ ঘণ্টার বিরতিহীন শুশ্রূষায় দুজন নার্স। এত বড় একটা ফাঁড়া কাটিয়ে শেষপর্যন্ত যদি ফিরেই পাওয়া গেল জীবনটা, কোথাও যেন কোনো রকম ফাঁক না থাকে চিকিৎসার।

বলাবাহুল্য পরদিনও শ্যামলকে ছুটি নিতে হলো। যদিও মানসিক বিষাদে তার ক্রিয়াকর্ম তখন নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক। অ্যাম্পুট-করা পা অথবা পক্ষাঘাতকুঞ্চিত দেহ নিয়ে হাসপাতাল থেকে নিষ্কৃতি যদি জীবনকে ফিরে পাওয়া হয়, পূর্ণাঙ্গ আরোগ্যে খোকন কি তাদৃশ প্রতিবন্ধীদের চেয়ে বেশি ভাগ্যবান?

এবম্বিধ সংশয়ের তাড়নায় শ্যামল সেদিন দুপুরেই ভাস্করকে সঙ্গে নিয়ে ওদের ব্যাঙ্কের অফিসে এল। বিষয়টা বুঝতে হবে। নচেৎ তার সাম্প্রতিক দিবারাত্রিও দহনপীড়ায় নিদ্রাহীন।

শিয়ালদহ এলাকার কোনো এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রথম শ্রেণীর একটি ব্র্যাঞ্চ। কাউন্টার ওয়ালের ভেতরে-বাইরে কর্মচঞ্চল কর্মীবৃন্দ। এক্ষণে, কারও কাছে কোনো প্রকার নিভৃত প্রার্থনাও যখন নেহাৎ-ই অশোভন, তারা চিফ-অ্যাকাউন্টেন্ট-কাম-অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার বাসুদেব মৈত্রের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

যথার্থই ব্যস্ত ভদ্রলোক। মস্ত টেবিলের তিন দিক ঘিরে জনাপাঁচেক নারীপুরুষ। ফিক্সড-ডিপোজিটের কী এক গণ্ডগোলে ভদ্রভাষার বিরক্তিতে ধমকাচ্ছিলেন জনৈক শৌখিন মহিলাকে। হঠাৎ ভাস্করকে দেখে—'আরে! আসুন আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম সকাল থেকে। কেমন আছে এখন?'

'ভালো!'

'আর কোনো বিপদ-আপদের ভয় নেই তো?'

'সে-আমরা কী করে বলব! মনে তো হয়—নেই।' ভাস্কর বাঁদিকে তাকাল— 'ইনি শ্যামলদা...শ্যামল দাশগুপ্ত। উৎপলের দাদা...'

'আচ্ছা আচ্ছা, নমস্কার...' উঠে দাঁড়ালেন বাসুদেব মৈত্র—'বসুন বসুন...'

'আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করতে এলাম।'

'না, ডিস্টার্ব কী! এ-কী কম ঝামেলায় পড়েছেন আপনারা! নিশ্চয়ই আসবেন। নাথিং ইজ মোর ইম্‌পর্টেন্ট দ্যান লাইফ...' টেবিলে কাগজপত্র। সামনে কাস্টমাররা। কী এক গোছা কাগজে সই করার শুরুতে—'একটু বসুন প্লিজ। এদিকটা একটু সামলে নিই...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই...'

চা বললেন বাসুদেব মৈত্র। বিস্কুট। তাঁকে ঘিরে নানা ধরনের মানুষ একের পর এক। সহকর্মীরাও কেউ কেউ। সই করছেন, টেলিফোন ধরছেন, ধমকাচ্ছেন, হাসছেন। মাঝে মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে—'অনেক সময় নষ্ট করছি আপনাদের। আর একটু...মিনিট পাঁচেক, প্লিজ...'

প্রতীক্ষার দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এপাশ-ওপাশ তাকায় শ্যামল। চারদিকের সচল কর্মপ্রবাহে কোথায় বসত খোকন? কোন্ টেবিলে? খোকন চাকরি পাবার পর সে কখনও আসেনি এখানে। প্রয়োজন হয়নি কোনোদিন। ভাস্করই দেখাল—অদূরে, ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজারের কাচঘরের পাশে পর পর তিনটি আলাদা টেবিলের একেবারে শেষেরটা। দুজন সহাস্য উজ্জ্বল পুরুষ এখন সেখানে। তৃতীয় টেবিলে শূন্যতা।

অবশেষে কিছুটা ফাঁকা হলেন বাসুদেব মৈত্র। দুচারটে প্রাসঙ্গিক কথার পর যা বললেন, তাতেই শ্যামলের ব্যক্তিগত ভূমণ্ডলে অকস্মাৎ ভূমিকম্প বা মহাপ্রলয়।

ঘটনা নিম্নরূপ

প্রাক্তন ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার তুষার তালুকদার এ-বছরই, এই ব্র্যাঞ্চ থেকেই মাস কয়েক আগে

অবসর গ্রহণ করেছেন। তার কিছুদিন আগে জগদীশ খাস্তগীর নামে কোনো এক চতুর বণিক ভুবনেশ্বরে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মাল পাঠিয়ে অ্যাডভান্স-ড্র-লিমিটের ভিত্তিতে ব্র্যাঞ্চ থেকে আশি হাজার টাকা অগ্রিম তুলে নেন এবং কিছুদিন পরই স্বয়ং ওড়িশা গিয়ে পার্টির কাছ থেকে অবশিষ্ট টাকাটা সরাসরি তুলে আনবেন বলে বিল বা কাগজপত্রগুলোও নিয়ে যান। অর্থাৎ আশি হাজার টাকা অ্যাডভান্স দেবার আবশ্যিক প্রমাণপত্র কিছুই আর ব্যাঙ্কের দপ্তরে রইল না। তালুকদার যত খারাপ লোকই হোন, বিল-সেকশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে উৎপল দাশগুপ্ত তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না কিছুতেই।

'তার মানে...' শ্যামল রুদ্ধবাক। স্নায়ু থেকে একটা শীতল রক্তধারা ধীরে ধীরে গড়িয়ে নামছে শিথিল শরীরে—'অর্থাৎ ব্যাপারটা...'

'হ্যাঁ...' কথাটা স্পষ্টভাবেই বলতে হচ্ছে বলে অস্বস্তিতে বাসুদেব মৈত্র—'এটা নিঃসন্দেহে একটা জালিয়াতির কেস। ব্যাঙ্কের চাকরিতে সাংঘাতিক অপরাধ।'

টেবিলের সমতলে দুহাতের কনুই, মাথার চুল দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে আনত শ্যামল দাঁতে ঠোঁট চেপে ফ্রিজ। ক্রোধ ক্রোধ...সীমাহীন ক্রোধের উত্তাপে ঘামছে শরীর।

মৈত্র ভাস্করের দিকে তাকালেন—'দেখুন, পার্টিকে অ্যাডভান্স দেবার পর বিল বা আদার ডকুমেন্টস এভাবে ফিরিয়ে দেবার সবটাই ইললিগাল। তবে প্র্যাকটিস হিসেবে এধরনের কাজ যে হয় না, তা নয়। আমাদেরও করতে হয়। আর্লি পেমেন্টের জন্যে খুব চেনাজানা পার্টির সঙ্গে এসব করা হয়, যদিও সেটাও বেআইনি। তবু সেটা করা হয় কন্‌সার্নড পার্টির কাছ থেকে একটা রিট্‌ন্ প্রমিস পাবার বেসিসেই। কিন্তু স্যাড, ভেরি স্যাড, উৎপলের ক্ষেত্রে যেভাবে ঘটনাটা ঘটল, তাতে ও-রকম কোনো ডকুমেন্টও রাখা হয়নি ফাইলে...'

পিঠে কোমরে মোচড় খেয়ে বসল ভাস্কর—'উৎপল যে এরকম একটা কাঁচা কাজ করে বসল, ও কি জানত না, এর কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে!'

'যদি ও-কথা বলেন, তাহলে বলব...' গালে ভাঁজ তুলে আলতো হাসলেন বাসুদেব মৈত্র—'আপনার বন্ধুকে আপনারা যতটা দায়ী করছেন, সে হয়তো অতটা দোষী নয়...'

যেন জলের ডুব থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুলল শ্যামল। উদ্‌গ্রীব।

'এই জগদীশ খাস্তগীর ভদ্রলোক তো এ-ব্র্যাঞ্চে নতুন কেউ নন। এর আগে ষাট সত্তর আশি হাজার কি তারও বেশি, লাখ টাকার ওপর বিল জমা দিয়ে অ্যাডভান্স নিয়েছেন। আবার বিলগুলো তুলে নিয়ে পার্টির কাছ থেকে চেক আদায় করে জমাও দিয়ে গেছেন ঠিক সময়ে। কাউকে কোনোদিন কোনো বিপদেই পড়তে হয়নি এর জন্যে। একটা কনভেনশন দাঁড়িয়ে গেলে তো কনভেন্‌শনটাই মেনে চলে সবাই। উৎপলও মানতে বাধ্য হয়েছে...'

'মানতে বাধ্য হয়েছে মানে!' শ্যামল, আকণ্ঠ আকুলতায়—'তার মানে, এ-ঘটনায় খোকন, মানে আমার ভাইয়ের ইন্‌ভল্‌ভ্‌মেন্ট...'

'সে-যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে বলব, লেস সেইড ইজ বেটার...' গালের ভাঁজে আবার সেই পুরনো হাসিটুকু—'খাস্তগীরের মতো লোককে অস্বীকার করব আবার ব্যাঙ্কে চাকরিও করব—সবই তো এক সঙ্গে হয় না মিঃ দাশগুপ্ত। তাছাড়া...'

আরো বেশি উৎকণ্ঠ দুজন।

দুটো কাগজ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল সাবস্টাফ। দেখেশুনে, একটু সময় নিয়ে সই করলেন মৈত্র এবং কোনো সুযোগ না দিয়ে দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে—'গোলমালটা কোথায় জানেন? আগে আগে ঝুটঝামেলায় এই ট্রাবলটা শুরু হবার সময়ও উৎপল প্রায়ই আসত আমার কাছে। শেষের দিকে কী যে হলো ছেলেটার! কারুর সঙ্গে কথাও বলত না তেমন। সাস্‌পেনশনের পর একদিনও এলো না এদিকে। অথচ ওর এগেনস্টে যে ঠিক কী কী চার্জ, কীভাবে সেগুলো সাজানো হয়েছে আমি জানি না। ফাইলটা বি. এম. মিঃ ধড়িয়ার কাছে। উনি না-আসা পর্যন্ত...'

এপক্ষে দুজনই নীরব। দুর্ভাবনার তলানি থেকে মাথা তুলেছে ভাস্কর—'আচ্ছা, এরপর কেসটার কী হবে! কী হতে পারে?'

'দেখুন, লিকুইড মানির কেস নয় এটা। তাহলে, যত টাকাই হোক, সোনাদানা বেচে কিংবা ইন্‌স্টলমেন্টের ব্যবস্থা করে এখান থেকেই ম্যানেজ দেওয়া যেত। ক্লার্কদের ওটা হামেশাই হয়। ভর্তুকিও দিতে হয়। কিন্তু উৎপল অফিসার। একটা ইররেগুলার ইললিগাল ট্র্যানজাকশানের চার্জ। এ-তো এমনি মিটবে না...'

'চাকরিটা থাকছে না। এ-না-হয় ধরেই নিলাম। কিন্তু এর বেশি কিছু?' ভীষণ সত্যের মুখোমুখি হবার প্রস্তুতিতে শ্যামল কঠিন চোখে তাকাল।

'দেখুন, তাহলে খুব সোজাসুজি স্পষ্ট করে বলাই ভালো। ওদিকে ছেলেটা বেঁচে উঠল তো এদিকে বাঁচবে কিনা ভাবতেই হচ্ছে যখন...' ঠোঁট উল্টে বিকৃত মুখভঙ্গিমায় মৃদু মাথা দোলালেন বাসুদেব মৈত্র—'অসম্ভব। আমি যা জানি, যতটুকু বুঝি, তাতে বলতে পারি, সিচুয়েশন যা দাঁড়িয়েছে, ম্যানেজমেন্ট কিছুতেই ছাড়বে না...'

'মানে বেঁচেবত্তে যদি ফিরেও আসে, রেহাই নেই? এর পর থানাপুলিশ কোর্ট কাছারি হাজতবাস...' উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে শ্যামল। প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

আরো একবার সযত্নে প্রসঙ্গ এড়ালেন বাসুদেব মৈত্র। উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল ঘুরে এগিয়েও এলেন কাছাকাছি—'ভেরি আনফর্চুনেট। কাল ওনার কাছে খবরটা পাবার পর থেকে এত ডিস্টার্বড ফিল করেছি সারাটা দিন। হাসপাতালেও গিয়েছিলাম সন্ধেবেলা...'

'হ্যাঁ, শুনেছি।' কাউন্টার-ওয়ালের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে শ্যামল।

বাসুদেব মৈত্র কানের কাছে ফিসফিসিয়ে আনলেন গলার স্বর—'ব্র্যাঞ্চের কাউকে এখনও বলিনি কথাটা। এখানে অ্যাদ্দিন ধরে কাজ করেছে ছেলেটা। সবাই চেনে জানে। ওর বন্ধুরাও তো আছে অনেকে...'

শ্যামল ক্ষেপে উঠল—'না, বলুন। বলুন সবাইকে। ওঁরা শুনুন, দেখে যান ওঁদের ক্রিমিনাল বন্ধুকে।'

ছোট্ট করে জিভ কাটলেন বাসুদেব মৈত্র—'বুঝি, আপনার টেনশন আমি বুঝতে পারছি মিঃ দাশগুপ্ত। কী করবেন, বলুন। উই নিড টু হ্যাভ পেশেন্স নাউ। ওটাই সবচেয়ে জরুরি এখন...'

ভরাট দ্বিপ্রহরে আগ্নেয় কলকাতা জ্বলছিল নিজের দহনে। ঘামে ঘামে শরীরের চামড়াশুদ্ধু

পুড়ছিল শ্যামল। চোখের পাতায় লেপটে-থাকা খোকনের মুখ! এ-ও সম্ভব? এ-রকম কিছুও ঘটতে পারে? যেন, আইডেন্টিটি কার্ডের ফোটোর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিটি নাকে মুখে চোখে মিলছে না কোথাও। তবু, তবু সহোদর!

ট্যাক্সিতে নেতিয়ে পড়ে যখন শ্যামল মৃতবৎ, ভাস্কর কুণ্ঠিত মৃদুতায়—'আমি বিশ্বাস করি না শ্যামলদা, এখনও বিশ্বাস করি না, উৎপল এত বড় একটা ফর্জারি কেসে...'

পুরো চেহারার তিক্ততায় শ্যামল সারমেয় বীভৎতায়—'কাল যদি অন্যরকম কিছু ঘটত হাসপাতালে?'

ভাস্কর ঘাবড়ে গেল।

'যা ঘটবার, যা স্বাভাবিক, যদি তাই ঘটত! খোকন মরে গেছে। শ্মশান থেকে ফেরার পর জানতে পারলে, তোমার বন্ধু একটা পয়লা নম্বরের ঠগ বাটপাড় চোর জালিয়াৎ। কী করতে?'

ভাস্কর নীরব শ্রবণে

'মা বাবা বোন...আমি কারুর কথা ভাবছি না। বংশমর্যাদা! ননসেন্স। ভাবছি স্কাউন্ড্রেলটার কথা। বেঁচে উঠে তো আরেক বিপদ। এর পরও বেঁচে থাকতে হবে ওকে। মুখ দেখাতে হবে লোকের কাছে...'

ট্যাক্সিটা ছুটছে। পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কলকাতা।

উত্তেজনা লাঘব করে শ্যামল স্বাভাবিক হবার চেষ্টায়, নিশ্বাসে নিশ্বাসে গলাটা খাটো করে এনে—'নাউ থিংক অব মি। আমি কী করব? এর পর নিজের হাতে খুন করতে পারি না ভাইকে। খুনী হবো। আরো কয়েক ডজন লার্গাক্টিল কিনে এনে হাতে তুলে দিয়েও বলতে পারি না—নে খা। আরো একবার দ্যাখ্ চেষ্টা করে। ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন...'

আর. এন. মিশ্র ওয়ার্ড। কেবিন নম্বর ফিফ্‌টিন।

যুদ্ধশেষে ঘরে ফিরছে ঘরের ছেলে। মরে না গিয়ে, বেঁচে। পরিবার পরিজন সকলেই, অন্তত আপাত-চেহারায়, উৎসাহে ভরপুর। অনেকেই এলেন বিকেলবেলা। কেবিনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনেক মানুষ।

সারাদিন ঘড়ির কাঁটায় প্রহর গুনে তর সইতে পারছিলেন না রেণুবালা। চারটের আগেই পৌঁছোলেন হাসপাতালে। কাকভোরে, সূয্যি ওঠার সময় তখন, প্রথম বাসে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন বুড়োবুড়ি। মা-গঙ্গায় ডুব দিয়েছেন। নাটমণ্ডপে বসে শুদ্ধচিত্তে সমগ্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ করেছেন সত্যসাধন। প্রাত্যহিক পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেবীবিগ্রহের দিকে মুখ রেখে, পদ্মাসনে চোখ বুজে মায়ের রাতুল চরণে, ধ্যানে, সন্তানের মুখ কল্পনা করেছেন রেণুবালা। মায়ের পায়ের রক্তজবা আঁচলে বেঁধে এনেছেন। পলিথিনের ব্যাগে অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে ছোট শিশিতে চরণামৃত আর মায়ের প্রসাদ।

শায়িত দেহে বাতিল-ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো এক জোড়া ঠাণ্ডা চোখ তখনও একই ভাবে

স্থির। থমকে দাঁড়ালেন রেণুবালা। তাঁর পশ্চাদবর্তী আরো সব আপন মানুষেরা।

'খোকন...' কম্পিত মাতৃহৃদয় ছোট ঘরের দেয়ালে অকারণ প্রতিহত।

বিকেলের আলোয় ছায়াচ্ছন্ন ঘর। নার্স আলোটা জ্বালতে চাইলেন। এবং সুইচটা শব্দ করে উঠতেই 'আঃ...' ক্রুদ্ধ চিৎকার—'স্টপ স্টপ...'

মানুষটা জীবিত অবশ্যই। নিশ্চিতভাবেই স্বস্তি দর্শনার্থীদের। কিন্তু বাতিটা নিভে যাবার পর পুরনো হালকা আলোর ঘরে এতগুলো নারীপুরুষের লম্বিত ছায়াগুলি মানুষটার ওপর দীর্ঘবাহু আলিঙ্গনের ছবি। অথবা

খোলা দরজার পড়ন্ত রোদে নিষ্পলক চোখের পর্দায় সিলিউট মূর্তিগুলি ধোঁয়ার রঙে অস্পষ্ট যখন

অতশত বোঝেন না নির্বোধ মা! নিজেরও ভগ্নতায় আরো বেশি ভেঙে পড়লেন বিছানার ওপর। সন্তানকে দুহাতে জড়িয়ে—'কথা বলবি না খোকন? আমি, আমি মা। খোওওকন...'

ব্রিজের ওপর রেলগাড়ি গড়িয়ে যাবার ধ্বনি, একটানা কান্না ঝিম-মারা ঠাণ্ডা ঘরটায় অথবা দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পাষাণে, আজই সকালে, সন্তানের জীবন কামনায় তাঁর আকুলতা ছিল যেমন সত্য।

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় ঘরের অন্যান্য মানুষগুলিও স্তব্ধ নির্বাক—নিজেরই জন্মের শিকড়ে সন্তান কবুল করুক তার অপরাধ অথবা মুখর হোক শালগ্রামশিলা

'সিস্টার...'

নার্স ছুটে এলেন।

ঘুমের ভান অথবা চোখ খোলা রেখেই বিরক্তিতে এপাশ-ওপাশ। রেণুবালা ডুকরে উঠতেই কষ্ট-উচ্চারিত একটিমাত্র বাক্য এই দীর্ঘ সময়ে—'ভিজিটিং আওয়ারেও দরজাটা বন্ধ রাখবেন কাল থেকে।'

কী এক দুর্বিষহ যন্ত্রণায়, বিছানায়, দুহাতের ভর রেখে কঁকিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন রেণুবালা। সন্তানের কাছে সরাসরি খারিজ হয়ে যাবার গ্লানি। কৃষ্ণা ছিল মায়ের পাশে। জাপটে ধরল। ছলছল চোখে সে নিজেও দিশেহারা।

টুনটুনিকে কোলে নিয়ে ঢুকেছিল সুনন্দা। ভিজিটরদের একজন, মেজকাকিমার হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল। স্কুলের দিদিমণি গোছের ক্ষুব্ধতায়—'এসব তোমার কী হচ্ছে খোকন?'

হঠাৎ নড়ে উঠল শরীরটা। উল্টোদিকে ঘুরে পশ্চাদবর্তী মানুষজনকে নাকচ করে দেবার ভঙ্গিতে পাশ ফিরে শোয়া—'বিরক্ত করো না আমাকে।'

অসভ্য ইতর আচরণ। জ্ঞাতি-আত্মীয়দের কাছে ঘরের মানুষদের লজ্জা। অথবা একইভাবে সকলের প্রত্যক্ষতায় যুবকের এতাদৃশ ব্যবহারে আরো এক নতুন ভাবনা—এখনও সুস্থ নয় ছেলেটা। বিষক্রিয়ার তো হাজারটা ফ্যাচাং। শরীরের খাঁজেখুঁজে কোথায় যে বাসা বেঁধে থেকে যাবে একটু!

পেছনের দিকে অনেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন বাইরে। বাকিরাও হালকা হতে

চাইলেন। শুধু রেণুবালা বরফের মতো গলছেন ভেজা বুকে, কান্নায়। প্রসাদী-ফুল আর চরণামৃতের পলিথিন-ব্যাগটা উঁচিয়ে ধরে অসহায়ভাবে তাকালেন স্বামীর দিকে।

নিজেরই সন্তান অথচ দূরবর্তী এক জটিল যুবকের ঔদাসীন্যের দিকে নিষ্পলক থেকে কী ভাবছেন সত্যসাধন।

কানে কানে বলল সুনন্দা—'থাক, এখন রেখে দিন। আপনার বড় ছেলে আসুক। ভাস্করও এসে পড়বে এক্ষুনি। তখন দেখা যাবে।'

দুপাশে ধরে রেখেছে মেয়ে আর ছেলে-বৌ। টলতে টলতে, কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরোবার পর কেঁদেই ফেললেন রেণুবালা—'কেন গো, অমন করছে কেন খোকন? ফের কি কপাল পুড়ল আমার?'

নৈরাশ্য-মানতে-নারাজ সত্যসাধন তখনও শিরদাঁড়ায় টান রাখতে চান—'দাঁড়াও দাঁড়াও, হবে। সবে তো নড়েচড়ে বসতে শুরু করেছে। বিশ্রাম নিয়ে আরো একটু চাঙ্গা হতে দাও। মা বলে ডাকবে। ছেলে কি পর হয় মায়ের?'

কেবিন ঘরের বাইরে সবাই। রেণুবালার কাতরতায় ঘনিষ্ঠ হলেন হরিসাধন—'হবেই তো বৌদি। এ-তো সাধারণ অসুখবিসুখ নয়। ছেলেমানুষ। ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছে কাণ্ডটা। লজ্জা বলেও তো কথা আছে একটা। আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়ালে বিচ্ছিরি লাগবে না ওর?'

নার্স ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। জানালেন—'ডাঃ ভাদুড়ী এসেছিলেন দুপুরবেলা। হাউসস্টাফরাও ছিলেন। পেশেন্ট খুব ভালোভাবেই কথা বলেছেন ওঁদের সঙ্গে। অনেক কথা।'

দীর্ঘ বারান্দায় অপরাপর ভিজিটরদের আনাগোনা। শুধু পনের নম্বর ঘরের দোরগোড়ায় অবস্থাটা অদ্ভুত। আপেল বেদানা নেসপাতি কমলালেবু নিয়ে এসেছিলেন যাঁরা, আর্তসেবায় তাঁরা শুধু দ্রব্যাদি রেখে যেতে পারেন। আর্ত স্বয়ং বাঞ্ছিত বিবেচনা করছে না কাউকেই।

এরই মধ্যে বড়-জামাই তাপস এসে পৌঁছোল। ঘেমো গা আর জামাপ্যান্টের হতচ্ছাড়া চেহারায় বোঝা যায়, আপিশ থেকে স্কুটারে সরাসরি আগমন। বাঁহাতে বুক চেপে ফলের ঠোঙা এবং শিরস্ত্রাণ, ডানহাতে ব্রিফকেস। এসেই লণ্ডভণ্ড হৈচৈ কাণ্ড। বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্ষুব্ধ—'সারাদিনের কাজকর্মের পর এত ভোগান্তি করে ঠেঙিয়ে আসা! দেখা করতে দেবে না কী? মামদোবাজি নাকি?'

বাবাজীবন এরকমই বেখাপ্পা। ইনকাম-ট্যাক্সের উকিল, দুহাতে রোজগার। ঘাঁটাতে সাহস পান না সত্যসাধন। কিছুটা কৈফিয়তের দীনতায়—'থাক বাবা, থাক। ও যখন চায় না...'

'চায় না কী? অ্যাঁ! এমন করলে জ্ঞাতিকুটুমরা আসবে কেন কাল থেকে? কার কী ঠেকা পড়েছে?' গোঁয়ার বিক্রমে ঘরের ভেতর ঢুকেই পড়েছিল তাপস।

কৃষ্ণা ছুটে গেল—'জামাইবাবু, ও জামাইবাবু, কী করছেন?'

'ধ্যাত্তেরি। তোমাদের অত কায়দাফায়দা ছাই আমি বুঝি না কিছু। আমি মোটা মাথার মানুষ। কাল থেকে জ্বলছে শরীরটা! সুইসাইড? সুইসাইড আবার কী? ও তো খবরের-কাগজ আর সিনেমায় হয়। ওটুকুন ছেলে, তার আবার দুঃখুফুখ্যু কিসের? উঠতি বয়সের ছোঁড়া, ভালো

করে দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে দাও দেখি ওর। দেখবে, সব ফিচলেমি একদিনে সেরে গেছে। এত এত মানুষ চরিয়ে বেড়াই। দেখছি তো রোজ...'

'আঃ জামাইবাবু...' কৃষ্ণা জ্বলে উঠল।

সকলেই সচকিত। আত্মীয় স্বজন, বিশেষত জ্ঞাতিভাইদের সামনে শুভ্রার দুঃখু বড় বেশি খোলসা হয়ে যাচ্ছে দেখে যখন পীড়িত সত্যসাধন, স্বামীগৃহের সম্ভ্রম রক্ষায় সুনন্দা এগোল তার শোভন নম্রতায়—'এসব কথা এখন থাক তাপসবাবু...'

'থাকবে? তবে থাক।' ডানে বাঁয়ে এদিকে-ওদিকে টেবিলচেয়ারবেঞ্চি কোথাও কিছু না পেয়ে ব্রিফকেসটা তাপস মেঝেতেই রাখল। ভারি হেলমেট আর ফলের ঠোঙা রাখতে নিচু হয়েছিল মাথাটা, ঠোঙাটা হাতে তুলে নিলো কৃষ্ণা এবং বাবাজীবন রীতিমতো ক্ষাত্র্যতেজে—'লাখ লাখ টাকার একটা বড় নতুন কাজ রয়েছে হাতে। পার্টিকে বলে এলাম—আজ পারব না। হসপিটাল যাব। নিউ মার্কেট গিয়ে ঘুরে ঘুরে বেছে বেছে এক নম্বরী সব ফল কিনেছি। সব ফালতু? কে জানত, আপনাদের আবার সুইসাইডের ভড়ং চলছে এখানে...'

এবং প্যান্টের পকেট থেকে গোটা কয়েক একশো টাকার নোট—'নিন, রাখুন।'

আচমকা ধাক্কায় হতচকিত সত্যসাধন—'কী? কী এগুলো?'

'আপনার মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

লাঞ্ছনায়, গোটা শরীরের দহনে কাঁপছেন সত্যসাধন—'এ...এ-অডাসিটি তুমি পাচ্ছো কোথায়?'

আহত রেণুবালা চুপচাপই ছিলেন এতক্ষণ। ভ্রূকুটির তিক্ততায় এবার ভিন্ন আদলে—'এত্ত এত্ত লেখাপড়া শিখেছ বাবা, সংসারের নিয়মবিধি কিছু শেখো নি? কুটুমবাড়িতে টাকা দিতে হয় মানুষটা মরে গেলে। শ্রাদ্ধশান্তির সময়। খোকন তো মরেনি এখনও! মরলে খবর পাবে। এখন যাও, তোমার লাখ টাকার পার্টি দেখ গে...'

ঘটনাটা হয়তো গড়াত আরো। সুনন্দা আর কৃষ্ণার আচমকা ছুটে যাবার দৃশ্যে সকলেই নাড়া খেল। ওদিকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছেন অণিমা জানা। সঙ্গে কাঞ্চন। বড়ই ক্লান্ত দুজন। হঠাৎ অভ্যর্থনায় বিস্মিতও কিছুটা।

সিঁড়ির তলার দিকে উঁকি দিলো সুনন্দা—'কী হলো? শিপ্রা আসেনি?'

'ন্‌না, শিপু বোধ হয় আসবে না। আমরা দুজনই তো অফিস থেকে আসছি...' অণিমা জানা আতঙ্কিত হলেন—'এ-কি' আপনারা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে?'

'খোকন তো ঘরেই ঢুকতে দিচ্ছে না কাউকে। মাকে পর্যন্ত বের করে দিয়েছে।'

'সে-কি!' অণিমা জানা সচল হলেন—'ছেলের কাছে মা যাবে। বের করে দেবে মানে?'

এবং এগিয়ে এসে সত্যি সত্যি রেণুবালার হাত ধরে টান—'আসুন তো মাসিমা, আসুন আমার সঙ্গে...'

কেঁদেই ফেললেন রেণুবালা—'না মা, ছেলেই যদি ফিরিয়ে দিলো। তবে আর কেন?'

'বাঃ! ফিরিয়ে দিলো বলে আপনিও ফিরে আসবেন? সে-হয় নাকি? চলুন তো দেখি, কেমন

মাতব্বর আপনার ছেলে!'

'না মা, তুমি যদি পারো, তাহলে বরং...' হাতেই ছিল সন্দেশের বাকসোটা। রেণুবালা হাত বাড়িয়ে ধরলেন—'খোকনের কপালে ছুঁইয়ে যদি একটু মুখে দিয়ে আসতে পারো...'

'পেসাদ! সে-তো মাকেই খাওয়াতে হয় মাসিমা...'

চারদিকের ফিসফাস গুঞ্জনে সমবেত ব্যক্তিদের কৌতূহল—কে এই মহিলা? এবং পরিচয়দানের সুতো বাঁধতে গিয়ে সুনন্দা বা কৃষ্ণা যখন দুজনই বিপন্ন, বাঁচাল কৃষ্ণাই—'ছোড়দার এক বন্ধুর কাকিমা। বড় ভালোবাসেন ছোড়দাকে।'

কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সুনন্দা-কৃষ্ণাকে নিয়ে অণিমা জানা সদলে ঢুকলেন ভেতরে। রীতিমত অধিকারের, শাসনের দাবিতে। সতেজে।

ঘরের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঘরের ভেতর ভয়ঙ্কর প্রাণীটি আর তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়। বিছানায় উঠে বসে ছিল শান্ত চুপচাপ।

'কী করছ তুমি? মাসিমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ?'

'ধ্যাৎ, ওসব কান্নাকাটি ফ্যাচফ্যাচ একদম ভালো লাগছে না আমার।'

'যা করেছ, তারপর কাঁদবে না তো হাসবে নাকি কেউ?'

'কেউ কোথাও হাসছে না, আপনি হলপ করে বলতে পারেন?'

আঁতকে উঠলেন ওরা। স্তম্ভিত বেদনার মুখোমুখি, যখন, যে-কোনো ভাষায় সহানুভূতির শব্দসমষ্টি সাজাতে জোলো-জোলো লাগে, অণিমা জানা খুবই আস্তে, নিবিড় হৃদ্যতায়—'মাসিমা তোমার কাছে এসে তো একটু কাঁদতেই পারেন উৎপল। কান্নাকাটি করেও যদি কিছুটা হালকা হতে চান!'

বড় করুণ, দুর্বল একটা হাত। বিছানা ছুঁয়ে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণা। হাতটা উঠে এল বোনের কাঁধে—'মা কোথায় রে?'

কৃষ্ণা সহসা উদ্বেল—'ডাকব?'

'ডাক্।'

ঘর ছেড়ে কখন বেরিয়ে গেছেন নার্স! অচেনা দেয়ালে ওরা সুইচ খুঁজল। আলো জ্বালানোটাও যেন মস্ত একটা আবিষ্কার, একটা বড় কিছু খুঁজে-পাওয়া। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় আলোটা জ্বালল কাঞ্চন। আলোর ঘরে প্রবেশ করলেন রেণুবালা। ভক্তিভরে গঙ্গাজল ছিটোলেন, প্রসাদী-ফুল ছোঁয়ালেন সন্তানের মাথায়। প্রসাদও দিলেন মুখে। বিনিময়ে পেলেন না কিছুই। ছেলে তাঁর বড়ই নিষ্ঠুর।

ভিজিটিং আওয়ারের সময়-সঙ্কেত বেজে যাবার একটু আগে শ্যামল আর ভাস্কর এল ছুটতে ছুটতে। কী-সব কাজ ছিল বাইরে, দুজনই ব্যস্ত সারাদিন। মোটামুটি একটা রিপোর্ট পেল বিকেলের। সমস্ত ঘটনার।

ভাস্কর ভেতরে ঢুকল একবার। একতরফা ধমকে গেল—হাসপাতালে থাকতে হলে হাসপাতালের নিয়মটাই মেনে চলতে হবে। এসব ন্যাকামো আর জেদ চলবে না। ভালো লাগুক আর না লাগুক, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আসবে। এটাও নিয়ম। মানুষকে বাদ দিয়ে বাঁচে না

মানুষ...

অন্য প্রান্তে প্রতিরোধ ছিল না। নাক মুখ চোখের বিকৃতিতে ঘৃণাই কিছুটা। শুধু হাতের ইশারায় নিঃশব্দে দরজা দেখিয়ে দেওয়া—ফোট্ শালা, ফোট্। ওসব জ্ঞান অনেক শুনেছি। গেট আউট...

অন্তর্গত ক্ষয়ে সর্বস্বান্ত শ্যামল প্রবেশ করেনি।

ভিড়ে জটলায় ওদের দুজনের অবস্থান কী দুর্বিষহ। ভয়ানক একটা সত্যকে জেনে ফেলার পরও মিথ্যেটাকেই মদত দিয়ে যেতে হবে বাবা মা বোনের নির্বোধ আর মূর্খ ভালোবাসায়। একজন মৃত ব্যক্তির যথাযথ অন্ত্যেষ্টি না করে জীবনে অভিষিক্ত করার বিচিত্র প্রহসনে নিজেদেরও জড়িয়ে রাখার অভিনয়কলা!

তাপস ক্ষুব্ধ। এদের এত সব জটিল এবং অতি সূক্ষ্ম রঙ্গরস কিছুই ভালো লাগেনি তার। সে চলে গেছে। যাবার আগে শ্বশুরমশাইকে জানিয়েও গেছে—রিটার্ন সাবমিটের সময় লাখ লাখ টাকার একটা কেস নিয়ে এখন সে খুবই ব্যস্ত। সুতরাং অযথা সময় নষ্ট করার জন্য এখানে, হাসপাতালে, আর সে আসছে না আপাতত। বরং খোকন বাড়ি ফিরে গেলে শুভ্রাকে নিয়ে যাবে একদিন সময়-সুযোগ পেলে।

একটু বেশি রাতে, আটটা নাগাদ ডাঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বললেন—'পেশেন্টের অবস্থা এখন ভালো। তবু আরো দিন কয়েক এখানে অবজার্ভেশানে থাক। তারপর...'

'কিন্তু বড় অদ্ভুত ধরনের ব্যবহার করছে ডাক্তারবাবু। কারুর সঙ্গেই ভালো করে কথা বলছে না। এমন-কি, মাকে পর্যন্ত...'

'দ্যাটস্ দ্য পয়েন্ট। ঘরে ফিরে যাবার পর একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করবেন। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এ-জাতীয় পয়জনিং কেসে এরকম অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার ইজ ভেরি নর্মাল। তবে আপনার ভাই ডিফারেন্ট। কমপ্লিটলি এ ডিফারেন্ট টাইপ অব ইয়াংম্যান। ভেরি ইন্টেলিজেন্ট! কথাবার্তা একটু হয়েছে আমার সঙ্গে।'

শ্যামল এবং ভাস্কর স্তব্ধতায় মলিন।

'ওর তো একজন গার্ল-ফ্রেন্ড আছেন। সোজা বাংলায় প্রেমিকা। হোয়ার ইজ শী?'

'আজ আসে নি। ওর দাদা এসেছিলেন...'

টেবিলের ওপাশে ডাঃ ভাদুড়ী একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ঠোঁটেই থেকে যায়। ঝুঁকে পড়ে, টেবিলের ওপর হাত দুটো রেখে, কোনো কিছু পাম্প করায় মুদ্রায়—'ওর এই হাতের পাতা দুটো দেখেছেন? কোথাও কোনো কাটাছেঁড়া নেই। পরিষ্কার আমাদের মতো, মোর দ্যান নর্মাল...'

দুর্বোধ্য ভাষা। বিমূঢ় শ্রোতৃদ্বয়!

'বেশ ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় ট্যাবলেটগুলো গিলেছে আপনার ভাই। ওয়েল প্ল্যানড অ্যান্ড ডিটারমিন্ড অ্যাক্সেপ্ট্যান্স অব সায়লেন্ট ডেথ...' সোজা হয়ে বসলেন ডাঃ ভাদুড়ী—

'সুইসাইডটা...জানেন, ইংরেজদের ন্যাশনাল হ্যাবিট। এতে এক সময় ওরা ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ন ছিল। এখন সুইডেন। টেমস্ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যারা আত্মহত্যা করে, লন্ডন-পুলিশ তাদের এই হাতের-পাতা দেখেই ডিটেক্ট করে—কারা প্রেমে ব্যর্থ, কারা ঋণের দায়ে মরল...'

উৎকণ্ঠ ওরা। কৌতূহলী!

'প্রেমের ব্যর্থতায় যারা ঝাঁপ দেয়, জীবনের বিতৃষ্ণাটা তাদের জেনুইন্। মিনিং অব লাইফ ইজ লস্ট টু দেম। তারা সুস্থভাবে মরে। টাকাকড়ির ব্যাপারে, ঋণের দায়ে যাদের মরতে হয়, মৃত্যুটাকে মেনে নিতে পারে না বলেই, ঝাঁপ দেবার পরও ব্রিজের লোহালক্কড় ধরে শেষ মুহূর্তেও বাঁচতে চায়। আঁচড়ে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে হাত...হাতের পাতা...'

'তার মানে...' দুজনই চঞ্চল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আকুলতায় ভাস্কর—'তার মানে, যারা...টাকা পয়সার ঝামেলায় যারা সুইসাইড করে, উৎপলের মতো তাদের হাত এত পরিষ্কার থাকে না?'

'আমি কিছুই বলছি না। এসব বলার জন্যে আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আছে, আপনারা নিজেরা আছেন, বুঝে নেবেন। আমি বলছি, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করবেন। সেটা জরুরি...'

উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ ভাদুড়ী। কাজের মানুষ। তাঁর কাজ আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনই স্তম্ভিত নিশ্চল। আরো এক নতুন ধাঁধা।

'এ-আবার কী সব উল্টোপাল্টা কথা শ্যামলদা?'

'হুঁ, এ-তো থিয়োরি কপচানো হলো। তাতে কী হবে? মোদ্দা কথা, সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে। না-হয় আরো কিছু গচ্চা দিয়ে সেসবও করা গেল। কিন্তু ওই আশি হাজার টাকার হিসেবটা? হাতের পাতায় রক্ত আছে কি-নেই তাতে তো ব্যাঙ্কের কেচ্ছাটা নাকচ হয়ে যায় না। নিজেই তো শুনেছ...'

একটা সিগারেট ধরিয়েছে শ্যামল। লিফটের গা ঘেঁষে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দুজন চুপ। হঠাৎ শ্যামল—'তাছাড়া শিপ্রা তো বলছে, ও-ও কিছু জানে না। খোকন ওর কাছে ট্রেটর। আজ তো একবার দেখতে পর্যন্ত এল না...'

'ও আর আসবে না।'

'কেন?'

'জানি না। সেদিন যাবার সময় আমাকে বলে গেছে—উৎপল ভালো হয়ে উঠছে। ও সুস্থ হোক। আমি আর আসছি না হাসপাতালে...'

'কেন আসবে? ব্যাঙ্কের ঘটনাটা শুনলে থুতু ছিটোবার জন্যে একবার এলেও হয়তো আসতে পারত।'

'একটা কথা বলব শ্যামলদা। কিছু মনে করবেন না। আপনি বয়েসে বড়...'

শ্যামল ফিরে তাকাল।

'এটা বেশ পরিষ্কার, ঘটনাটা উৎপল কাউকে বলেনি। আমরাও এখনও কিন্তু জানি না সবটা। না জেনেশুনে একটু বেশিই ক্রুড হয়ে পড়ছি বোধ হয়...'

ল্যান্ডিংস্টেপ ঘুরে একতলার দিকে কয়েক ধাপ নেমে যাবার নীরবতা।

'শিপ্রা একবার এলে বোধ হয় একটু ভালো হতো ভাস্কর।'

'কেন?'

'ছেলেটা সইতে পারছে না কাউকেই। যদি একটু শান্তি পেত ও এলে! মেয়েটাও তো মরছে ঘরে। যাও না তুমি। তোমারও তো বন্ধু...'

'আমি!'

'একা না যেতে চাও। তোমার বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো...'

সংসারে এত বড় বিপর্যয়ে, এমন কি, বছর তিনেকের বাচ্চা মেয়ে টুনটুনিও অতিষ্ঠ জীবনে। শিশুর যত্নআত্তি নজরদারিতেও বড়রা সময় ভুলে যাচ্ছে।

আরেক বিপদ, উৎপাতই রীতিমত—শ্যামল স্বয়ং। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত একটানা দৌড়োদৌড়ি আর প্রবল স্নায়ুচাপে নিজের আয়ত্তে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না লোকটা। সামান্য ছুতোনাতায় চিৎকার চেঁচামেচি। বাড়তি ঝঞ্ঝাটে সন্ত্রস্ত সংসারের বাকি চারজন মানুষ।

হাসপাতাল থেকে ঘরে ফেরার পর রাত প্রায় নটায় বড় বিচ্ছিরি একটা ঘটনা ঘটে গেল। খোকনের বিষ গেলার রাতে কিংবা তার আগের দিন থেকে কীভাবে ফিউজড হয়ে গিয়েছিল বাথরুমের বালবটা। নানান হট্টগোলে দিনের বেলা কারও মনেই পড়ল না অন্ধকারের কথা। তিন রাত্তির ধরে একই যন্ত্রণা। কেননা, আলো ছাড়া বাথরুমটা মারাত্মক। প্যানে পা ফেলতে গেলে সাবধানে দুটো লাফ মারতে হয়। জায়গাটা ভীষণ পিছল! সবচেয়ে বড় কথা, ঘরে দুজন বুড়োবুড়ি!

সুতরাং গোটা বাড়িতে তুলকালাম হৈচৈ তুলে সংসারের বড়ছেলের প্রভুত্ব হুঙ্কার—একটু কাজও নিজেরা করে নিতে পারে না কেউ! একজন তো সাধ করে নিমতলার ঘাটে চুল্লির লাইনে শুয়েই পড়েছিল। যাহোক করে যদিও বা তাকে ফেরানো গেল, এখন আরেকজন কেউ অর্থোপেডিকের গাড্ডায় পড়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অসুখবিসুখ হয়, সে-কথা আলাদা। কিন্তু শখ করে এমন সব ঝামেলা পাকানোর ভড়ং চলতে থাকলে, সে আর পারবে না। স্পষ্ট কথা। তারও সহ্যের সীমা আছে একটা! সে-ও মানুষ..

অর্থহীন উন্মত্ত প্রলাপে ভারাক্রান্ত বাতাস। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ওঘরে সত্যসাধন নিশ্চুপ। ভাঙাচোরা অবশ শরীরে একবার ফুঁসে উঠতে চেয়েছিলেন রেণুবালা, কৃষ্ণা আগলে রাখল—'থাক মা, বলতে দাও। মাথাফাথা কি আর ঠিক আছে কারুর? সত্যি তো, দোষ তো আমাদেরও। কদিন ধরে দিনের বেলা একবারও কারুর মনে পড়ল না বালবটার কথা? এতবার করে বাইরে যাচ্ছি আসছি সবাই, কেউ একজন তো কিনেও আনতে পারতাম...'

এবং এঘরে, শ্যামল নিজেই বোঝে, নিজের বাড়াবাড়ির ইতরতাটা। তখন অন্তর্গত দংশন।

ভেতর থেকে কুৎসিত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যেই অসহায় চোখের ঝাপসা বাইরের আলোয়। খোকন শুধু ওর নিজেরটা নয়, সমস্ত হিসেবের অঙ্ক গোলমাল করে দিয়েছে এতগুলো মানুষের! শেষপর্যন্ত জালিয়াতি! বিরাট কেলেঙ্কারির একটা সম্ভাব্য আতঙ্কে সুদীর্ঘ মালগাড়ির বগি যেমন, আট—সংখ্যাশব্দের ইঞ্জিনটাকে সামনে রেখে একের পর এক শূন্যগুলো গড়িয়ে যেতে থাকে চোখের পর্দায়—আআ...শি হাজার টাকা!

অগত্যা রাত দশটায় আবার বেরোতে হলো। হাতিবাগানের চত্বর ঘুরে ঘুরে একটা বালব কিনে এনে আলো জুড়তে হলো বাথরুমে।

এবং তারপরও, টেবিলচেয়ার খাট আলমারি আলনা ড্রেসিং-টেবিল টিভি টেলিফোন বোঝাই দশ-বাই-পনের ফুট গুদোমের মধ্যে জানালার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের গভীরে অস্থির দাপাদাপি। মাথার ঝিমঝিম সামলাতে অ্যাস্‌পিরিন গেলার সাধ।

সর্বাধিক বিপন্ন সুনন্দা। স্বামীর অসভ্য বিকারে যেমন নিজেরই সঙ্কোচ, অন্য দিকে, ওঘরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে না শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে। ভাবতেই কেমন নাটুকে-নাটুকে লাগে।

রাতের প্রহর বাড়ে। এঘরে ওঘরে পারম্পর্যহীন কতিপয় নৈঃশব্দ্যের মানুষ। ঝড়ের ঝাপটায় একই গাছের বৃন্তচ্যুত ফল বা ফুল যেমন, মাটিতে এলোমেলো দূরে দূরে, অসংলগ্নতায়।

'এভাবে অসভ্যের মতো চেঁচালে কেন তখন? তুমি তো এত নোংরা নও...'

ঘরের কোণে, টেবিলের একটা গ্লাসে জগ গড়িয়ে জল ভরছে শ্যামল। মাথা ধরার ট্যাবলেট গিলবে।

শোবার আয়োজনে খাট থেকে বেডকভারটা টেনে তুলছিল সুনন্দা। মৃদু শান্ত গলায়—'খুবই খাটাখাটুনি যাচ্ছে তোমার, হয়রানির একশেষ। এমনিতেই মনমেজাজ ঠিক রাখা কঠিন। কিন্তু কী করবে? হুড়ুমহাড়ুম করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে বিপদটা। তাই বলে এদিকেও তো সুখে নেই কেউ...'

ট্যাবলেট গেলার পরও নিস্তার নেই। সর্বাঙ্গ দাহে বুক থেকে গেঞ্জিটা উপড়ে ফেলে খাটের দিকে ছুঁড়ে মারল শ্যামল—'যা বোঝো না, জানো না, সব নিয়েই কথা বলো কেন? যা দেখছ, এই তো সব নয়। আরো অনেক কিছু আছে, যার কিচ্ছু জানো না...'

'জানি না তো বটেই। সুইসাইড তো আর এরকম হামেশা হয় না ঘরে ঘরে। এতকাল শুধু শুনেই এসেছি। জীবনে এই প্রথম দেখলাম...' বিছানা পরিপাটির পর ড্রেসিংটেবিলে আরশিটার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সুনন্দা। ক্রিমের কৌটোটা হাতে তুলে নিয়ে—'কিন্তু এ-যে একেবারে নিজেদের ঘরে এসে ঢুকবে! উঃ, কী যে গেছে রাতটা! পরদিনও গোটা দুপুর। এখনও টিপটিপ করছে বুকের ভেতরটা। এ-যে কী করে সম্ভব! খোকন...'

'হ্যাঁ, খোকন-খোকন করে কেষ্টনাম জপো সবাই। একটা স্কাউন্ড্রেল...'

সিঁথির সিঁদুররেখা থাকে। গালে কপালে থুতনিতে নাকে আঙুলের ডগায় ছোপ ছোপ ক্রিম লাগিয়ে নেবার আগে কপালের টিপটা সন্তর্পণে মুছে নিতে হয়, ঘষে নিতে হয় আঁচলে। আরশিতে, নিজেরই প্রতিরূপে চোখ রেখে সুনন্দা চুপ।

'কী সর্বনাশটা হলো, কোনো ধারণা আছে তোমার?' শ্যামল তার একই তিক্ততায়।

'থাকবে না কেন?'

'কোন্‌টা বলো তো?'

'আমাদের ফ্ল্যাটে যাওয়া।'

'হ্যাঁ, ফ্ল্যাট-ফ্ল্যাট করছিলে! ফ্ল্যাট তো তৈরি হচ্ছে। যাও এবার ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট করে দিয়েছে সবাইকে। আর উঠতে হবে না।'

ফর্সা মসৃণ ত্বকে সুরভিত কোল্ডক্রিম। গালে আঙুল ঘষার টানে মুখে স্বভাবতই হাঁ তৈরি হয়ে যায়। টেনে টেনে শব্দের উচ্চারণ—'তাই বলে ভাই...নিজের ভাই। ওর এত বড় একটা বিপদে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে...' শ্যামলের গলায় স্বরে একটা ভাঁজ পড়ল। খাটো হয়ে আসে চড়া সুর—'ভাই বলেই তো এত ঝক্কি। যা করা যায়, যতটুকু করা সম্ভব, সব করেছি। এর মধ্যেই শ-চারেক বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কালই যদি হাজার কি দেড়-হাজার টাকার দরকার পড়ে যায়, বাবার কাছে চাইতে পারবে? তুমি নিজে দিতে পারবে?'

'সেকি!' সুনন্দা চমকে তাকাল—'চাইছে নাকি কেউ?'

'চাইবে। পেয়িং বেডে আছে। আরো কত দিন থাকতে হবে, হিসেব নেই। তার ওপর দুজন নার্স, ওষুধপত্তর! এক হাজারে কুলোবে ভেবেছ? মিনিমাম দেড় হাজার। কে দেবে? সকলেরই তো ধারণা, লাখ লাখ টাকা আমাদের। দুজনে রোজগার করি...' অশান্ত শ্যামল দুঃসহ আত্মপীড়নে—'তার মানে আবার ধার! আরো হাজার দেড়-দুইয়ের ধাক্কা একটা স্কাউন্ড্রেলের জন্যে...'

'আঃ...' সুনন্দা খিঁচিয়ে উঠল—'চেঁচাচ্ছো কেন? শুনবে তো।'

দাম্পত্য-নিভৃতে দরজায় খিল ছিল। একই দেয়ালের ব্যবধানে এঘর-ওঘর, সম্প্রতি গড়ে-ওঠা এপার ওপার। তাছাড়া রাস্তার দিকে খোলা জানালায় উচ্চকিত ধ্বনি স্যুয়িং করতেও পারে ওদের ঘরের দিকে।

শ্যামল বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে বসল। পাশবালিশটা কোলে টেনে নিয়ে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, মাথার চুল চেপে ধরেছে দুহাতের মুঠোয়।

ড্রেসিংটেবিলের মুখোমুখি, সুনন্দা পিঠের এলোচুল বুকে এনে, চিরুনির আঁচড়ে আঁচড়ে একই ভাবে ভাবনার অতলে।

'এত করে বললাম তখন...' আস্তে, মাথা তুলল শ্যামল—'ফ্রিজটার পর টিভিটা থাক। না-হয় ওখানে গিয়েই সুযোগমত...'

'এই, এই দেখো, বাজে কথা একদম বলবে না...' ঝাঁঝিয়ে উঠল সুনন্দা। ক্ষিপ্রতায়—'টিভির কথা আমি বলেছি তোমাকে? আমি বলেছিলাম?'

রাতদুপুরে বিবাদ নিরর্থক। শ্যামল আপোসে নামল। মাথা ঊর্ধ্বমুখী রেখে, মুদিত চোখে ঘন ঘন দুহাতের তেলোয় চুল পাট করা।

'বরং সেদিন আমিই বলেছিলাম তোমাকে—দেখো, কো-অপারেটিভের ষাট হাজার

দিলেই তো হবে না। আরো খরচ আছে। ফ্রিজের ইনস্টলমেন্টটা শেষ হয়নি এখনও। তুমি তখন আবার পে-কমিশন দেখে বসলে। আমি আমার স্কুলে মুফতে এরিয়ার পেয়ে যাচ্ছি হাজার আড়াই...'

সজোরে পাশবালিশটা ছুঁড়ে দিয়ে শ্যামল উঠে দাঁড়াল। মনে নেই। মিথ্যে কথা। অথবা হয়তো সত্যি। শাটার-টানা টিভিটার ওপর চোখ পড়ল। রাগ হয়। সুন্দর ঢাকনার ওপর প্লাস্টার-অব-প্যারিসের ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি। দুরন্ত ক্রোধে সে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিলো।

'খোকন তো মরে যায়নি। বেঁচে উঠেছে।'

'তাতে কী?'

হাউসকোট চলবে না এ-বাড়িতে। বৌকে নাইটি পরাবার শখ ছিল শ্যামলের। কেনাও হয়েছিল একটা। পোষায় নি। কদিন পরে সুনন্দাই বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু শোবার আগে ব্রেসিয়ারটা খুলতেই হয়। নইলে সারা রাত হাঁসফাস। ব্লাউজের হুক সেফটিপিন খুলছিল সুনন্দা—'চিকিৎসার খরচপত্র তো ওর কাছে পরে চাওয়াও যেতে পারে। তুমি না পারো, আমি চাইব। খোকনের সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনো কিছুতেই আটকায় না...'

'চাইবে তো বুঝলাম। দেবে কোত্থেকে?'

'কেন?'

ব্লাউজটা পেছনের দিকে টেনে খুলতে, এমন কি, স্বামীর কাছেও শাড়িটা বুকে তুলে দাঁতে কামড়। নেহাৎ-ই অকারণ। পুরনো স্বভাব।

'ফার্স্ট ক্লাশ জোচ্চোর। ব্যাঙ্কের প্রায় লাখ টাকা তছরুপ করলে চাকরি থাকে না কারুর। জেল হয়। কমপক্ষে বছর পাঁচেকের আর. আই....'

'কী! কী বলছ? মাথাটাথা খারাপ হলো নাকি?' স্তম্ভিত সুনন্দা কেঁপে উঠতেই, মুখের আঁচল খসে পড়ল। ধবধবে শাদা ব্রেসিয়ারের বক্ষ সুষমায় প্রস্তর-প্রতিমা।

চঞ্চল অধৈর্যে শ্যামল আবার আছড়ে পড়েছে বিছানায়। ফুলস্পিড পাখার তলায় খালি-গায়েও ঘাম। আসলে নিজেরই মূর্খতায় ঈশপের সেই কাক, মাংসের টুকরোটা বেমক্কা খসে পড়েছে মুখ থেকে। আপাতত যা তার একান্ত গোপন।

শাড়িটা তুলে নিয়ে, বুকে পিঠে কোনোমতে জড়িয়ে সুনন্দা স্বামীর পাশে এসে বসল। থরথর কাঁপছে শরীর—'কী হলো? কিছু বলছ না কেন?'

'কী বলব?'

'কী বললে এই মাত্তর! তছরুপ? লাখ টাকা তছরুপ মানে?'

'মিথ্যে হলে তো আমিও রেহাই পেতাম...' কোলের বালিশে কনুইয়ের ভর শিথিল হয়ে আসে। শ্যামল মাথা তুলল—'ভাস্করই ওদের ব্যাঙ্কে গিয়েছিল প্রথম। আমিই পাঠিয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর খোকনের ঘরে বসে কাল যখন কথা বলছিলাম আমরা দুজন, তুমি ঢুকলে, তখনই ভাস্কর বলছিল। মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল আমার। সেই থেকে আনব্যালেন্সড হয়ে আছি। আজ দুপুরে নিজে গিয়েছিলাম ওদের ব্র্যাঞ্চে...'

'কী শুনলে?'

'আশি হাজার টাকার বিরাট একটা ফর্জারি কেসে খোকন ইন্‌ভলভ্‌ড।'

'বলছ কী? কী বলছ তুমি?' চোটটা সামলাতে গিয়ে সুনন্দা বিহ্বলতায়—'এজন্যে, এজন্যেই বুঝি ওর ঘুমের ওষুধ গেলা?'

'সন্দেহ আছে কোনো?'

গোটা শরীরে মোচড় দিয়ে কী এক দুঃসহ যন্ত্রণায় শ্যামল কিছু একটা খাবলে ধরতে চাইল। শ্রীখোলের মতো কোলে নিয়ে যে-পাশবালিশ, তারই দুদিকে কঠিন থাবার পেষণ। অক্ষম ক্রোধের আক্রোশ।

দাম্পত্যের নিবিড়ে মলিন বিষাদ। প্রিয়জন-ভাবনায় শ্মশান-অগ্নি যদি এভাবেই কাঠগড়ার চালচিত্রে হঠাৎ বদলে যায়, মানুষটাকে জীবনে ফিরিয়ে আনার সুখ বা সান্ত্বনা ধূসর কুয়াশায় বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। কুয়াশার মতোই গভীর রাতের সময় চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে, নৈঃশব্দ্যের শিশির যেমন। রাত গাঢ়তর হয়।

'এর ফল কী দাঁড়াল জানো?'

বিপরীত দেয়ালে, ড্রেসিংটেবিলের দীর্ঘ কাচে বিম্বিত ছায়ায় নিজেরই অসম্বৃত শরীরে চোখ রেখে সুনন্দা বেহুঁশ।

'সব কিছুই কেমন অনিশ্চিত হয়ে উঠল এবার। খোকন সাসপেনশনে আছে। চাকরিটা তো যাচ্ছেই, কোনো সন্দেহ নেই। এরপর থানা পুলিশ কোর্টকাছারি কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, কত বছরের ধাক্কা, ভাবাই যাচ্ছে না সেসব। অথচ আমাদের ফ্ল্যাটটা মাস ছ-সাতেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। এ-অবস্থায় ওদের ফেলে যদি চলে যেতে হয়? যদি কী। যেতে তো হবেই। আর উপায়ও নেই। স্বার্থপর, চারপাশের সকলেই কুচ্ছিত স্বার্থপর ভাববে আমাদেরই। সেলফসেন্টার্ড ক্রুড আগলিয়েস্ট ক্রিমিনাল। খোকনের চেয়েও বেশি কুলাঙ্গার...'

বড্ড খারাপ লাগে এভাবে নিজের নগ্নতায় নিজেকে দেখতে। সরাসরি বিশাল কাচের ফ্রেম থেকে পালাতে চাইল সুনন্দা। স্বামীর কোলের পাশাবালিশ ঠেলে স্বামীর দিকে নয়—বাঁপাশে, খাটের অন্য প্রান্তে।

শ্যামল নিজের বিবরে—'লোকজনের আর দোষ কী? বলতেই পারে। অবস্থাটা যা দাঁড়াচ্ছে, কথাটা তো মিথ্যেও নয় খুব...'

'জানো...' হঠাৎ, ঘরের বাতাসকে নিশ্বাসের উপযোগী করে তুলতে চাইল সুনন্দা।

শ্যামল তাকাল।

'তুমি বলছ, বটে, আমি বিশ্বাস করি না। কিছুতেই মানি না...'

'কী?'

'খোকন! খোকন এসব করেছে!'

'ভাস্করও তাই বলছিল...' এবার বিরক্তি অথবা ক্রোধ। পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্যামল—'আছো সুখে তোমরা। সুখেই থাকো।'

'আশি হাজার টাকা চুরি করবে একটা ছেলে, খোকনের মতো ছেলে, তার চোখে মুখে স্বভাবে কথাবার্তায় একটু ছাপ পড়বে না কোনো? তোমরা না বোঝো, আমরা...মেয়েরাও বুঝব

না?'

'এত টাকা কি কেউ একা মারে নাকি? সম্ভবও নয়। তোমার সাধের দেওরটি হয়তো আরো দু-চার পাঁচজনের সঙ্গে মিশে, একটা গ্যাঙ...'

'বেশ তো, আশি হাজারের একটা পার্টই হোক। দশ বিশ ত্রিশ হাজার! তাই বা কম কিসের?'

'টাকাটা হয়তো হাতে আসে নি এখনও। তার আগেই ফেঁসে গেছে। আরো বড় একটা কেলেঙ্কারির ভয়ে এরকম ভয়ানক একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে ইডিয়ট।'

আর জোর পায় না সুনন্দা। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। কাঁপছে শরীর। এমন অসম্ভব, অবাস্তবকেও যদি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হয়, জীবন সংক্রান্ত মুগ্ধতা নিঃস্ব হবার আগে, সে, বিছানায় শায়িতদেহ স্বামীর দিকে নয় কিংবা পূর্ণাঙ্গ আরশিতে প্রতিবিম্বিত নিজেকেও বাতিল করে দিয়ে, আপাতত হাসপাতালশায়ী যুবকের কথা ভাবল। যাকে সে চিনত একদিন। জানত। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে প্রখরতায় স্মার্ট সে-যুবক চলনে বলনে প্রতিদিন গোটা দুনিয়াটাকে বারবার তুড়ি মেরে নস্যাৎ করে দিলেও, মনে হতো, অবিশ্বাসী নয়। পৃথিবীর অনেক কিছুই আঁকড়ে ধরতে জানে। নিজের ওপর কোথায় যেন একটা জোরও ছিল ওর।

'সে-যা হবার হবে। ভেবে আর লাভ কী!' গোটা শরীরে আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরল শ্যামল। পাশবালিশটাকে বুকে চেপে, ডান পায়ের লেংড়িতে নিয়ে—'রাত অনেক হয়েছে। নাও, শুয়ে পড়ো...'

এবং তখনও, মেঝেয় দাঁড়িয়ে সুনন্দা তার নিজের জড়ত্বে স্থির। স্তব্ধতার ঘরে শ্যামল নড়ে উঠতেই সচল হতে হয়। পা তুলতে হয় খাটে। মধ্যরাত গড়িয়ে যাবার পর শয়ন বা নিদ্রাই যদি প্রাত্যহিক বিধি।

স্ত্রীকে বিছানায় হামা দিতে দেখেই হাত তুলে বেডসুইচটা টিপে দিলো শ্যামল। অন্ধকার।

'জানো, তোমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে এতগুলো বছরে একদিনের জন্যেও যে কোনো অসুবিধে হয়নি আমার, সে-শুধু খোকনের জন্যে। সব রকম খামখেয়ালি নিয়েও এমন...এমন একটা কিছু আছে ছেলেটার মধ্যে, মেয়েরা প্রেমে পড়তে চাইবে। সেদিন খোকনের সামনেই বলেছিলাম শিপ্রাকে। মেয়েটা এমন লজ্জা পেল। ওদের দেখে দারুণ মজা লাগছিল আমার। কৃষ্ণাকে খারাপ বলছি না। কিন্তু বেশ একটু প্যাঁচপোঁচ আছে তোমাদের বোনদের মধ্যে। কিন্তু খোকন? খোকন আলাদা...'

স্বামী-স্ত্রীর ললিত শয্যায় ঘন অন্ধকারে তৃতীয় অস্তিত্ব!

বুকের নগ্নতায় শক্ত সবল হাতের চাপ। প্রত্যাখ্যান নয়, আমন্ত্রণও নেই! চোখ বুজতে পারে না সুনন্দা। খোলা চোখেও সেই একই অন্ধকার!

দেহমনে দুঃসহ কাতরতায়, অন্তর্দাহে মরিয়া শ্যামল একটা কিছু চায় অন্ধকারের কাছে—'তুমি বলছ! বলছ তুমি, খোকন নিষ্পাপ?'

শরীরে শরীর লেপনে নিরুত্তাপ বেহুঁশ সুনন্দা। ভালোবাসা যদি এতই যান্ত্রিক নিয়ত অভ্যাসে, মৃদু উচ্চারণ ঘরের নির্জনে—'তোমরা যা বলছ যদি সব সত্যি হয়, তোমাদের

কোর্টকাছারিতে যদি প্রমাণিতও হয়ে যায় সব কিছু, তাহলেও আমাকে কটা দিন সময় দিয়ো। নিজেকে এতটা দেউলে করে তোলার আগে একটু তৈরি হয়ে নিতে হয় মানুষকে...'

মুদিত ঝিনুকের মতো ওরা নিবিড় হয়ে আসে। যেন সুখের আঁধারে অনুচ্চার ধ্বনি—পৃথিবীটা এভাবে, এমন বিচ্ছিরিভাবে নগ্ন হয়ে উঠলে আমরাই বা বাঁচব কী করে?

অফিসে আরো একদিন ছুটি নিতে হলো, এবং যেহেতু অবকাশহীন ছুটি, মৃতপ্রায় বৃদ্ধ পিতাকে রেহাই দিতে শ্যামল বাজারে গিয়েছিল ভোরবেলা। ফেরার পথে, গলির মুখে বাঁক ঘুরতেই ঝলকে উঠল গোটা শরীর। ঝাঁ করে মাথাটা ঘুরে যাবার পর ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকা কিছুক্ষণ। দাঁতে দাঁত চেপে, শীতল রক্তস্রোতে ওম্ দিয়ে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা।

সন্দেহ নেই তারই বাড়ি। বাড়ির দরজায় ভেঙে পড়েছে পাড়ার সমস্ত মানুষ। বিরাট জটলা। তবে কি হাসপাতাল থেকে হঠাৎ কোনো টেলিফোন? শেষপর্যন্ত সেই নিষ্ঠুর পরিণামটাই?

তুচ্ছ হয়ে যায় হাতে ঝোলানো ছোট-বড় দুটো থলে—আলুপটলপেঁপে আনাজপাতি আর আড়াইশো কাটা-পোনা। চার বছর পর্যন্ত শিশুকে হাইপ্রোটিনে রাখার বিধানে মেয়ের জন্য দুটো টেংড়ি। পঞ্চাশ-ষাট গজের ব্যবধান দূরান্তর হয়। উন্মাদ বেগে ছুটতে ছুটতে ভিড়ের আওতায় এসে পৌঁছোতেই তার আরেক বিভ্রম—ক্ষিপ্ত সত্যসাধন। ভিড়-জনতা কলরবের ঊর্ধ্বে বৃদ্ধের দিশেহারা চিৎকার।

হট্টগোলের এবম্বিধ চেহারায় বুকের পাথর প্রায় সবটাই নেমে গেছে যদিও, শ্যামল ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল—'কী! কী হয়েছে তোমাদের?'

মাথার টুপি বগলদাবা ছিল বলেই চেনা যায়নি দূর থেকে। সোরগোলের কেন্দ্রে দুজন পুলিশ অফিসার। প্রতাপই সবচেয়ে জঙ্গী—'দেখুন বড়দা, খোকনের কী হবে না-হবে ঠিক নেই। আর এরা দেখুন, কী শুরু করেছে তখন থেকে...'

'হোয়াট অডাসিটি! আমার ছেলেকে ক্যারেকটারলেস বলছে? খোকন দুশ্চরিত্র?'

ঝিমঝিম মগজটার ভেতর তখন আর কিছুই নেই। বিধ্বস্ত শ্যামল বুঝল, আরো এক নতুন উৎপাত। সরাসরি বাবাকেই ধমক—'তুমি যাও তো! ওপরে যাও। আমি দেখছি...'

অন্যদিকে অফিসারদের —'আসুন আপনারা। আসুন আমার সঙ্গে...'

লোককৌতূহল থেকে বিচ্ছিন্নতায় অফিসারদের সরিয়ে নেবার সুবিবেচনায় শ্যামল বাড়ির ভেতর ঢুকতে চাইলেও রোখা গেল না সবটা। প্রতাপ শিবাজীর সঙ্গে ঢুকে পড়ল পাড়ার ইজ্জত-সচেতন কতিপয় যুবক। নিচের তলার কাকারা অপ্রতিরোধ্য।

গোটা বাড়ি জুড়ে তুলকালাম হট্টগোলে যখন এদিকের ঘরে ভূলুণ্ঠিতা মূর্ছিতা রেণুবালাকে নিয়ে ব্যস্ত মেয়েরা, অন্য প্রান্তে দরজা-ভাঙা খোকনের ঘরে

'আরে দাদা, আমাদেরও তো চাকরি করে খেতে হয়। না কী? আপনাদের ছেলে বিষ খেয়ে

ররবে আর তাই বললেই দোষ?'

'লিখুন না রিপোর্ট, যা খুশি তাই লিখুন। তাই বলে...' পাড়ার মাস্তা উত্তেজিত।

শ্যামল কটাক্ষে তাকাল মাস্তার দিকে এবং অফিসারদের—'কী হয়েছে বলুন। আমি পশেন্টের দাদা...'

'অ্যাই, অ্যাই তো ভদ্দরলোকের মতো কথা...' যেন পকেটমার বলে জনতার হাতে বেধড়ক ার খাচ্ছিলেন বেচারিরা। দয়াবান কাউকে পেয়ে রেহাই—'আরে দাদা, খবর পেয়ে এলাম রিপোর্ট নিতে। আমাদের নিতে হয়। ডিউটি। কিন্তু আপনার বাবাকে যা জিজ্ঞেস করি, বলেন জানি না।'

'না জানলে কী বলবেন?'

'এ-তো আর বাস-চাপা নয়তো ট্রেনের-তলায়-মাথা কি গলায়-ছুরি নয় যে অ্যাকসিডেন্ট ালে ফ্যাক্ট গায়েব করবেন। রাতের বেলা ঘরের ছেলে ঘরে ঘুমোতে গেছে একা। ভেতর থেকে খিল-তোলা। কেউ তো বিষ খাওয়াতে পারে না জোর করে?'

'ফ্যাক্ট...'

'শুনলাম, হাজার দেড়েকের ওপর মাইনে...'

'ভুল শোনেন নি।'

'এ-কি মামদোবাজি নাকি? সে-ছেলে এমনি-এমনি বিষ খায়?'

'খায়!'

'খায়? আপনি বললেই হবে?'

'কি মুশকিল!' শ্যামল উত্তপ্ত এবার—'খায় যে সে-তো হাসপাতাল থেকেই খবর পয়েছেন। বিশ্বাস না হয় ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করুন, বেডে গিয়ে দেখে আসুন।'

'আরে দাদা, তাই তো বলছি, কেন খেলো?'

'জানি না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অফিসার হতাশ এবং ক্রুদ্ধ—'আরে মশাই, আমাদেরও তো একটা রিপোর্ট িতে হবে। একটা কিছু বলুন, হদিশ দিন...'

'কী বলব।' শ্যামলও চড়া গলায়, অধৈর্যে—'যা জানি না, তা-ও বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে?'

দ্বিতীয় অফিসার কিছুটা শান্ত মেজাজের। খাটো গলায়, কিছুটা সুস্থির ভঙ্গিতে বোঝাতে াইলেন—'আজকালকার ছেলেমেয়েরা, বুঝলেন দাদা, কে যে কী করছে কোথায়, বোঝা ঠিন। বাইরে থেকে দেখছেন ভালো ছেলে, তলায় তলায় বিষফোঁড়া। হয়তো জানেনই না, ময়েছেলেদের লদকালদকিতে কোথায় ফেঁসে গেছে! ছোকরা বয়স। বলা তো যায় না। নয়তো রুন, ব্যাঙ্কের চাকরি! আপনার ভায়ের হয়তো কোনো দোষ নেই, কোন্ রাঘব বোয়ালদের রিচামারিতে জড়িয়ে গিয়ে...'

শ্যামল অতর্কিতে বেসামাল। তাকাল এদিকে-ওদিকে। পাশেই কাকারা।

'কী হলো দাদা?' সংশয়ে তাকালেন অফিসার।

'না, কিছু না।'

'কিছু না কি মশাই! একটা কিছু তো হতেই হবে। বলা নেই কওয়া নেই, সাধ করে বিষ খাবে একটা তাজা জোয়ানমরদ ছেলে...' প্রথমজন আবার তার নিজের স্বভাবে—'আর দেখুন, এ-কথাগুলো বলেছি বলেই আপনার বাবা, পাড়ার ছেলেরা এই-মারে-কি-সেই-মারে চড়াও হয়ে উঠল আমাদের ওপর। পঁচিশ-তিরিশ বছর এ-লাইনে আছি দাদা, লোক দেখে চেনা যায় না, আমরা গন্ধ শুঁকে বলতে পারি। আপনাদের মতো ভদ্দরলোকের চেহারায় রামখচ্চর মস্তানরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরে। ধরবেন কি, সে-আবার পলিটিকসের লোক।'

'বেশ তো, ওকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। যদি বেঁচেবততে ওঠে তো ওকেই জিজ্ঞেস করবেন। আমরা কিছু জানি না...'

'আর যদি টেঁসে যায়?'

'লিখবেন—হি ওয়জ এ ফার্স্ট ক্লাশ ডিবচ্ ড্রাগ-অ্যাডিক্ট ইয়াংম্যান। বেহেড মাতাল হয়ে বেপাড়ায় পড়ে থাকত। যদি মরেই যায়, ওতে কিছু যায় আসে না আমাদের...'

অফিসাররা বেকুব এবং শ্যামল সরে যাচ্ছে দেখে—'সেও-তো খুশিমতো লেখা যায় না দাদা। আবার আমাদের আসতে হবে। খুঁজে তো বার করতেই হবে একটা কিছু। আরো ইনভেস্টিগেশন চলবে। ভোগান্তি আমাদের। আপনাদেরও। সব ঝামেলাই মেটাতে পারতেন যদি এখানেই একটু...বলেকয়ে দিতেন...'

'ঠিক আছে...' ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যেতে যেতে পিছু ফিরল শ্যামল। ভ্রূকুটিতে তাকাল মাত্র—'আপনাদের কাজ আপনারা করুন। যদি কিছু জানতে পারেন, দয়া করে জানাবেন আমাদের। উপকৃত হবো।'

গৃহকর্তা নিজেই যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অফিসাররাও আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। জনতা বিহ্বল। একজন অফিসার—'কাজটা খুব ভালো করছেন না দাদা। খোঁজখবর তো করতেই হবে আমাদের। ওর বন্ধুবান্ধব, পাড়ার-লোক সকলের কাছেই স্টেটমেন্ট চাইব। ব্যাঙ্কেও যেতে হবে একবার। আজই যাব...'

বারান্দার এক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শ্যামল আবার শিলীভূত স্তব্ধতায়। মাকে নিয়ে কী চলছে ওঘরে, সে জানে না। বুড়ো বাপটা এর মধ্যে হার্টফেল করে মরবেই একদিন। কেউ রুখতে পারবে না। এবং দৈবজ্ঞ সেজে থাকার ঝুঁকিতে তার একার যন্ত্রণা।

সঙ্কীর্ণ বারান্দায় প্রতিবেশীদের চেনা মুখগুলি! অফিসারদের সঙ্গে একে একে নেমে যাচ্ছে সকলেই। পুলিশ ব্যাঙ্কে যাবে? বাসুদেব মৈত্রের চেহারাটা মনে পড়ল। ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে সব। মরে গিয়েও বাঁচবে না খোকন। বেঁচে গেলে জানবে—পৃথিবীটা চারপাশে মরে গেছে ওর।

বারান্দাটা ফাঁকা হয়ে যাবার পর সে এগোল। ওঘরে বিছানায় শায়িত মাকে ঘিরে নিচের তলার কাকিমারা, কৃষ্ণা আর খুড়তুতো বোন ছায়া। জানালার ধার ঘেঁষে মাথা মুড়ে বসে বাবা স্তব্ধবাক। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বোনকে ডাকল সে। সঙ্গোপনে—'তোর বৌদি কোথায়?'

'তুমি বাজারে গেলে, তার একটু বাদেই ভাস্করদা এলেন...'

'ও, ওরা বেরিয়ে গেছে?"

'হ্যাঁ।'

মনে পড়ল। এবং আরো একবার ঘৃণিত ক্রোধ সহোদরের ওপর। চোখের পর্দায় শিপ্রা স্পষ্ট হয়। খুব বেশি জানে না সে। তবু কী জানি কেন, মেয়েটাকে বড় বেশি নিষ্পাপ মনে হচ্ছে আজ! রিয়েল ভিকটিম।

৮

শেষ পর্যন্ত কথার খেলাপ শ্যামলদা নিজেই করলেন কিংবা প্রেমিক স্বামী নিভৃত প্রণয়ে চেপে থাকতে পারেন নি হয়তো। আপাতত যা গোপন রাখারই প্রতিশ্রুতি ছিল। অলিগলি পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগোবার পথে বৌদির কথার আভাসে ভাস্কর বিরক্ত হলো। অথচ এই একই উত্তাপে নিরন্তর চাপের মুখেও যে-কথা সে বলতে পারে নি কৃষ্ণাকে। ছেলেটা ফিরে এসে মোকাবিলা করার আগেই অনর্থক কেন ওর জগৎ বিষিয়ে তোলা!

দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের অন্ধকার গলির ভেতর ঢুকতে হলো না ওদের। শিপ্রাই বেরিয়ে আসছিল। বিষাদের মলিন প্রতিমা।

'বৌদি আপনি?'

'তোমার কাছেই একটু যাচ্ছিলাম ভাই। কিছু কথা ছিল...'

'আপনারা অ্যাদ্দুরে এলেন...' পেছনে গলির দিকে তাকিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে, শিপ্রা ম্রিয়মাণ—'বাড়ি গেলে মুশকিল, মা হাজার প্রশ্ন করবেন। কিছুই জানেন না। দাদা বলেছেন, খাবারদাবারে হয়তো গণ্ডগোল ছিল কিছু। সিরিয়াস ফুড পয়জনিং...'

অস্বস্তিতে আনত সুনন্দা—'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'সকালের টিউশনি...'

'আজ থাক। একটু চলো...'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি। প্লিজ...'

'কেন?'

'কথা আছে।'

হঠাৎ-ই বদলে গিয়ে কি রকম শক্ত কঠিন হয়ে ওঠার আস্তরণ শিপ্রার মুখেচোখে। আসলে নিজের মধ্যেই নিজের অবুঝকে আড়াল রাখার জেদ নিয়ে ক্ষণিক স্তব্ধতায় নিঝুম। আস্তে, প্রায় অস্ফুট স্বরে—'আমাকে কেন এত ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছেন বৌদি? আপনাদের বাড়ি আমি যাব? কেন?'

কোনো সদুত্তর নেই সুনন্দার। অথবা মানুষের একান্ত অনুভবের ভাষা মূলত মৌন। শব্দ শুধু কলহ। শুধুই বিসংবাদ।

পথচলতি মানুষের ভিড়ে সেই শব্দ ছিল, চাঞ্চল্য ছিল, কোলাহল ছিল। অনুজার কাঁধে হাত রাখল জ্যেষ্ঠা—'আমি...আমিও তো মেয়ে। তোমার অসুবিধেটা আমি বুঝি। কিন্তু তুমি

আমার সঙ্গে যাবে। সোজাসুজি আমার ঘরে। আমিই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে...'

দাঁতে দাঁত চেপে ছিল সে-মেয়ে। অনড় দৃষ্টিটা অপলক ছিল কোন্ দুর্নিরীক্ষ্যে, শূন্যতায়। অকস্মাৎ কী মনে হলো! ভাঙল নিজেকে। গা ঝাড়া দিয়ে—'চলুন...'

ওদের জন্য রিকশ ডাকল ভাস্কর। নিজে পিছু-পিছু হেঁটে।

ঠুনঠুন ঘণ্টি হাতে নিয়ে বুড়োমতো রিকশওয়ালা ছুটতে থাকে এবং ভাঙাচোরা তেরপল্-ছাউনির খাঁচায় বসে থেকে লজঝর চাকার দুলুনিতে ওরা দুজন—বয়সের ফারাকে ছোটয়-বড়য় ব্যবধান নিয়ে কনিষ্ঠাই যেখানে অগাধ মন্দ্রতায় সুগম্ভীর। শব্দ নেই কথা নেই বাক্য নেই। হৃদয়ে-প্রোথিত সব বাক্যই যদি অনুচ্চারে পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকায় আরো বেশি নিবিড়।

দূরত্ব সামান্যই। বিধান সরণির এপার-ওপার হেঁটে গেলেও মিনিট পনের বড়জোর। পৌঁছে গেল ওরা। এবং এভাবে কোথাও পৌঁছে যাওয়াও যে কী ভীষণ দহনজ্বালা জীবনের, বৌদির সঙ্গে ওপরে উঠে আসার পায়ে পায়ে প্রতিটি রক্তকণায়, অনুভবে, শিপ্রা আরো বেশি শক্ত হয়ে উঠতে থাকে। একতলায় দেখল সকলেই। নিজের স্বাভাবিক আচরণের বাইরে কোনো জড়তা ছিল না। এ-বাড়িতে বা ওদের সংসারে নিজের প্রাসঙ্গিকতায় একটা শূন্যতা ছিল। ক্রোধ ছিল। ক্রুদ্ধ বেদনায় এক ধরনের প্রতিবাদ ছিল।

এবং ওপরে দোতলার ঘরে এসে পাখার তলায় বসার পর আগড়ুমবাগড়ুম কোনো ভণিতা ছিল না। অনুরোধ তৈরি হয়ে উঠতেই প্রস্তাবটা সরাসরি নাকচ করল শিপ্রা—'না, আমি যাব না।'

'কী পাগলামি করছ?'

'পাগলামি আমি করছি?' শিপ্রা ক্ষিপ্রতায়, ক্রোধ চেপে থাকার আক্রোশে—'এ-কি ফাজলামো নাকি? ছেলেখেলা? শখ হলো, মরে গেলাম! এখন বেঁচে উঠে উদ্ধার করেছেন সবাইকে। বক্তৃতা ঝাড়বে, ফিলসফি আওড়াবে, নিজের অপকর্মকে জাস্টিফাই করতে টেবিল চাপড়ে গলাবাজি করবে। আমি ওদের হাড়ে-হাড়ে চিনি বৌদি। আমাকে ক্ষমা করুন।'

ঘরের দরজায় ছিটকিনি তোলা ছিল। ওদিকে মৃতপ্রায় সত্যসাধন এবং রেণুবালা যদিও কিছুটা আশ্বাস ফিরে পেয়েছেন, এখনও সবল নন। তিন দিন পর শ্যামল আপিশে। শিপ্রাকে নিয়ে বাড়ি ঢোকার দৃশ্যে ঢুকে পড়েছিল কৃষ্ণা। শিপ্রার প্রতিক্রিয়ায় দুজনই আহত।

বেখাপ্পা মেজাজে শিপ্রাও হয়তো সঙ্কুচিত কিছুটা। ভেজা গলায়, অনেকটা নেমে এসে—'উৎপল মরে যাক, এ-তো কেউই চায় নি বৌদি। আপনারা সবাই নিজেদের মতো করে দম চেপে সহ্য করেছেন যন্ত্রণাটা। ওর বেঁচে-ওঠায়, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, কেমন যেন করছিল শরীরটা! আমার কোনো রিঅ্যাকশনই ছিল না।'

কৃষ্ণার বলার নেই কিছু। বরং সেদিন হাসপাতালের সেই বাড়াবাড়ি ঘটনার পর থেকে ওর একটা চাপা রাগ শিপ্রাদির ওপর।

ঘরের মেঝেয় পুতুল নিয়ে আপন মনে খেলছিল বাচ্চা মেয়ে টুনটুনি। মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুনন্দা চোখ তুলল এবার—'জানি, এমন একটা ঘটনা, কেউই ঠিকমত সামলে উঠতে পারছে না নিজেদের। এদের মায়ের অবস্থাটা ভাবো একবার। বাবার কথা। ছেলে তো বেঁচে গেল। এখন ওই বুড়োবুড়িকে কি বাঁচানো যাবে? নির্ঘাৎ বিছানায় পড়বেন এবার...'

'সে-আমি কী করতে পারি?'

'না, তোমার কিছু করার নেই। যেভাবে যা ঘটছে সেখানে কারুরই তো করার থাকছে না কিছু। হাসপাতালে আজ দুদিন ধরে সবাই যাচ্ছে, কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলে নি খোকন। কাল তোমাদের কাকিমা গিয়েছিলেন, একটু-আধটু কথা তাঁর সঙ্গেই হলো...তাই মনে হচ্ছে...'

'আমি গেলে আমার সঙ্গে কথা বলবে?'

'বলতেও তো পারে। সেটা তুমি নিজেও জানো।'

'আপনারা কী ভেবেছেন, বলুন তো...' শিপ্রা, ডান হাতে কপালের কেশরেণু সরিয়ে উত্তেজিত—'সেদিন সকালে ভাস্কর গিয়ে খবরটা দিলো, ভূমিকম্পের মতো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছি। এতগুলো লোকের মধ্যে বসেছিলাম চোরের মতো। ঘুরে ঘুরে আপনারা সবাই—কৃষ্ণা শ্যামলদা ভাস্কর—হ্যাঁ, বোধ হয় আপনিও জিজ্ঞেস করেছেন—কী হয়েছে, তুমি কিছু জানো? আপনারা কেউ কিছু জানেন না, যেন আমিই সব জানি। তার মানে কী? আমি...'

'এটা কী! এ-তুমি কী বলছ শিপ্রাদি...' কৃষ্ণা ক্ষেপে গেল—'সেদিন তো সবাই সবাইকে করেছে প্রশ্নটা। ছোড়দার বন্ধুরা, যাঁরা এসেছিলেন, জনে জনে সবাইকে বলেছেন দাদা...'

হঠাৎ, দরজায় মৃদুধ্বনি। কৃষ্ণা উঠে যায়। ছিটকিনি খোলে। ভাস্কর।

'তুমিও তো ওর এতদিনের পুরনো বন্ধু ভাস্কর। রাগ হয় নি তোমার?'

প্রথম প্রবেশেই আচমকা ধাক্কায় বিব্রত ভাস্কর।

ক্রোধ দুর্নিবার হয়ে ওঠে। চাপা কান্নাটা শোকের নয়—অস্বস্তির। খুবই আলতোভাবে আঁচলটা টেনে নিয়েছে শিপ্রা—'আমার ওপর এই প্রেশার কেন তোমাদের? আমাকে কেন? একটা ডিসেন্সিও তো আছে সব কিছুর?'

খাটে, শিপ্রার পাশে বসে সুনন্দা হাত রাখল কাঁধে—'প্রেশার কেন বলছ? অনুরোধ—একবার যাও। দেখে এসো। খোকনও জ্বলছে-পুড়ছে নিজের আগুনে। ওকে বিশ্বাস ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব আছে আমাদের...

'এগ্‌জাক্টলি...' ওদিক থেকে ভাস্কর—'যাই ঘটুক, যত বড় দুর্ঘটনাই হোক, আমরা আছি। মরে যাবার মতো এমন কিছু হয় নি ওর...'

শিপ্রা নিরুত্তর। নিজেকে নিয়েই বিব্রত কিছুটা। পিঠের আঁচল ডান কাঁধে টেনে নিচু মুখে বিমর্ষ আরো।

'খোকন ফিরে আসার পরও তো ঝক্কিঝঞ্ঝাট আরো থাকতে পারে। আজ আমরা ওকে ডেজার্টার বলছি, এর পর আমরাই যদি ছেড়ে যাই ওকে?' ভাস্কর ভ্রূ কুঁচকোল। শিপ্রাকে এড়িয়ে সরাসরি বৌদিকে ইশারার সুযোগ নেই।

সুনন্দা অকুতোভাবনায়—'আমরা অবিশ্যি কেউই জানি না এখনও, খোকন এরকম একটা কাণ্ড কেন করল! কী ভীষণ একটা ব্যাপার হয়ে যেতে পারত। হতো কী? হয়ে তো গিয়েইছিল।'

শিপ্রা সোজা হয়ে বসল—'আপনারা ওর অফিসে গিয়েছিলেন?'

'কেন, কেন বলো তো?' ভাস্কর তীক্ষ্ণ চোখে।

'হাসপাতালে যাবার দিন-দশেক আগে থেকে ওর সঙ্গে দেখা হয় নি আমার...'

ভাস্কর দ্রুত হিসেব কষে নিতে চাইল। ট্যাবলেট গেলার দশদিন আগেই সাস্পেনশন নোটিশ। অফিসে বেহাজির।

'তার আগে থেকেই ভীষণ বদলে যেতে দেখেছি ওকে। গম্ভীর, সব সময় কিছু একটা ভাবছে। একদিন বড় ছটফট করছিল—কী নাকি লাখ টাকার একটা গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছে...'

'আর। আর কিছু?'

'আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম—কী? তোমার চাকরির কোনো গোলমাল নয়তো?'

'খোকন... খোকন কী বলল?'

'দুঃ, টাকা চুরি না করলে ব্যাঙ্কে চাকরি যায় না কারুর। আমি তো চোর নই...'

চেয়ারে শিথিলভাবে এলিয়ে ভাস্কর। শিপ্রার পাশে সুনন্দা চুপ। অন্য দিকে কৃষ্ণার ড্যাবডেবে চোখে দুর্জ্ঞেয় ধাঁধা। পরিস্থিতি দ্রুত টেনে নিয়েছে সুনন্দা—'দেখলে তো অ্যাদ্দিন বাদে তবু হদিশ মিলল একটা। এই জন্যেই বলছিলাম তোমাকে...'

তৎপর ভাস্কর কব্জির ঘড়িতে পলক ঘুরিয়ে নিয়ে—'আমি আজই যাব ওদের ব্যাঙ্কে। জেনে আসব ডিটেল...'

'তুমি আজ একবার যাও ভাই, প্লিজ...' সুনন্দা আকুল হলো—'খোকন যদি কিছু খুলে বলে, আমি সিওর, ও শুধু তোমাকেই বলবে।'

চতুর ভাস্কর—'কজটা জানা আমাদের বড্ড দরকার। পুলিশের ঝঞ্ঝাট আছে, ডাক্তারবাবুরা জানতে চাইছেন।'

শিপ্রা কাঁপল না—'সব কিছুর জন্যে আমার নিজেরও তো একটা লজিক থাকবে বৌদি! যাব কি যাব না সে-আমার ডিসিশন। এখনও ভাবিনি। কারুর খেয়াল খুশির পুতুল তো নই...

তিন দিন কেটে যাবার পর বন্ধুরা অথবা আত্মীয়জন, ইতিপূর্বে দুচারজন যারা এসেছিলেন, এলেন না কেউ। সত্যসাধন এবং রেণুবালাকে নিয়ে নিচে নেমে এল শ্যামল সুনন্দা। কেবিন ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল ভাস্করের সঙ্গে কৃষ্ণা।

নিঃসঙ্গ প্রবেশ। এবং দৃশ্যমান হতেই সেই পুরনো একজোড়া চোখ একবার মাত্র পলক ফেলে একইভাবে ক্লান্ত হলো। চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে বসে থাকা মানুষটা হঠাৎ শুয়ে পড়ে দুহাতের আঙুল-জড়ানো করপুটে ঘাড় রেখে মাথাটা উঁচিয়ে রাখল ঊর্ধ্ববর্তী সিলিংয়ের দিকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে শিপ্রা, দেখেও, মুদিত নয়নে, অনুভবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপ গোনা।

'কেমন আছো?'

তাকাল একবার। নড়েচড়ে ওঠার সঙ্গে মুখে হালকা হাসি।

'ওভাবে অসভ্যতা করছ কেন সকলের সঙ্গে?'

সাড়া নেই।

'মাসিমা মেসোমশাইর সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলো নি ভালোভাবে...'

প্রতিক্রিয়া নেই।

'এমন একটা সর্বনেশে কাণ্ড করলে কেন হঠাৎ?' এভাবে শাদাসিধে সরাসরি প্রশ্নের পর নিজের অধৈর্যে শিপ্রা নিজেই ঘাবড়ে গেল। নার্সের স্তম্ভিত ভ্রূকুটি রেখায় একজন মেয়ে হিসেবেই তার অস্বস্তি এবং সঙ্কোচ। আরো একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে ফিরেই যাচ্ছিল যখন

পিছু ডাক—'শোনো...'

থামতে হলো।

'উত্তরটা কি তোমাকে আজই পেতে হবে? এক্ষুনি?'

'প্রশ্নটা আমার নয়। এখানকার ডাক্তারবাবুদের। তোমার ট্রিট্‌মেন্টের জন্যেই তাঁদের জানা দরকার।'

'আমি কেন মরতে চেয়েছিলাম, ওঁদের জানার দরকার কেন?'

'যাঁরা তোমাকে বাঁচালেন, তুমি কেন বাঁচতে চাইছ না, জানতে চাইবেন না?'

এবম্বিধ সংলাপে হতচকিত নার্স তাৎক্ষণিক জড়ত্ব থেকে নাড়া খেয়ে, তাদৃশ যুবক-যুবতীকে খানিকটা নিরিবিলিদান একান্ত আবশ্যিক বিবেচনায় 'আপনারা কথা বলুন। ভিজিটিং-আওয়ার ছটা অব্দি...' বলেই ঘর ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হবার পর সান্ধ্যনির্জনে শিপ্রা, তাপদুঃখক্রোধের রাসায়নিক আবেগে পুরনো মানুষকে নতুন করে চিনে নেবার কঠিন খেলায় যখন দাঁতে ঠোঁট চেপে স্থির, অন্য পারে, আরো বেশি নিরুত্তাপ ঔদাসীন্যে শয্যাশায়ী মানুষ চোখে-চোখ এড়িয়ে হয়তো-বা ভিন্নতর জটিলতায় ভরদুপুরের নিস্তরঙ্গ দিঘির মতোই ভাবনার গভীরে শান্ত চুপচাপ।

'মাসখানেক কিংবা তারও বেশি, কেমন বদলে যাচ্ছিলে তুমি। দেখা করতেও বলতে না...'

ওপারে কাঁপুনি নেই।

'এ-বেস্পতিবারের আগের বেস্পতিবারও দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে। আমি একটা ছাতা কিনব। মহাত্মা গান্ধী রোডের দোকানে দোকানে ঘুরলাম। কফিহাউসে যেতে চাইলে না। কলেজ স্কোয়ারের অন্ধকার বেঞ্চিতে সন্ধেটা কাটালাম। তুমি আপিশের গোলমালের কথা বলছিলে। বললে—সেটা এমন কিছু না। কিন্তু তারপর যে এমন একটা বিপত্তি ঘটিয়ে ফেলতে পারো...এত বড় সর্বনাশ...'

এপাশে মোচড় খেল মানুষটা। একঘেয়েমি ভাঙতে হাতের পায়ের পিঠ-কোমরের গাঁটে গাঁটে জমাট রস ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা।

এবং চোখে চোখ পড়তেই, কিছুমাত্র বিচলিত হলো না শিপ্রা। কী ভয়ানকভাবে বদলে গেছে চাউনিটা! অথচ দুদিন আগেও যে-চোখে অন্যরকম দুষ্টুমি ছিল। অন্য এক দামাল মানুষ।

'আমাকে চলে যেতে বলছ?'

ইশারায় ঘনিষ্ঠ হবার আমন্ত্রণ।

শিপ্রা এগিয়ে এল—'থাকব?'

ঠোঁট ভেঙে নিঃশব্দ হাসির আস্তরণ। যন্ত্রণার কণ্ঠস্বর—'রাত করে বাড়ি ফিরলে মাসিমার কাছে এখনও কৈফিয়ত দিতে হয় তোমাকে...'

'আজ তোমার অন্যরকম কিছু ঘটে গেলে আমার কান্নার কৈফিয়তটা আরো মর্মান্তিক হতো...'

খাট ছুঁয়ে দাঁড়াল শিপ্রা। পাশে বসার নির্দেশ। বুকের কাছে।

কোথায় যে গেলেন মহিলা? কিংবা পেশাদারি নার্স হলেও, যেহেতু অনতিবয়সের মহিলাই একজন, অনুপম জীবন চেনেন। জীবনের মুহূর্তগুলি। নিরবচ্ছিন্ন কেবিনঘরের নিঝুমে পর্দাসহ বন্ধ-দরজায় ঘর আর বাহির আলাদা হয়ে এলে নিভৃত শূন্যতায় দীর্ঘ সময় অপলক তাকিয়ে থাকার ক্লান্তিতে বাদী-বিবাদী উভয়তই যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে ম্রিয়মাণ দ্বিধায় আনত, অনেক-কথার পরও কথা-ফুরোয়-না-গোছের অন্তরঙ্গতাও যদি এমন বোবা হয়ে যেতে পারে কখনও, কুৎসিত অপরাধের মানুষটাকে তবে ক্ষমা। কান্নার শরীর ভেঙে এবার তোলপাড়। চোখের নীরব ভাষায়—মনে পড়ে উৎপল! সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি? আমি তখন ছোট ছিলাম। ফ্রক পরে স্কুলে যাই। তখন কোথায় তুমি? খুন আর খুন! খুনোখুনির বীভৎস কোলাহলে আমাদের কৈশোর! মৃত্যুকে ডিঙিয়ে হাঁটা প্রতিদিন।

দাদার এক বন্ধু সত্যদা। তাঁর ভাই দেবুদা...দেবব্রত ভৌমিক। মোটামুটি পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। বাপ মস্ত সরকারি অফিসার। দেবুদা নিজেও লেখাপড়ায় খুব ভালো। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স অনার্সে পড়তেন। কী থেকে যে কী হয়ে যাচ্ছিল সেসময়! দেবুদা পাল্টে যাচ্ছিলেন। গোপন ইস্তাহারের মতো দেবুদা নিজেও এক নিষিদ্ধ ব্যক্তি। একদিন খুঁজে পাওয়া গেল তাঁকে। উনিশ-কুড়ি বছরের এক রক্তাক্ত শবদেহ

এরই মধ্যে বড় হতে হতে আমি কলেজের ছাত্রী। তখন তুমি ইউনিভার্সিটিতে। বছর তিনেকের সিনিয়ার আমার চেয়ে। একদিন আলাপ হলো

তুমি শুরুই করলে অন্যভাবে। পড়াশুনো করতে খুব। সুন্দর কথা বলতে। কলেজ-ইউনিয়নের নির্বাচন যখন বারুদের গন্ধে রীতিমত রণাঙ্গন, পরীক্ষার হলে কালাপাহাড়ী তাণ্ডব, শ্রদ্ধাভক্তি ভালোবাসার ঠাঁই নেই কোথাও—দিশেহারা দিনে তোমাকে...তোমার বন্ধুদের ভালো লেগেছিল খুব। তোমার এলোমেলো স্বভাবের মধ্যে এমন একটা ধুমধাড়াক্কা পাগলামি

আমার চারপাশটাও বড্ড ছোট উৎপল। ঘাড় উঁচিয়ে তাকাবার মতো খুব লম্বা সিঁড়ি দেখি নি কোথাও

নুলোর মতো উৎপলের অবশ হাতটা বুকে এসে ঠেকল। আরো গভীর মমতায়, দ্রুত, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে শিপ্রা দুহাতে আগলে ধরল মানুষটাকে। বুকে গালে কপালে মাথার-চুলে ভালোবাসার হাত বুলোতে বুলোতে দাঁতে-দাঁত চেপে থাকার সব অহঙ্কার ঝুর্‌ঝুর ভেঙে পড়ে। তখন নতুন করে অণুতে অণুতে শিহরনের কাঁটাগুলি আপ্লুত সোহাগে শরীর চেনায়। শরীর! রক্তে রক্তে দহনের সহনের প্রস্তুতিহীন অভিজ্ঞতা! এতদিনের ঘন সান্নিধ্যেও শরীরটাকে ও এমন করে চায় নি কোনোদিন।

'আমাকে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে শিপ্রা...'

'নিশ্চয়ই।'

কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতা ছিল। বাধা নেই, প্রতিবাদ নেই। চোখ বুজে শিপ্রা আবিষ্ট নির্বাক। শিথিল শাড়ি আর ব্লাউজ-ব্রার শক্ত বাঁধুনি ভেঙে ক্রীড়াময় আঙুলগুলো উঠে আসছে ওপরের দিকে। গলা হাতড়ে গালে। বোধ হয় আঙুলগুলো ভিজল। আদরে আদরে মুছে নিচ্ছে জল। জীবনে এই প্রথম এতটা আত্মনিবেদনে, নিশ্চল স্থবিরতায় একই সঙ্গে জননী হয়ে উঠছে সে। দ্বিতীয় জন্মের সূচনায় ভিন্ন ভাবে অন্য এক রমণী-আস্বাদন ওর!

'কিন্তু আমার জবাবদিহিটা...' কষ্ট-উচ্চারিত শব্দাবলি স্তব্ধতার ঘরে। যেন শব্দগুলোও শিপ্রার শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—'অ্যাট লিস্ট তোমার কাছে...'

'বলবে, নিশ্চয়ই বলবে। শুনব...' ব্রেইল পদ্ধতিতে অন্ধের বর্ণশিক্ষা যেমন, বুকের নম্রতায় পাঁচ আঙুলের বৈধ এবং অবোধ চলাচল, নখের আঁচড় খামচানিতে গোটা শরীর জুড়ে রক্তের ঝড়। আবেশে শিথিল শিপ্রা।

'আত্মহত্যাকে ঘেন্না করি আমি। আই হেটেড, আই হেটেড ইট লাইক এনিথিং। বললে বিশ্বাস করবে তুমি?'

'কেন করব না? নিশ্চয়ই করব।' চিৎ-হয়ে-শোয়া মানুষের ইংরেজি 'ভি'-এর মতো এক জোড়া পায়ের দিকে তাকালে মরা-বাপের শেষ ছবিটা মনে পড়ে। কিন্তু উৎপলের পায়ে ওভাবে আনত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে নি কোনোদিন। কিন্তু ললাট! মাথা-ভরে ঝাঁকড়া চুলের নিচে চকচকে ললাটের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি দুর্নিবার হয়ে ওঠে। পেছনের দরজায় দ্রুত পলক ঘুরিয়ে, একটু বেশিই বেপরোয়া, নিচু হয়ে, কম্পিত ওষ্ঠের তৃষ্ণায় জীবনে এই প্রথম, নিবেদনের আকুতিতে নিচু হতে হতে আরো আনত হয়ে মানুষটার ভ্রূসঙ্গমে নিঃশব্দ চুম্বনে নিশ্বাসের উষ্ণতায় নিশ্বাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে—'একা-একা এভাবে আর জ্বলবে না কখনো। কথা দাও...'

ছোট একটু হাসল উৎপল।

উঠে গিয়ে ভেজানো-দরজাটা শিপ্রা নিজেই খুলে দিল। দর্শনার্থীদের জন্য নিষ্ক্রান্তির ঘণ্টা বাজে নি তখনও।

জবানবন্দি

ভালো অঙ্ক কষাটা মিস্তিরির কাজ। আইনস্টাইন হতে পারব না যখন, দাদার মতো মিডিওকার হয়েও লাভ নেই। বরং আমি আমার মতোই হই...এমত বিশ্বাসে বড় ভাই শ্যামল যে-বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট-ক্লাশ নিয়ে গার্ডেনরিচের বড় ফ্যাক্টরিতে হাজার টাকা মাইনের সাহেব হলো, তার পরের বছর 'নেভার স্টুড ফার্স্ট'-গোছের মাঝারি ছাত্র উৎপল, উৎপল দাশগুপ্ত, কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইকনমিকস-এ সসম্মান সেকেন্ড ক্লাশ যোগাড় করে পরবর্তী দু বছরের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করল এবং মোটামুটি ভদ্রগোছের এম. এ. নিয়ে বেরিয়ে আসার পরই দ্রুত সিদ্ধান্ত তার—স্কুল কলেজের মাস্টারিতে ফালতু ইজ্জত ধুয়ে বাঁচার চেয়ে বরং

কেরিয়ার—দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অর্থোপার্জনই জীবনের মহৎ কর্ম। সুতরাং উঁচুতলার ডাইভিং বোর্ড থেকে নিখুঁত ঝাঁপ।

জীবন-গড়ার স্থাপত্যে আই. এ. এস. বা ডব্লু. বি. সি. এস. জাতীয় হোমরাচোমরা হবার দিগদারিতে যাবার মানসিক স্থৈর্যও ছিল না তেমন। বরং ব্যাঙ্ক...

প্রবেশনারি অফিসার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি এবং একদিন অভীষ্ট ফললাভের পর পারিবারিক বৃত্তে, বন্ধুজন সমাবেশে সপ্রশংস বাহবা—'কেল্লা ফতে। ব্যাঙ্কের অফিসার? আরে বাপস্! শুনেছি, ওখানে ক্লাশ-ফোর-স্টাফ হয়ে ঢুকলেও নাকি মাসে ছশ সাতশ টাকা...'

উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাঁদের দিকে মইটা তাক করা থাকে। এবার ধাপে ধাপে পা ফেলা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় ইন-ব্র্যাঞ্চ-ট্রেনিং-এ এক বছর। টগবগ উৎসাহে ফুটছে শরীর। দুনিয়াকে লাথি মেরে চলার দুর্দম গতিবেগ।

অবশেষে ডায়রেক্ট রিক্রুটমেন্ট—বিল ডিপার্টমেন্টে অফিসার একদিন।

দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই। জামাইবাবু শ্রীতাপস করগুপ্ত এম. কম. এল. এল. বি. (ক্যাল) এক আজব সামগ্রী। মোটামুটি পয়সাওলা ঘরের চার পুত্রের জ্যেষ্ঠ, নিজেও ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। বলা চলে, হাজার দশেক টাকা পণ দিয়ে বাজার-সেরা বাবাজীবন কিনেছিলেন বাবা।

দাদা বিয়ে করলেন। ঘরে বৌদি এল। হোল-টাইম বান্ধবী একজন। গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কুলের দিদিমণি আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মিলিত রোজগারে আজীবন রেলের কেরানি শ্রীযুক্ত সত্যসাধন দাশগুপ্তের সংসারে অকস্মাৎ সবুজ-বিপ্লব। টেলিফোন এল, টিভি এল। গ্যাসওভেন ফ্রিজ সহ মূল্যবান আসবাবপত্র।

দাদার সর্বশেষ প্রস্তাব—সল্ট লেকে কো-অপারেটিভের ফ্ল্যাট। একই ব্লকে একই ফ্লোরে পাশাপাশি দুটো। দ্বিতীয়টা খোকনের নামে। এখন তো আর কোনো অসুবিধে নেই। শুরুতেই ওর মাইনের অঙ্কটা আমার কাছাকাছি। আমি যদি সাহস পাই...

বাবা এখনও সেই ঋষি বাল্মীকির যুগে। নিতান্তই বাজারে দুর্লভ, নইলে খটাং-খটাং খড়ম পায়েই চলতে-ফিরতে চান। আপত্তির হেতু—পরের জমিতে নিজেদের ঘরবাড়ি আবার কী? এ-কি ফানুস নাকি?

তাছাড়া নতুন চাকরি। উৎপল নিজেও সাহস পেল না।

এক্ষুনি কোনো ফ্ল্যাট না হোক, শিপ্রা ছিল। ঘরের গ্যারেন্টি। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ভুলিয়ে ভালিয়ে ঢুকে পড়েছিল একটা বেনারসী সিল্কের দোকানে। প্রবেশ-সিঁড়িতেই দ্বিধা—'*কেন? কী হবে এখানে?*'

'শাড়ি কিনব। পিওর সিল্ক, সাউথ-ইন্ডিয়ান কাঞ্চীভরম। চাও তো বেনারসী পর্যন্ত। যা চাইবে...'

'হা কপাল! তুমি শাড়ি কিনে দেবে, আমি পরব?'

'কেন, তাই তো নিয়ম!'

'বাড়ির লোককে কী বলব? কে দিলো? দুশো আড়াইশো তিনশো টাকা কোথায় পেলাম?'

'কেন? তোমার মা কাঞ্চনদা কাকিমা অখিলকাকু সবাই চেনেন আমাকে...'

'খোকাবাবু, প্রেম করতে না শিখেই কাঁথার-গন্ধ গায়ে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছ? ও-ক্লাশটাও কি আমাকেই নিতে হবে নাকি? এই বুদ্ধি! এই বুদ্ধি নিয়ে চাকরি করো অফিসারবাবু? কবে যে ডুববে, ডোবাবে সবাইকে...'

সত্যি-সত্যি চাকরিতেই ভরাডুবি।

ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার বুড়ো তুষার তালুকদার ডাকলেন একদিন। সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট হীরের বোতামে ধুতি-পাঞ্জাবির শাদায় বিশাল দেহের একজন মানুষ। পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনি মিঃ জগদীশ খাস্তগীর। এঁর ফাইলটা তোমার কাছে আছে!'

'কোন্ ফাইলটা?'

'ড্রয়িং-পাওয়ার রেজিস্টারটা দেখি। খাস্তগীরদের ফাইলটাও আনবে। কাল না পরশু কাগজপত্তর নিয়ে এলে কথা বলতে...'

উৎপল গম্ভীর—'হ্যাঁ স্যার, কিছু গোলমাল ছিল।'

'আরে, গোলমাল তো থাকবেই। লাখ লাখ টাকা কি গাছ থেকে পড়ে? গোলমাল থাকে তো পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলেকয়ে নাও। ইনি আমাদের খুব পুরনো ক্লায়েন্ট। খুব বড়, বেশ প্রমিজিং বিজনেস এলিট...'

সদাশয় জগদীশ খাস্তগীর ভারি ঠোঁটের ফাঁকে হাসলেন। দামী জর্দার গন্ধ। ব্যক্তিগত পরিচয় বাহুল্যমাত্র। চাকরির শুরুতেই খাস্তগীরমশাইকে উৎপল চিনে ফেলেছিল। অধস্তনতম কর্মচারী পর্যন্ত ব্র্যাঞ্চের সবাই জানে। সবুজ অ্যাম্ব্যাসেডরটা ব্যাঙ্কের দরজায় এসে দাঁড়ালেই চাপা চাঞ্চল্য চারপাশে—ব্ল্যাক অ্যাম্ব্যাসেডর-এ 'হ্যান্ডস আপ' গ্রীন অ্যাম্ব্যাসেডর-এ 'স্যালুট'। খোদ আর, এম্. অফিসে দহরম-মহরম, বি. এম্-এর বিগ-ক্লায়েন্ট।

'স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ' প্রকল্পের ঋণপ্রার্থী জগদীশ খাস্তগীর বাণিজ্য বোঝেন। কামধেনু-দোহনকৌশল ততোধিক করায়ত্ত। বিভিন্ন ধরনের লোনের মধ্যে সাপ্লাই বিলের ভিত্তিতে অ্যাডভান্স-ড্রয়িং-লিমিট অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে! অর্থাৎ প্রায় সব সময়ই হাজার হাজার অথবা লক্ষাধিক টাকার বিল জমা দিয়ে, বিনিময়ে শতকরা পঁচাত্তর আশি ভাগ টাকা অগ্রিম তুলে নেবার বৈধতা তাঁর ছিল।

কিন্তু খোদ ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার তালুকদারের প্রশ্রয়ে এতাদৃশ লেনদেনের মাত্রাটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল অনেক দূর। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কোম্পানিগুলির কাছ থেকে পুরো টাকা আদায় করে আনতে সময় লাগে এক মাস দেড় মাস। বহিঃরাজ্য হলে আরো বেশি। কিন্তু শতকরা পঁচাত্তর ভাগ তুলে নেবার পরও অবশিষ্ট পঁচিশের জন্য খাস্তগীরমশাইর তর সইত না। বিলগুলি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে লোক মারফত হোক অথবা স্বয়ং গিয়ে দূর-দূর কোম্পানিগুলির কাছে পেশ করে টাকাটা আদায় করে নিতেন। প্রক্রিয়াটা বেআইনী। সেক্ষেত্রে হাজার হাজার বা

লক্ষাধিক টাকা আগাম নেবার কোনো প্রমাণপত্র ব্যাঙ্কের ফাইলে থাকে না। কিন্তু দায়িত্বটা সংশ্লিষ্ট অফিসারের ঘাড়ে যথারীতি থেকে যায়। কিন্তু তালুকদার চান, কাজকর্মের প্রসার এবং ব্র্যাঞ্চের শ্রীবৃদ্ধিতে নিজের দক্ষতার প্রচার। খাস্তগীর বা অসংখ্য খাস্তগীদের পুষতেই হয়। সুতরাং বি. এম.-এর বিরাগভাজন হবার ঝুঁকি এড়াতে কিংবা তাঁরই প্রদত্ত সবুজ-সঙ্কেতে অফিসাররা রাজি হতেন। অন্তত উৎপল দাশগুপ্তের টেবিলের পূর্বসূরি এভাবে লিখিত প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকেই কাগজগুলো খাস্তগীরমশাইর হাতে তুলে দিয়েছেন বারকয়েক অথবা বাধ্য হয়েছেন।

এবম্বিধ ঘটনাবলি যে শেষপর্যন্ত ব্র্যাঞ্চে একটা নিয়মিত রেওয়াজ হয়ে উঠছিল, তার হেতু, খাস্তগীরমশাই প্রতিবারই তাঁর বিশ্বস্ততার মর্যাদা রেখেছেন। অধমর্ণ কোম্পানিগুলি থেকে আদায়ীকৃত অর্থ বা চেক তিনি প্রতিবারই ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন যথাসময়ে এবং কোনো ব্যাঙ্ক-কর্মচারীকেই এজন্য কিছুমাত্র বিপাকে পড়তে হয় নি।

পরিচয়ের পর খাস্তগীরমশাই উৎপলের টেবিলে এসে বসেছেন বহুবার। নানা কথায় দামি সিগারেটে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন। নিজের গাড়িতে বারকয়েক লিফটও দিয়েছেন শ্যামবাজার অব্দি।

কিন্তু প্রথম অভিজ্ঞতায় এ-জাতীয় ব্যবসায়িক জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে উৎপল ভয় পেল। ফাইল নিয়ে ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার তালুকদারের সঙ্গে কথা বলাও তখন নিতান্তই বাতুলতা।

অ্যাকাউন্টেন্ট তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার বাসুদেব মৈত্র পুরনো মানুষ। তালুকদারের সঙ্গে খটাখটি লেগেই আছে প্রতিদিন। উৎপল এগোলো ফাইল নিয়ে—'কী করব বলুন তো বাসুদা! বি. এম. নিজে এমন প্রেশার দিচ্ছেন...'

'সে-আর তুমি কি করবে? এই তো চলছে এখানে। চলবে...'

'আপনারা বলেন না কিছু। এমন ইল্‌লিগাল...'

'আর ইল্‌লিগাল! ও-শালা তোমাদের তালুকদার যদ্দিন আছে, সব লিগাল। আর মাস পাঁচেক বাদেই রিটায়ার করছে বুড়ো। সাবধানে থাকো কটা দিন...'

রাজাসনে বসে স্বয়ং ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার তুষার তালুকদার মুচকি হাসলেন—'খাস্তগীর কে তুমি জানো?'

'দরকার নেই জানার। বড় রাস্তায় আমি জেব্রা-ক্রশিং মেনেই এগোতে চাই।'

'ভেরি গুড। কিন্তু চারদিক থেকে নানা ধরনের প্রেশার পড়লে সামলাবে কে? তুমি?'

উৎপল চুপ।

'তোমার ব্র্যাঞ্চে বছরে কত লাখ টাকার ডিপোজিট বাড়ছে খবর রাখো?'

উৎপল নিরুত্তর।

'একজন রেসপনসিবল অফিসার হিসেবে মিনিমাম এটুকু খবর তোমার জানা উচিত।

দেশের এত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টে খাস্তগীররাই ভাইটাল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট মানেই ব্যাঙ্কিং-বিজনেসের ফ্লারিশমেন্ট অ্যান্ড ভাইসে ভার্সা...'

'কিন্তু এ-তো অন্যায়। ভেরি মাচ ইররেগুলার।'

'তোমার প্রেডিসেসররাই করে গেছেন এসব। খাস্তগীর আজকের লোক নন...'

উৎপল দিশেহারা। কোনো জবাব নেই তার।

'ঘাবড়াচ্ছো কেন? দায়িত্ব আমারও আছে। ফাইলটা রেডি করে রেখে যাও আমার কাছে। পার্টির কাছ থেকে রিট্‌ন্ ডকুমেন্ট রেখে দেব। নিশ্চয়ই সেটা রাখা হবে।'

মেনে নিতেই হলো এক সময়। খোদ বি. এম.-ই যদি অনুমোদন দিচ্ছেন। যদিও খাস্তগীরের লিখিত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই কাজটা করতে হলো তাকে, তথাপি রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে উদ্বেগে কটা দিন।

কি আশ্চর্য! পাক্কা আট দিনের মাথায় এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকার একটা চেক ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ওফ্, স্বস্তি স্বস্তি! একরকম জোর করেই ধমকে-ধামকে শিপ্রাকে নিয়ে সে একটা সিনেমায় ঢুকে পড়ল সন্ধেবেলা। কি ছবি! কেমন ছবি! বিচার নিরর্থক।

জগদীশ খাস্তগীর বিশ্বস্ততায় নিরুপদ্রব তখন। ঝানু ব্যবসায়ী। নিজের গুড-উইলের ওপর অগাধ মমতা লোকটার।

বাবা রাজি হলেন না। কিন্তু দাদাও পিছোতে নারাজ। টাকাকড়ি জমা দিলেন। সংসারের অশান্তিতে উৎপল দাদা-বৌদির পক্ষে—এই তো হবে আজকাল। নিউ আর্বান সোসাইটি। ছোট ছোট ছিমছাম ফ্ল্যাট। নিজস্ব বাড়িঘরের ভাবনা ভেরি মাচ ব্যাকডেটেড ফিউডাল আইডিয়া। ফালতু টাকা নষ্ট।

সল্ট লেকের খোলামেলা হাওয়ায় কো-অপারেটিভের হাউসিং-কমপ্লেক্স শালসেগুন দেবদারুর স্বভাবে দ্রুত চাগিয়ে উঠবেই আকাশে। বৌদির স্বপ্নটা রীতিমত একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। নানাভাবে ফ্ল্যাটের একই ছক কাটেন প্রতিদিন।

আঁকিবুকির বয়স্ক খেলা—কোথায় কী রাখবেন, কী ভাবে সাজাবেন! কোন্ ঘরে কী রঙ? পর্দার নকশা। মাত্র হাজার দশেক টাকা বেশি খরচ করলে দেয়ালে প্যারিস প্লাস্টার আর মেঝেটা ডেকরেটিভ টাইলসে সুন্দর করা যায়।

আহা বেচারি! উৎপল উঠে আসে চুপচাপ।

মাস কয়েক বাদে ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার তুষার তালুকদারের রিটায়ারমেন্টের মুখে খাস্তগীর এলেন একদিন। লরিতে মাল পাঠিয়েছেন ভুবনেশ্বর। এক লক্ষ দশ হাজার টাকার বিল জমা রেখে ওভারড্রাফট তুললেন আশি হাজার টাকা। দুদিন পরে নিজেই যাচ্ছেন ওড়িশা। বহুদিনের চেনাজানা কোম্পানির কাছ থেকে নিজেই চেকটা নিয়ে আসতে পারেন। ব্যবসার প্রয়োজনে

দিন চারেক থাকবেন সেখানে। অর্থাৎ সপ্তাহান্তে পুরো টাকাটাই পেয়ে যাবে ব্যাঙ্ক।

যেহেতু শ্রেষ্ঠীসেবাই তার চাকরি এবং খাস্তগীরও ব্যাঙ্কের বিশ্বস্ত সুহৃদ, সংশয় ছিল না কোথাও। উৎপল সতর্ক তবু। ফাইল নিয়ে ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজারের কাচঘরে—'এবার কিন্তু সিচুয়েশনটা একটু আলাদা স্যার!'

'কেন?'

'কদিন বাদেই আপনি আর থাকছেন না। পার্টি যদি এর মধ্যে টাকাটা রিটার্ন না করেন?'

'খাস্তগীর তো কথার খেলাপ করে নি কখনও। বলছে তো, সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসছে।'

উৎপল ভাবে। ভাবতেই হয় তাকে।

'লাখ লাখ টাকার অ্যানুয়াল ট্রানজাকশন। এত বড় পার্টি যদি হাতছাড়া হয় তোমাদের? যদি অন্য কোনো ব্যাঙ্কে চলে যায় খাস্তগীর? ইউ, ওনলি ইউ মে বি হেল্ড রেসপনসিবল ফর দ্য হোল থিঙ...'

কাঁচা বয়সের তেজে উৎপল চোখ তুলে তাকাল—'আগের বার ওঁর রিট্‌ন্ ডকুমেন্টটা আমার কাছে ছিল না।'

'আমাকে অবিশ্বাস করছ?'

'না না, ঠিক তা নয়। এর পর তো রিটায়ার করছেন আপনি।'

'এবার থাকবে। নিশ্চয়ই তোমার কাছেই থাকবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইয়োর ওনলি পয়েন্ট অব ডিফেন্স...'

সুতরাং ছেড়ে দিতে হলো। খুশি মনেই ভুবনেশ্বর রওনা হলেন খাস্তগীর।

কিন্তু সাত দিন নয়, পনের দিনের মধ্যেও যখন প্রত্যাবর্তন নেই, অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে পড়ার সেই উন্মাদ ক্রোধটা দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে তখন থেকেই। খাস্তগীরকে আরো একবার বেআইনী ভাবে কাগজপত্রগুলো দিয়ে দেবার পর কোনো লিখিত স্বীকৃতিপত্র রাখা হয়েছে কিনা—তখনও স্পষ্ট নয়। বুড়ো শয়তানটার এক কথা—'আছে আছে। ঘাবড়াচ্ছ কেন? চার্জ হ্যান্ড-ওভার করে যাচ্ছি যখন, সবই রেখে যাব।'

বিলের টাকাটা ফেরেনি। ওভারড্রাফটের আশি হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে বেওয়ারিশ! উৎপল দাশগুপ্ত যে-দস্তুরের মানুষ, তার ভূমগুলে হিসেবের অঙ্কটা অনেক অনেক অনেক

অবশেষে একদিন ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান হলো অফিসে। তালুকদারের বিদায় সংবর্ধনা। গলায় মালা পরিয়ে বানানো-সাজানো দুচার কথাও বললেন কেউ কেউ। উৎপল ছিল না। মায়ের-অসুখ অজুহাতে বেরিয়ে পড়েছিল অনেক আগেই।

আগের দিনই ব্যাঙ্কে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। যে-লিখিত প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছিল খাস্তগীরের স্বাক্ষরে—বলেছিলেন তালুকদার, কাগজটা পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। বি. এম.-এর ঘরেই ফাইলটা ছিল। অন্যান্য কাগজপত্র সবই আছে। শুধু সেই জরুরি ডকুমেন্টটাই...

ফাটাফাটি চিৎকারে হট্টগোলও বাঁধানো যায় না। শেষ মুহূর্তে বিস্তর ক্ষতি করে যেতে পারে লোকটা।

কয়েকজন হিতৈষী সিনিয়রের সঙ্গে উৎপল কাচঘরে ঢুকেছিল। সকলের সাক্ষ্যে খাস্তগীর অ্যান্ড সন্স কারখানায় টেলিফোন করলেন তালুকদার। জানা গেল, ওড়িশা থেকে ফেরেননি ভদ্রলোক। ভুবনেশ্বরেই অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়ে পরিবারের অন্যান্যরাও চলে গেছেন! নার্সিং-হোম থেকে সুস্থ হয়ে চিকিৎসক-নির্দেশে আপাতত তিনি পুরীর সমুদ্রসৈকতে সপরিবারে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ফিরবেন শিগগিরই।

রিসিভার রেখে হাসলেন তালুকদার—'তাহলে তো হয়েই গেল। ভদ্রলোক ফেরেনইনি এখনও। আপনাদের টাকা দেবে কে?'

'লোকটা যদি মরেই যায় ওখানে?'

উৎপলের উদ্বেগে হেসে ফেলেছিলেন সকলেই। তালুকদার—'আরে বাপু, অল্প বয়স। এতেই এত ভয় পাচ্ছো? লাখ টাকা কোনো ফিগার নাকি ব্যাঙ্কের লেজারে? এটুকু রিস্ক নিতেই হাত-পা গুটিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছো? প্রমিসিং ইয়াংম্যান, একদিন তো এ-চেয়ারেও বসতে হবে। শুধু বি. এম. কেন? এই তো বয়স! এ. আর এম., আর. এম., এ. জি. এম, সি. ও., অব্দি উঠতে পারো। তোমাদের সময়ে, টপাটপ উঠে যাওয়া কত সহজ হয়ে যাচ্ছে। বছরে বছরে কাজকর্ম কত বেড়ে যাচ্ছে ব্যাঙ্কের, নতুন নতুন ব্র্যাঞ্চ গজাচ্ছে রোজ...'

ভবিষ্যৎ-স্বপ্নে মাদকতা ছিল না। উৎপল স্থবির। মোটামুটিভাবে মেনে নিলেন সকলেই—যতটা বিপজ্জনক মনে করা হচ্ছে, ঘটনাটা হয়তো সে-পরিমাণ মারাত্মক নয়। সান্ত্বনা এই, খাস্তগীর ফেরেননি এখনও। ফিরলে অবশ্যই চেকটা জমা দিয়ে যাবেন। কেন না, ইতিপূর্বে আরো অসংখ্যবার সংশ্লিষ্ট পার্টি এ-ধরনের ট্র্যানজাকশনে কখনওই বিপন্ন করেননি কাউকে।

বুড়ো তালুকদার তাঁর শেষ বাক্যে—'ডোন্ট বি ওয়ারিড ইয়াংম্যান। খাস্তগীররা ব্যাঙ্কের অ্যাসেট নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাঙ্কের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়ে ওদেরও লাভ নেই। লাখ লাখ টাকার ইনভলভমেন্ট ওদের বিজনেসে। অনেক বড় রিস্ক। তোমাকে খুশি রাখবে ওরা ওদের নিজেদের ইনটারেস্টেই...'

শরীরে মনে বড় মুষড়ে পড়েছে শিপ্রা। এম. এ. পাশ করার পর আজ প্রায় বছর দেড়েকের মধ্যে একটা চাকরি যোগাড় হলো না কোথাও। অথচ এঁদো গলির অন্ধকারে ওই বন্ধ খাঁচাটায় জীবন দুর্বিষহ!

পি অ্যান্ড টি-র কেরানি, ভালোমানুষ কাঞ্চনদা এরই মধ্যে মা আর বোনকে নিয়ে হিমশিম। ভদ্রলোকের আরেক ব্যাধি—কবিতা লেখেন। সম্ভ্রান্ত কিছু লিটল ম্যাগাজিনে ছাপাও হয় সেসব।

ভদ্রলোক হয়ে বাঁচার কী অশেষ লাঞ্ছনা!

নতুন ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার গঙ্গাপ্রসাদ ধড়িয়া তলব করলেন একদিন। খাস্তগীর কোম্পানির ফাইলটা চেয়ে পাঠিয়েছে রিজিওনাল হেড-অফিস। আশি হাজার টাকার একটা ও. ডি. আছে ওদের

নামে। টাকাটা ফিরছে না কেন? অথচ ভুবনেশ্বর থেকে খবর—পার্টি চেক নিয়ে ক্যাশও করে ফেলেছে আজ প্রায় চার সপ্তাহ আগে। ঘটনাটা অদ্ভুত।

এর চেয়ে বরং আণবিক যুদ্ধও বাঞ্ছিত তখন। সভ্যতা নির্মম। মাত্র সাতাশ বছরের যুবক উৎপল টলতে টলতে ফিরল টেবিলে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার বাসুদেব মৈত্র কেঁপে উঠলেন—'সে কি! কী বলছ তুমি? ফেঁসে যাবে যে একেবারে...'

দশদিগন্ত নিরাকার। উৎপল পাথর।

'কথাটা মিথ্যে নয় ব্রাদার। খাস্তগীর যদি চাইত, অনেক আগেই ফাঁসাতে পারত তোমাদের। এবার কেন যে দেরি করছে এত...' ভাবনার তলানি থেকে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ বাসুদেব মৈত্র ললাটের বলিরেখায় তাকালেন—'তা হোক, পার্টির সঙ্গে দেখা করেছ একবার?'

'না, এখনো যাইনি।'

'সে-কি! যাআআও। গিয়ে কথা বলো ওর সঙ্গে। আরে বাপু, একটা ইন্সপেকশনের হক তো আছে তোমার...'

কলকাতাটা দুলছে তখন। মাধ্যাকর্ষণের নিরবয়ব সত্যটা, জীবনে এই প্রথম, নিজের অস্তিত্বের নিশ্বাসে নিশ্বাসে অনুভব করছে উৎপল।

খাস্তগীর কোম্পানীর দরজায় পৌঁছে আশ্বাসের শেষ বিন্দুটুকুও উবে গেল। সে নেই। সত্যি-সত্যি তার সর্বশেষ অস্তিত্বটুকুও বায়ুভূত শূন্যতায় কর্পূর।

মালিকানা বদলে গেছে কোম্পানির। সাইনবোর্ডেরও রঙবদল। একই কারখানা ভিন্ন নামে স্বতন্ত্র প্রশাসনে এখনো সচল।

আগেই দুটো লরি ছিল জগদীশ খাস্তগীরের। মিনিবাসের পারমিট পেয়েছেন নতুন। আরো একটা লরি কিনবেন। এবার পরিবহণ ব্যবসা।

তিলোত্তমা হচ্ছে কলকাতা। ফ্লাই ওভার, পাতাল রেল, স্যাটেলাইট টাউনশিপ, রাজপথ সংস্কার—পথচারীর ফুটপাথ কেটে কেটে সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর। বুভুক্ষু হকাররা কেড়ে নেবে বাকিটুকু। প্রশস্ত রাজপথ প্রসারিত আরো। গাড়ি বাড়ছে শহরে। গতি বাড়ছে। উন্নতিশীলতার অশ্বমেধ। বন্যাবেগে গাড়ি ছুটছে দেশময়।

নিষ্পাপ গাভীর মতো ঊর্ধ্বমুখে তাকালেন রেণুবালা। পাশে বোবা চোখে সত্যসাধন—'কি রে! কী হয়েছে তোর?'

'কী আবার হবে?'

'কেমন মনমরা! কথা বলছিস না কারুর সঙ্গে। চুপচাপ!'

'নাহ্, কিছু না।'

অন্তরালে সুনন্দার কৌতুক হাসি—'বয়স বাড়ছে। মন খারাপ?'

জঘন্য, সেদিন বড্ড বিরক্তিকর লাগছিল বৌদিকে।

'সিঙ্গল বেডের খাটটা এমন বিচ্ছিরি, দেখলেই কেমন মড়ার-খাট মড়ার-খাট মনে হয় আমার। আর কেন! শিপ্রাকে আমিই বলব। বাদবাকিটা হবার আগে নিদেন রেজিস্ট্রিটা হয়ে যাক না চটপট...'

অসহ্য! কথাগুলো অসহ্য ছিল সেদিন। কত কুৎসিত হতে পারে মানুষের ভালোবাসা!

'রেজিস্ট্রিটা চুপি-চুপি করবে না কিন্তু। খবরদার। আমি থাকব। সাক্ষী দেব। খুব মহৎ কাজ তেমন কিছু তো করি নি জীবনে...'

কাঁকুড়গাছিতে জগদীশ খাস্তগীরের নতুন প্রাসাদ। দিন কয়েক ঘোরাঘুরির পর একদিন পাওয়া গেল লোকটাকে। কোন রকম ভণ্ডামি বা লুকোচুরি নেই। সাফ-সাফ কথা—'সে-আমি কী করব?'

'কী করবেন মানে! আমার চাকরি!'

'কটা পয়সা মাইনে পান মশাই আপনার চাকরিতে? চাকরি দেখাচ্ছেন! আমার লাখ-লাখ টাকার এত বড় কারবার হাতছাড়া হয়ে গেল!'

'সে-তো আপনি হাতছাড়া করবেন বলে। লরি কিনেছেন নতুন। এখন আপনার নতুন বিজনেস—ট্র্যান্সপোর্ট।'

'সে-আমি কি করি-না-করি তার জবাব তো আপনাকে দেব না মশাই।'

'দেবেন। দিতে হবে...' বিপুল ক্রোধে উৎপল তার শত্রুকে, জীবনে একমাত্র শত্রুকে কামড়ে ধরতে চাইল—'নতুন লরিটা বিক্রি করে ও. ডি-র আশি হাজার টাকা পে করবেন আগে। তার পর অন্য কথা। পার্টির কাছ থেকে পুরো বিলটা আপনি ড্র করেছেন অনেকদিন আগেই। খবর আছে।...'

'সে সব যা বলার আমি ব্যাঙ্ককে বলব। আপনি আসুন...'

'আসব মানে কী? আমার সর্বনাশ করে...'

'কেউ কারুর সর্বনাশ করে না মশাই। আপনার চাকরি আপনি দেখবেন, আমার কারবার আমি ..' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ নিলেন জগদীশ খাস্তগীর। ব্যাঙ্কে যে লোকটাকে দেখা যেত, সে নয়। ভিন্ন চেহারায়, অন্য আদলের মানুষ। ভারি গলায়—'এটাই নিয়ম। যান, আমার কাজ আছে। আপনার সঙ্গে ফালতু গ্যাঁজালে চলবে না আমার...'

বাটিকের লুঙ্গির ওপর হাতা-গোটানো ফিনফিনে পাঞ্জাবি। গলায় সোনার চেনে সরু হার। বাঁ হাতের কনুইয়ে কবচমাদুলিগুচ্ছ। সেই প্রথম, বিস্তীর্ণ রোমশ বক্ষপটের নিশানায় বগলে একটা কাল্পনিক স্টেনগান এসে গিয়েছিল মগজের চিন্তায়। ডান হাতের তর্জনী কাঁপছিল ট্রিগারে।

ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের ঘরে ঘনঘন তলব। মিঃ ধড়িয়া বিরক্ত—'কী করবেন, করুন একটা কিছু। আমাকে তো রিপোর্ট দিতে হবে। ব্র্যাঞ্চটার বহুৎ বদনাম করে দিয়েছেন আপনারা। বাস্তুঘুঘুর আখড়া...'

উৎপল স্বীকার করেছে সব। বারবার একই স্বীকারোক্তি—পুরনো বি. এম. তালুকদারই করিয়েছে সব। এমন-কি বিলগুলো দেবার লিখিত প্রমাণ রাখার কথাও সে বলেছিল যথারীতি।

'ওসব বললে তো চলবে না দাশগুপ্ত। বি. এম. বলেছেন আর আপনি করেছেন। এখন যদি দ্যাট ওল্ড ম্যান অস্বীকার করেন সব? যদি কেন, করবেনই। আপনি তো জেলে যাবেন মশাই। ইমপসিবল, নো বডি ক্যান সেভ ইউ নাউ...'

আস্তে আস্তে, সঙ্কুচিত হতে হতে বড় বেশি ছোট হয়ে আসছে পৃথিবীটা। মেট্রোপলিস কলকাতা তার বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ের ওপর। এবং তখনও, কিছুটা জোর করেই নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা। এই শহরের পরমাণু ভগ্নাংশে তার ঘর আছে একটা।

সেখানে রান্নাঘরের ফার্নেসে স্বেচ্ছাবৃত নারী-শ্রমিক মায়ের ক্লান্ত মুখ। মা-লক্ষ্মীর আসনে প্রতিদিনের পুজো ছাড়া এখনও সন্তানদের কল্যাণে চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলের উপোস, বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত।

বড় ছেলের ওপর চাপা আক্রোশে শহরতলি বা অন্য কোথাও একটু জমি কেনার কথা ভাবছেন বাবা। খোকন ভরসা।

অ্যাকোয়ারিয়ামের নীল জলে চঞ্চল মাছের মতো এঘর-ওঘরে খেলছে কৃষ্ণা।

ছোট্ট একটা টোকায় ওদের খেলাগুলো ভেঙে দিতে নিজের মধ্যেই কাঁপুনি। শিপ্রার চোখে চোখ রাখতে ভয়।

প্রাথমিক তদন্তে রিজিওনাল অফিস থেকে অফিসাররা এলেন একদিন। মিঃ ধড়িয়ার ঘরে ব্যস্ততা। জটিল থেকে জটিলতর আবর্তে উৎপল নাজেহাল। থানায় ডায়েরি করা হয়ে গেছে। নিয়মমাফিক পূর্বতন ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারকেও শো-কজ করা হয়েছিল, যার জবাবদিহিতে তালুকদার স্পষ্টতই জানিয়েছেন— এত বড় দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে, জীবনের বত্রিশ বছর একাদিক্রমে মহান সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে সেবা করেই তিনি পূর্ণ মর্যাদায় অবসর গ্রহণ করেছেন। এক্ষণে, এতাদৃশ শো-কজ তার সম্মানের পক্ষে হানিকর। সংশ্লিষ্ট অফিসারকে একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও খাস্তগীর কোম্পানির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে দুঃখবোধ করা ছাড়া তাঁর অন্য কিছু করণীয় নেই...

ব্র্যাঞ্চের ভেতরও পালটে গেছে মুখগুলি। করুণায় তাকায় সহকর্মীরা। সংশয় আর সন্দেহে নির্বাক।

'বারবার, এত করে বলেছি তোমাকে—সাবধান থাকো। বি কশাস...' অ্যাকাউন্টেন্ট বাসুদেব মৈত্র বললেন একদিন—'এই বয়সেই জীবনটা ফাঁকা করে ফেললে?'

'সাবধান আর থাকব কি বাসুদেবদা? ভ্যালিড টিকিট কেটে রিজার্ভড কামরার বাঙ্কে ঘুমোচ্ছি। মাঝরাত্তিরে ট্রেনটা অ্যাকসিডেন্ট করল। মরে গেলাম। ওতে আমার সতর্ক থাকার কি আছে...'

'আমারও তো উনিশ বছরের চাকরি এ-লাইনে। আগে অনেক সময় শুধু মুখের কথায়ও জরুরি কাগজপত্রে সই করে দিতাম। ঠকি নি কখনো! এখন ক্লাস-ফোর-স্টাফ কেউ চায়ের বিল

আনলেও ভালো করে দেখে বুঝেশুনে সই দিই আজকাল। কোলিগদের মধ্যেও অবিশ্বাস...'

ভিজিলেন্সের লোক এল একদিন। ঘণ্টা দেড়েক ধরে হাজার প্রশ্নের লাঞ্ছনা। সাহেবসুবো গোছের তাগড়াই চেহারার আরো কিছু ভদ্রজন অন্য একদিন। কাগজপত্র ফাইল রেকর্ড উথালপাথাল করে ব্যাঙ্কের প্রায় প্রতিটি কর্মীর সাক্ষ্য গ্রহণ।

গোটা শরীরে থরথর কেঁপে উঠল উৎপল—সি বি আই?

একা, ভীষণভাবে একা এক প্রতিহিংসার লড়াই।

শিপ্রার প্রতিবেশী কাকা অখিল জানাকে মনে পড়ল। এককালের রাজনীতির মানুষ। এখন বিষাদ-নিশ্চল কৃশকায় এক বৃদ্ধ। ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের একজন সর্বভারতীয় নেতা তাঁর পরিচিত। ভদ্রলোকের সূত্রে যদি ধরা যায় তাঁকে? দিল্লী বোম্বাই পর্যন্ত যাঁর নাগালের দৈর্ঘ্য।

দ্বিধা তখনও। শিপ্রা জেনে যাবে। শিপ্রার দাদা কাঞ্চনদা? সেখান থেকেই হয়তো মা বাবা দাদা বৌদি কৃষ্ণা।

বুকের মধ্যে ঝড়। সত্যি-সত্যি প্রতারক হয়ে যাবার ভয়। মানুষের স্বপ্ন ভাঙার প্রবঞ্চনা।

নিজেই ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। উন্মাদ-বিভ্রমে সারাদিন। নিজের ব্যাঙ্কের সকল বান্ধব কর্মী বা মাতব্বরদের ছাড়িয়ে অন্যান্য ব্যাঙ্কেরও তাবড় তাবড় নেতা।

'এ-তো ক্রিমিনাল কেস মশাই! জালিয়াতি।'

'সেকথা বোঝাব কাকে? প্রমাণপত্র কোথায়?'

'বোঝাবেন কী! আপনিই তো ক্রিমিনাল।'

'আমি?'

'কাগজপত্র আইন তাই বলবে।'

'ওদের আইন যাই বলুক, আপনারা বিশ্বাস করেন?'

'আমাদের বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে ওদের আইন তৈরি হয় নি...'

'কিন্তু আমার কাছে আজ ওটাই বিশেষ জরুরি। অন্তত আপনারা বিশ্বাস করেন কিনা, আই অ্যাম নট অ্যাজ হোয়াট দে থিংক অব মি...'

'বি. এম. বলল আর দিনের পর দিন একটা অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে গেলেন! কতগুলো চিট আর ডাহা শয়তানকে জালিয়াতির সুবিধে করে দিয়ে এসে আমাদের কোঅপারেশন চাইছেন? সুড উই ফাইট ফর দ্যাট? আপনি কি তাই আশা করেন?'

গোটা শরীরে মোচড় দিয়ে দুঃসহ যন্ত্রণা। পাকস্থলীর তলানি থেকে ক্লান্তি অবসাদে গাঢ় দীর্ঘশ্বাস—'ভুল। সত্যি ভুল। আমার ভুলের জন্যে আমি না হয় ডুবলাম। মরেই গেলাম, ধরুন। কিন্তু ওরা তো থাকছে। থাকবে। ওদের জন্যেই ব্যাঙ্ক আর আপনাদের চাকরি! লেজারে লেজারে ফোলিওর পর ফোলিও উল্টে ওদেরই কোটি কোটি টাকার হিসেবের অঙ্ক কষে যাচ্ছেন আপনারা। মিনার সাজাচ্ছেন। সাজাবেন!'

'ডিউটি!'

'এর বেশি বলার নেই কিছু?'
মধ্যরাতে সামুদ্রিক কলোচ্ছ্বাস নৈঃশব্দ্যের চিৎকার।

তবু, তথাপি বেঁচে থাকা।

অন্ধকারে যেমন, দিগন্তের বিস্তৃতি সঙ্কুচিত হতে হতে গায়ে-গা লেপটে মাখামাখি একাকার। মাত্র সাতাশ বছরের সর্বস্বান্ত যৌবনে উৎপল তার ভবিষ্যতের সুদূর হারিয়ে একা নিদারুণভাবেই একা, গৃহসুখশঙ্কায় পীড়িত হয়ে, যখন, গোপন বাসনার আধার শিপ্রার মোহময় শরীরে, অন্তর্বর্তী জরায়ুর সরোবরে আত্মসুখের প্রতিবিম্ব-কল্পনায় অতর্কিত পাপবোধে নিষ্পিষ্ট—হয় না, হয় না, এ-অসম্ভব...তখনই, বরং মনে হলো, নিজেকে নিংড়ে নিংড়ে নিভৃত আত্মক্ষয়ের মতোই বড় ক্ষণিক, প্রেক্ষিতহীন পৃথিবীর ভালোবাসা

অথবা মূঢ় ভালোবাসা শিকড় পায় না তলানিতে। অন্যায় যুদ্ধের তঞ্চকতায় ব্যূহভেদে অক্ষম নিরস্ত্র অভিমন্যু লড়তে লড়তে, লড়াইয়ের দম নিঃশেষ হয়ে এলে জীবনের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছিলেন পৌরাণিক তারুণ্যে—দৃশ্যমান শত্রু ছিল তাঁর। ভূমিশয্যার লগ্নে অন্তত শেষবারের মতোও অন্তিম ঘৃণাটুকু ছুঁড়ে দিতে পেরেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীদের, যার বিপরীতে, আজ, তার কোনো প্রত্যক্ষ শত্রু নেই। সইসাবুদে নামাঙ্কিত কাগজ, কাগজের পাহাড় শুধু—বিল্‌স্ পার্চেজ লেজার, ড্রয়িং পাওয়ার ফরোয়ার্ডিং রেজিস্ট্রার, স্টক স্টেটমেন্ট ফাইল, রেজিস্টার অব আউটওয়র্ড ইনওয়র্ড বিল্‌স্...কাগজপত্র আলপিনবিদ্ধ হবার প্রক্রিয়াতেই যখন স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে দংশনের যন্ত্রণা, মগজটা চেতনারহিত। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার লেনদেন আর হিসেবের অঙ্কে কোন্ অদৃশ্যলোকে শিল্পোন্নয়ন! স্বদেশ-শ্রীবৃদ্ধির সান্ত্বনায়, নিজেরই অন্বেষণে নিজেকে খুঁজে না পেয়ে যখন অবসাদ—মাথার ওপর ভেঙে পড়তে চায় সিলিংয়ের ছাদ. সঙ্কুচিত হতে হতে গায়ের সঙ্গে লেপটে বিধ্বংসী আততায়ীর জিঘাংসায় চেপে ধরে থাকে বিস্তৃত দেয়ালগুলি। ফাইলের পর ফাইল, লেজারের পর লেজার জমতে জমতে মেঘছোঁয়া স্পর্ধিত স্কাইস্ক্র্যাপার, যার তরাই অঞ্চলে লাখো লাখো মানুষের পদযাত্রায় নিজেকে হারিয়ে. নিজের আবশ্যকতাকে খুঁজতে খুঁজতে, এবং খুঁজে না পেয়ে পরদেশী পরবাসী, সর্বশেষ সাসপেনশনের হুকুমনামা হাতে পৌঁছানোর পর মনে হতেই পারে একসময়—ঘুম

এক ফোঁটা ঘুমের কাঙালপনায় বুড়ো বাপের কী অস্থির দাপাদাপি সারা রাত! বুড়ো স্বপ্ন চায় এখনও সত্তরে। যদি সেই ঘুমই পেয়ে যায় তার সন্তান? মাত্র সাতাশে। স্বপ্নহীন কর্মহীন অনন্ত শয়ান

নিদ্রাভঙ্গে, স্বপ্নে, যেন পাখির গা থেকে স্খলিত পালক, একটা ঠাণ্ডা নরম হাত বিলি কাটে মাথার চুলে। গড়িয়ে যায় কপালে নাকে গালে গলায় বুকে, শিহরিত বুকের প্রবাহে। জেগে-ওঠা আরো একবার, নারীর প্রথম চুম্বনে

মধুময় পৃথিবীর ধূলি। মধুক্ষরা সিন্ধুজলরাশি।

অন্ত্যপর্ব

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু জনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
উটপাখি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আদ্যিকালের দরজাটা সেদিন রাতে পুরোপুরিই ভেঙে ফেলেছিল সবাই। মিস্ত্রি ডেকে নতুন কাঠে সত্যসাধন আবার তাকে তৈরি করেছেন। সেই সুবাদে শুধু ঘরের কলি ফেরানো নয়, হালকা গোলাপী রঙে উজ্জ্বল করা হলো দেয়ালগুলো। জানালায় দরজায় নতুন পর্দা।

সিঙ্গল বেডের একটা খাট ছিল মাঝখানে। সেটা সরানো হয়েছে ওপাশের দেয়ালে ঘেঁষে। মেঝের পরিসর দীর্ঘতর করে ভূমিশয্যার আয়োজন। মা শোবেন রাত্তিরবেলা।

'কেন?'

'একা ঘরে এখন আর রাত কাটানো উচিত নয় তোমার।'

কুঞ্চিত ভ্রূরেখার বিরক্তিটা লেপটে থাকে—'টুনটুনি?'

'কী আর করা যাবে! ও থাকবে ওর মার কাছে। তাই বলে ওঘরে নিয়ে যাওয়া যায় না ওকে। মাটিতে শুলে সর্দিকাশি লাগবে মেয়ের। রাত্তিরে কান্নাকাটিতেও বিরক্ত করতে পারে তোমাকে। ঘুমের ব্যাঘাত হবে। এখন তোমার ঘুমের দরকার। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন...'

মস্ত একটা ঘুম ঘুমোতে চাওয়ার পর যখন আর শারীরিক প্রক্রিয়ায় ঘুম বলে অবশিষ্ট কিছু নেই, গাঢ় ঘন কুয়াশার প্রান্তরে দিগন্তও দৃশ্যমান নয় কোথাও। চারপাশটা খাটো হতে হতে কুঁকড়ে গেঁথে যাচ্ছে নিজের মধ্যে। বসে বসে বৃথা কপাল-চাপড়ানোর ন্যাকামো ছিল না কস্মিনকালে। আজও নেই। ক্রোধ বিক্ষোভের বাষ্পটা ভেতরে ভেতরে আরো বেশি উত্তাপ পেয়ে গেলে বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত আক্রোশ।

শ্মশানেও কোলাহল থাকে। আসলে গোটা বাড়িটাই কদিন ধরে অদ্ভুত এক শবের শরীর। রেডিও বা স্টিরিও স্তব্ধ।

সকালে খবরের-কাগজ এবং তার সান্ধ্য-বিকল্প রেডিও-সংবাদ বাবার বিশ্বজ্ঞান লাভের প্রাত্যহিক নেশা। বৃদ্ধ স্থাণুবৎ নির্জীব।

দরজায় খিল তুলে বৌদি লঘুমাত্রায় টিভি চালিয়ে যাচ্ছেন রোজ। জানে সবাই। শনি-রবিবারে বাংলা-হিন্দী সিনেমার নেশায় একতলা থেকে অবোধ কাকিমারা, খুড়তুতো বোন ছায়া

এবং পাড়ার দুচারজন মহিলা গুটিগুটি ওপরে উঠে এলে সাদরে দরজা খুলে দেন। ভঙ্গিটা এমন, যেন জনগণের দাবিতেই ওদের টিভি।

কৃষ্ণা যায় না। অবশ্যই টিভির প্রতি বীতরাগবশত নয় : দাদা-বৌদির ভোগস্বত্বের মাঝের-ঘরটা সংসারে এক এস্টাব্লিশমেন্টের দুর্গ। এড়িয়ে চলার চেষ্টা। বাবা-মার ঘরটাই ওর নির্দিষ্ট পড়ার-ঘর। সেখানেই নিমগ্নতার ভঙ্গি। ভাস্কর রোজই একবার আসে সন্ধেবেলা। মনে হয়, ওদের প্রেমটাও মূলতুবি আপাতত।

এই হলো এক সর্বনেশে ঘর। বাবা মা মেয়ে—সারাদিন ধরে তিনজনের ঘুসঘুস ঘুসঘুস। এরপর কী হবে? খোকনের এত বড় চাকরিটা আচমকা চলে গেলে ঘরসংসারের ভবিষ্যৎ? বড়ছেলে আর ঘরের-বৌ যদি সংসার থেকে ছিঁড়েই যায়! যেমন ভাবছে ওরা।

তখনই রগরগে একটা রাগ ঝামটা মারে সেরিব্রায়। ক্রোধের মাত্রাটা চড়তে চড়তে একেবারে বয়েলিং-পয়েন্টে। সাস্‌পেনশনের নোটিশ, চিঠিচাপাটির কিছু কপি এবং কাগজপত্র উদাসী ভাগ্যবিধাতা সেজে টেবিলের ড্রয়ারে মরা-মানুষের ডেথ-সার্টিফিকেট হয়ে এখনও বাস্তব এবং হাজতবাসীর তদারকি বা বাবা মা কৃষ্ণার চব্বিশ ঘণ্টার নজরদারিতে ঘরবন্দী থাকতে থাকতে বিষাদে ভাবনায় বিরক্তিতে যখন যন্ত্রণা, একদিন রাতে দুরন্ত বেগে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। মাঝের-ঘর বাদ দিয়ে সরাসরি তৃতীয় ঘরে—'কী ভেবেছ? কী ভেবেছ তোমরা?'

খাটের ওপর হামা দিয়ে স্বামীর জন্য বিছানা গোছাচ্ছিলেন রেণুবালা। চমকে তাকালেন।

কোণের ঘুপচিতে মোড়ায় বসে নিঝুম সত্যসাধন।

টেবিলচেয়ারে মোটা আর ভারি বই খুলে কলেজের পড়া পড়ছিল কৃষ্ণা।

অতর্কিত আক্রমণে সকলেই ভড়কে গিয়ে মনে মনে দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে দুর্বৃত্তের হুঙ্কারে এবং আতঙ্কে যে-যার অবস্থানে স্থির।

'নতুন দরজা লাগানো হয়েছে আমার ঘরে। ভেতর থেকে খিল দেবার ব্যবস্থা নেই। একটা ছিটকিনি-ফিটকিনিরও প্রয়োজন মনে করো নি কেউ। এ-কি মিস্তিরির দোষ? নাকি এ-ও ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন—কোনো প্রাইভেসি থাকবে না ওর। খোলা ঘরে আটকে রাখবেন যদ্দিন পারেন। পোষা কুকুর-বেড়ালের মতো...'

ঘরের নির্বাক মানুষগুলো চোখে চোখ পড়ার দায় এড়াতে চেয়ে অস্বস্তির পাকে। অপরাধী নিজেই যদি অভিযোগকারীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায়!

'ঘরটা বন্ধ করতে না পারলেই আর মরতে পারব না ভেবেছ?' এক তরফা নালিশের নিশানা ছিলেন রেণুবালা। হঠাৎ রাইফেলটা ঘুরে গেল—'কার মগজের বুদ্ধি এটা? তোমার?'

আক্রান্ত সত্যসাধন ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন। বলার কিছু নেই। সংসারে সহস্র সংঘর্ষে সন্তান যদি দুর্বোধ্য জটিল!

উৎপল বীভৎস আরো —'দাড়ি কামাবার ব্লেড আছে তো আমার কাছে। যদি কণ্ঠনালীর শিরাটা টুক করে চিরে দিই? রাতদুপুরে উঠে গিয়ে লাফ মারতে পারি ছাদ থেকে। রাস্তায় বেরিয়ে বাস-লরি, কিংবা ধরো, দমদম কি লিলুয়ায় গিয়ে যদি ঝাঁপ দিই রেলগাড়ির তলায়!

কোন্ ডাক্তার দিয়ে বাঁচাবে আমাকে? জন্মো দেওয়াটা তোমাদের ইচ্ছের ওপর ছিল, আমার মরতে চাওয়ায় ব্যাগড়া দেবার তোমরা কারা?'

কণ্ঠস্বরে বেসামাল উন্মত্ততা ছিল। অফিস থেকে ফেরার পর চা-জলখাবারের সঙ্গে সস্ত্রীক টিভি উপভোগ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে শ্যামল। পেছনে সুনন্দা। উৎপল ঘাড় ফিরিয়ে আধাআধি পর্দার ওপারে দেখল ওদের। পর্দার তলায় বৌদির শাড়ি এবং রবারের শ্লিপারে একজোড়া পা। আমল দিলো না। বাবাকে লক্ষ্য করেই তিরিক্ষি আক্রোশ—'আশি হাজার টাকা ছাড়তে পারবে ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে? চোর জোচ্চোর ছেলেকে বাঁচাবার জামিন এখন আশি হাজার টাকা। পারবে তো বলো...'

'আশি হাজার টাকা পেলেও কি চাকরিটা থাকবে তোর?' পর্দা সরিয়ে স্পষ্ট হলো শ্যামল। পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জিতে ঘরোয়া সাহেব।

'একবার চেষ্টা করা যেত...'

'না, যেত না। এর মধ্যে ভাস্করকে নিয়ে দু'দিন তোদের ব্যাঙ্কে গেছি।'

'জানি।'

'ওটা একটা ব্যাঙ্ক। কোটি কোটি টাকার লেনদেন। এসব ছিঁচকাঁদুনে সেন্টিমেন্ট আর কায়দার কথাবার্তা চলে না সেখানে...'

আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে উৎপল জোর চায় ভাঙা শিরদাঁড়ায়। জামিনে-খালাস একজন মানুষ, আপাতত বুঝে নিতে চায় তার পারিপার্শ্বিক।

শ্যামল সরাসরি চোখ তুলে তাকাল—'মিঃ ধড়িয়া, তোদের নতুন ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার, খুবই ভালো লোক। ভেরি সিম্পেথিটিক। স্পষ্টই তো বললেন—ভিক্টিম অব অ্যান অ্যাবসার্ড সিচুয়েশন। কিন্তু কী করবেন ভদ্রলোক? এখন লাখ টাকা যদি আমাদের থাকতও, আগে হলে, হয়তো কোনো রকমে ধামাচাপা দেওয়া যেত স্ক্যান্ডলটা। কিন্তু এখন আর হঁয় না। তোদের রিজিওনাল হেড-অফিসে ফাইল কাগজপত্তর সব চলে যাবার পর ইম্পসিবল। ইট ইজ এ ডেফিনিট কেস অব ফর্জারি। তোর কোনো দোষ থাক আর না-ই থাক ইউ আর পার্টি টু ইট। এখন আবার এত সব কাণ্ডকারখানার রিপোর্ট পেলে কেসটা আরো এগেনস্টে যাবে...'

মা-বাবা-বোনের বিপন্ন মুখগুলির দিকে তাকিয়ে উৎপল বিষণ্ণ নির্বাক। তাকে বাঁচিয়ে তোলার মানুষগুলো যখন ভিন্নভাবে নিজেরাই মরে গেছে, দুঃখ নয়—ক্রোধ কাঁপে রক্তে রক্তে। শুধু অগ্রজ এখনো প্রাণময় তার নিজস্ব দাপটে।

অন্য প্রান্তে ককিয়ে উঠেছেন সত্যসাধন—'চুরিচামারির মধ্যে থাকবে না তো সুইসাইড করতে যাবে কেন? নির্ঘাৎ একটা ফ্রড। জোচ্চোর বদমাশ। হ্যাঁ, এই তো বলছে লোকে। বলবেই। লোকের আর দোষ কী?'

'প্রিসাইসলি দ্যাট...' দরজার পাশে শ্যামলের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কুণ্ঠিত বহিরাগতের মতো।

মগজের টিপটিপ যন্ত্রণাটা বাড়ছে। ডান হাতে আঙুলের সাঁড়াশিতে কপালটা চেপে ধরে উৎপল খাটে এসে বসল। মার পাশে।

এবং ঘরের বাকি তিনজন মানুষ তাদের একান্ত নিবিড়তায় টিউববাতির নীলচে আলোয়

নিজেদের ছায়াগুলোকে ব্যাগ-ছাতার মতো পাশে রেখে রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হতাশ প্রতীক্ষায়। সুখের গাড়ি ধরতে না-পারার বেদনা। নাগালে এসেও বেরিয়ে গেল।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শ্যামল। দেখল সবাই। সাংসারিক দায়িত্ববোধেই যেন তার প্রবেশটুকু অথবা এবম্বিধ সংক্ষিপ্ত সংলাপ বিশেষ জরুরি ছিল। নচেৎ জ্ঞানকাণ্ডহীন এহেন এক যুবকের খেয়ালখুশিতে বসে বসে মদত দেবার মতো অঢেল সময় বা এনার্জি তার নেই. সেক্ষেত্রে তার দায়িত্বটা গায়ের সঙ্গে আঁটোসাটো স্যুট কোট টাইয়ের মতো নয়। শীতের হালকা চাদর। ঘামে বিরক্তিতে অনায়াসেই ঝেড়ে ফেলা যায়। সুনন্দা তার স্বভাবের নম্রতায় ঘরে প্রবেশ করেনি। দরজার ওপাশ থেকেই ফিরে গেছে।

আশি হাজার টাকা। আ আ আ আশি হাজার! হোমাগ্নি-উত্থিত ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেমন, অনুচ্চারিত নীরব অব্যয়ধ্বনি ধীরে ধীরে গ্রাস করল দশ-বাই-দশ ছোট ঘর। নাসিকায় ধূম্রজনিত ঘ্রাণ নেই। চোখে ঝাপসা আস্তরণ। ড্যালাড্যালা চাউনি ছড়িয়ে ঘরের তিনজন মানুষ একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত শব্দের বিভীষিকায় পরস্পরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকে

মরচে-পড়া লোহার কব্জার মতো বাতিল শরীরটা ভেঙেচুরে থুবড়ে পড়তে চায়। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন সত্যসাধন। পারলেন না। বাঁশ আর বেত দিয়ে তৈরি পুরনো মোড়াটাই গেঁথে যেতে চাইছে পাছার তলায়। সেই যুদ্ধের বছর, উনচল্লিশে মাত্র ষাট টাকা মাসিক বেতনে রেলের চাকরি। তাই দিয়ে ঘরসংসার বিবাহ মাতাপিতৃশ্রাদ্ধ ছেলেমেয়েদের-লেখাপড়া ইত্যাদির পর অবশেষে সাতাত্তরে রিটায়ারমেন্ট। গ্র্যাচুইটি আর ধারদেনায় প্রথমা কন্যা শুভ্রাকে সম্প্রদান। উদ্বৃত্ত ছিল না কোনোদিনই। একটি মাত্র লাইফ-ইনসিওরেন্স থেকে হাজার পাঁচেক পড়ে আছে একটা ব্যাঙ্কে। এখনও ছোট মেয়ে কৃষ্ণা! তারপর প্রশ্ন—কে আগে যাবে? রেণুবালা অথবা তিনি নিজে? নিজেদেরও শ্রাদ্ধশান্তি! ছেলেদের রোজগারে বেঁচে না-থাকার অহঙ্কার

বাইরের দিকে পা ঝুলিয়ে রেখে খাটের উপর উৎপল তার প্রস্তরময়তায়—তাকে ঘিরে তিনজন প্রতিবন্ধী অথবা তিনটি ভূমিলগ্না লতা গুটি গুটি হামা দিয়ে এসে দেহকাণ্ড ধরতে চেয়েছিল একদা। আসলে সে নিজেই উৎপাটিত

আপাত-শান্ত ছেলের গা ঘেঁষে সরাসরি পাখার তলায় বসে দিশেহারা রেণুবালা, অনেকটা, যেন শহিদের মা। যমের দুয়ার থেকে ফিরে-আসা যখন ফিরে না-আসার চেয়েও বড় বিপদ, ঘন নিশ্বাসে হাঁপ টানতে টানতে নিরক্ষর হরিজন গোছের বিহ্বলতায় অপলক তাকিয়ে থাকেন। অর্থ বোঝেন না জগৎসংসারের। নিজের মতো করে একটা সংসার গড়তে চেয়েছিলেন জীবনে। গড়েওছিলেন। কী যে হলো হঠাৎ! বাইরের উৎপাতে উল্টেপাল্টে গেল সব। টাকাপয়সা ছুঁয়ে দেখেন নি কোনোদিন। নির্লোভ সুখে হিসেবের অঙ্কটা তুলে দিয়েছিলেন স্বামীর বুদ্ধি বিবেচনার ওপর। কিন্তু আশি হাজার টাকা! আজ সন্তানের ভাবনায় অঙ্কটা বুঝতে গিয়ে আট শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য...ঘুলিয়ে যায়, সাবান-জলের বুদবুদের মতো শত শত হাজার হাজার শূন্য অস্পষ্ট ছায়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে চোখের পর্দায়। ঠিকমতো সাজাতে পারেন না! তখন অস্থিরতা। হাবুডুবু খাবার পর নিরাপদ ডাঙায় উঠেও বুকের ধড়ফড়।

ডাঙাটাও নিরাপদ নয়। তলিয়ে যান, তলিয়ে যেতে থাকেন

পড়ার টেবিলে কোমর ঘেঁষে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণা। এলোমেলো বুদবুদগুলোকেই যেন গোছাতে চাইল সঠিক সংখ্যায়। সঙ্গোপনে কড়ে আঙুলের গায়ে বুড়ো আঙুলটা বাঁকিয়ে এনে মনে মনে একক দশক শতক সহস্র...এক আঙুলের কড়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যেতে পারত হিসেবটা...কিন্তু হবে না। আশি হাজারের আট চলে যাবে অযুতের ঘরে। ইস। তিনটে শূন্যের মধ্যেই যদি থাকত ব্যাপারটা! কিছু না। কিচ্ছু না। অনায়াসেই ঝামেলাটা চুকিয়ে দেওয়া যেত। বাবা হয়তো একাই পারতেন। দিদির বিয়ে হয়ে যাবার পরও মায়ের আড়াই-প্যাঁচ মাপের আর্মলেট একটা, খালি সোনার চারগাছা চুড়ি আদ্দিকালের

কিন্তু

বুদবুদগুলোই কাতারে কাতারে লাখে লাখে বিন্দু বিন্দু হয়ে শরীরে ঘাম হয়ে জমতে শুরু করল। কণ্ঠনালীটা কামড়ে ধরে থাকে ভয়—দশটা একশো-টাকার নোটে এক হাজার। আশিটা একশো-এ আট হাজার! আশি হাজারের জন্য এরকম কটা একশো? ওরে বাপ্‌স! ছোট খালের এপার-ওপার নদী হলো, নদী সমুদ্দুর! পুরো একটা সমুদ্রের জল আঁজলায় তুলে নিয়ে জীবনের খেসারত!

'আশি হাজার টাকা একটা টাকা নাকি আজকাল!' আচমকা উঠে দাঁড়াল উৎপল। জল থেকে উঠে-আসা হাঁসের মতো গা ঝেড়ে।

মুখের হাঁ তুলে স্তম্ভিত মানুষগুলো নিঝুম। কী হলো ছেলেটার? এখনও কী ঘোর কাটেনি ট্যাবলেটের? নাকি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল? হাসপাতাল থেকে ফিরে কথাই বলছে না আজ প্রায় তিন দিন। বেরোয়ও নি ঘব ছেড়ে! ডাক্তারবাবু বলেছিলেন...

উৎপল খুব লঘুস্বরে—'নন্দদের বাড়ির পাশে, ওই যে পাড়ার মোড়ে ভাঙাচোরা বাড়িটায় গাছপালা গজিয়ে দোতলাটা ভেঙে পড়ছে, মাসতিনেক আগে ভাড়াটেশুদ্ধু ও-বাড়িটাও বিক্রি হয়ে গেল দু লাখ টাকায়। মাত্র দেড় কাঠার মতো জমির ওপর নড়বড়ে কন্‌ডেমড একটা বাড়ি। সেটাও বিক্রি হয়। দুলাখ টাকা দিয়ে কেউ কেনে! এর ওপর রেজিস্ট্রেশন ফি, উকিলফুকিল দালালি হাবিজাবি বাড়তি খরচপত্তর তো আছেই...'

মানে কী এসব বাক্যের? ঘরের স্তব্ধতায় তিন জোড়া বিহ্বল চোখ যখন অর্থ খোঁজে এবম্বিধ প্রলাপের, পেট বুকের তলানি থেকে ঘন নিশ্বাস টেনে তুললেন রেণুবালা—'ওসব গপ্পোগাছা শুনে আমাদের কী? ওদের টাকা আছে, কিনেছে...'

'এগজাক্টলি। ঠিক, ঠিক বলেছ মা। ওদের টাকা আছে, কিনেছে—সহজ সরল কথা! জানো সেসব কী টাকা? কীসের টাকা? কোটি কোটি টাকা কাগজকুঁচির মতো রোজ উড়ছে কলকাতায়। বিশ্বাস করবে? অ্যাদ্দিন চাকরি করে এলাম ব্যাঙ্কে...' যেন জাতিস্মর কেউ, পূর্বজন্মের মানুষগুলোর কাছে নতুন করে ফিরে এসে শুধু কথা...শব্দের বুদবুদে উদভ্রান্ত যুবক—'তোমরা যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা মানো, উপোস করো, পুজোআচ্চা দাও, ওরাও মানে সেসব। ওদের প্রফিটঠাকুরের পুজোয় পূর্ণিমার চাঁদি, অমাবস্যার কালো...'

মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

সকলেই একবার তাকাল মাত্র।

'ওসব কথা বলে আর লাভ কি বাবা। বেশ ভালো করেই কপাল পুড়েছে আমাদের...' ভাঙা গলায় থামলেন রেণুবালা। কোমর ঘেঁষড়ে খাট থেকে নামতে নামতে—'চাকরিটা থাকবে তোর?'

বেরিয়ে যাবার দরজাটা ছুঁয়েছেন সত্যসাধন। পেছনে না তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। যেন দৈববাণী শুনতে চান পশ্চাতে। বাবা এবং মায়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে উৎপল তার নিজের ঔদাসীন্যে। জানে না পক্ককেশ অবোধ শিশুরা, পৃথিবীর পরিমাপ কত? এত বড় ভারতবর্ষে, বিশাল ব্যাঙ্কিং-সিস্টেমে উৎপল দাশগুপ্ত, তাঁদের সন্তান, অণুকণা। ভেতর থেকে চাগিয়ে ওঠা একটা গাঢ় নিশ্বাসে শরীরে মোচড় খেল সে—'জানি না। অনেক কিছুই ঘটবে এখন। পুলিশ আসবে বাড়িতে, কোর্টটোর্ট পর্যন্ত গড়াতে পারে। হয়তো হাজতেও যাব...'

কাতরতায় অবোধ চোখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন রেণবালা। নিশ্বাস, নিলেন—ঠাকুর, আর কত শাস্তি জীবনে!

'চাকরি নয়। টাকা চাও? এনে দিতে পারি। কলকাতায় অঢেল টাকা...' উৎপল মায়ের দিকে তাকল—'না, ভয় নেই। সাট্টা খেলব না প্রতাপ শিবাজী বাসুদের মতো। সিনেমার টিকিটও ব্ল্যাক করতে যাচ্ছি না। ননব্যাঙ্কিং ইন্‌সিওরেন্স বোঝো? হাজারগণ্ডা চিট ফান্ড আর ইন্‌ভেস্টমেন্ট কোম্পানি গজিয়ে উঠছে রোজ। এজেন্ট হবো! বছর দুয়েকের মধ্যেই ফিল্ড অফিসার। থার্টি থার্টি-ফাইভ চাই-কি তারও বেশি ইন্টারেস্ট। টাকা, টাকা মানে? মানি গ্রোজ রাউন্ড দ্য ক্লক! তোমাদের মতো ভালোমানুষদের টুপি পরিয়ে যেতে পারলে কলকাতা শহরে টাকার অভাব? ইংরেজি জানি। সুবিধে কত...'

ভয়ের চোখে সাড়া নেই কৃষ্ণার। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—সাইকিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করবেন ঘরে ফিরে যাবার পব। হয়তো তারই উপসর্গগুলি!

এবং যখন কান্নাও নিঃশেষ, যেন অনেক কালের রুগ্নতা থেকে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় রেণুবালা—'কী হয়েছে তোর? বাজে বকছিস কেন অত?'

'বাজে কথা নয় মা...' উৎপল শান্তভাবে পূর্ববৎ—'আরো কত কী আছে এই আজব শহরে! বাস মিনিবাস ট্যাকসি সিমেন্ট হ্যানোত্যানোর পারমিট। লাখ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট...'

দরজায় পর্দার কাঁপুনিতে বোঝা যায়—বাইরে কারা! হয়তো সত্যসাধন কিংবা শ্যামল সুনন্দা সকলেই। রেণুবালা বেরোতে চাইলেন। শ্লথ বিষাদ টেনে এগোতে এগোতে—'কী জানি বাপু, তোর বাবার কেরানির চাকরিটাই ছিল ভালো। অভাব ছিল, দুঃখু ছিল না। তোদের নিয়ে যাহোক দুটো ডালভাতে নিশ্চিন্তে ছিলাম। নে, চল্, খেতেটেতে হবে তো এখন! নটা বেজে গেছে...'

ঘরটা ফাঁকা হয়ে যেতেই টেবিলের ওপর খোলা বইয়ে চোখ ফেলল উৎপল। অকারণেই গোটাকয়েক পাতা ওল্টাল আঙুল ঘষে। স্নাতক শ্রেণীর পদার্থবিদ্যা। দুর্বোধ্য জটিল সব ছবি। কালো কালো গুটি গুটি মুদ্রিত অক্ষর শব্দ বর্ণমালা!

কৃষ্ণা তাকিয়ে থাকে। পিঠের ওপর ঘরের আলো রেখে নিজেরই ছায়ায় বইটা বুকে তুলে নিয়ে কি দেখছে মানুষটা! তাকিয়ে থাকতেও কেমন ভয় হচ্ছে তার। ডাঃ ভাদুড়ী বলেছিলেন...

বইটা ছুঁড়ে ফেলে বোনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল উৎপল—'মনে নেই তোর? এই সেদিন, মাস দুয়েক আগে গয়নার বাকসোটার গল্প বলেছিলাম তোদের। বোঝ্ তাহলে টাকা! মাথা ঘুরে যায় শালা ভাবলে—দামি দামি পাথর বসানো জড়োয়া গয়না সব বেওয়ারিশ...'

কৃষ্ণা শান্ত ভঙ্গিতে, নিস্পৃহতায়—'সে-কি! ওটা কেউ এসে চায়নি এখনও?'

'আমি যেদিন পর্যন্ত শেষ অফিসে গেছি, কেউ আসেনি। এল কি এল-না, বড় কথা নয়। আশি নব্বুই হাজার টাকার প্রপার্টি স্রেফ ফেলে রেখে গেল। তার পরও অ্যাদ্দিন ধরে আন্‌ক্লেমড...'

ঘর ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে উৎপল। কৃষ্ণা তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ সেই গয়না-বাকসোর প্রসঙ্গ কেন? কী সব আবোলতাবোল!

একদা দ্বিপ্রহরে

বেলা প্রায় বারোটাই হবে তখন। হয়তো মিনিট পাঁচ-দশ বেশি। একজন ভদ্রমহিলা এলেন। লকার খুলবেন। রেজিস্টারে তারিখ লিখলেন। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সময় এবং লকার নাম্বার। সইসাবুদ মিলিয়ে কাস্টডিয়ান বনদেব কুশারী পেল্লাই চাবির গোছা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভল্ট-এ কেউ ছিলেন না। মহিলার লকারে মাস্টার-কী সরিয়ে তাঁকে লকার খুলতে দিলেন। বেরিয়েও এলেন। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসেছেন মাত্র। হেডলি চেজ-এর পাতায় পেজ-মার্ক হিসেবে ট্রামের টিকিট গোঁজা ছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার মৌতাতে ডুববেন, এমন সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই মহিলা একেবারে সামনে। হেডলি চেজ-এর পাতা থেকে উঠে আসা জ্যান্ত আতঙ্কিত নায়িকা থরথর কাঁপছেন।

'কী হলো?' দ্রুত বই বন্ধ করে বনদেবও ভ্যাবাচ্যাকা।

'আসুন। দেখুন এদিকে...'

লকার খোলার পর ভদ্রমহিলা অদূরবর্তী একটা ট্রলি টানবেন বলে এগিয়েছিলেন। পেছন থেকে টানতেই শিহরিত হবার মতো এক ভয়াবহ দৃশ্য, যার মুখোমুখি বনদেব কুশারীও কিংকর্তব্যম্ সঙ্কটে দিশেহারা।

মাঝারি ধরনের একটা শৌখিন বাকসো। উন্মুক্ত দ্যুতিময় স্বর্ণালঙ্কার অগুনতি। ঝলসানো চুনি পান্না হীরে, আসল অথবা নকল প্রশ্ন উঠতে পারে, সোনাগুলোর ফাঁক নেই। অনেক অনেক সোনা। রূপকথার গল্পের ঘড়াভর্তি মোহর আচমকা!

জনশূন্য সেফ-ডিপোজিট ভল্টের চার-দেয়াল ঘিরে মৌচাকসদৃশ খোপে খোপে কাস্টমারদের গোপন সম্পদ। 'ওপেন সিসেম'-এর মন্ত্র জানা নেই। রত্নরাজি নাগালে পেয়েও সন্ত্রস্ত দুই পুরুষ রমণী। ভাগাভাগি বখরায় এসে যেতে পারতেন অনায়াসেই। নির্বোধ নিতান্তই। ত্যাগের মহিমা নেই, লোভে কাপুরুষ।

তড়িঘড়ি বেরিয়ে এলেন বনদেব। দারোয়ান ডেকে কলাপসিবল গেট আটকে দিলেন

নিজের দায়িত্বে। খবর পেয়ে ছুটে এলেন ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার গঙ্গাপ্রসাদ ধড়িয়া। ব্যাঙ্কের পিক আওয়ার। নিঃশব্দে দেখলেন সব কিছু। কোনো রকম হল্লা তুললেন না। টেলিফোন করলেন লোকাল থানায়। বিশ্বস্ত দুজন সহকর্মীকে পাঠালেন বাইরে—আশেপাশের দোকানপাট থেকে দায়িত্বশীল দু-চারজনকে, দোকানের মালিক হলেই ভালো হয়, ডেকে আনার অনুরোধ। অদূরবর্তী স্কুলের হেডমাস্টারকে অনুগ্রহপূর্বক পদধূলিদানের মিনতি জানিয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন এবং প্রতীক্ষমান কয়েকজন লকার-কাস্টমারের কাছে ঘোষণা—'ভল্ট অপারেশন ইজ ক্লোজড ফর রেস্ট অব দ্য ডে। রিজন নট টু বি ডিসক্লোজড।'

পুলিশ এল। ডায়েরি করা হলো। আমন্ত্রিত মান্যজনদের উপস্থিতিতে রত্নরাজির তালিকা প্রস্তুত হলো। এক জুয়েলারি দোকানের বিশেষজ্ঞ মালিককে দিয়ে মূল্য নির্ধারিত হলো—আনুমানিক ছিয়াশি হাজার টাকা। সকলের সাক্ষ্যে ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার মিঃ ধড়িয়া বাকসোটা তুলে নিয়ে এলেন স্ট্রংরুমে, নিজের হেফাজতে।

বেলা বারোটা দশ মিনিট পর্যন্ত সেদিন যত কাস্টমার লকারের জন্য তাঁদের স্বাক্ষর নথিভুক্ত করেছিলেন, ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজারের নামে চিঠি লেখা হলো প্রত্যেককে—'প্লিজ কাম শার্প অ্যান্ড সি দ্য আন্ডারসাইনড ইম্‌মিডিয়েটলি...'

এলেন সকলেই। শুধু একজন ছাড়া।

যাঁরা এলেন, নিজেদের লকার পরখ করে গচ্ছিত ঐশ্বর্য-সংক্রান্ত নিশ্চয়তা রিপোর্ট করে গেলেন। যিনি এলেন না, ঘটনার আট সপ্তাহের মধ্যে তাঁর কোনো সন্ধান ছিল না। অর্থাৎ সাসপেনশনের নোটিশটা উৎপলের হাতে পৌঁছনোর আগের দিন পর্যন্ত কোনো দাবিদার এসে জানান নি—সমুদয় অলঙ্কার তাঁর। তিনিই মালিক।

প্রথম দিন ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করার সময়ই মা বাবা বোন বৌদির বিস্ময়ের চোখে পরতে পরতে রঙ বদলানোর মুহূর্তে আস্তে আস্তে নিজেই থিতিয়ে এসেছিল উৎপল। অথবা বলা ভালো, ঘন কুয়াশার গভীরে তখন থেকেই হারিয়ে যেতে শুরু করেছিল সে-যুবক।

এবং আজ, চাকরি খোয়াবার পুরো কাণ্ডটা খোলামেলা হয়ে যাবার পর, জীবন নৃত্যের তালভঙ্গে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে অনায়াসে ভাবতে পারে—লটারির টিকিট সে জীবনে কেনেনি, কদাপি কিনবে না এবং সুইসাইড ব্যাপারটা সত্যি খারাপ। বেঁচেবর্তে ফিরে আসার দুর্ভাগ্য আরো বেশি উৎকট। এর পর বাকি জীবন শুধু বোনাসে বেঁচে থাকা।

ঘুমের আগে একটা বই বুকে নিয়ে খাটে চিৎ হয়ে থাকাটা তার পুরনো অভ্যাস এবং যখন, রাত গভীর হলে বগলে মাদুর-চাদর-বালিশের পাটিসাপ্টা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন রেণুবালা, পেছনে কৃষ্ণা, বইয়ের ওপরই চোখ রেখে উৎপল টেরিয়ে তাকাল একবার। কোনো শব্দ নেই।

শহরেব বিপুল নৈঃশব্দ্যে ছোট্ট ঘরটুকুর বোবা নিশুতিই তখন ভয় কাঁপায় ভিন্ন বয়সের দুই রমণীর বুকের খাঁচায়। স্থিরপলকে তাকিয়ে থাকে দু-জোড়া চোখ—হাসপাতালের খাট নয় ওটা। কিন্তু অদ্ভুত নিঝুমে সেখানেই শায়িত একজন মানুষ। খেঁকিয়ে উঠতে পারে এক্ষুনি। কিংবা যার পাথর-মূর্তিটা ভয়ঙ্কর আরো। ডাঃ ভাদুড়ী, অত বড় একজন ডাক্তারই যদি বলে থাকেন—সাইকিয়াট্রিস্ট...

বিস্ময়ের চোখজোড়া যখন তারই দিকে নিষ্পলক, উৎপল লাফিয়ে উঠল খাট থেকে। শক্ত নতুন কাঠও ককিয়ে উঠল। শব্দটা যন্ত্রণার। যন্ত্রণাটা বুকে, সজীব হাড়পাঁজরে। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওপাশের জানালাটার দিকে, যেখান থেকে রাস্তার ঢালুতে খাড়াখাড়ি নেমে গেছে বাইরের দেয়ালটা। নিচু চোখে রাতদুপুরের নির্জন রাস্তা ফুটপাথ, নিঃসঙ্গ লাইটপোস্ট। কলকাতা ঘুমোয় 'সেখানে। মুখোমুখি বাড়ির কোণের ঘরে এখনও আলো! মাস ছয়েক আগে পাড়ারই মেয়ে মুনিয়াকে বিয়ে করেছে ছোটন! একই বয়েসী, ছেলেবেলার বন্ধু উৎপলের। এখন কাছে ঘেঁষতেও ভয়। কী যেন সব দুর্বোধ্য কাজকর্ম করে বেড়ায় ছেলেটা। সবটাই ঘোলাটে। সাজসজ্জায় চলনে-বলনে মাতব্বর। ফিল্‌ম্‌ লাইনে অনেককেই চেনে জানে বলে ইজ্জত খোঁজে পাড়ায়।

পিছু ফিরল সে। কৃষ্ণা চলে গেছে। ছেঁড়া পাটিতে যেমন-তেমন একটা চাদর পেতে মেঝেতে শুয়ে পড়েছেন মা। মাথায় ছোট বালিশ। শাঁখাসিঁদুর আর লাল-পাড় শাড়িতে মায়ের কৃশ শরীরটা, সুখবিলাসশূন্য সংক্ষিপ্ততম শয়নভঙ্গি, হয়তো অকারণেই তাকে বিদ্ধ করে। ঘুমোয়নি বুড়ি। এ-এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা। অবশ্যই জেগে থাকবেন সারারাত। নজরের সীমানায় রাখবেন ছেলেকে। কথা থাকবে না! দুর্ভাগ্য তাঁর—বিশ্বাসঘাতক সন্তানকে কুলাঙ্গার বলতেও অক্ষম। কেননা তস্করতা প্রমাণিত নয় এখনও।

মায়ের সমান্তরালে গৃহের প্রান্তবর্তী সিঙ্গল-বেড খাটটার দিকে তাকিয়ে থেকে রাতদুপুরে একটা সিগারেটের কথা ভাবল সে। রঙিন চাদরে, রঙ মেলানো বালিশের ঢাকনায় পরিপাটি করে বিছানাটা সাজিয়ে রেখেছে কেউ—মা অথবা কৃষ্ণা। অথচ এই খাটটাই স্মৃতিময় হয়ে উঠতে পারত ওদের কাছে। কিন্তু হয়নি। বিশাল ভূমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ এই শয্যায় পৃথিবীটা সঙ্কুচিত হতে হতে কফিন গোছের একটা কিছু হয়ে ওঠার পর ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেদিন। হয়তো ভুল। বিচ্ছিরি ধরনের একটা হেরে-যাওয়া বা নিরর্থকের মাশুল মেটাতে যদি তার নতুন করে ফিরে আসা!

গোটা শরীর নিংড়ে বুকে পেটে মগজে গাঁটে গাঁটে কাঁপুনি তুলে দুঃসহ খিঁচুনি। যেন মনে করা যেতে পারে, এই মুহূর্তে ঘরটা সর্বৈব ফাঁকা। কেউ নেই। মায়ের কাছে ধূমপানের অনুমতি আছে বলেই নয়, অবোধ শিশুর অতিরিক্ত কিছু ভাবাই যাচ্ছে না ভদ্রমহিলাকে। 'আমার সোনার সংসার কেন ভাঙল'...ছিঁচকাঁদুনি ন্যাকামি বা মন্দিরে-মন্দিরে পাথরে মাথা ঠুকে চিল্লানোর মূর্খতাকে নিয়ে আপাতত এর বেশি কিছু ভাবা যাচ্ছে না নিজেরও ক্লান্ত স্নায়ুক্রিয়ায়।

সুইচটা টিপে দেবার পর ঘরের অন্ধকারে হাতের সিগারেট জোনাকির মতো জ্বলে। খাটটার দিকে এগোয়। যেহেতু আজন্ম পরিচয়ে নিজেরই ঘর, পা ফেলতে বিঘ্ন নেই। অথচ সুবিপুল অন্ধকারটাই এখন সত্যি। একমাত্র সত্য। আহ্নিকগতি বার্ষিকগতির বিধানে পুরনো পৃথিবীটা একইভাবে সচল এখনও। সাসপেশন নোটিশ ভ্যালিড।

নতুন করে আর কোনো ক্রোধও উদ্দীপিত নয় শরীরে। মস্তিকের কোষে কোষে অনভূতিগুলি ভোঁতা এবং নির্জীব। অথচ এখন সে তার দেহের প্রতিটি প্রত্যন্তকে উপলব্ধির গাঢ়তায় চেনে জানে। অস্তিত্বের গাঢ় অনুভবে যেন স্পর্শ দিয়ে পরখ করে নিতে পারে রক্ত

চলাচলের প্রতি অণুকণা। চোখ বুজলে নিজের গভীরে নিজেরই এক শান্ত মূর্তি। হাতে পায়ে নখকণায় বাতাস ছুঁয়ে গেলে কম্পিত শিহরন। ফুল-স্পিড পাখার তলায় ঝাঁকড়া চুলে ঝড় উঠলে আলাদাভাবে চেনা যায় প্রতিটি কেশরেণু। লার্গাকটিল ফিফটি এম. জি. কী এক সাংঘাতিক দাওয়াই! এভাবে জীবন চেনায়!

যদি নিদ্রাহীন, তবু নিঃশব্দে এসে সে তার শয্যায় বসল। যেখান থেকে এই ঘুটঘুট্টি অন্ধকারেও সে তার ঘরের দেয়ালগুলি কড়িবরগা বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে, এমন কি, সহবাসের পতঙ্গগুলিকেও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। সঙ্কুচিত খাটটা আস্তে আস্তে একই সঙ্গে আবার দিগন্ত পেয়ে যাচ্ছে। ঘরের দেয়াল ভেঙে আজন্ম-সংলগ্ন মানুষগুলির মুখ বা সংসার ডিঙিয়ে একদা-ঘনিষ্ঠ প্রাচীন কলকাতায় ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘর। কলকাতার বাইরে, নিতান্তই টিকে থাকার স্বার্থভাবনায়, আপাতত যেখানে তার কোনো পৃথিবী নেই।

ঘরটা হাসপাতাল হলো কিংবা জেলখানা। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে স্পষ্ট অনুভব —এ-বাড়িরই অন্য এক ঘরে লার্গাকটিল খুঁজে বেড়াচ্ছে আরেক বুড়ো। এখন তো খোলাখুলিই জানে সবাই—শুধু প্রেসক্রিপশনটাই নয়, পুরোপুরি ঘুমটাই কেড়ে নিয়েছে তার অতিশয় শিক্ষিত সুযোগ্য সন্তান।

সাতসকালে মাজা-বাসনগুলো নিয়ে বাসুর-মা ওপরে উঠে এল। তারপরই ঝড়।

দোতলায় একটা সঙ্কীর্ণ বাথরুম আছে ঠিকই, কিন্তু গোটা বাড়ির প্রয়োজনীয় জলের আধার একতলার ওই বড় চৌবাচ্চাটাই। সেখানেই, খোলা জায়গায় সাকুল্যে তিন পরিবারের বাসন-মাজা কাপড়কাচা পুরুষদের স্নান। সকালে বিকেলে কিছুটা সময়, বিশেষত প্রভাতবেলায় স্থানটা ভয়াবহ। বিবিধ ধাতবধ্বনির সুরসঙ্গতে নারীকণ্ঠের কাকলি। কুব্জপৃষ্ঠ নিম্নকেরানির সংসারে ঝি-চাকর পোষার বাড়তি বিলাস থাকে না। নিজেদের এঁটো বাসন নিয়ে পাশাপাশি বসে যান হরিসাধন শিবসাধনের স্ত্রীরাই। কখনও কখনও মায়ের বিকল্পে শিবসাধনের অষ্টাদশী কন্যা ছায়া। তখনই কথাবার্তা, বিবিধ আলাপন। পাড়ার গেজেট বাসুর-মা। বিভিন্ন গৃহস্থঘরের বা পাড়ার হরেক সংবাদ সে পাখির মতো ঠোঁটে বয়ে নিয়ে আসে এবং শ্রুতিবিলাসী রমণীরাও এতাদৃশ সংবাদ সংগ্রহে বিশেষ প্রীত হন।

কিন্তু বড়ই সরস ঘটনা, এখন, এ-বাড়ির ভেতরই। দোতলার পয়সাওলা বাবুদের সংসারে। আজ কদিন ধরেই বাসুর-মা নিতান্ত কাতর—'আহা গ, ছুট দাদাবাবুর মতন অমন সুন্দর এট্রা মানুষ! তাঁর কিনা এমনধারা ভিমরতি! পয়সায়ও সুখ নেই গা! নইলে সাধ করে মরণ চায় অমন জোয়ান ছেল্যা?'

বাসনপত্র নিয়ে বারচারেক ওপর-নিচ করতেই হয় বুড়িকে। দ্বিতীয় কিস্তির থালা গ্লাসবাটি রান্নাঘরের মেঝেতে রেখে ফিসফিসিয়ে বলল—'কী সব আকতাকুকতা হচ্চে গ মা! আপনার জায়েদের মুখেই ত শোনলম। ছুটকাকাবাবু বলচে...'

মেঝেতে বসে আনাজ কুটছিলেন রেণুবালা। ফিরে তাকালেন।

'হ্যাঁ গ মা। ছুটকাকাবাবুর ঘরে বলাকওয়া কচ্চেন সব্বায়—এট্টা কিছু নিচ্চয় করেচে ও-ছোঁড়া! চুরিচামারি না কব্বে ত বিষ গিলতে যাবে কেনে অমন তাজা বয়সের মরদ ব্যাটা? বেঙ্কের চুরি! ওখেনে কি কোনো বাপ-মা আচে ট্যাকার? ভালররকম দাঁ-ই মেরেচে ছোঁড়া। ভাবচ, আইনকানুন নেই দেশে! ধম্মো নেই? টিভি আর ফিরিজের ঠাণ্ডা জল এবার রক্তামাশায় বেরুবে পোঁদ দিয়ে..'

সারাক্ষণের গৃহভৃত্য বা কাজের লোক ময়না চলে যাবার পর এখনও বিশ্বস্ত নতুন কাউকে যোগাড় করা যায়নি বলে সকালের দিকে সুনন্দাকে আসতেই হয় শাশুড়ির সাহায্যে। ভাতের-হাঁড়ি নামাবার উদ্যোগ তখন। দুহাতের ন্যাকড়ায় হাঁড়িটা ছুঁয়েও সে থমকে গেল। খুবই সংযত লঘু গলায়—'যে যা-খুশি বলুক, তোমার তো ওসবে কান দেবার কথা নয় বাসুর-মা। তুমি তোমার কাজ সেরে চলে যাবে...'

'আমি কি-আর আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেছি গা বৌদি। ওনারা বলাবলি কচ্চেন, তাই শুনে খারাপটা লাগল বলেই না...'

বঁটিটা দেয়ালমুখো কাত করে রেখে উঠে দাঁড়ালেন রেণুবালা—'তুমি ভাতটা নামাও বৌমা, আমি আসছি এক্ষুনি...'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

কাউকে কিছু না বলে, একাই ওপর থেকে নিচে নেমে এলেন রেণুবালা।

কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি আক্রমণ—'আমার সংসারে কী হয় না-হয় তাই নিয়ে গপ্পোগাছা গাইলে কি তোমাদের সম্মান বাড়ে ঠাকুরপো? থুতুটা নিজের গায়ে লাগে না? একই বাড়িতে আছো যখন...'

কলতলায় উবু হয়ে বসে দাঁতে গুড়াখু ঘষছিলেন শিবসাধন। বাঁকা চোখে তাকালেন।

লালায় লালায় গা-ঘুলোনো নোংরা আর বিচ্ছিরি লোকটার মুখ আর ডানহাতের তর্জনী। রেণুবালার ভ্রূক্ষেপ নেই—'আমার ছেলে চোর হয়, ডাকাত হয়, বিষ গেলে কি খুন করে তাতে তোমাদের যখন দুঃখুফুখ্খু কিছু নেই, চুপ করে থাকলেও তো পারো। কেচ্ছাকেলেঙ্কারি তো তোমাদেরও কম নয় কিছু! দশ গলা করে আমার ঘরের কেউ তো কখনও বলতে যায় নি সেসব...'

নারীশক্তির অপার মহিমা। গোটা দুনিয়ার ওপর অপ্রতিরোধ্য ক্রোধে খিটখিটে মানুষ শিবসাধন বিনাবাক্যে এত কথা হজম করার লোক নন যদিও, কিন্তু চুপসে গেলেন। লাল লুঙ্গির গিঁট বাঁ-হাতে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালেন নিঃশব্দে। ভাবনাটা তাঁরও—কাল রাতে কথায় কথায় মনের কথা খোলসা করে বলে ফেলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু প্রশ্ন, ঘরের গোপন চিন্তা এই সাতসকালে ওপরে গিয়ে পৌঁছোল কী করে?

একই কারণে চিন্তিত হরিসাধনের গিন্নি যমুনা। কেন না, কাল রাতের ঘরোয়া কথাবার্তার সারটুকু তিনিই আজ সকালে বেমক্কা তুলে দিয়েছেন বাসুর-মার কানে। কিন্তু ও-মাগী যে এরই মধ্যে দশ-কান করে একটা প্রলয় বাধিয়ে তুলবে, জানা ছিল না বলে এখন ভোগান্তি তাঁরই।

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে বিপদ তাঁর ঘরে-বাইরে। স্বামীটা তাঁর বড়ই নরম। বড়দার বাঁধুক।

এবং ওপরে, পয়সাওলাদের ঘরে আরো বেশি আপনজন হয়ে ওঠার তাড়নায় তখনও চাপা গলায় গুমরে মরছে বাসুর-মা। বাসন-মাজার পরও তাকে ঝাড় দিয়ে ভেজা-ন্যাকড়ায় নিকোতে হবে তিনটে ঘর। মশলা বেঁটে যেতে হবে। অর্থাৎ আরো বেশ কিছু সময় থেকে বাবুদের হুজ্জুতিটা সে পুরো বুঝে যেতে চায়।

ওদিকে একতলার হট্টগোলটা তখন চরমে। ভিড় করে বেরিয়ে এসেছে সকলেই। রেণুবালা অগ্নিময়ী। বয়স সম্ভ্রম সব ভুলে তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো আরো বেড়ে যেত। ওপর থেকে নেমে এসেছে কৃষ্ণা-সুনন্দার সঙ্গে শ্যামল। মাকে সে টানল রাগের ঝাঁঝে—'হচ্ছে কী? করছ কী তুমি? এটা কি ভদ্রলোকের বাড়ি না অন্য কিছু! সকাল থেকে চেঁচিয়ে যাচ্ছো গলা ছেড়ে?'

বেরিয়ে এসেছেন হরিসাধন। সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে ডাকাবুকো প্রতাপ শিবাজী। কৃষ্ণা সুনন্দা জোর করে রেণুবালাকে দোতলায় তুলে নিয়ে যাবার পর শ্যামল তাকাল মেজোকাকার দিকে—'ঘটনাটা যা ঘটেছে, সে-তো আর অতটা সহজ সরল ব্যাপার নয় কাকা। সাদামাটা বিষয়ও না। সব কিছু খুলেও বলা যায় না সবাইকে। ওসব না জেনেশুনে, না বুঝে কেন ঝামেলা পাকাচ্ছেন অনর্থক? এমনিতেই অশান্তির শেষ নেই। তার ওপর আপনারাও যদি ঘরের মানুষ হয়ে...'

'আরে না না...' শিবসাধন অবশেষে কিছুটা সাফাই গাইবার চেষ্টায়—'আমি ওসব বলিনি। বিশ্বাস কর্। তোর মা কোত্থেকে কী সব শুনেছেন...'

'কিছুই বলেন নি? তাহলে মা তো আর বসে বসে বানান নি কথাগুলো?'

স্পষ্ট কোনো জবাব নেই অভিযোগের। সংসারজ্বালায় ক্লান্ত মানুষ শিবসাধন অক্ষম ক্রোধে নত হতেও বীতশ্রদ্ধ। অম্লপিত্ত শ্লেষ্মা কোলাইটিস প্রভৃতির যাবতীয় গণ্ডগোলে বিষাক্ত শরীরটার মতোই যখন জীবন দুর্বিষহ, গায়ের ঝাল মিটিয়ে বেশ দুচার কথা শুনিয়ে দিতে তিনি অবশ্যই পারতেন। কিন্তু সাহস হলো না। অত বড় ইঞ্জিনিয়ার ভাইপোর সামনে মুখ ফসকে হঠাৎ কিছু বলে ফেললে আরেক বিপদ—ওদের অনেক টাকা।

ক্রুদ্ধ শ্যামল আরো কিছু বলতে চেয়েছিল হয়তো। থেমে গেল। বাজারে গিয়েছিলেন সত্যসাধন। দুহাতের ব্যাগে আনাজপাতি আর মাছের থলে নিয়ে ভেতরে ঢুকেই হৈ-হল্লায় স্তম্ভিত এবং তাঁর প্রবেশে গলা-উঁচোনো মানুষগুলো যে-যার মতো মিইয়ে এল। আলাদা উনুন হলেও পরিবারের জ্যেষ্ঠতম এবং কার্যত গৃহকর্তা। পুরো বাড়িটা তাঁরই নামে এবং ভাড়া হিসেবে অনুজ দুই ভ্রাতাকে যৎসামান্য যা দিতে হয়, তাতে একটা বস্তিঘরও জোটে না এ-বাজারে।

'থাক বাবা, থাক। ঘরে যা...' মধ্যস্থতায় এগোলেন মেজোকাকা হরিসাধন—'নিজেদের নিজেদের মধ্যে ব্যাপার। এ-রকম কিছু তো হবার কথা নয়। তবু হয়। হয়ে যায়। জানিসই তো সব...'

শ্যামলের সঙ্গে পায়ে পায়ে হরিসাধনও উঠে এলেন ওপরে। সামান্য সওদাগরি আপিসের ছোট্ট কেরানি! অহমিকার কিছু নেই। বরং প্রতাপ শিবাজী—অপগণ্ড দুই ছেলেকে নিয়ে বড়ই দুঃখী মানুষ। সেক্ষেত্রে বড়দার দুই ছেলের সাফল্যে প্রচ্ছন্ন গর্ব তাঁর। দশজনের কাছে বড় মুখ করে বলার মতো দুটি রত্ন এবং সেখানেই রাগ বা গা-পোড়ানি জ্বলুনি শিবসাধনের। লেখাপড়া খুব বেশি শেখেন নি। একটা সিনেমা হলের চাকরি। টর্চ জ্বেলে দর্শকদের আসন নির্দেশ করেন। কোনো রকমে চলে সংসারটা। সইতে পারেন না দোতলার বড়মানুষী। মানুষের যত সুখ আর ভাগ্যি, সবই কেন পাবে ওই একা একটা লোক? বড়দা!

কিন্তু এতাদৃশ ঘটনার প্রতিক্রিয়া, বলা বাহুল্য, খুব সহজে নির্বাপিত হবার নয়। রেশ একটা থেকেই যায়। যেহেতু আজ রবিবার এবং বিষয়টাও নেহাৎ মামুলি ভাড়াটিয়া বিবাদ নয়—জ্ঞাতিকলহ, দোতলায় নানাভাবে তার গুঞ্জরণ চলতেই থাকে। প্রধান ভূমিকায় হরিসাধন। দাদা-বৌদির সমর্থনে তাঁর বক্তব্য—শিবু চিরটা কাল এ-রকম। স্বার্থ ছাড়া বোঝে না, বুদ্ধিতেও খাটো। দাদার কাছে আছি আমরা। কত বড় বলভরসা আমাদের। তা নয়, তাঁরই শত্তুরতা? এমন দুদ্দিনে তাঁরই ছেলে, তোর নিজের ভাইপো...ওর নামে বদনাম গেয়ে বেড়াচ্ছিস তুই? এ-যে তোর নিজের গায়েই লাগে রে মুখ্যু। ও তো তোরও ছেলে। এক বংশের সন্তান...

বিবিধ সংলাপ গুঞ্জন সত্ত্বেও সকলেরই মনোযোগ ছিল অন্যদিকে। যে-অর্বাচীন যুবার জন্য এত তোলপাড়, এত কাণ্ড, সে কোথায়? বিছানায় শুয়ে থেকেই বেড-টি চলে বাবুর। সাহেবমানুষ। তারপরও আলসেমিতে এপাশ-ওপাশ কিছুক্ষণ। নিশ্চয় এত হল্লা-চিৎকারের সব কিছুই সে শুনেছে। আশ্চর্য! কোন বিকার নেই? অন্য সময় হলে এতক্ষণে ছোটকাকার ঘাড় মটকে খাবার কথা ছিল ছোঁড়ার।

হঠাৎ! এক সময় সবাই দেখল, পায়জামা আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে তড়বড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে যাচ্ছে উৎপল। শঙ্কিত হলেন সকলেই। এবার...এবার নিশ্চিতভাবেই আবার একটা ঝড়। এ-ছেলেকে এখন আর বিশ্বাস নেই।

সদ্য হাসপাতাল-ফেরত রুগ্ন এক যুবকের অবতরণ ধ্বনিতে ভূমিতল কম্পিত হলো না তেমন। বড়ই শান্তভাবে নামল সে। সিঁড়ি গুনে গুনে।

খিটকেল বুড়ো শিবসাধন তখনও আহত অপমানবোধে ধমকে যাচ্ছেন মেয়েকে —'ফের...ফের যদি তুই ওপরে যাবি, ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব হারামজাদি। ওই টিভিফিভির দরকার কী তোর? সিনেমার পাশ এনে দিই না তোদের? আমাদের হলের কোন্ বইটা তোর বাদ থাকে?'

উৎপল ঢুকে পড়ল। একটা গুদামঘর, যেখানে জলঝড়রোদ থেকে রক্ষার নিমিত্ত মানুষগুলো নিজেরাই মালপত্তর বিবেচিত হতে পারে। ছোট্ট একফালি চতুষ্কোণের ভেতর একটা তক্তপোশ ফেলার পর পুরনো চলতা-ওঠা ট্রাঙ্ক-সুটকেস লটবহর ঠাকুরের-আসন ইত্যাদিতে বাকিটুকু নিজেরাই দুর্ভেদ্য করে নিয়েছে। গোটা বাড়ি জুড়ে এত হট্টগোলের পর সে যে কেন এখানে নেমে এল, কী অভিপ্রায়—নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় যদিও, উৎপল,

কোথাও বাড়তি পরিসর না থাকায় সোজা গিয়ে বিছানার ওপরই জাঁকিয়ে বসল—'কী! বকছেন কেন ওকে? ছায়া, যাই বলুন, মেয়ে ভালো...' বলেই বোনের মাথায় ছোট্ট করে একটা চাঁটি।

বোন অষ্টাদশী। বাপের ওপর অভিমান নিয়ে কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিল। কিঞ্চিৎ হাসতে চেয়েও সহসা বিহ্বল। তুলকালাম এত কাণ্ডের পর ছোড়দা নিজেই তাদের ঘরে!

ওদিকে একই রান্নাঘরে দুটো উনুন পেতে শরিকি ব্যবস্থা। ছুটে এসেছেন দুই কাকিমাই। একই ঠিকানায় সমরক্তবাহী একই পরিবারের একতলা দোতলা হলেও নববর্ষ বিজয়াদশমী ছাড়া যে-ছেলে দরজায়ও উঁকি দেয় না কোনোদিন, সে আজ নিজেই নেমে এসেছে উর্ধ্বলোক থেকে? যথার্থই বিস্ময়। পাশের ঘর থেকে শিবাজীও এসে দাঁড়াল লাল-কালো জবরজং নকশাকাটা বাটিকের লুঙ্গি পরে।

'কী হলো?' হাসল উৎপল—'কই, চা খাওয়াও এক কাপ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয় নিশ্চয়...' কৃতার্থ উচ্ছ্বাসে ছোট কাকিমা ব্যাকুল হলেন—'বোস্ বাবা, বোস্। আমি এক্ষুনি আনছি...'

'না, তুমি কেন? যা তো ছায়া। এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়। চিনিফিনি বেশি দিবি তো মারব মাথায় গাঁট্টা।'

ছায়া সোৎসাহে উদ্বেল। স্বেচ্ছায় মরতে চেয়েছিল—এ-হেন বীর অথবা পাড়ার মেয়েদের আলোচনায় একমাত্র জ্যান্ত হীরো ছোড়দার সেবায় তার উৎসাহ বিপুল।

ছায়া বেরিয়ে যেতেই এবার অস্বস্তি। উৎপলও বিব্রত কিছুটা। ময়লা চিরকুটে শাড়িতে সারাক্ষণই কেমন একটা হলুদলঙ্কার গন্ধ কাকিমাদের গায়ে! দিন দশেকের সংসার-খরচ সারা মাস খেটে ঘরে এনে স্বামীরাও যেখানে কুঁজো-পিঠ, ছেলেমেয়েরাও কোনো ভবিষ্যতের ছবি নয়। সেভেন-এইটের পর আর স্কুলের গোলপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারল না প্রতাপ শিবাজী। খেলার মাঝামাঝিতেই রেফারির লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে। কিংবা ওদের আরো বড় খেলা—পরের রোজগারে ভয় দেখিয়ে বাঁচার নতুন কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে একই সিনেমা হলের চত্বরে ওরা গোটা পরিবার। ভেতরে কাকার চাকরি, বাইরে সন্তানরা টিকিট ব্ল্যাকার। ঘরে পয়সা আসে। চাকরি ছাড়াও বাড়িভাড়া জমির-কেনাবেচা সংক্রান্ত হরেক দালালিতে ছোটকাকা রীতিমত নামী লোক এ-পাড়ায়। নেহাৎ-ই খুল্লতাত, শাস্ত্রমতে পিতৃসম, বাধ্যতামূলক দু চারটে পেন্নাম ঠুকতেই হয় বছরে দু-চার দিন। এবং আজ, দোতলায় রাজার-ছেলেও যখন তস্কর বলে শনাক্ত, কিছুটা হট্টগোল উঠতেই পারে নীচুর তলানিতে।

রোদে শুকোনো আমসির মতো কুঁকড়োন মোচড়ানো বাঁকা মানুষগুলোর মধ্যে নেমে এসে উৎপল হঠাৎ একটু আপন হতে চাইল।

সন্দিগ্ধ চোখে ভ্রূকুটি তুলে তাকালেন শিবসাধন। সন্ত্রস্ত ভঙ্গি। নাটের গুরু ছোঁড়াটা নিজেই ঢুকে পড়েছে আচমকা? আবার কোন্ মতলব। কিংবা আতঙ্কিত তিনি। নিত্য-অভাবের সংসারে দশ-পাঁচ-কুড়ি পঁচিশ করে কম টাকা তো হাত পেতে নেন নি এতকাল। ছেলেটা দিয়েওছে। এখন যদি সেসব কথাই বেমক্কা তুলে বসে সকলের সামনে? যেন আত্মরক্ষারই তাড়না। চুপচাপ বিড়ি টানছিলেন। জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন—'তুই আবার কোন্ নতুন ফন্দি নিয়ে এলি

বল দেখি।'

'ফন্দি বলছো কেন?'

'কী জানি বাপু, তোদের কায়দাফিকির আমরা কী বুঝব? মুখ্যু গরিবমানুষ...' 'শিবসাধন তার ঝাঁঝাল ক্রোধ চেপে রাখতে গিয়েও বিপন্ন কিছুটা—'তোর মা সাতসকালে এসে যা-নয়-তাই শুনিয়ে গেল। শামুও অপমান করে গেল ওভাবে। আরে বাপু, তোদের ওই ব্যাঙ্কফ্যাঙ্ক, লাখ লাখ টাকার গপ্‌পো...আদার ব্যাপারি আমরা, ওতে আমাদের কী...'

উৎপল হঠাৎ দুর্বিপাকে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। স্তম্ভিত চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে চকিত ত্রস্ততায়—'ছাড়ো তো, ছাড়ান দাও। সব মায়েরাই ধম্মোপুত্তুর যুধিষ্ঠির ভাবে তাঁদের ছেলেদের। আমার মা-ও ভাবেন। কিন্তু মহা ঘোরেল লোক তোমাদের ওই যুধিষ্ঠির ব্যাটা। ফালতু পাশা খেলে অত বড় রাজত্বিটা খোয়ালি তুই? আমার তো তুচ্ছ একটা ব্যাঙ্কের চাকরি...'

দুর্বোধ্য আর জটিল ভাষার দিকে তাকিয়ে থেকে বিহুল নারীপুরুষরা যখন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না—কী বলছে ছেলেটা, প্রতাপ দরজায় এসে দাঁড়াল।

চা এসে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে অখাদ্য। গোটাদুয়েক নিরাসক্ত চুমুকের পর উৎপল চায়ের কাপটা তক্তপোশে রেখে হঠাৎ কী হলো—লাফঝাঁপেরও মাথামুণ্ডু নেই, লাফিয়ে উঠল—'আরে, হেভি দিয়েছিস তো রে এটা। ফ্যান্‌টাস্টিক...'

পরিজনদের চোখগুলো মেঘের সাদৃশ্যে ভাসে। হুটপাট কী বলছে, কী করছে এ-ছেলে—হিসেব কঠিন। প্রতাপ নিজেও বেকুব! এতক্ষণ নিজের সাজগোজে ওঘরে ব্যস্ত ছিল সে। বেরোবার পথে একবার নিতান্তই কৌতূহলে উঁকি দিয়েছিল এঘরে। শাহানশা বিক্রমে পাড়া চমকিয়ে বেড়ায় যে-যুবক, সে-ও প্রথম ধাক্কায় বিদ্বান বুদ্ধিমান ভাইয়ের তারিফ পেয়ে ঠিক বুঝতে পারে না—বাহাবাটা সত্যি কিনা? নিজের সিনায় হাত বুলোতে বুলোতে সে হাসল। হাসিটা ওর নিজস্ব ধাতের। বোকা বোকা চোখজোড়ায়, ঠোঁটের দুপাশে ছোট ভাঁজে নিঃশব্দ ঝিলিক। হেঁড়ে গলা—'এই তো হপ্তা দুয়েক আগে পঞ্চার কাছ থেকে নিলাম। নেপাল লাইনের মাল। শিলিগুড়ির সঙ্গে কারবার পঞ্চার...'

জিনসের প্যান্ট, তিন ইঞ্চি চওড়া বেল্টে ছ-বুলেটের বকলস। প্যান্টে গোঁজা টকটকে লাল-গেঞ্জির বক্ষঃপটে শাদা হরফে অত্যুজ্জ্বল অক্ষরমালা—বিগ বয়েজ প্লে অ্যাট নাইট।

কী ভাবল উৎপল। শান্তভাবে—'কথাটা দারুণ রে প্রতাপ। মানে জানিস?'

মাস-ছয়েকের ছোটয়-বড়য় সময়বয়সী প্রতাপ বুঝতে পারে না, হেঁয়ালিটা কতদূর! পরম আদরে, স্নেহে, বুকের ওপর হাত বুলিয়ে ঠোঁট ভাঙল—'ধ্যুস্ মানে! মানেফানে আবার কী? বিলিতি মাল, শস্তায় পেলাম...'

'নে খোল্, খোল্ তো গেঞ্জিটা।'

প্রতাপ অবাক—'কেন? খোলার কী দরকার? এই ত দ্যাখ না...'

'ওটা পরে আমি ঘুরে আসব একটু। বিকেলেই ফেরত পাবি। তার বদলে আমার একটা ভালো দামী শার্ট দিচ্ছি। তুই ঘুরে আয়।'

মানুষগুলি হতবাক। প্রতাপ কিছুতেই বুঝতে পারে না—কী চাইছে খোকন? কিন্তু দু-

হাজারী মাইনের মান্যিগণ্যি ভাইয়ের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতেই এমন একটা চাপ থাকে, সে, বুকে পেটে দুহাতের গুণচিহ্ন এঁকে ঝাঁ করে গেঞ্জিটা উৎপাটনে সক্রিয় হলো। কী যেন সব ভালো ভালো জ্ঞানের কথা লেখা আছে তার বুকে। কিছু না বুঝেশুনেই কিনে ফেলেছিল নগদা চল্লিশটা টাকায়। এখন সেটা পড়ুক যথাস্থানে। খোকন ইংরেজি জানে।

ইংরেজি জানে? কী জানে অথবা কতটুকু...ইত্যাদি প্রশ্ন ব্যতিরেকেই ঝলমলে চৌকোস সে-যুবক ব্রাত্যজনদের চোখে অবশ্যই সাহেবসুবো কেউ একজন। এবং অলৌকিক সাহেব-দুনিয়ায় যদিও সে আজ অনেকটাই ব্রাত্য, ঘোরতর তমসায় সবটাই তামাশা হয়ে উঠতে থাকে এরপর। 'বিগ বয়জ প্লে অ্যাট নাইট' বুকে এঁটে এবং বিগ বয় সেজেই সে খেলতে চাইল তার নিজের খেলা। ওপরে নিজের ঘরে উঠে এসে হুটপাট দ্রুততায় সাজাল নিজেকে। যেভাবে যত বেশি করে হট্টগোলের মজাটা বাধিয়ে তোলা সম্ভব। ডিপ নেভি-ব্লু প্যান্টের ওপর সরু বেল্টটা ঢাকাই পড়ে থাকে। গেঞ্জিটা প্যান্টের ওপর টানটান।

নিজের ঘরে বড়সড় কোনো আরশি নেই। বৌদির ঘরের ড্রেসিং-টেবিলটার কথা মনে পড়ল। যেহেতু রবিবার এবং বাড়িতে দাদা, প্রস্তাবটা মনে মনেই নাকচ হয়ে যায়। সুতরাং নিজেই নিজেকে এপাশ-ওপাশ নানাভাবে দেখে নিয়ে যখন ঘর থেকে বেরোল

বারান্দায়, কী কাজে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল সুনন্দা, অতর্কিত সর্পদর্শনে চমকে উঠল—'এ, কি! খোকন! খোকন তুমি...'

ঘাড় নিচু করে নিজেকে আরো একবার দেখে নিতে নিতে উৎপল দুহাতে গেঞ্জিটা তলার দিকে টানল আরো একবার —'কেন খারাপ? বাজারে এই চলছে আজকাল।'

'অশ্লীল অশ্লীল খোকন। ভীষণ নোংরা...' মুখচোখের বিকৃতিতে, যেন সত্যি সত্যি কালমেঘ পাতার বড়ি-গেলার বাধ্যতায় সুনন্দা, বিবমিষা ঝোঁকে—'তুমি কি সত্যি পাগল হয়ে গেলে? খোলো, খুলে ফেলো। প্লিজ...'

নারীকণ্ঠের চিৎকারে অথবা নতুন কোনো অঘটন-ভাবনায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সকলেই। সত্যসাধন রেণুবালা দূরে দাঁড়িয়ে নিঝুম। বিষয়টা বোঝেন না যথাযথ। রঙিন মলাটে দেখাচ্ছেন ছেলেকে। স্ত্রীর দাপাদাপিতে এক ঝলক বেরিয়ে এসেছিল শ্যামল। পলকপাতে ফিরে গেল। কৃষ্ণা এসে দাঁড়াল বৌদির পাশে—'তুই এটা কোথায় পেলি রে ছোড়দা? কিনেছিস?'

'সব কিছুতেই কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি তোদের?'

'এটা গায়ে দিয়ে তুই বাইরে বেরুবি?'

'বেরুচ্ছি তো।'

'পারবি বেরুতে?'

বোনকে নয়, বৌদিকেই আলতোভাবে সরিয়ে দিয়ে উৎপল এগোবার পথ করে নেয়

কৃষ্ণা পেছন থেকে কিছুটা রূঢ়তায়—'নিচের প্রতাপদার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিস তুই কালও ওর গায়ে এই কুচ্ছিত ইতর জামাটা দেখেছি আমি।'

সিঁড়ির পাশে বাড়ির সকলের জুতো। বাতিল বা বর্তমান হরেক ধরনের জুতোর স্তূপ।

উৎপল তার নিজস্ব বুটজুতোজোড়া বেছে নিয়ে, মোজাটা পরে নেবার ফাঁকে চোখ টেরিয়ে দেখতে পেল, ক্ষুব্ধ অভিমানে বৌদি দ্রুত ঢুকে যাচ্ছেন তাঁর নিজের ঘরে। এবার স্বামীর সঙ্গে নিভৃতে ব্যথিত সংলাপ।

কৃষ্ণা স্বস্থানে স্থির। রেলিংয়ের ধারে শরীরের অবশ ভার রেখে জাহান্নামগামী অগ্রজের দিকে অপলক চোখে ফুঁসছে ক্রোধ ।

শুধু বাবা আর মা সিঁড়ির খুব কাছাকাছি। অতি প্রাচীন দুই মানব-মানবী মাইল কিলোমিটারের হিসেবে সময়কে ছুঁতে চেয়ে জীবনে ব্যর্থ বারবার। বোঝেন না, হদিশই পাচ্ছেন না—একটা লাল গেঞ্জি পৃথিবীর কতটুকু পাপ? ভাষার পবিত্র অক্ষর বা শব্দ বা বাক্য কতটা অন্যায় হতে পারে মানুষের!

সিঁড়ির দুটো ধাপ নিচে একটা পা, দৌড় প্রতিযোগিতায় স্টার্ট নেবার ভঙ্গিতে দুধাপ ঊর্ধ্ববর্তী সিঁড়িতে আরেকটা পায়ে জুতোর ফিতে বাঁধার অভিপ্রায়। কোমর থেকে মাথা অব্দি শিরদাঁড়ার টানসুদ্ধু পুরো ঊর্ধ্বাঙ্গ নত হয়ে এলে, নিজেরই পদসেবায় দুনিয়াটাকে লাথি মেরে চলার উপেক্ষা তীক্ষ্ণতর যখন

টগবগ টগবগ লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি ভেঙে নিচে এসে দাঁড়াতেই হলুদলঙ্কার-গন্ধমাখা ঘেমো গায়ের কাকিমারা কলকলিয়ে উঠলেন—'বাঃ, খাসা মানিয়েছে রে তোকে খোকন। তাই তো বলি, দেখতে শুনতে কি খারাপ গো আমাদের ছেলে! এত লেখাপড়া জানিস তুই। এসব ইংজিরি কথাবাত্রা তো তোকেই মানায়...'

বোকার মতোই বলল ছায়া—'তোমাকে ঠিক প্রতাপদার মতো লাগছে ছোড়দা। একেবারে প্রতাপদা...'

এক ঝটকায় উৎপল বাইরে। রাস্তায়। নিজের কাছেও খুব একটা স্বস্তি ছিল না! রঙচঙে চিৎকারটার জন্য ঝামেলা ছিল না তেমন। মোটামুটি রঙিন শার্টপ্যান্ট তার নিজেরও অভ্যাসের পোশাক। গোলমাল ওই বুকের পাঁচিলে সাইনবোর্ড বা পোস্টারটা। পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপন নয়, কোনো মনীষীবাণীও নয়—অনর্থ। অনর্থকে বহন করে একটা কিছু অর্থ দেওয়া যখন নিতান্তই ক্রীড়া।

আশৈশব পরিচিত কানাই মল্লিক লেনের গলি। আত্মীয়পরিজনের মতোই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীজন। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় গলির রাস্তায় ইটের উইকেট সাজিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শীতের ক্রিকেট, বড় রবারের বলে বর্ষায় ফুটবল। মুখুজ্জেদের বাড়ির লম্বা রকে গুলতানি। পরীক্ষায় ফেল না-করার সুবাদে ভালো ছেলে বলে মোটামুটি একটা ক্ষমাঘেন্নাও ছিল অনেকের। আজও সেই একই গলি একই ঘরবাড়ি মানুষজন।

কিছু দূরে, পাঁচিশের-এক বাড়ির দরজা ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন পানুদার বৌ, শান্তাবৌদি। দূর থেকেই দেখছিলেন ভদ্রমহিলা। কাছাকাছি পৌঁছতেই পলক-পড়ে-না চোখের বিস্ময়ে—'তুমি?'

উৎপল নিরুত্তাপ। হাঁউমাউকাঁউ বৌদির সাদৃশ্য শান্তাবৌদির স্মিতমুখ থেকে বোঝা কঠিন—মহিলার ভিরমিটা কোথায়? আত্মঘাতীর সজীব সাক্ষাতে অথবা গেঞ্জি?

উৎপল গাল টিপল মেয়েটার—'কি রে, কোথায় যাচ্ছিস?'

'গান শিখতে।'

'গান শিখছিস? বাঃ খুব ভালো। কী গান?'

এইট না নাইনে পড়ে মেয়ে। নেহাৎ খুকি নয়। চটপট উত্তর—'রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুলগীতি ক্লাসিকাল পল্লিগীতি গজল আধুনিক...'

'এক সঙ্গে এত? বাঃ ভালো...' উৎপল পা বাড়াবার আগে—'বিটোভেন শেখায় না একটু? মোজার্ট? বাখ? জ্যাজ? ওগুলোও তো লাগবে একটু-আধটু। বলিস তোর মাস্টারমশাইকে। উনি নিশ্চয়ই সবই জানেন...'

সান্যালদের বাড়ির দরজায় পাড়ার যুবতীরা! মাধ্যমিক থেকে কলেজের ছাত্রী অথবা বি. এ. পাশ হলো-না বলে বিয়ের-জন্য-প্রস্তুত এসব ললনারা, উৎপল জানে, তার প্রতি ইদানীং বিশেষ কৌতূহলী—লোকটা বিষ গিলেছিল! কী সব্বোনাশ! ও-তো সিনেমায় হয়।

'টপ দিয়েছেন খোকনদা, টপ। অ্যাদ্দিনে পথে এসেছেন তাহলে...' প্রেম করা যায়, সেই দুরন্ত মেয়েটা। পুতুল।

উৎপল থমকে দাঁড়াল দুহাত খেলিয়ে—'ভালো বলছিস?'

'ওহ্? দারুণ। জবাব নেই। লুফে নেবে বইয়ে।'

হাসিতে হাসিতে খুশিতে দুলে উঠল যুবতীরা এবং এগোবার দিকে পা বাড়িয়ে ওদের আরো কিছু একটা বলার জন্য পিছু ফিরতেই চোখে পড়ল, চড়চড়ে রোদ মাথায় নিয়ে তারই বাড়ির ছাদের কার্নিশে বুক চেপে দু-জোড়া করুণ চোখের দৃষ্টি। কৃষ্ণা আর বৌদি ঘরের ছেলেকে দেখছে তার ভ্রষ্টতায়।

উল্টোদিকের দোতলায় কেষ্টদার বাপ রিটায়ার্ড খিটকেল বুড়ো খটখট্টি চোখে তাকিয়ে ছিলেন হেডমাস্টারি কায়দায়। উৎপল আমল দিলো না।

ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ করে-ফেলা কাজটার জন্য সে এখন সঙ্কুচিত কিছুটা। বীভৎস লাল গেঞ্জিটা কটকটায় না কারো চোখ। কিছুই অশোভন নয় এখন আর। ইংরেজি বাক্যটারও কোনো অর্থ নেই। আসলে সুইসাইডের হিরোকেই দেখছে সবাই। শুধু ওটা...ওটাই নাকি মেনে নেওয়া যাচ্ছে না কোনোভাবে। মুখুজ্জেদেব বাড়ির রকটার আর সে-ইজ্জত নেই। ওখানে গ্যাঁজায় প্রতাপ শিবাজী বাসু বিমল হাবু সত্যরা। রহস্যজনক কাজকারবারের মানুষ, পাড়ার রুস্তম যারা। অথচ বছর দশ-বারো আগেও, একাত্তর বাহাত্তর সালের আগ্নেয় দিনগুলিতে হতকুচ্ছিত পায়জামা-পাঞ্জাবিতে দীনুদা এসে বসতেন ওখানে। উৎপল বা প্রতাপ শিবাজী বাসু হাবু পাড়ার ছেলেরা স্কুলের ছাত্র। কী সব বলতেন দীনুদা! শুনত সবাই—ভীষণ ভীষণ সব সুবিশাল কাণ্ডকারখানা নাকি চলছে জগৎ জুড়ে। চারদিকটা উল্টেপাল্টে লণ্ডভণ্ড করে বদলে ফেলতে হবে গোটা দেশটার। নইলে মুক্তি নেই। ভীরুতা পাপ। জেলে গিয়েছিলেন দীনুদা। মরেই গেছেন শোনা গিয়েছিল। বেশ ক-বছর বাদে জেল থেকে বেরিয়ে ভালো একটা চাকরিও পেয়ে গেছেন কোথায় কোন্ একটা অফিসে! বিয়ে করেছেন। পার্কসার্কাসের দিকেই কোথায় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছেন। এখনও ভাবেন। সমাজবদলের ভাবনা।

হলুদ জমির ওপর ব্লু-চেক জাপানী টেরিকট জামাটায় প্রতাপকে মানিয়েছে বেশ। আসলে স্বাস্থ্যে চেহারায় খুব একটা ফালতু তো নয়! লম্বা চুল আর বাঘা জুলপিতে জুতসই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারছে না বলেই দুঃখু কিছুটা। কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই প্রতাপ এবং ওর বন্ধুরা অনাবশ্যক সম্ভ্রমে নড়েচড়ে উঠল। মোটামুটি একই বয়সের মাপে একই পাড়ার ছেলেরা সবাই।

'কি রে খোকন, ভায়ে ভায়ে পাল্টাপাল্টি করেছিস জামায়! লাভ ত ওই প্রতাপটারই। জেল্লাই আলাদা শ্‌শালা। বহুৎ দাম...'

এড়ানো গেল না। কিংবা এড়াতে চাইল না বলেই উৎপল, বয়সে-কিছুটা-বড় শিবুর কথায় হাসল। এগোল রকটার দিকে—'হ্যা, গেল-পুজোয় কিনেছিলাম।'

'এ-কী বদলা মাইরি! নসিবও হয় শালা কারুর কারুর...' খ্যাকখ্যাক হাসছে বাসু—'তোকে চল্লিশ ধরিয়ে প্রতাপ শালা অ্যায়সা দাঁও মারল! এ-ত কমসে-কম চারশো। অ্যাঁ! চামড়ায় সইবে শালার? ফোস্কায় জ্বলবে না?'

হারু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—'একে শালা দুহাজারী মালদার পার্টি, তায় আবার সুইসাইড ফেরতা আদমি খোকন। এ-শ্‌শালা ইজ্জতই আলাদা।'

সবাই হেসে উঠল। নির্বিকার উৎপল নিজেও হাসছে। সে তার বুস্তম ভাইকে দেখছিল। জামাটা গায়ে এঁটে অহম্‌স্ফীত প্রতাপ রকে বসছে না। চোখের গুলতি ঘুরিয়ে এপাশে ওপাশে ঘরবাড়ির দোতলা তিনতলার রেলিংয়ে জানালায় অথবা রাস্তায় চলতি-মানুষের ভিড়ে খুঁজছিল কিছু। জামা নিয়ে এত মশকরায় হঠাৎ ক্ষেপে গেল—'ফালতু বকছিস কেন তখন থেকে? চুপ মার।'

'চুপ মারব কি বে! জামাটা কি কবচমাদুলি নাকি? অ্যাঁ! একটা জামার হেক্‌কড়ে তুই শালা দু-হাজারী বনে যাবি ভেবেছিস? ব্যাটা বদ্যি তো বদ্যিই। হোমিওপ্যাথের ফোঁটা...'

ইত্যাদি সংলাপের মূলত কোনো অর্থ নেই। কিংবা প্রবল কোনো অর্থ। উৎপল চটপট কব্জিঘড়ির দিকে তাকাল—'আজ চলি রে। একটা কাজ আছে জরুরি...'

'কাজ ত তোমাদের থাকবেই গুরু। দুনিয়া কা রাজা। সুইসাইডেও জান যায় না শালা!'

'আরে না না, আসব। আজ সন্ধেবেলা আড্ডা দেব! জোর আড্ডা। পাড়ায় বসিনি কতদিন...' নিজেরই জামার ছাঁচে প্রতাপের দিকে তাকিয়ে উৎপল পিছু ফিরল। গলির মোড়টা পেরিয়ে যেতে চাইল দ্রুত।

নেহাৎ-ই অর্থহীন অমূলক একটা ভাবনা দানা বাঁধতে শুধু করেছে স্নায়ুতে শিরায় শিরায়। রুচিসুন্দর ভদ্রলোকের জামায় প্রতাপ যদি প্রতাপ ছেড়ে কোনো এক যাদুক্রিয়ায় হয়ে উঠতে পারত উৎপল, উৎপল দাশগুপ্ত...কিংবা উল্কি আঁকা লাল গেঞ্জির মহিমায় সে নিজে পাল্টে যেতে পারত অন্য কোনো প্রতাপে? গড়বড় হতো না হিসেবের। পৃথিবী একই ভাবে সচল থাকত অহিংস বিধানে। সুইসাইড করত না উৎপল দাশগুপ্ত।

কিন্তু আমি? ভিন্ন প্রতাপ!

খটকা লাগে। সত্যি কি তাই? নিজের তাড়নায় সে ছোটে। জানে না যদিও এ-গেঞ্জিটা গায়ে লেপটে সে নিজেই বা এগোবে কতদূর? গেঞ্জিটার মাপে নিজেকে পাল্টে নিতে পারলে ভালো

হতো। অবশ্যই ভালো। যথার্থ প্রতাপ হয়ে উঠতে পারলে এক ধরনের মুক্তি জীবনে —মগজে সঙ্কট নেই।

হাসপাতালের নিয়মেই ভাস্কর আসে প্রতিদিন। তাকে আসতেই হয়—কেন না কৃষ্ণা! কিন্তু, নিজেদের অফিস-ছুটির পর অন্যান্য বন্ধুরাও পালা করে এসেছে অনেকেই। রোগশয্যায় সুহৃদকে দেখতে আসার একটা সামাজিক কানুন প্রচলিত আছে লোকসমাজে। এতাদৃশ উৎপাতকে সৌজন্য বলে।

সুস্থতার দাবিতে উৎপল আজ নিজেই রাস্তায়।

রবিবার বা ছুটিছাটার দিন সকালে খোকাদার চায়ের দোকানে বেজায় ভিড়। কফি-হাউস অনেকদিন বাতিল। বিবেকানন্দ রোডে অঞ্জনদের বাড়িতে বন্ধুদের জটলা। কন্ট্রাকটর বাপের অঢেল টাকা। মস্ত বাড়ির এক তলায় ঢালাও একটা ঘর। বিশাল বিশাল জানালা-দরজা চকচকে দেয়াল মোজায়েক ফ্লোর।

লার্গাক্টিল-গেলা বা হাসপাতাল সংক্রান্ত ঘটনার পর, সে নিশ্চিতই জানে, বন্ধুদের অব্যাহত আড্ডায় ঘুরেফিরে আলোচ্য বিষয় সে নিজে এবং আজ, তার অতর্কিত উপস্থিতি ওদের প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেবে। প্রসঙ্গটা সরাসরি উঠে পড়তে পারে। কেননা, সুইসাইড! স্টুপিডিটি অব এ কমন ম্যান। গাঢ়তর চিন্তাবিলাসে—বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্ব সঙ্কট। সুতরাং মোকাবিলাটা যেন যুদ্ধই একপ্রকার। সে মানসিকভাবে প্রস্তুত হলো।

কিন্তু তার প্রবেশে বন্ধুরা ধাক্কা খেল না কেউ। কিংবা ধাক্কাই। সমবেত উচ্ছ্বাস—'এ-কি মাঞ্জা গ্‌গুরু? কোজিনৎসেভের হ্যামলেট মাইরি! পিপল্‌স হিরো...'

প্রত্যন্ত গভীরে অস্বস্তিই কিছুটা। কিন্তু নিজেকে চাগিয়ে রাখার তীব্র জেদে উৎপল হাত বুলোয় বুকে। লুকোনো যায় না প্রলাপবাক্যটাকে।

'আয় বোস্‌...' সোমনাথ স্বাগত জানাল—'ভাস্কর আসে নি এখনও। ও এলে তোর কাছেই যাব ভাবছিলাম আমরা।'

প্রাণিত হয় না উৎপল। কিংবা তার আকস্মিক আগমনে বিহ্বল বন্ধুরাই, ঠিক এ-মুহূর্তে কীভাবে গ্রহণ করবে তাকে, দোলাচলে, নানাভাবে বিবিধ আচরণে সঙ্ঘবদ্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো ব্যক্তি হতে থাকে। প্রথমাবস্থার হালকা রসের মেজাজটা থিতিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে সব কথা থেমে যেতে চায়।

নির্ঝঞ্ঝাট বিশাল একটা ঘরে বেশ বড়সড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘিরে পাঁচ-সাতটা চেয়ার। চেয়ারে চেয়ারে বন্ধুরা। টেবিলের ওপর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেট, হরেক লাইটার এবং দেশলাই! উৎপল হাতের কাছে নির্বিচারে একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে তুখোড় বন্ধুদের বোকা-বোকা চোখগুলির দিকে তাকাল যখন, যূথবদ্ধ চোখগুলি পূর্ণ নিরীক্ষণে বুঝে উঠতে পারছে না—বিগ বয়েজ প্লে অ্যাট নাইট...বাক্যটির একটি আভিধানিক অর্থ স্পষ্টত থাকলেও কটকটে লাল গেঞ্জিতে এমত বক্ষঃপ্রচার বা নাটকীয়তার বিশেষ তাৎপর্য কী? অথবা একজন

মরতে-চাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে ব্যক্তিটি তার অতীত এবং বর্তমানের অবিচ্ছিন্নতায় একই ভাবে একই মানুষ কিনা ইত্যাদি তত্ত্ববিষয় যখন মগজে মগজে ক্রিয়াশীল

সিগারেটটা নিঃশব্দে ধরিয়ে উৎপল একটা চেয়ার খুঁজল এপাশে ওপাশে। নেই। হাউসফুল। বরং চারপাশের গড়ে ওঠা দুঃখু-দুঃখ ভড়ংটাকে সজোরে ধাক্কা মারার তাড়নায় সে মাধবের চেয়ারের পেছনটা বাঁহাতে ধরে হাঁটু তুলে ছোট একটা লাথিই মারল বন্ধুর কোঁৎকায়—'এই মোটা, ওঠ্। যা ওদিকে...'

যথেষ্ট নামী কোম্পানির শিক্ষানবিশ সেল্‌স্-রিপ্রেজেন্টেটিভ মাধব ভূঁইঞা বেকুব। আশৈশব মেদলদেহটা বন্ধুমহলে এরকম একটা আদুরে-নাম পেয়ে যাবার পর, দীর্ঘকাল বাদে যেহেতু এখন প্রায় তাৎপর্যহীন, হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াবার পর সমস্যা তার—কোথায় বসবে। হাতলছাড়া চেয়ারে কিঞ্চিৎ সরে বসে সোমনাথ তাকে ভাগাভাগিতে আহ্বান জানাল। মাধব এগোল না। লম্বা টেবিলটার ওপরই এক পাশে পা ঝুলিয়ে উঠে বসল। মস্ত পাহাড়।

পরিত্যক্ত আসনটা কেড়ে নিয়ে নির্দ্বিধায় জাঁকিয়ে বসে এবং বসার পরও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে চারপাশের আবহাওয়ায় যখন বোঝা গেল—হাউস এখন পুরোপুরি তার কব্জায়, উৎপল নিরাসক্ত ভারি গলায়—'খাওয়া তো কিছু। মুখটা শালা তখন থেকে পানসি মেরে আছে।'

আতিথেয়তায় চঞ্চল হলো অঞ্জন—'কী খাবি? চা? দাঁড়া, বলছি। এক রাউন্ড হয়ে গেছে আমাদের। তোরা কেউ খাবি? আর কেউ?'

বন্ধুরা যখন প্রায় সকলেই সম্মত, কিঙ্কর, কিছুটা বোকা-বোকা ভাবেই বলে ফেলল হঠাৎ—'লেট আস সেলিব্রেট দ্য ডে। আজ সন্ধেবেলা...'

'আলবৎ...' সমস্বরে পৃথ্বীশ আর অঞ্জন—'গ্র্যান্ড অকেশন অব হিজ হিরোইক রিটার্ন...'

উৎপল ভ্রূ কুঁচকোল—'হিরোইক রিটার্ন মানে? কেন? কোথায় গিয়েছিলাম আমি?'

'কোথাও যাওনি রাজা। অ্যাদ্দিন বাদে আড্ডায় এলে!' কথাটা বলল পৃথ্বীশ, যখন অন্যান্যরা উৎপলের কটাক্ষের দিকে চোখ রেখে আগুন-ছোঁয়ানো দোদমার প্রতিক্রিয়ার প্রতি স্থিরলক্ষ্য। ডাকসাইটে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার নিতান্তই শ্রমিক পৃথ্বীশ চিরকালই একটু ধুমধাড়াক্কা। অত সূক্ষ্মতা-ফুখ্যতা খুব একটা ধাতে সয় না বলেই বিচ্ছিরি ঘ্যাম্-মারা রবিবারের সকালটাকে ধাক্কা দিতে অস্থির হলো—'তুই শালা মরে গেলে শ্মশানে যেতে হতো আমাদের। তোর ছেরাদ্দে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কতগুলো চিঁড়েদই আর নিরামিষ লুচি ধোঁকা ছানার-ডালনা খাওয়াত তোর বাপ। ও-শালা ভাবলেই আমার পিত্তি কাঁপিয়ে বমি আসে। তার চে' এই ভালো—খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। তোকে আমরা রাম খাওয়াব। কী চাই তোর? হুইস্কি জিন?'

পৃথ্বীশের বেফাঁস বলে-ফেলা কথার প্রতিক্রিয়ায় ভয়ঙ্কর কিছুই যখন প্রত্যাশা ছিল সকলের, বিস্ফোরণ নয়, দাঁতে দাঁত চেপে রাখার কঠিন আক্রোশে শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার প্রতীক্ষা কিছুক্ষণ। উৎপল তার চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবৃত্তে আন্তরিক চোখগুলি দেখল ভালো করে। চেনা, খুবই ঘনিষ্ঠ মুখগুলি! চাকরিবাকরি বা ব্যবসাবাণিজ্যে নিজেদের নিরাপদ জেনে সুখের প্রচ্ছদে চতুর উজ্জ্বল আরো কিছু মূর্খ যুবক পৃথিবীর। জানে না এখনও—স্খলিত হতে পারো তুমিও, একই ভাবে হঠাৎ কোনো একদিন...

পৃথ্বীশের দিকে তাকাল সে। ঠোঁট ভেঙে অল্প হাসিতে—'সার্ভাইভ আমি করিনি এখনও। তোর চিঁড়ে-দই ছানার-ডালনার ভয় কিন্তু যায়নি...'

প্রশস্ত ঘরে শব্দগুলি আওয়াজ করে বাজল। সন্ত্রস্ত বন্ধুজনরা। প্রায় পক্ষকালেরও বেশি সময় যে-মানুষটিকে নিয়ে এত ছুটোছুটি ভয় রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের প্রহর, তাকে কাছাকাছি পেয়ে হালকা হতে চাইলেও যে নিজেই তার খোলস ভাঙতে রাজি নয়, কিংবা দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার দুটো চোখই হয়তো তার নিজের কথা...

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সচল মানুষের দিকে যেভাবে তাকায় মানুষ, উৎপল তাকাল বন্ধুদের দিকে। অপলক চোখগুলি। আহা-উঁহুর এই ভঙ্গিটাতেই প্রচণ্ড রাগ তার। অ্যাস্‌ট্রেটা ছিল না কাছাকাছি। হাত বাড়াতেই মাধব এগিয়ে দিলো। সিগারেটের ফিল্টার অংশটুকু গুঁজতে গুঁজতে শান্তভাবে—'যে-টেনশনের মধ্যে ওই ডিসিশনটা ছিল আমার, এখনও সেই একই টেনশনেই আছি।'

বন্ধুরা নীরব।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল উৎপল—'ভাবি না। এখন আর কিছুই ভাবছি না ওসব...'

ভালো লাগছে না বন্ধু-পরিবেশ। নিজের স্বাভাবিক হতে না-পারার ব্যাধিতে কেন জানি মনে হয় ওদেরই ডিস্‌টার্ব করা। উৎপল তাকাল অন্যদিকে।

অঞ্জনকে—'শোন্, শোন্ তো একটু...'

'যাচ্ছিস কোথায় তুই, চা বলেছি...'

'ধ্যাৎ, তুই শোন্ না। আয় বাইরে।'

এবম্বিধ অদ্ভুত আচরণে স্তব্ধ বন্ধুরা। অঞ্জন বেরিয়ে এল এবং বাইরে, সদর দরজার প্যাসেজে দাঁড়িয়ে উৎপল—'একটা জামা দে তো তোর।'

'জামা!' অঞ্জন বিস্মিত—'জামা মানে?'

'দিবি তো দে। না দিবি তো ফোট্ শালা। অত কথা কিসের?'

উৎপল তার দুঃসহ বিরক্তিতে অথবা রাগে চলেই যাচ্ছিল, অঞ্জন খাবলে ধরল—

'দাঁড়া, ওপরে চল্। বেছে নিবি।'

'বাছাবাছির কী আছে? নিয়ে আয় একটা ভদ্রগোছের।' সদর দরজার প্যাসেজে শ্বেতপাথরের মেঝে, দরজার ললাটে কুলুঙ্গিতে তেলসিঁদূরে লক্ষ্মী-গণেশের ছোট ছোট মূর্তি। ভেজানো-দরজার ভেতর থেকে চাপা গলায় বন্ধুদের কণ্ঠস্বর। উৎপল, প্রতীক্ষায়, বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মস্ত একটা ডবলডেকার বাস চলে গেল। ঘর্মাক্ত রিকশওলা, পথচারী যুবতী, দ্রুত ধাবমান গোটাকয়েক গাড়ি।

প্রতি মুহূর্তের নিঃসঙ্গতা এখন ভেতর থেকে মারে। দু-চার-পাঁচ মিনিটের প্রতীক্ষাও কী দুঃসহ! বাইরের রাস্তায় ঝাঁঝাল রোদের ঝলরে চোখ, শ্রুতিতে বন্ধ-দরজার ভেতর থেকে বন্ধুদের কণ্ঠস্বর। গায়ের লাল গেঞ্জিটা এবার থাপ্পড় মারতে শুরু করল।

ভাবনার গভীরে, যেন নিজের মধ্যেই অন্য এক নতুন মানুষ চাগিয়ে উঠতে চাইছে। ভিন্ন কোনো উৎপল দাশগুপ্ত, যাকে সে চিনত না। চেনার চেষ্টাও করে নি কোনোদিন

ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলার পর হয়তো কোনো কৈফিয়ত চাইছে না কেউ। নিজের কাছেও লজ্জা বা দীনতার পরোয়া না থাক, আজ মনে হয়—পরিষ্কার ভাবেই সে এখন দুজন আলাদা মানুষ। একদা সে একইভাবে এই আড্ডায়, বন্ধুপ্রবাহে জীবনটাকে ভেবেছিল বস্তুত কোনো খেলার মাঠ। উৎসাহে হাততালিতে কোনোরকম ভ্রূকুটি ছাড়াই কেটে যাবে দিন। যেমন কেটেছে পিতৃপুরুষদের। আত্মসুখের শিথিল বিলাসে মহৎ সব প্রাপ্তি জীবনে। হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে যখন পতন, আরো বড় আরো মারাত্মক এক ভুল

ততোধিক অলৌকিক ঘটনায় ভুল থেকে ফিরে আসাটাই যদি সত্যি, তবে আজ...নিষ্পলক চোখজোড়া আটকে থাকে রাস্তার রোদ্দুরে কোনো এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। অসহ্য স্নায়ুপীড়ায় আজ সে ভাবতেই পারে নিজেকে ভিন্নতর স্বতন্ত্র একজন। ভুল ভাবে বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় এরকম একটা গাড্ডায়ই তো পড়বে কেউ! এক্স্ট্রাভেগেন্ট ইডিয়ট

যখন নিজেরই অতীতকে ভেংচি কেটে নিজেকেই চড়চাপড়, পাশেই বৃদ্ধ পাঁচিলের ওপাশে আরো একবার বন্ধুদের মৃদু গুঞ্জন শুনল সে। নিশ্চিতভাবেই ওদের আলোচ্য—সে বা তার মরে-যাওয়া অথবা বেঁচে-ওঠা। আপাতত ভাঙা যাচ্ছে না পাঁচিলটা—অতীত-বর্তমানের ফারাকে যারা। সজ্জন বন্ধুরা, এখনও বোঝেনি নিজেদের মূঢ়তা কিংবা সে নিজেই যখন এক আলাদা মানুষ। লার্গাক্টিল যাকে মানুষ করেছে

তখন রাগ। সর্বাঙ্গ ক্রোধের জ্বলুনিটাও দুর্বিষহ! বিস্ফোরণে ফেটে পড়ার মতো কোনো যথাস্থানও যদি নেই চারপাশে, গোটা শরীর কাঁপিয়ে অস্থির চঞ্চলতা। পিছু ফিরে তাকাল সে।

একটা জামা এল। চাকচিক্যে একটু বেশিই উজ্জ্বল। প্যাসেজে দাঁড়িয়েই অস্বাভাবিক দ্রুততায় গেঞ্জিটা উপড়ে ফেলে নিজেকে পাল্টে নিলো উৎপল— 'গেঞ্জিটা রাখ্। নিয়ে যাব সন্ধেবেলা।'

'সন্ধেয় আসছিস তো তুই?'

'বলতে পারি না। কেন?'

'তোরই জন্যে অ্যাদ্দিন হয়নি কিছু। আজ তুই আসার আগেই কিঙ্কর বলছিল —খাওয়াবে।'

উৎপল ঝাঁপিয়ে নামল রাস্তায়। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে, রাজপথে...অফুরন্ত প্রাচীন কলকাতা তার অতিকায় চেহারায় আজও সেই একই ভাবে কলকাতা। উৎপল হাঁটে। অনেকটা নিরুদ্দেশের হাঁটা। ঠিক নিরুদ্দিষ্ট নয়। যেন একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে কোথাও। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বা মহাযুদ্ধের শেষে যেমন হয়, ধ্বংসস্তূপের পথে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে প্রতি মুহূর্তের স্খলনে পরিচিত প্রিয়জনের ঠিকানা খুঁজে না পাবার আতঙ্ক। সাঁকোগুলি ভেঙে গেছে চারপাশে। নতুন করে গড়ে তোলার দায়।

প্রখর রোদের জনারণ্যে, একা, উৎপল শূন্যতায় ভাসে।

গোয়াবাগানে, দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনে সকালের রোদ প্রথম ভূমিস্পর্শ করে বেলা ঠিক বারোটায়। খরতর দ্বিপ্রহরে। দেড় থেকে দুই হাত, কখনও কখনও বড়জোর আড়াই হাত চওড়া দীর্ঘ সরু সুড়ঙ্গ পথটার দুধারে দোতলা-তিনতলা বাড়ির ছাদে-ছাদেই দিনটা কখন নিঃশেষে

গড়িয়ে যায়।

ঈশ্বর মিল লেন থেকে ডানদিকে বেঁকে অনেকটা এগোবার পর ভারি পাথর-চাপা হাইড্রান্টের পাশে অন্যূন একশো বাড়ির জঞ্জালে ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ। নাক চেপে পচা গন্ধটাকে ডিঙোলে বাঁপাশে আরো একটা কানাগলি কয়েক কদমের। সেখানে বিশেষ একটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই অন্ধকার গুহার অন্তঃপুরে—মানুষ। মানুষের অন্তঃপুর।

অন্ধকার পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশের পর অতটা বীভৎসা নেই। যথাসাধ্য গোছগাছে কিছুটা বিন্যস্ত ভাঙাচোরা দোতলা-বাড়ির একতলা। ওপরে বাড়িওলা, নিচে সাকুল্যে সাড়ে তিনটে ঘর নিয়ে দুটি পরিবার। পরিবার দুটিও ঠিক-ঠিক আস্ত কিনা নিজেদেরই সংশয়। শিপ্রাদের বাবা মারা গেছেন অনেক বছর আগে। অভিভাবক কাঞ্চনদা, পড়ন্ত যৌবনে ঠাণ্ডা গোছের মিনমিনে ভালো মানুষ। নিজেই অভিভাবকহীন!

বরং সেক্ষেত্রে প্রবীণ অখিল জানা অনেকটা ভরসা। এক্সরে-প্লেটের আদলে শীর্ণ বক্ষে আপাতত ধুঁকছেন ভদ্রলোক। শুধু রাজনীতিই করতেন এককালে। ধ্যানে জ্ঞানে দেশ মানুষ আর পার্টি। একমাত্র সন্তান, মেয়ের বিয়ে দিয়ে যখন ঝাড়া হাত-পা, বছরকয়েক হলো হাঁপানির টান নিয়ে খিদিরপুরে কোথায় এক আইসক্রিম কেক-পাউরুটির কারখানায় চাকরি নিয়ে ঢুকেছেন। স্ত্রী অণিমা জানা একটি বেসরকারি অফিসে কাজ করছেন দীর্ঘকাল। এককালের সক্রিয় রাজনীতির মানুষ অখিল জানা বহু বছর নাকি জেলও খেটেছেন যৌবনে। ইংরেজ আমলে। স্বাধীনতার পর পুলিশের লাঠির মার খেয়ে পাঁচের দশকে হাসপাতালেও গেছেন বারকয়েক। সমাজ বদলানোর দুরন্ত আবেগে সেদিন পার্টিই ছিল ঘরবাড়ি। কিন্তু সমাজ বদলায় নি। নিজেই বদলে গেছেন অনেকখানি। এখন স্মিতভাষী শান্ত। এখনও বিশ্বাস করেন—সমাজ বদলাবে। বদলাবেই। ইতিহাস মানুষের সপক্ষে।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর প্রায় প্রতিদিনই, যত রাতই হোক কাঞ্চনদা গেছেন বাড়িতে। উৎপলকে দেখতে। যেন তার প্রাত্যহিক কুশল সংবাদ বিশেষ জরুরি ছিল এদের।

ভেতরে ঢুকতে অখিল জানার সঙ্গেই প্রথম চোখের ধাক্কা। এক চিলতে বারান্দায় আদ্দিকালের পুরনো মাদুর পেতে খবরের-কাগজ পড়ছিলেন ভদ্রলোক। হাঁটু ভেঙে বসে দুটো হাঁটুর ডগায় কাঁধ দুটো সমতায় এনে হুমড়ি খেয়ে আছেন। উদোল গায়ে একটা বেগুনি রঙের লুঙ্গি পরনে। পাশে যথারীতি নস্যির-কৌটো এবং নিঃশেষ চায়ের কাপ। চশমা নামিয়ে চোখ-কুতকুত ঘাড় উঁচিয়ে তাকালেন। নিতান্তই উচ্ছ্বাসহীন—'আরে তুমি? এসো এসো। কেমন আছো এখন?'

'ভালো।' উৎপল হাসল।

অখিল জানা সশব্দে নস্যি গুঁজলেন নাকে। বিকট নাসিকা গর্জন। ছেঁড়াফাটা লুঙ্গিতে আঙুল ঝেড়ে ঝেড়ে নস্যির গুঁড়ো ওড়াতে ওড়াতে—'যাক, ভালো থাকলেই ভালো...'

ব্যস, অভ্যর্থনার দায়িত্ব শেষ। দু-হাতের নাগালের চেয়ে বড় খবরের-কাগজটাকে খশখশ খশখশ শব্দে ভাঁজ করতে করতে অখিল জানা আগতের প্রতি নিস্পৃহ হলেন। এবং উৎপল, পৃথিবীর সঙ্গে নবপর্যায়ে সঙ্গতিস্থাপনে যে-ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছুটা ভাবনা ছিল, তাঁরই সঙ্গে

মোকবিলায় প্রাথমিক রেহাই পেল। ছ্যাকছ্যাক একটা শব্দ ওদিকে ঘরের আড়ালে। বারান্দার অদৃশ্য কোণে। শিপ্রাদের রান্নার জায়গা। এদিকের বারান্দায় অণুকাকিমার উনুনে ঠাণ্ডা শাদা ছাই, শুকনো হাঁড়িকুঁড়ি।

'কাকিমা কোথায়? আজ তো রোববার!'

'বুলার কাছে গেছে।'

'ব্যারাকপুর?'

'হ্যাঁ, যোগেশের বাবা খুবই অসুস্থ। এ-কি, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? যাও, ঘরে গিয়ে বোসো..' দুটো পায়ের পাতায় শরীরের ভর রেখে, ঝুঁকে পড়ে মেঝেতে ছড়ানো কাগজটা আবার দেখতে শুরু করলেন অখিল জানা এবং পত্রিকায় চোখ রেখেই—'বৌদি, অ বৌদি, দেখুন কে এসেছে।'

'কে গো, ঠাকুরপো আমায় কিছু বলছেন?' অলক্ষ্যের কণ্ঠস্বর থেকে তড়িঘড়ি উঠে এলেন মাসিমা। এবং অতিথি নয়, উৎপলকে সশরীরে দেখে সত্যি-সত্যি স্বস্তির আকুলতা—'এসেছ বাবা! কবে যে আবার স্বচক্ষে দেখতে পাব তোমাকে, সেই থেকে ভেবে ভেবে মরছি। তবু সুখের কথা, মায়ের ছেলেকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন ভগবান...'

যেখানে কৈফিয়ত নেই, কৃতকর্মের জন্য আলগা হাসিটা ভাসিয়ে রাখতেই হয় ঠোঁটে।

'হ্যাঁ বাবা, কী যে কেটেছে কটা দিন! আমাকে তো নিয়ে যায় না কেউ...' হেঁসেলের এঁটো-হাত ধুয়ে এসেছেন মাসিমা। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে—'ওদের মুখেই যা শুনেছি। সবই এই কপাল বাবা। কার যে কখন কী হয়ে যায় আজকাল! খাবারদাবারের কত কি ভেজাল! দেখলে তো, কী হয়ে যাচ্ছিল। সব্বোনাশ। সাবধানে থাকবে। দোকানপাটে আর কিছু খাবে না এবার থেকে। পয়সায় পয়সা নষ্ট, তায় আবার বিষ...'

মানে! উৎপল স্তম্ভিত। বলছে কী বুড়ি!

চোখ টেরিয়ে একবার শুধু তাকালেন অখিল জানা। উৎপল আরো এক বড় ধাঁধায়। কিন্তু বিষয়টা বুঝে ওঠার আগেই মাসিমার ব্যস্ততা—'তোমরা কথা বলো বাবা। আমি চা করে আনি। কি গো ঠাকুরপো, আপনারও চাই নাকি এক কাপ?'

অখিল জানা তাঁর নিবিষ্টতা থেকেই না তাকিয়ে—'দেবেন একটু। আধ কাপ।'

তখনও, একই ভাবে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থ্রিলার পড়ার উত্তেজনায় ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকীয় পড়ে যাচ্ছেন বুড়ো। এত অঢেল সময় আর ধৈর্যও নাকি থাকে মানুষের? না-পড়ার জন্য ছাপা হয়, সেখানেও কাঁকর খুঁজতে হবে? উৎপল পাশ কাটিয়ে ঘরের দিকে এগোল।

সাতপুরুষের সঞ্চিত সম্পদ খোয়াতে খোয়াতে অবশিষ্টটুকু যা আছে অথবা নিত্য-প্রয়োজনে নিজেদেরও যেটুকু সংগ্রহ, তার সবই যেন এই একটা ঘরে! উই ইঁদুর আরশোলার সঙ্গে প্রাত্যহিক সংগ্রামে অক্লান্ত শিপ্রা বইপত্র বাঁচিয়ে, নিজেদের রক্ষা করে, এখানে, এই অন্ধকার থেকেই কী এক অলৌকিক মায়ামন্ত্রে এম. এ. পাশ করে ফেলেছিল একদা—দর্শনে। ওদের বাবা মারা যাবার পর হিস্ট্রি অনার্সের ওপরে আর এগোতে পারেন নি কাঞ্চনদা। বয়স থাকতে থাকতে সরকারি চাকরিটা পাকড়ে ফেলেছিলেন। পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের কেরানি।

অধিকতর মরণ—খামোকা কবিতা লেখে লোকটা এবং সেগুলো আবার ভদ্র-পত্রিকায় ছাপাও হয়।

দিনদুপুরে ঘরের আলো জ্বেলে বিছানায় উপুড় হয়ে কী লিখছিল শিপ্রা। বুকের কাপড় সামলে উঠে বসল ত্রস্ততায়। হাঁটু-গোড়ালির দিকে বাঁ-হাত।

'আমি এসেছি। টের পাও নি?'

'পাব না কেন?'

'এত চুপচাপ!'

বিছানা থেকে নামল শিপ্রা। খুশি-অখুশিতে উত্তাপহীন—'সরো...'

ঘরের একমাত্র দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল উৎপল। শিপ্রা বেরোবার উদ্যোগ নিলো।

'কাঞ্চনদা কোথায়?'

'সপ্তাহে একটা ছুটির দিন। ঘরে থাকবে কেন? গেছে কোথাও আড্ডায়। হয়তো কফি হাউস।'

'আধুনিক কবিতা! কবিদের আড্ডায়?'

'হতে পারে। ওতে ঠাট্টার কিছু নেই। নাও সরো...'

'সরো সরো করছ কেন বলো তো তখন থেকে! কী! কাপড় ছাড়বে?'

চোখে চোখ রেখে শিপ্রা হেসেই ফেলল—'উঃ, পারোও বটে তোমরা। তোমার কি সত্যি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? একটা ডিসেন্সি নেই? ওদিকে অখিলকাকু, এদিকে মা। ভরদুপুরে ঘরে বসে বসে বকবক করব নাকি তোমার সঙ্গে? এ-বাড়িতে তোমাদের আধুনিকতাটা এগোয় না বেশি দূর। নাও, বেরোতে দাও...'

এক ধাক্কায় শিপ্রা তখন ঘরের বাইরে—'দাও মা, চা-টা আমিই করছি।'

'সে-কি আর বসে আছে তোর জন্যে! যা, নিয়ে যা। হাতে হাতে দিয়ে দে। ছোট কাপটা চিনি-ছাড়া—ঠাকুরপোর। উৎপলকে দুটো বিস্কিট দিস।'

ঘোড়ার গর্দানার মতো লুঙ্গি-চাপা হাঁটুজোড়া মুড়ে তখনও ঘাড় গুঁজে কাগজ পড়ে যাচ্ছেন অখিল জানা। টেন্ডার-নোটিশ সিচুয়েশন-ভেকেন্ট সিচুয়েশন-ওয়ান্টেড সিনেমা-থিয়েটার স্যুটিংশার্টিং তন্তুজ শাড়ি স্টেট-লটারির বিজ্ঞাপন সবই কি পড়েন নাকি ভদ্রলোক? মায় 'আজকের দিন কেমন যাবে' বা শেয়ারমার্কেট, রেসের ঘোড়া, খেলার খবর? কাছাকছি এসে উৎপল আশ্বস্ত হলো—স্টেট্‌স্‌ম্যান নয়, এবার দিল্লীওয়ালী ইংরেজি সাপ্তাহিক। এক সকালেই তাবৎ বিশ্বজ্ঞান!

ভদ্রলোকের জন্য মাদুরে চায়ের কাপটা রাখতে নিচু হয়েছিল শিপ্রা। যেন আঁচলের বাতাসেই স্পর্শ পেলেন—'কি গো বড়মা, লিখেটিখে দিয়েছ ওদের? ভেবেচিন্তে যা-হোক একটা-কিছু জানিয়ে দাও। ওটা ভদ্রতা। আমাদের দেশে আবার ও-বস্তুটার বড্ড অভাব।'

'ভাবব আবার কী? অ্যাকসেপ্ট করব। সেই চিঠিটাই তো লিখছিলাম এতক্ষণ। আজই পোস্ট করে দেব...' দ্বিতীয় কাপটা উৎপলের হাতে তুলে দিতে দিতে শিপ্রা হাসল—'জানো, কাল একটা চিঠি এসেছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার...'

'কোথায়?'

'জানো তো তুমি। সেই যে কাকুর সঙ্গে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। তারকেশ্বর থেকে দুটো না তিনটে স্টেশন আগে হরিপাল। সেখান থেকে আবার বাসে পনের-কুড়ি মিনিট। বটকৃষ্ণ ঘোষ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। কো-এডুকেশন। শেষ পর্যন্ত কাকুর জন্যেই তবু যা-হোক হলো একটা কিছু...'

'সে-তো আরেক অ্যাবসার্ড ব্যাপার।'

'ওমা, সে কি!'

'ধ্যাৎ, হয় নাকি এটা! ইম্পসিবল্...' উৎপল ঠাণ্ডা গলায়—'বেলা নটা সাড়ে নটায় অফিসের পিক-আওয়ারে ভিড়ের বাসে চেপ্টে ঘেমে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে রেলগাড়িতে ঘণ্টাখানেক। তারপর আবার বাস-কি-রিকশ! ব্যস, এগারটা তো বেজে গেল। সই করবে কখন? পড়াবে কী?'

'সেই যদি হয়, আরো আগে বেরোতে হবে।'

'আগে মানে? কত আগে? ঘুম থেকে উঠেই চায়ের বদলে ভাত খেয়ে ছুট? ফিরবে সেই সন্ধেবেলা? এভাবে রোজ রোজ? গ্রামের ছেলেমেয়েদের মানুষ করবে তুমি? কাঁচকলা। রোজ তো ক্লাশে বসে বসে ঘুমোবে।'

'ক্লাশে ঘুমোব?' শিপ্রা হেসে ফেলল—'কি বলছ? শুনতেই তো কি রকম বিচ্ছিরি লাগছে আমার।'

'ও-প্রথম প্রথম। তারপর আর কিছু বিচ্ছিরি লাগবে না। এদেশে সবাই তাই করে। স্কুলে কলেজে অফিসে ব্যাঙ্কে সবাই ঘুমোয়।'

'যাক গে ছাই। মাইনেটা তো পাব।'

'হ্যাঁ, সেটা বলো। ওটাই আসল কথা। হ্যাঁ, সেটা পাবে। নিশ্চয়ই পাবে। এদেশে পাবলিক মানিটা পুকুরপাড়ের শাকপাতা। পুকুরের মালিক থাকে, পুকুরপাড়ের থাকে না। যত পারো তুলে নাও। এমনি না পারো, পলিটিকস করো। দেয়ার মাস্ট বি এ লিডার এভরিহোয়্যার। লিডারের গা ঘেঁষে থেকো...'

ঘোড়ার গর্দানা হাঁটুজোড়াকে দুহাতে জাপটে ধরে বাচ্চাদের রকিং-হর্সের কায়দায় অখিল জানা দোল খাচ্ছিলেন। ভ্রূকুটি তুলে থেমে গেলেন। বললেন না কিছু। তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ করছিলেন শব্দ বাক্য কথা নিয়ে যুবক-যুবতীদের ব্যাডমিন্টন খেলা।

চা-টা ভালো লাগছিল। কিন্তু চাপা হলেও, মৃদু একটা পচা গন্ধ কোথাও। অস্বস্তিবোধে উৎপল ঘ্রাণের উৎস খুঁজছিল। এ-বাড়িতে যা অসম্ভব খুঁজে পাওয়া। কোম্পানি-আমলের প্রাচীন দোতলা বাড়ির পেছনের দিকে হয়তো চাকরবাকর সহিসরা থাকত পুরাকালে। এখন দেউলে বাড়িওলার দেউলে ভাড়াটেরা। ইংরেজি 'এল' ধরনের ঘর-বারান্দার সঙ্গে প্রতিবাসী বাড়ির সীমানা মিলিয়ে দশ-বারো বর্গহাতের একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে দেয়াল ঘেঁষে জলের-কল খোলা-চৌবাচ্চা। ইঁদুরগুলো নাকি খুঁটে খুঁটে গর্ত খোঁড়ে মাটির তলায়, পাকা-বাড়ির ভিতে। এবড়ো-খেবড়ো ফাটল-ধরা মেঝেয় হাড়-জিরজিরে ফাঁক। এখানে গর্ত ওখানে গর্ত। গর্তে গর্তে

সারাক্ষণ জল। পচা জলে এঁটোকাঁটা ভাতের-দানা বাসন-মাজার ছাই। হাইড্র্যান্ট থেকে উঠে আসে ইঁদুর আর ছুঁচো। রান্নার জায়গায়, শোবার ঘর পর্যন্ত ছুটে ছুটে যায়। আরো মারাত্মক—ওপাশে জ্যান্ত টিটেনাস জং-ধরা পুরনো টিনে দরজা বানিয়ে দুই পরিবারের এজমালি পায়খানা। সেখানেই বালতি ভরে জল তুলে নিয়ে মেয়েদের স্নান। বৃথা কার্যকারণ উৎসের সন্ধান। পচা একটা দুর্গন্ধ তো থাকতেই পারে এখানে কোথাও। মেথর একবারই আসে, ভোরবেলা। কতটুকু আর ক্ষমতা একটা বেসরকারি ঝাঁটার?

এদের বারান্দায় কোনো চেয়ার বা টুল নেই। প্যান্টের অসুবিধা নিয়েই উৎপল বারান্দার ধার ঘেঁষে মেঝেতে বসল চায়ের কাপ হাতে।

'কি গো বড়মা, কাঞ্চন আসুক। দাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওদের জানিয়ে দাও—'তুমি ওখানে যাচ্ছো না।'

'ওমা, সৈকি!' কেঁপে উঠল শিপ্রা—'কেন?'

'ঠিকই তো বলেছে উৎপল, ও-মাস্টারি তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা! যাতায়াতের কষ্ট, সময় নষ্ট—এসব তো আছেই। তার ওপর গ্রীষ্মে বর্ষায় রোজ গিয়ে টানা কাজ করে যাবার ধকল। ও-তুমি পারবে না...' হালকা শরীর মুচড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইছেন অখিল জানা। বিলম্বিত নিশ্বাস টেনে টেনে দীর্ঘায়ত উচ্চারণের ঝোঁক—'করো। ভেবেচিন্তে যা ভালো বুঝবে, করো একটা কিছু।'

শিপ্রা উৎপলের দিকে তাকাল। এ-বাড়িতে, এখনই, তার সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে ওর একটা কথা সর্বসমক্ষে গুরুত্ব পেয়ে গেলে নিজেরই অস্বস্তি বাড়ে। সে ঝাঁঝিয়ে উঠল—'বললেই তো হবে না কাকু। একটা চাকরি সোজা কথা নয়। গত দেড় বছরে কয়েক ডজন অ্যাপ্লিকেশন করে গোটা দশ-পনের ইন্টারভিউ দেবার পর যা-হোক একটা জুটেছে অ্যাদ্দিনে। ছেড়ে দেব? ইয়ার্কি নাকি? এটা ছেড়ে দিলে কে আমাকে পাইয়ে দেবে আরেকটা?'

'ওসব চাকরিফাকরি ছেড়ে দেবার কথা আমি কাউকে বলি নি কাকু...' উৎপল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—'হাউ স্ট্রেঞ্জ! ওসব কথা বলার আমি কে? সে-আপনারা বুঝবেন। আমি বলেছি, এখনও বলছি, ইম্পসিবল্। ওর পক্ষে ইট ইজ অ্যান ইম্পসিবল টাস্ক। ছেলেরাই হিমশিম খাবে...'

সোজাসুজি তাকালেন অখিল জানা। শান্তভাবে—'তুমি তো আরো অনেক কিছুই বললে, শুনলাম। দেশ জুড়ে মানুষজন শুধু ফাঁকি মেরে পয়সা কামাচ্ছে। কেউ কোথাও কাজ করে না। দেশটা তাহলে চলছে কী করে? হাওয়ায়?'

'দেশটা যে চলছে, সেটাই বা কে বলল আপনাকে? সে-তো আপনাদের জনকয়েক পণ্ডিতদের মগজে...'

ঠোঁট দুটো চিরে একটু হাসলেন অখিল জানা। ললাট কুঞ্চনে—'আপিশে কাজ না-করার জন্যেই কি তোমার চাকরিটা গেল নাকি উৎপল?'

উৎপল নাড়া খেল। কেন না, প্রশ্নটা বড় সরাসরি। যুদ্ধং দেহি আহ্বান। শিপ্রার দিকে এক পলক চোখ ঘুরিয়ে হঠাৎ ঝলসে-ওঠা ক্রোধে, প্রত্যাঘাতে—'না দেশ জুড়ে যে-ফ্রাঙ্কেনস্টাইন[4] বানিয়ে তুলেছেন, আমি তার ভিকটিম্।'

'আমরা! আমরা বানিয়েছি? আমরা কারা?'

'ওই...ওই আপনারা, যাঁরা বিপ্লবটিপ্লব কী সব বলেন...'

অখিল জানা হাসলেন। খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ির তোবড়ানো গালে ঠোঁটের প্রান্তব্যাপী হাসিটা আরো প্রশস্ত হলো—'মোটা মাইনের অমন বাহারের চাকরিটা যদ্দিন ছিল, এসব সুন্দর সুন্দর কথা তো তোমার মুখে শোনা যায়নি কখনও। মানুষের কোনো মিছিলেও তুমি ছিলে না কোনোদিন।'

'মিছিল? মিছিল আপনাদের?' কী এক যন্ত্রণায় অধীর উৎপল বিষাদভারে—'ওই, ওই যেখানে ভিড় বাড়াবার জন্যে সেন্ট পলের মতো আপনাদের নেতারাও একটা করে পোস্টার ধরিয়ে দেন সবাইকে—আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে ডি.এ. দিব...'

মধ্যবর্তী শিপ্রা কলকলিয়ে উঠল—'বাঃ, বেশ বললে তো! কী, কী কথাটা? ওরিজিনাল?'

'না, কোন্ একটা নাটকে দেখেছিলাম।'

'ও, তাই বলো।'

'হ্যাঁ, ওই নাটক-নভেলেই তো খেলো তোমাদের...' ওপাশ থেকে অখিল জানা—'বাহারের সব সুন্দর সুন্দর কথা। শুনতে ভালো লাগে। ও-সব কোনো কাজের কথা নয়।'

'সুন্দর কথা নয় কাকু। সত্যি কথা। ওটাই কাজের কথা।'

'ওভাবে একা-একা নিজের সুখটুকু নিয়ে বাঁচতে চাইলে ও-রকম বাহারের কথাগুলো নিয়েই বাঁচতে হয়...' শব্দগুলি খুবই আলগাভাবে উচ্চারণ করলেন অখিল জানা। নস্যির কৌটোটা হাতে তুলে নিয়েছেন। কৌটার মাথায় আঙুল ঠুকতে ঠুকতে—'কাজ না করে মাইনে নেওয়া খারাপ। মাইনে নিয়ে কাজের ভুল করা, কতগুলো বজ্জাত-বদমাশের কাজে মদত দেওয়া আরো খারাপ ব্রাদার। ফেঁসে গেলে তখন ইন্‌ডিভিজুয়াল ডিসিশন। শেষ পর্যন্ত ফেটাল কিছুও ঘটে যেতে পারে। ঘটেও তো যাচ্ছিল...'

ক্রুদ্ধ যুবক ঝাঁঝিয়ে উঠল। সবিক্রমে—'আপনি কিন্তু উল্টোপাল্টা বলছেন এবার। ঘটনাটা পুরোপুরি জানেন না। যারা অর্ধেক জানে কিংবা কিছুই জানে না, তাদের কাছে শুনে...'

'জানি জানি, সব তো বলার দরকার হয় না। শোনারও দরকার নেই...' অর্বাচীনের স্পর্ধায় ক্রোধের মাত্রা চড়লে কফের টান। বুকে হাত রেখে, খকখক কাশির গমকে নিজেকে সামলে নিতে অখিল জানা সত্যি বিপন্ন। কাশতে কাশতে দেয়াল ধরতে চাইছেন হাত বাড়িয়ে। বসে পড়লেন মাটিতে।

শিপ্রা ঘাবড়ে গেল। আরো জটিলতর কিছু ঘটে যাবার আগেই ছুটে গিয়ে—'আঃ থামো না ছাই। কী হচ্ছে তোমাদের? কথা বলবে বলো, কিন্তু একি! এভাবে ক্ষেপে গেলে কেন দুজনই...' উৎপলের দিকে সরাসরি তাকিয়ে—'ভর দুপুরবেলায় স্নান খাওয়া নেই তোমার? যাও, বাড়ি যাও...'

এবং কাকুকে জড়িয়ে ধরে—'তুমি! তুমিও কি পাগল হলে কাকু! কাল রাতেও তোমার শরীর খারাপ ছিল। তোমাদের দুজনেরই এখন রেস্ট দরকার...'

ঠিক তখনই স্তব্ধ দুপুরের কাকের ডাকে হঠাৎ ডিস্‌কো-দেওয়ানা। নতুন ক্যাসেট

টেপরেকর্ডার কিনেছে পাশের বাড়ির মুখুজ্জেদের ছেলেমেয়েরা। কিবা দিন কিবা রাত ওদের। প্রতিবেশীরা নিদ্রাহীন।

উনুন থেকে উঠে এসেছেন আধময়লা শাদা থানে মেঘময়ী মাসিমা—'কী? কী হলো তোমাদের? ঝগড়াতক্কো কেন অত?'

ত্রস্ত ব্যাকুলতায় অখিল জানার দিকে মাসিমার ছুটে যাবার দৃশ্যে, উৎপল আরো বেশি হতচকিত বিহ্বলতায় দুহাতে চুলের মুঠি চেপে ধরে আবার হাঁটু ভেঙে বারান্দায় এসে বসল।

অখিল জানা অনেকটাই সামলে নিয়েছেন এবং তাঁর বড়মা—অর্থাৎ শিপ্রার কাঁধে হাত রেখে, উঠে দাঁড়িয়ে, পলকে পাল্টে ফেলেছেন নিজেকে। হেসে—'দুর পাগলী, আমি কি ঝগড়া করছি নাকি ওর সঙ্গে? ও-ব্যাটা স্টেনগান বের করেছিল, আমি মেশিনগানে জবাব দিচ্ছিলাম। আসলে দুটোই তো খেলনা...' বৌদিকে পাঠালেন তাঁর হেঁসেলের সেরেস্তায়—'যান, যান তো আপনি। কিছু হয়নি আমার। তিনটে তো প্রাণী। কী এত করছেন সকাল থেকে? একটা গরম উনুন নিয়ে এতক্ষণ।' .

একাদশী-ফেকাদশীর কিসব দোহাই বকতে বকতে মাসিমা চলে যাবার পর, চোখ টেরিয়ে উৎপল লক্ষ করল, বারান্দা থেকে জল-শ্যাওলার স্যাঁতসেতে ফাঁকা জায়গাটায় নামলেন অখিল· জানা এবং তারই দিকে—'এই, এই ছেলে! বোসো, বসে থাকো ওখানে। কোনো রকম টেনশনে থাকা উচিত নয় তোমার। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো। এই তো বয়েস। এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেলে চলবে কী করে? পেসিমিজ্‌মের বাতে ধরলে যে আর কিছুই করার থাকবে না ব্রাদার। বড্ড বাজে জিনিস...'

কানে বাতাসে জোরদার ডিস্‌কো-দেওয়ানা তখন। উৎপল বিপাকে। আরো জোরদার এক প্রতিপক্ষকে আচমকা নাগালের মধ্যে পেয়ে যখন তার এতদিনের রাগঝাল অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে পড়ার সুযোগ পেয়ে মুক্তি খুঁজছিল, তখনই আরেক ঝঞ্ঝাট, সে-মানুষ নিজেই বড় বেশি কাবু। দুহাতের আঙুলে ঝাঁকড়া চুল নিড়োতে নিড়োতে মাথা তুলল সে। নাক-চোখ কুঁচকোনো তিক্ততায়—'কথাগুলো আপনাদের বলে যেতেই হবে, না কাকু? কাশতে কাশতে কফে রক্ত দেখে আঁতকে ওঠার পরও একই ভাবে মন্ত্রের মতো?'

শিউরে উঠলেন অখিল জানা এবং সঙ্গোপনে নিজেকে লুকোতে যখন আবার ঘরের দিকে পা, হঠাৎ পেছনে

'যে-মরালিটির ওপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কাকু, ওতে তো চারদিকে লোকজন কাবুর সঙ্গে এক জায়গায় বসে কথা বলাও উচিত নয় আপনার...'

গতিভঙ্গে থেমে যেতে হয়। ফিরলেন অখিল জানা—'ফের তুমি বানানো-বানানো সুন্দর কথাগুলো বলতে শুরু করলে?

'সুন্দর কথা না। সত্যি কথা...' কী এক দুর্বোধ্য অস্থিরতায় চঞ্চল উৎপল। আবার লাফিয়ে উঠে—'বোঝেন না কেন, আপনাদের মতো লোকজন নেই বি. বি. ডি. বাগের তল্লাটে। থাকলেও চোখে দেখা যায় না তাঁদের। আমার ব্যাঙ্কের বা নানান অফিসের নেতাদের আমি চিনি...'

'এই, এই আবার শুরু হলো তোমাদের...' মধ্যবর্তী শিপ্রা ভয় পেল এবং উৎপলকে—'আঃ,

থামো তো তুমি। খালি বকবক বকবক। বেলা তো অনেক হয়েছে। ক্ষিদে পায় না তোমাদের? যাও, বাড়ি যাও...'

অট্টহাস্যে মুখর হলেন অখিল জানা—'হ্যাঁ গো বড়মা, তোমার এই বন্ধুটি কিছু জানে না। খালি লম্বা লম্বা কথা...'

এগিয়ে এসে উৎপলের পিঠে সস্নেহ চাপড়—'তাইতো হবে ব্রাদার, সেটাই স্বাভাবিক। ধবধবে ফর্সা জামাপ্যান্টে হাওয়ায় উড়ছ তোমরা বাবুরা। পার্ক স্ট্রিট কি চৌরঙ্গির রাস্তায় সাহেবি দোকানপাটের কাচে সুখের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে শ্রেণীঘৃণা জন্মায় না তোমাদের কারুর। শ্রেণীঈর্ষা বাড়ে। তখন কপালে চাপড়ানো ফালতু হাহুতাশ। না-পাবার দুঃখু আর ন্যাকামো...'

উত্তেজনায় সেভাবে আর ক্ষেপে যাওয়া নয়। চোখ টেরিয়ে দেখল উৎপল—মেঝে থেকে ভাঁজ করা কাগজ আর মাদুরটা তুলে নিয়েছে শিপ্রা। ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে এবং এবার সত্যি সত্যি ফিরে যাচ্ছেন ভদ্রলোক—'চলো গো বড়মা, আমার সঙ্গে চলো একদিন। দেখবে—মানুষ। গার্ডেনরিচ তারাতলা টিটাগড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে। বিচ্ছিরি সব বস্তিফস্তি। পায়রার খুপরির চেয়েও খারাপ নোংরা সব ঘরদোর। অথচ কোনো দুঃখুফুঃখু নেই। টগবগ করছে সবাই। মিছিলে কিংবা প্রোটেস্ট র‍্যালিতে সে-কি জঙ্গী মেজাজ ব্যাটাদের। আবার এই হারামজাদারাই রাত্তিরে তাড়ি গিলে এমন হুজ্জুতি বাধাবে! খুনদাঙ্গা মারপিট রক্তারক্তি তো লেগেই আছে। হামেশাই ঘটছে। কিন্তু বেইমানির ক্ষমা নেই! কুপিয়ে মারবে বেইমানদের। তোমাদের ওই শখের ফ্রাস্ট্রেশনও নেই। বাবু তো নয়...'

প্রত্যাঘাতে গাত্রদাহের রক্তপ্রবাহ যখন ছত্রভঙ্গ সেনাদলের মতোই দিশেহারা, বিব্রত হতে হয় নিজেকে নিয়েই। দুহাতের তেলোয় গালচিবুক ঘষতে ঘষতে উৎপল লোকটাকে দেখল আরো একবার। বইকেতাবের থিয়োরি আর কথার দুর্গে কী নিশ্চিন্ত বসবাস মানুষগুলোর? জীবনের শেলেটে কত তো অঙ্ক কষলেন মশাই। জল-ন্যাকড়ায় মুছলেনও কতবার। এখন কেন ধুঁকছেন? প্রশ্নটা তেড়েফুঁড়ে ফেটে বেরোতে চাইলেও উৎপল হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে বারোটা! ঝমঝমাঝম হিন্দী ফিল্‌মি গান ছাড়াও বোধ হয় বাড়িওলার রেডিও-এ 'বিবিধ ভারতীর' বাংলা নাটক! এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল সে। ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছেন অখিল জানা। শিপ্রাও। সে নিজেও গুটিগুটি সেদিকেই এগোল।

প্রথাসিদ্ধ দুটো জানালা থাকলেও প্রায় অর্থহীন। অন্ধকার গুমোট একটা ঘর। দুটো তক্তপোশ আর শস্তা টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র ছাড়া আসবাবপত্রও বিশেষ কিছু নেই। বেরিয়েই আসছিল শিপ্রা। থমকে দাঁড়াল—'উঃ আবার! আবার তুমি এখানে এসে ঢুকেছ?'

উৎপল আমল দিলো না। সোজাসুজি অখিল জানাকে—'একটা কথা বলব?'

তাকালেন অখিল জানা।

'কবিতাটা ভালো কি মন্দ, সে-পরের কথা কাকু। কিন্তু আজ থেকে ষাট সত্তর আশি বছর আগে বাংলাদেশের একজন মেঠো কবি বলতে পেরেছিলেন—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই। দীন দুঃখিনী মা যে মোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই....'

'রজনীকান্ত সেনের গান। ছেলেবেলায় খুব শুনতাম। আমার বাবা তাঁর নিজের মতো করে

গাইতেন।'

'শুধু আপনার বাবা নন, গোটা বাংলাদেশ জুড়ে শিক্ষিত নিরক্ষর সব মানুষের মধ্যে পপুলার শ্লোগান হয়ে উঠেছিল একটা গান। তার কারণ দ্যাট ওয়জ দ্য পলিটিকস্ অব দ্য ডে। পারবেন আপনারা? আপনাদের নেতাদের সাধ্যি আছে কারুর, এমন করে দেশের সব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন—'গরিবী হটাও'। না ওটা হোক্স। আসল শ্লোগান হবে—বড়লোকি হটাও...'

প্রত্যন্ত গভীরে হয়তো কোনো স্তব্ধ বিস্ময়। ক্ষণিক বিহ্বলতা থেকে বেরিয়ে এসে অখিল জানা দু-চার কদম এগোলেন। হাসতে হাসতে—'সময় তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই ব্রাদার! দিনকাল বদলেছে। এত বড় একটা দেশে যাঁরা কাজকম্মো কিছু করছেন, ওঁদেরও তো বলার আছে কিছু...' এবং পরক্ষণেই, একেবারেই ভিন্ন মেজাজ—'বেলা তো প্রায় একটা বাজে বোধ হয়! বাড়িঘরে যাবে না তুমি? দ্যাখো দ্যাখো কীভাবে তাকিয়ে আছে মেয়েটা? আমাদের এক নম্বর গার্জিয়ান...'

উৎপল বিরক্ত হলো। বয়সের দোহাইয়ে শেষপর্যন্ত সেই পিঠ-চাপড়ানোর ভঙ্গি! যা অসহ্য তার কাছে। কিংবা কথাটা সত্যি! ঘড়িতে বারোটা চল্লিশ। স্বেদস্রুতির মতো আগ্নেয় ক্রোধটাও যখন ভেতরে ভেতরে থিতিয়ে আসে, অর্থহীন মনে হয় সবটাই। শ্লথ পায়ে পিছিয়ে আসতে হয়।

ওদিকে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, ব্যাটাছেলেদের পণ্ডিতি বোলচালে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন ছিলেন না পার্বতী। বারান্দার এক কোণে রুটি সেঁকছিলেন তোলা-উনুনে। উৎপল সামনে গিয়ে দাঁড়াল—'যাই মাসিমা....'

'যাই বলতে নেই বাবা, এসো। আবার আসবে...' শাদা থানে মেঘময়ী মাসিমা চোখ তুললেন—'আজ আবার একাদশী। ভেবেছিলাম, কিছু করব না। গোটা কয়েক কলা আছে। দুটো সাগু ভেজানোতেই চলে যাবে একটা দিন। তা মেয়ে কি শোনে সেসব? জোর করে ফের সেই কয়লা দেওয়ালো উনুনে। আজ তো কথাই বলতে পারলাম না তোমার সঙ্গে। সাবধানে থেকো বাবা। দেখলে তো, কী বিপদটা বাধিয়ে তুলেছিলে! রাস্তাঘাটে আজেবাজে জিনিস আর খাবে না ওসব...'

কানাগলি থেকে সরকারি সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত শিপ্রা পায়ে পায়ে—'অখিলকাকুর সঙ্গে ওভাবে মুখ ঝামটে কথা বললে কেন তুমি? বুড়ো মানুষ!'

'ধ্যাৎ, কথামৃত গোছের ফালতু বুকনি একদম ভাল্লাগে না আর। মেজাজ চড়ে যায় ওসব শুনলে...' দীর্ঘ সময় বাদে সিগারেট বের করার সুযোগ। উৎপল তিরিক্ষি হলো—'ছাত্ররা পরীক্ষায় ফেল করলে মাস্টারমশাইকে ধাতানি খেতেই হবে একটু। ও-করার কিছু নেই।'

দুপুরবেলার শান্ত কলকাতা! চুপচাপ নিজেকে সামলে নিয়ে শিপ্রা ঠাণ্ডা গলায়—'তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছো! আমার ভয় করে।'

হাতের সিগারেটটা নিয়ে আঙুলে খেলতে খেলতে উৎপল শাসনের ভ্রূকুটিতে তাকাল।

ওপাশ থেকে আসছিলেন একজন মহিলা। পেছনে কে. জি. স্কুলের বাচ্চা। মায়ের হাতে বইয়ের বাকসো, জলের প্লাস্টিক-বোতল। সারা গায়ে গলগল ঘাম। আড়াই হাত চওড়া রাস্তায়

তাঁকে পথ দিতে উৎপলকে দেয়ালে পিঠ ঠেসে দাঁড়াতে হয়। ভদ্রমহিলা, পাড়ারই কেউ, যেতে যেতে শিপ্রার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। একই ভাবে শিপ্রার ঠোঁটে সৌজন্য-হাসির রেখা। হাসিটুকু শুকোয়—'তুমি যে এরকম সাংঘাতিক একটা কাণ্ড করে বসেছিলে, মা জানেন না কিছু! বলা হয়েছে, বন্ধুদের নিয়ে দোকানে বসে কী-সব খেয়েছ, তাতেই সিরিয়াস ফুডপয়জনিং গোছের...'

'শুধু তোমার মায়ের জন্যেই এ-মিথ্যেটুকু?'

দুপুরের নির্জনে একটা কাক ডাকছিল কোথায়! কাছাকাছি রাস্তার জঞ্জালে দুর্গন্ধ। নাকেমুখে-চাপা আঁচলটা আরো গাঢ় হয় শিপ্রার হাতের মুঠোয়। গলার স্বর ম্লানতর—'সেদিন অনেক রাতে ঘরে ফেরার পর যখন সহ্য করতে পারছিলাম না কিছুতেই, দাদা আর অণুকাকিমাও স্থির থাকতে পারছিলেন না, তখনই ঠিক করলেন ওঁরা—মাকে জানানো হবে না...'

সিগারেটে বারদুয়েক নিঃশব্দ শোষণ। উৎপল নিজের গভীরে নিশ্চল।

'কী যে ভয়ে ভয়ে ছিলাম এতক্ষণ! এই বুঝি তর্কে তর্কে বলে দিলে কিছু। মা জেনে গেলে...'

'আমার বাবা-মা নিজের চোখে দেখলেন সব। এখন ব্যাঙ্কের গোলমালগুলো সবই জেনে গেছেন। শুধু তোমার মায়ের জন্যেই এ-মিথ্যেটুকু কেন?'

চোখে চোখ রেখে তাকাল শিপ্রা। আঁচল-চাপা ঠোঁটে বা গালের ভাঁজে চঞ্চল চোখের ভাষা স্পষ্ট ছিল না। বাতাসে মরা-ইঁদুরের গন্ধ সত্ত্বেও মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে সচল হলো—'অনেক হয়েছে। যাও তো, ঘরে যাও। হাতেই তো ঘড়ি। কটা বেজেছে দেখেছ! নিজের বারোটা তো বাজিয়েছ। এখন আমারটাও বাজাবে, সে-তো জানিই। দাদাটাও যে কী! এখনও ফিরছে না। জানে আজ মা-র একাদশী...'

এবং ঘরে ফেরার পর আরেক হট্টগোল। মূর্ছিতা মা।

খোদ হেড-কোয়ার্টার থেকে পুলিশ এসেছিল সকালবেলা। যেহেতু দুই ছেলের কেউই বাড়ি ছিল না, বাবাই ঘরে বসিয়ে চা-মিষ্টি খাইয়েছেন অফিসারদের। কথাও বলেছেন ঘণ্টাখানেক।

অফিসাররা আবার আসবেন কাল সকালে। আপাতত কোনো ভাবনার হেতু নেই। ওয়ারেন্ট গোছের কিছু হাতে নিয়ে আসেন নি তাঁরা। একই সঙ্গে সুইসাইড এবং ব্যাঙ্কের ঘটনা সংক্রান্ত কিছু তথ্য সংগ্রহই উদ্দেশ্য।

প্রচণ্ড এক ঘূর্ণ্যাবর্ত তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের কোথায় কোন্ মধ্যাঞ্চলে! ঘণ্টায় পাঁচশো সাতশো কিলোমিটার বেগগামী ঝড় আছড়ে পড়ার আশঙ্কা পোড়োবাড়ির ভাঙা দরজাটায়। ভঙ্গুর মানুষগুলোর জন্য কিছুমাত্র বিচলিত নয় সে। ভাবনা নিজেকে নিয়েই। এবার লড়াইটা তার একার। নিজের টিকে থাকার।

সুতরাং গা ভরে রাগ ছিল। পায়ে কড়া-পড়ার মতো একটা বাড়তি উৎপাত শরীরে। যার উপশম-চেষ্টায় শুধু বেড়েই যায় সেটা। বাড়তেই থাকে। পুলিশ আসবে ঘরে! শুধুমাত্র সংবাদটুকু ছুঁয়ে যেতেই হাটবাজার বন্ধ, রান্নাবান্না স্থগিত। ভাঙাচোরাভাবে যে-যার অবস্থানে

ঝিমিয়ে পড়ে আছে ঘরের মানুষগুলি! অর্থাৎ হাসপাতাল থেকে মৃত্যুসংবাদ বা ডেথ-সার্টিফিকেট নিয়ে ঘরে না ফেরার চেয়ে আরো বেশি বিপদ—মরতে-চাওয়া মানুষটাকে ঘরের মধ্যে জিইয়ে রাখা। মরণ যার ছায়া!

আশ্চর্য! প্রতিবিম্বে উৎপল নিজেও সেই মরা-মানুষটাকেই দেখল। আরশিতে মুখ ফেললে ফিরতি চালে প্রতিবারই ভেংচিটা চলে আসে নিজের দিকে। তখনই ঝাঁ করে ওঠে মগজটা। মরে যাবার সিদ্ধান্তটা কী ভুল কী ভুল!

ব্রাশ ব্লেড সেফ্‌টি-রেজার টিউবক্রিম জলের-বাটি—টেবিলের ওপর সাজানো সব আয়োজনই বাতিল হয়ে যায়। ছোট আরশিটা মুখোমুখি রাখার পর 'আমি'টাকে নিয়ে আরেক ঝঞ্ঝাট—এভাবে নিজেকে চিনে নেবার জন্য বেঁচে না-ও থাকতে পারত কেউ! কিন্তু বেঁচে আছে!

উৎপল তাকিয়ে থাকে। আত্মরতির আরেক ক্রীড়া

এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময়, বাঁপাশে ভ্রূ ছুঁয়ে, ভ্রূকেশ জঙ্গলে হঠাৎই আবিষ্কার—ছোট, খুবই ছোট কালো একটা বিন্দু। আঙুল ঘষে ঘষে বারবার পরখের পর—না, আঁচিল নয়, তিলই একটা! নিশ্চিতভাবে বুঝে নেবার শেষেও যখন অস্বস্তি—এটা কি ছিল কোনোদিন? অথবা নতুন? অথবা হয়তো ছিল, চোখে পড়েনি কখনও। নিজের অজ্ঞাতকে চিনে নেবার অহেতুক কৌতূহলে অনুল্লেখ্য বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা তিলের অস্তিত্বে, দর্পণে, ঘুরে ফিরে বারবার নিজেকেই খুঁজতে খুঁজতে, মনে হয়, নাক মুখ চোখ কান নাক গাল গলা হাত পা পেট বুক পিঠ নিয়ে সর্বাঙ্গীণ দেহটাও হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছু না। কিংবা পিতৃরক্তবাহী নাম? উৎপল! মহিমাহীন কত সাধারণ একটা শব্দ! কম পক্ষে লাখখানেক উৎপলকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ ভোটার তালিকায়। খাঁটি তৎসম সুবাদে গোটা আর্যাবর্তে আরো কয়েক কোটি এবং বৈদ্যকুলোদ্ভব সন্তানদের মধ্যে অখণ্ড উৎপল দাশগুপ্তই হাজার পঁচিশ ত্রিশ কিংবা ততোধিক। নবাবিষ্কৃত কৃষ্ণবর্ণ তিলটুকুকে তখন ভালো লাগতে শুরু করে। শনাক্তকৃত হবার জন্যই বড় প্রয়োজন তাকে—আমি, নিশ্চিতভাবেই আমি। আমার আইডেন্টিফাইং মার্ক

শিরদাঁড়ায় জোর লাগে। ব্রাশের ডগায় কিছুটা ক্রিম লাগিয়ে জল। গালে ঘষতে ঘষতে ফেনা বাড়তে থাকে। শ্বেতশ্মশ্রুর আকারে গালপাট্টা

এবং তখনই, মগজে ভিন্নতর চিন্তা—এই আইডেন্টিফাইং মার্কই যদি অঙ্গুলী নির্দেশে শনাক্ত করে—তুমি, অদ্বিতীয়ভাবে তুমি উৎপল দাশগুপ্ত চোর

নতুন ব্লেডটাকে তার জামাগেঞ্জি থেকে খুলে সেফটি-রেজারের ফাঁসে এঁটে নিতে নিতে ঘনিষ্ঠ মমতায় নিবিড় হতে থাকে স্বদেহে আবিষ্কৃত নতুন কলঙ্ক অথবা গৌরব। হ্যাঁ, আমি, অদ্বিতীয়ভাবে আমিই সেই উৎপল দাশগুপ্ত, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা চারপাশটায়, তোমাদের সকলের সব কিছু মেনে নেওয়ার মধ্যে একমাত্র জ্যান্ত একজন মানুষ বড়সড় একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়। করো প্রমাণ—আমি, আমিই তস্কর!

রেজারটা গালে টানতে গেলে শাদা ফেনায় মাখামাখি মুখটা সহজেই হাঁ হয়ে আসে। আরশিতে, কাচের স্বচ্ছতায় তখন নিজের অবয়বটাই কী বিচিত্র অদ্ভুত! হাস্যকর। অনেকটা

ক্লাউনের মতো। এই ক্লাউনটাকেই যদি টিকিয়ে রাখা যেত? নিরন্তর ভেংচি কেটে চলতে চলতে তেতো বিস্বাদটাকে উগরে বিতরণ করা যেত ভদ্রমহোদয় ভদ্রমহোদয়াদের মনোরঞ্জনে, যাঁরা, জীবনকে রিপু করে করে টিকে থাকার নিয়ত অভ্যাসে জানেনই না হয়তো—কৃষ্ণনামেও দাঁড়ের-ময়না মূলত নাস্তিক।

গণ্ডমুণ্ডনের নোংরা বাটিটা হাতে, তোয়ালেটা পিঠ ঢেকে কাঁধে। উৎপল তার সমাধির শোকশান্ত নীরবতার বারান্দা পেরিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল। দাদা অফিসে যান নি। মা শয্যাশায়ী। নিচের তলার কাকা-কাকিমা এবং অন্যান্যরা আকণ্ঠ উৎসুক।

বাবা বলেছিলেন কাল রাত্তিরে—'সত্তর বছর বয়স হলো আমার। কোনোকালে কোনোদিন পুলিশের লোক ঢোকেনি আমাদের সংসারে...'

ননসেন্স! এক প্রকার কৌতুকানুভবে মজা পেল উৎপল—ইংরেজের গোলামিতে রেলে ঢুকেছিলে। স্বদেশী করা ভালো, যদি পরের ছেলে করে—এমত বিশ্বাসে লালপাগড়ির জুজু এড়িয়ে গুড-বয়। এবার বোঝো। একই কায়দায় ছেলেদের গুড-বয় বানাতে চেয়ে এখন সামলাও বাউন্সার। ঢুকে তো পড়ল। লালপাগড়ি না হোক, স্বাধীনতার শাদা টুপি।

ভারতীয় ফৌজদারি আইনে তিনশ নয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট আসামী স্বগৃহে এখনও জীবিত। এতদ্‌ভিন্ন সরকারি তহবিল তছরুপকারী নিকৃষ্ট অপরাধী অবশ্যই জনস্বার্থবিরোধী প্রতারক।

পরদিন ওরা এলেন বেলা প্রায় দশটা নাগাদ। খোদ সদর দপ্তর থেকে একজন বড় অফিসার, স্থানীয় থানার বড়বাবু, তৎসহ শাদা পোশাকের আরো দুজন। বোঝা মুশকিল, কে বা কারা?

'হত্যা পাপ। আপনি স্বীকার করেন?'

'পাপ কিনা জানি না। অবশ্যই অপরাধ।'

'অ্যান্ড ইউ বিলিভ ইট টু বি দ্য ওয়র্স্ট ক্রাইম এ ম্যান ক্যান কমিট?'

'আপনারা তো শুধু মানুষের হাতে মানুষের রক্তপাতকেই মার্ডার বলেন?'

'বটেই তো, বটেই তো...' নিজেদের আওতায় বিষয়টা ফিরে পেয়ে অফিসাররা খুশি—'মাছ বা মাছি মারলে আপনাকে বিরক্ত করতে আসব কেন? আপনি মানেন, নিজেকে খুন করে আপনি দেশের একজন নাগরিককেই খুন করতে যাচ্ছিলেন।'

'স্বীকার না করা উপায় নেই। জনসেবার লাইসেন্স নেই আমার।'

অফিসাররা ভ্রূকুটি তুললেন—'কীভাবে কথা বলছেন? স্পষ্ট করে বলুন।'

'পরিষ্কার বাংলায় বলছি।'

সত্যসাধন এবং শ্যামল পাশেই ছিলেন। ভীরু চোখে তাকালেন অফিসারদের দিকে। কেন না, ঘরের ছেলে হলেও বেকায়দার এই যুবক তাঁদের আয়ত্তাধীন নয়।

কর্ডিয়াক-ধকল সামলে কিছুটা আত্মস্থ হয়ে উঠেছেন শাদা-পোশাকের প্রৌঢ় অফিসার। প্রসঙ্গান্তরে—'আচ্ছা ঠিক আছে, কনসার্নড পার্টি মিঃ খাস্তগীর কিংবা ধরুন, আপনাদের পুরনো

ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার মিঃ তালুকদার সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য?'

'ন্‌নাহ্‌, লোকগুলোর খুব একটা দোষ নেই তেমন।'

ট্রে-তে সাজিয়ে সন্দেশ-রসগোল্লার প্লেট নিয়ে ঢুকছিল কৃষ্ণা। রসগোল্লা গেলার হাঁ-গুলো অন্যভাবে তৈরিই ছিল। অফিসাররা নড়ে উঠলেন—'কী সব বলছেন! যারা আপনাকে এভাবে পথে বসাল...'

বাবা এবং দাদার শীতল চোখের দিকে তাকাল উৎপল। অফিসারদের—'আপনাদের কোমরের পিস্তলগুলো আপনারা কোথায় পেলেন? কিনেছেন?'

অফিসাররা কৌতুকে হাসলেন—'হাউ ফানি! কিনব কেন? আমাদের চাকরি...'

'চাকরি সুবাদেই ওই মানুষ-মারার অস্ত্রগুলো যেমন আপনাদের সঙ্গে থাকে, খাস্তগীররাও ওদের ট্রেড-লাইসেন্সের সঙ্গে আমাকে, আমার মতো অনেককে পথে বসানোর অধিকারটা এমনিতেই পেয়ে যান...'

'একজন রেসপন্‌সিবল অফিসার হয়ে আপনি নিজেই বলছেন এসব?'

'বলছি।'

'ইন্‌ক্রেডিবল্‌! ইউ আর নট নর্মাল।'

'কমপ্লিটলি নর্মাল...' বাবা এবং দাদা, অবোধ দুই বয়স্ক শিশুর দিকে দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে উৎপল—'একটা বাঘ একটা হরিণ বা গরুকে মারল কেন? ওতে বাঘটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওই খুনটা না করলে ও-বেচারি নিজেও বাঁচত না। মৃগয়াক্ষেত্রে দুচারজন থাকবই আমরা টু বি দ্য ভিকটিম ফর দেয়ার সুইট প্লেজার...'

'হাউ স্ট্রেঞ্জ! আপনার সঙ্গে তো কথাই বলা যাচ্ছে না ঠিকমত...' অফিসাররা কিঞ্চিৎ বিরক্ত এবার—'জানেন, আপনাকে আমরা এখনই অ্যারেস্ট করতে পারি।'

'জানি। আমার করার কিছু নেই।'

থরথর কেঁপে উঠলেন সত্যসাধন। শ্যামল অস্থির—'কী করছিস তুই? সময় নষ্ট করছিস কেন এঁদের?'

'কী বলব? কী করতে পারি আমি?'

'ভালোভাবে কথা বল্‌। এটা ছেলেখেলা নয়।'

'আমি কেন মরতে চেয়েছিলাম, তার উত্তর? আমার জানা নেই।'

'থাক থাক, লিভ হিম...' কী ভাবলেন অফিসার। তাকালেন অনায়ত্ত আসামীর দিকে—'আপনি আসুন। আরো বারকয়েক আসব আমরা। কথা হবে আপনার সঙ্গে।'

পশ্চাৎ-ভাবনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে উৎপল বেরিয়ে এল। চৌকাঠের বাইরে ওত পেতে ছিল কৃষ্ণা সুনন্দা। অদূরে আলুলায়িতা রেণুবালা। নির্মম নিষ্ঠুর সন্তান। তাকাল না কোনো দিকে। ছিটকে নিচে নেমে গেল। ওর একার নিশ্বাসের জন্য খোলামেলা বাতাস খুঁজতে। স্বার্থপর।

দৃশ্যান্তরে

পাখার তলায় চা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। সত্যসাধন এবং শ্যামলের অনুরোধে সন্দেশ রসগোল্লার

প্লেটে চামচ কাটলেন অফিসাররা—'এ-রকম একটা ব্রাইট ইয়ংম্যান! সরি, রিয়েলি সরি, এ-তো ক্লিন মেন্‌টাল ডিসঅর্ডারের কেস।'

সত্যসাধন স্থাণুবৎ বধির। শ্যামল বিষাদে নিঝুম।

'আপনি বলেছিলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করার জন্যে অ্যাডভাইস করেছেন হাসপাতালের ডাক্তারবাবু...'

'দেখলেন তো সব...' শ্যামল বিরক্ত... 'এ-ছেলেকে কী করে নিয়ে যাই বলুন দেখি? প্রথম তো নিয়ে যাওয়াই এক মস্ত হাঙ্গামা, তারপর যদি নিয়ে যাওয়াও গেল, এমন সব কাব্যি করতে শুরু করবে সেখানে...'

'কিন্তু মেডিকেল স্টেটমেন্ট একটা যে চাই-ই শ্যামলবাবু, দ্যাট ক্যান প্রুফ হি হিজ নট মেন্টালি নর্মাল...' নিপুণ ভঙ্গিতে সন্দেশের টুকরো মুখে তুলছেন অফিসার ...'না না, থ্রি হান্ড্রেড নাইনের জন্যে ওকে আমরা কোর্টে তুলছি না। রেস্ট অ্যাসুয়োর্ড। এ-রকম একটা ছেলেকে আরো হেনস্থা করে লাভ নেই। আমরাও তো মানুষ...'

কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত পিতাপুত্র।

'কিন্তু ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তো একটাই নয়...' অফিসার মুচড়ে উঠলেন—'ব্যাঙ্ক ডায়েরি করেছে। হি ইজ দ্য সেকেন্ড পার্টি। পুরো কেসটা এন্‌কোয়ারির দায়িত্বও আমাদের কিছু আছে। তার তো কিছুই হলো না...'

হৃদস্পন্দনে ঝড়। শ্যামল সত্যসাধন উদগ্রীব।

'অবিশ্যি সেটা একদিনে হবার মতো সামান্য ব্যাপারও নয়...' সোজা হয়ে বসলেন অফিসার—'মিঃ খাস্তগীর, রিটায়ার্ড ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার মিঃ তালুকদার আরো সব কন্সার্নড লোকজন অনেকের কাছেই আমাদের যেতে হচ্ছে। একবার নয়, এক এক পার্টির কাছে বারকয়েক করে। কেসটা তো ছোটখাটো ব্যাপার নয়। আপনাদের কাছেও আসতে হবে। পরে হয়তো আরো বারকয়েক ডিসটার্ব করতে হবে আপনাদের...'

'আচ্ছা শ্যামলবাবু...' প্রায় একই সঙ্গে একই বাক্যের জের টেনে অন্য ভদ্রলোক—'আপনাদের ফ্যামিলির অ্যাসেট-লায়াবিলিটির হিসেব দিতে গিয়ে আপনার বাবা বলেছিলেন, আপনার নিজের জন্যে আপনি একটা ফ্ল্যাট করছেন সল্ট লেকে।'

'হ্যাঁ।'

'কস্ট কত? অ্যাপ্রক্সিমেট্‌লি।'

'সবটা তো দিতে হচ্ছে না এখনই। অ্যাপেক্স বা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আমার ব্যক্তিগত লোন আছে।'

'নিজে কত ইন্‌ভেস্ট করেছেন এখন অব্দি?'

'ধরুন, রাফ্‌লি সত্তর হাজারের কিছু বেশি।'

'সব আপনার নিজের? একার রোজগার?'

'মানে?'

'আই মিন, আপনার বাবা ভাই বা ফ্যামিলির আর কারুর ইন্‌ভল্‌ভমেন্ট নেই এতে?'

'না...' পলকে বাবাকে দেখে নিয়ে ঋজুতায় কঠিন হলো শ্যামল—'আমি, আমার স্ত্রী দুজনেই চাকরি করি...'

'কত বছর চাকরি করছেন?'

'বছর আটেক।'

'কত দিন বিয়ে করেছেন?'

'ছ বছর।'

'দেখুন...' মৃদু হাসলেন অফিসার—'বড্ড বদখত চাকরি আমাদের। সভ্যতা ভদ্রতা ডিসেন্সির কোনোরকম বালাই-ই থাকে না। আপনার এই সত্তর হাজার টাকার সোর্স অব ইনকাম সম্বন্ধে আমরা একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে চাই। যদি সম্ভব হয়, আজই...'

'আমার সোর্স অব ইনকাম?' কাঠের চেয়ার। স্প্রিংটিং নেই। শ্যামল লাফিয়ে উঠল—'ব্যাঙ্কের ঘটনার সঙ্গে আমাকে...আমাকেও রিলেট করতে চাইছেন? হোয়াট, হোয়াট ডু ইউ মিন?

কিছু মনে করবেন না শ্যামলবাবু। এ-সবই ডিউটি টাস্ক আমাদের...' অফিসারের মাজাঘষা গালে সেই তেরচা, আপেল-কাটা-ভঙ্গির হাসিটুকু—'এমন একটা ছ্যাঁচড়া চাকরি আমাদের! এ-ধরনের আন্‌কম্ফর্টেবল্ সিচুয়েশন প্রায়ই ফেস করতে হয় অ্যান্ড দ্যাট অ্যাফেক্টস দ্য গুড পিপল...'

সর্বাঙ্গের ক্রোধে শ্যামল অবশ হয়ে আসে। আত্মহত্যা কী? এরপর...এরপর তো মানুষ খুনও করতে পারে!

সাস্‌পেনশনের পর প্রথম মাসপয়লা এবং এক অতি দীর্ঘ দ্বিপ্রহর।

অফিসে যাবার ঝঞ্ঝাটটা যে কত মূল্যবান জীবনে—বড় বেশি দাম দিয়ে প্রতিদিনের নির্মম অনুভবে দুঃসহ টেনশনের চাপ। শারীরিক রগ্নতার সত্যি-মিথ্যে দোহাই পেড়ে অফিসের ছুটিতে আলস্যের বিলাস চলে। কিন্তু অফিসই যাকে খারিজ করে দেয় তার কাছে

স্বগৃহ আরো দুর্বিষহ। হাত-পা খেলিয়ে স্বাভাবিকভাবে চলতে-ফিরতেও ভুলে যাচ্ছে ঘরের মানুষগুলি। কথাবার্তা গুনে গুনে। মাসান্তে সার্ধ সহস্রাধিক মুদ্রার আমদানি আজ থেকেই সঙ্কুচিত হতে শুরু করল — উপলব্ধির পর গায়ে গা-লেপটানো মানুষগুলির ঠোকাঠুকি, নদীর মাছ কারুর জালে জড়িয়ে যাবার মতো। ঝঞ্ঝাটটা আরো বাড়বে। 'সাসপেনশন পেরিয়ড' নামক সময়কালে, অতঃপর, অঙ্কট। খাটো থেকে আরো খাটো হতে হতে, তিনমাস ছ-মাস এক বছর কিংবা আরো আরো দীর্ঘকাল প্রাণকণিকা হয়ে ঝুলে থাকবে কর্তাদের পকেটে পকেটে এবং অবশেষে একদিন—দোষী বা নিরপরাধ, প্রভুবাক্যের অপার করুণায় একেবারেই শূন্যতা অথবা সতের শো আটষট্টি টাকার নবজন্ম পুনর্বার। সংসারে ভরাট জ্যোৎস্না অগাধ অগাধ

অথচ প্রকৃতি-বিধানে পৃথিবীর আহ্নিকগতি তথাপি সচল। আরো একটি সূর্যোদয় এবং আরো একটি নতুন মাস ক্যালেন্ডারে। উৎপল বেরিয়ে পড়ল। খররৌদ্রের দ্বিপ্রহরে এক

অলৌকিক কলকতায়।

মস্তিষ্কের কোষে কোষে শিপ্রা! আরো এক দুঃসহ যন্ত্রণা।

যেহেতু মাসের এক তারিখ, আজই, আজ থেকেই শিপ্রার ছোটা শুরু। ছোটখাটো ভেলেন্টানা তেরাস্কোভাই হয়তো-বা। চন্দ্রলোকের কাছাকাছি হরিপাল না কোথায় পাড়ি! কলেজ নয়, স্কুল। হাজিরার চাপ অনেক বেশি। তবু নাকি এভাবেই প্রতিদিন!

অ্যাবসার্ড। জীবন নামক গোলমেলে ব্যাপারটায় আরো এক অবাস্তব প্রস্তাব। উৎপল শূন্যতায় ভাসে। চলতে চলতে, নিতান্তই অভ্যাসে সে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে এসে পৌঁছোল। বাঁয়ে ঘুরে আরো কিছুটা এগোলে শিয়ালদা। তার রণভূমি।

এগোল সে।

বেলা দুটোর পর ব্যাঙ্কের প্রবেশপথে কোলপসিবল গেটটা আধাআধি বন্ধ হয়ে যায়। বন্দুকটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল দারোয়ান লালমোহন সিং। উৎপলের দুর্বার প্রবেশে বেচারি ফ্যালফ্যাল তাকাল।

শুধু লালমোহনই নয়, কাউন্টার-ওয়ালের সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই খোলামেলা টেবিলে টেবিলে যারা ছিলেন, পলকপাতে সমবেত সহকর্মীরা নাড়া খেলেন সকলেই। কাজের কলম, অকাজের আড্ডা অথবা টিফিন-আহার সবই থেমে গেল। লজ্জা সঙ্কোচ বা কুণ্ঠারও হেতু নেই। উৎপল তার চারদিকে চোখটা একপাক ঘুরিয়ে নিয়েই সামনের দিকে এগোয়। লোকবিশ্বাসে মৃতের প্রেতাত্মা যেভাবে ঘুরে ফিরে বেড়ায় তার অচরিতার্থ বাসনার কেন্দ্রে।

ভ্যাবাচাকা চোখগুলো গুটি গুটি উঠে এসেছে। উঠে আসছে। এমন কি, পেমেন্ট বা রিসিভিং কাউন্টারের সর্বাধিক ব্যস্ত এবং সন্ত্রস্ত মানুষরাও তাঁদের খুপরিতে তালা এঁটে এসেছেন। দু-চারজন তাঁদের টেবিল থেকেই দেখছেন বিরল-বিস্ময়!

কাছাকাছিই ছিলেন পাসিং-অফিসার পরিতোষ দে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—'তুমি! তুমি ভালো আছো তো?'

'কেন? কী হয়েছে আমার?' নিজেকে খুবই স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা। উৎপল হাসল। ঠিক এই মুহূর্তে একটি সফল ব্যাঙ্ক-ডাকাতি ঘটে গেলে কেমন হতো সুধীজনদের চেহারা, সে তার চারপাশের চোখে চোখে ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পেল। পরিতোষদার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসে একই হালকা চালে—'দেখুন কপাল। শেষ পর্যন্ত একটা সুইসাইড করার অ্যাটেম্পট নিলাম। তাও ফসকে গেল...'

ঘিরে-থাকা সহকর্মীরা মনীষী দেখছেন সবিস্ময়ে অথবা উন্মাদ! ব্যাঙ্কের অঘটনটা ঘটে যাবার পর নানা ধরনের খবরই শোনা যাচ্ছিল উৎপল দাশগুপ্ত সম্বন্ধে। মানুষটার সশরীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য সত্ত্বেও তালগোল-পাকানো ভাবনাগুলি বোবা হয়ে যেতে থাকে এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রৌঢ় পরিতোষও বসে পড়েছেন একসময়। সিগনেচার কার্ডে পুরনো মানুষটার সঙ্গে অতিবাস্তব ব্যক্তিটি কোথাও মিলছে না বলেই হয়তো চোখের হাঁ-এ তাঁর সংশয় ঘোচে না।

সুস্বাস্থ্য আর আপন পৌরুষরূপে আত্মমুগ্ধ ফিল্ড-অফিসার কালীধন বটব্যাল

'কেদার রায়'-এ কার্ভালো করতেন যৌবনে। বছর কয়েক আগে যাদবপুর সেন্ট্রাল পার্কে মস্ত বাড়ি হাঁকিয়ে স্কুটার কেনার পর জৌলুস আরো বেড়েছে। প্রায় পঞ্চান্ন ছুঁয়ে এখনও খুব বড় অভিনেতা এবং নাট্য-বিশারদ মনে করেন নিজেকে। 'বীরসা মুণ্ডা'য় বিপ্লবী নায়ক সেজেছিলেন গত বছর স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটকে। ভিড়ের পেছন থেকে নাটকীয় ভঙ্গিতেই তাঁর এগিয়ে আসা—'একটা রিভলুশন চাই, বুঝলেন! বড় রকমের একটা ওলটপালট কিছু না হলে কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না এ-দেশটার! ব্যাঙ্ক বানিয়ে গৌরী সেনের টাকা লুটবে কয়েকটা লোক অ্যান্ড আওয়ার ইনোসেন্স ইজ রংলি ভিক্‌টিমাইজ্‌ড! সুইসাইড! হ্যাঁ, সুইসাইডই তো করতে হবে এর পর। ইররেস্‌পেক্‌টিভ অব সেক্স ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে সবাই মিলে জহরব্রত...'

টেবিল থেকে কাচের পেপার-ওয়েটটা তুলে নিয়ে হাতের তেলোয় খেলছিল উৎপল। চোখ টেরিয়ে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল ঝাঁ করে। হাসতে হাসতেই—'কেন কালীদা, বাঁয়াতবলায় হাতটা তো খুব খারাপ ছিল না। জুতসই বানিয়েও নিয়েছিলাম...'

বাঁয়াতবলা! স্তম্ভিত জনগণ। এর মধ্যে—এর মধ্যে বাঁয়াতবলা কেন?

উৎপল ভিড় ঠেলে এগোয়—'অ্যাকম্প্যানিং মিউজিকে শ্রীখোল তবলা থেকে বাঁশি সারেঙ্গি তানপুরায় মোটামুটি ভালো সঙ্গতই দিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই। কোথাও বেতাল নেই। নইলে এত হাঁকডাক প্রতিপত্তি বাড়ে ওস্তাদজিদের? গমগম করছে গোটা দেশ।'

জনতা বুদ্ধবাক। কেন না, এবম্বিধ অসংলগ্ন এবং অর্থশূন্য প্রলাপভাষ্যে সংশয়টা আরো বেশি প্রকট যে, উৎপল দাশগুপ্ত নামক পুরাতন ব্যক্তিটি আর তার স্বাভাবিকতায় নেই। তৎসহ নীরব ধিক্কার—কী জ্ঞানকাণ্ডহীন ঘরের মানুষগুলি? এ-অবস্থায় ওকে রাস্তায় একা বেরোতে দেওয়া শুধু দায়িত্বহীনতা নয়, নিশ্চিত অপরাধ।

এবং উৎপল, অলিভ-অয়েল-চকচক একদা সহকর্মী সুবেশ সুহৃদবর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে চেনা-মুখগুলোই দেখল দূরাত্মীয় চোখে। অতীতে কোনো একদিন যাদের সঙ্গে একাকার মিশে থেকে চন্দ্রলোকে পৌঁছোতে চেয়েছিল সে নিজেও হয়তো-বা। আজ, স্খলিত দেবদূত, সমবেত দৃষ্টির দর্পণে অনায়াসে চিনে নিতে পারে নিজেরই পুরাকাল—ডাউন ডাউন উইথ গড পেরেন্টস্‌ লিডার্স অ্যান্ড পেট্রিয়টিজম্‌—জ্যাকপট, জ্যাকপট মারো লাইফের নিশানায়—অমিতাভ বচ্চন নট ব্যাড, ক্রুফো গদার বেয়ারম্যান সুপার্ব—খিদিরপুর ফ্যান্সিবাজার, মসলন্দপুর নতুন নামে হংকং মার্কেট—ফোকটসে পেয়ে গেলাম দাদা, খাঁটি জাপানি মাল, ইলেক্ট্রনিক ফ্ল্যাশগান ক্রিক্লেস্টর সব নিয়ে কম্‌প্লিট নিপ্‌পনম্যাট মাত্তর চার হাজার...'স্পোর্টসউইক' পড়েছেন এ-সংখ্যা? গাভাসকার গ্‌গুরু, কপিলদেবের জবাব নেই, 'ভারতরত্ন' দেওয়া হোক ওঁকে...একেবারে ইস্টার্ন বাইপাসের ধার ঘেঁষে দশ কাঠার একটা প্লট মশাই, ফার্স্টক্লাশ জায়গা, নিউ ক্যালকাটা, কল্লোলিনী তিলোত্তমা, আট হাজার করে চাইছে কাঠায়, এর ওপর তিন হাজার করে ব্ল্যাক, যদি বাগাতে পারি দাদা, এখন না-হয় মাটিতেই ফেলে রাখব টাকাটা, বছর পাঁচেক বাদে সোনার দরে ধুলো বিকোবে—হ্যাঁ দাদা, ওই ফাঁকা মাঠেই গোল্ড মাইন...হয় না, হয় না মশাই, আর চলে না এভাবে, একটা বিপ্লব চাই দেশে,

মার্ক্স-লেনিন ছাড়ুন, চে গুয়েভারা যুগ যুগ জিয়ো...ওভারটাইম ওভারটাইম—চাঁদি বানাও চাঁদি পাকাও, মানি গ্রোজ রাউন্ড দ্য ক্লক—নন-ব্যাঙ্কিং প্রাইভেট ইন্‌ভেস্টমেন্ট, থার্টি থার্টি-ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট, চাঁদি-কা-তালগাছ—মা কিংবা বৌয়ের হেঁসেল থেকে ঝাল-কটকট পুঁইচিংড়ি-চচ্চড়ির ঢেকুর তুলতে তুলতে অফিসে পৌঁছেই ট্রিক্কাস ব্লুফক্স মোগাম্বো চাঙোয়া অলিম্‌পিয়াড, সান্ধ্যপিপাসায় রাম জিন-উইথ-লাইম অথবা হুইস্কি—পাঁচতারা হোটেলের দিকে উর্ধ্বগ্রীব রাজহংস যথা অথবা সারস...

সুতরাং উৎপল, ডানে বাঁয়ে কোনো রকম আমল না দিয়ে 'অতঃপর রাণা প্রতাপ সিংহ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার সঙ্কল্পে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন'-সদৃশ ঘুরতে ঘুরতে একেবারে খোদ মুঘল সেনাপতির শিবিরে বীরদর্প প্রবেশে থমকে দাঁড়াল—'আসতে পারি?'

হ্যামলেটের পিতৃদর্শন। স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার আর দুজন মাস্টারমশাইর সঙ্গে কথা বলছিলেন মিঃ ধড়িয়া, গোটা শরীরের ঝাঁকুনিতে আঁতকে উঠলেন—'ইউ! মিঃ দাশগুপ্ত আপনি? আসুন আসুন, প্লিজ ডু কাম, বসুন...'

তৎপর আতিথেয়তায় অধস্তনকে চেয়ার নির্দেশ করছেন ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার স্বয়ং। উৎপল বসল। খানিকটা নিষ্প্রয়োজনেই সিগারেট ধরানো।

এরপর আর কাজকর্ম চলে না বেশিক্ষণ। অতিরিক্ত ব্যস্ততায় মিঃ ধড়িয়া ফাইলটা গোটাতে চাইলেন। কথাবার্তাও—'কাগজপত্র সবই তো দেখলাম। অল রাইট, আমি দেখব। আই মাস্ট সি টু ইট। আপনারা বলছেন, পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস পাঠিয়ে দিয়েছে! লিঙ্ক ব্যাঙ্ক থেকে কাল সাড়ে বারোটার মধ্যেও যদি চেকটা বের করে আনতে পারেন, পাঠিয়ে দেবেন লোক। না-হয় ক্লিয়ারেন্সের আগেই ও. ডি. দিয়ে দেব বাহান্ন হাজার টাকা। আজ এক তারিখ। অথচ এখনও গত মাসেরই মাইনে পাননি মাস্টারমশাইরা! হাউ ইজ ইট?'

'থ্যাঙ্ক ইউ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে...' বিগলিত ভদ্রজনরা উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁদের নিষ্ক্রান্তিতে, কাচঘরের নিরিবিলিতে মিঃ ধড়িয়া কথা শুরু করার অস্বস্তিতে বিব্রত এবার—'আমি, আমি সব শুনেছি দাশগুপ্ত। যেদিন শুনলাম...'

'হ্যাঁ, ভেরি শকিং। খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন।'

কুঞ্চিত ভ্রূরেখায় মিঃ ধড়িয়া কোনো রকমে সামলে নিলেন নিজেকে—'আপনার দাদা এসেছিলেন কদিন আগে। আজ বা কালই হয়তো আবার আসবেন।'

দাদা! ভদ্রলোক আবার এখানে কেন? ধাক্কাটা নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে উৎপল ভ্রূকুঞ্চনে তীক্ষ্ণ হলো।

'কিন্তু এতটা ইমোশনাল হবার কী কারণ ছিল দাশগুপ্ত?' কাচঢাকা টেবিলে দুহাত রেখে নড়েচড়ে বসলেন মিঃ ধড়িয়া—'শার্প ইন্টেলিজেন্ট ইয়াংম্যান, এত কিছু বোঝেন আর এটা বুঝলেন না, সাসপেনশন মানেই কারুর চাকরি চলে যাওয়া নয়। এনকোয়্যারি হবে, ট্রুথস্ আর ইয়েট টু বি রিভিলড। এত বিশাল একটা ব্যাঙ্কিং চেন ভারতবর্ষ জুড়ে। সে-কি আর এমনি চলছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। মরাল-অর্ডার বলে একটা কিছু তো আছে কোথাও।'

পিঠটান দিয়ে সোজা হয়ে বসল উৎপল। বিস্বাদের সিগারেটটা কাছাকাছি অ্যাশট্রেতে

গুঁজতে গুঁজতে—'আপনাকে তো এখানে ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার করে পাঠানো হয়েছে ব্র্যাঞ্চের কাজকর্ম আরো বাড়িয়ে ব্যাঙ্ককে এক্স্‌প্যান্ড করবেন বলে! ব্যাঙ্কের আইনকানুন মেনে, রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে থেকে কি সেসব সম্ভব?'

বুকের টাই-এ আঙুল বুলোতে বুলোতে মিঃ ধড়িয়া শিশুছাত্রভঙ্গিতে অপলক নির্বাক। সারসগ্রীবায় স্থিরমূর্তি।

একই ভাবে শান্ত উৎপল—'আপনাদের আজব কারখানায় কিছুদিন থেকে অন্তত এটুকু বুঝেছি—যায় না! ইম্পসিবল। হাজার কয়েক পেটি ক্লার্ক আর স্কুলমাস্টারের সেভিংসে কি এত বড় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সব চলে? না চলতে পারে? দু-চার দশজন তো পুষতেই হবে আপনাদের। মোস্ট অনারেবল কাস্টমার্স...'

নিঃসন্দেহে ব্র্যাঞ্চের সর্বোচ্চ কর্তা একজন অধস্তন অফিসারের স্পর্ধায় ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। মিঃ ধড়িয়া তাঁর গদির চেয়ারে শিরদাঁড়া উঁচিয়ে বসলেন। গম্ভীর—'ওসব নয়। কাজের কথায় আসুন মিঃ দাশগুপ্ত। আপনার-এমাসের মাইনেটা, হিসেব করে যা হয়েছে, নর্মাল প্রসেসে আপনার অ্যাকউন্টে জমা হয়ে যেতে পারে কিংবা ক্যাশেও নিয়ে যেতে পারেন। যদি চান...'

'করবেন, আপনাদের যা খুশি।'

'কিছু মনে করবেন না, সাসপেনশন পেরিয়ডের কিছু নিয়মকানুন আছে। সে-সবই তো মেনে চলতে হবে।'

'হ্যাঁ, সে-তো বটেই। আপনার চাকরির পুরোটাই যখন আস্ত।'

ওষ্ঠ এবং অধরে বিস্ফারিত মিঃ ধড়িয়া। খুব একটা ঘাঁটাবার সাহস নেই বলেই হয়তো, আস্তে—'আপনি কি আপনার কাজটা ফিরে পেতে ইন্টারেস্টেড নন?'

'কাজটা করব বলেই আপনারা আমাকে অফিসার বানিয়েছিলেন।'

'ইন্‌ভেস্টিগেটিং অফিসার বা এন্‌কোয়্যারি বোর্ডে আপনি এভাবে কথা বলবেন?'

উৎপল চুপ।

কুঞ্চিত ভূরেখায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে অথবা কিছু একটা করতেই হবে বলে পানের কৌটোটা টেনে নিয়ে মিঃ ধড়িয়া—'ইউ আর ডেস্‌পারেট টু লুজ দ্য জব?'

'আই অ্যাম ডেস্‌পারেট টু আর্ন মানি, লটস্‌ অব মানি ইন থাউজ্যান্ড্‌স অ্যান্ড লাখস্‌...'

ভরাট মুখে পান চিবুনিতে ভাঙা উচ্চারণ—'বাট হাউ? চাকরিটা খুইয়ে?'

'চাকরি? চাকরি করব কেন? ডাকাত হবো। ব্যাঙ্ক লুট করব আন্ডার ইয়োর কেয়ারফুল প্রোটেকশন...'

'কী বলছেন? আমার ঘরে বসে আমাকেই...'

উঠে দাঁড়িয়েছে উৎপল—'সামান্য কিছু টাকা চাই মিঃ ধড়িয়া। লেদ মেশিন কি এমনি একটা-কিছু কেনার জন্যে ছোট্ট ক্যাপিটাল। তারপর স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রজেক্টে লোন চাইব আপনাদের কাছে। দেবেন না? দেবেন, আপনিই দেবেন। আই হ্যাভ অলরেডি প্রুভড মাই ওয়র্থ বাই লুজিং দ্য জব।'

মিঃ ধড়িয়া দিশেহারা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছেন টেবিলের বাইরে। সীমাহীন ক্রোধ

থেকে পলকে গভীর মমতায়—'আপনি এখনও ঠিক...আই মিন ভালোমতো সুস্থ নন মিঃ দাশগুপ্ত...'

'ভেরি মাচ নর্মাল...'

প্রীতিময় জ্যেষ্ঠের ভূমিকায় কাঁধে হাত রেখে দুর্বোধ্য জটিল সামলাতে যখন রীতিমত ঘামছেন মিঃ ধড়িয়া, সুয়িংডোরের বাইরে পা ফেলেই উৎপল হঠাৎ—'নো মোর থার্ড সন অব দ্য গোট মিঃ ধড়িয়া। এবার বাঁচব, চুটিয়ে বাঁচব এবার। অব কোর্স ইন মাই ওন ওয়ে। সবটাই আমার নিজের মতো করে...'

সাড়ে তিন-হাজারী ডাকসাইটে এগজিকিউটিভ মিঃ ধড়িয়া বেকুব। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকেন। হাউ হরিবল! এই যুবক বিষ গিলেছিল?

শেষ পর্যন্ত নিজের কাছেও খামোকা লাগে সবটাই। কোনো মানেই হয় না এভাবে কতগুলো ভদ্রলোককে খুঁচিয়ে বেড়ানো! চারপাশের ফাঁকা আর ফাঁপা মানুষগুলি যদি সবাই অসহ্য বাপু, তবে তুমি কে হে তালেবর, একমাত্র খাঁটি?

প্রশ্নটা নিজের মধ্যেই এবং যেহেতু ভেতর থেকে কোনো সদুত্তর নেই, রাস্তায় নেমে অতিকায় প্রাসাদচূড়ার অরণ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের এলোমেলো পদচারণায় নিজেকে মেলাতে গিয়ে উৎপল তার অস্তিত্ব হারাল। পুরো ব্যাপারটাই নাকচ করে তোমার ওয়াক-আউটের সিদ্ধান্ত ছিল একদিন। সেটাও ভুল! মেট্রোপলিটান মস্ত কলকাতা যদি তার বিশাল চেহারায় আবার বাস্তব, তবে ভাবো—ভেবে দেখো, নিজের অবস্থান। তুমিও এদের মধ্যে এদেরই মতো একই চেহারায় ছিলে একদিন। মেনে নিতে না-পারার দাম দিতে চেয়েছিলে? এবার মেনে নাও মেনে-না-নিতে পারার ভুল। পোশাকী সম্মান-মর্যাদার অনেক ঊর্ধ্বে প্রশ্নটা টিকে-থাকার।

কিংবা মনে হয়, বুঝি লার্গাক্‌টিলও একই রকম ভুল। সুখের উজানে ভাসতে ভাসতে তুমি, হ্যাঁ তুমিও তোমার সহকর্মীদের মতো হতে চেয়েছিলে পদ্মরাগমণি। নিজের বিচ্ছুরণে তৃপ্ত, তাকাও নি চারপাশে। সব কিছুই ছুঁয়ে ছুঁয়ে চেখে বেড়াবার অসদাচারে ভালোবাসার মতো মরণকেও আঁকড়ে ধরতে চাইলে যখন, একই ইন্‌সিন্‌সিয়ারিটি ছিল কোথাও। মুঠোয় ভরা লার্গাকটিল ফস্‌কে যায়!

টুক করে বাঁ-হাতি একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল সে। অফিসের পর পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরার কথা ভাবেনি কোনোদিন। কিন্তু ট্রামবাসকে বড় অকারণ দ্রুতগামী মনে হচ্ছে আজ। শাঁই শাঁই ছুটিয়ে নিয়ে বড্ড তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে শ্যামবাজার। অথচ এখনও পুরো একটা লম্বা বিকেল। তার করার কিছু নেই। চেনা-অচেনা প্রায় সব মানুষ এবং সব ঠিকানাই আপাতত বাতিল। ভরাট শূন্যতায় কলকাতার জনকোলাহল। বরং সে হেঁটে হেঁটে মন্থরতায় অলিতে গলিতে মোচড় খেয়ে খেয়ে পৌঁছে যেতে পারে আড়াই তিন কিলোমিটার পথ। চারপাশের কলকাতায় ছুটে ছুটে চলে যাবার দিগন্ত অনেক বড়, কোথাও গিয়ে পৌঁছোনোর স্থান যদি সত্যি বিরল

উৎপল হাঁটে। প্রতিটি গলির বাঁকে মোড় ঘুরতেই শহরটাকে মনে হয়, যেন নতুন। ইতিপূর্বে কোনোদিন সে আসে নি এখানে। ভাঙাচোরা বা রং-করা চকচকে বাড়ির নিরবচ্ছিন্ন ধারায়

মধ্যবিত্ত সুখদুঃখের ফ্রেসকো, ঘিঞ্জি বস্তিও ইতস্তত, ছোটখাটো দোকানপাট, দেয়ালে হরেক রাজনৈতিক পোস্টারের পাশাপাশি সিনেমা-থিয়েটারের বিজ্ঞাপন, ডাস্টবিন, খোলা-হাইড্যান্টের হাঁ এবং মানুষ, অসংখ্য অগুনতি মানুষের মুখ

এতকাল, আজন্মকাল বড় হয়ে ওঠার দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আগে কখনও মনে হয়নি এমন। চারপাশ চেখে বেড়াবার পর্যাপ্ত অবসরে পুরোপুরি না-চিনে না-জেনেই কলকাতাকে মনে হতো নিজের শহর। একান্তভাবে আমার। নিজেরই ঘরবাড়ি বা বন্ধুর মতো, বার-দুই-তিন-পড়া পুরনো বই যেমন। প্রতিটি রাস্তা অলিগলি ঘুপচি, ট্রামরুট বাসরুট সিনেমা থিয়েটার রেস্তোরাঁ এত বেশি চেনাজানা, বরং ক্লান্তিকর হয়ে ওঠার পক্ষে বড় বেশি একঘেয়ে। সেই কলকাতাই আজ অভাবে-বিক্রি-হয়ে-যাওয়া বসতবাটির মতো। বিচ্ছেদে বড় আপন।

বিচ্ছেদের কলকাতায় যেহেতু তার একটাই ঠিকানা, ক্লান্তিতে বা ক্লান্তিহীনতায় অনুভূতিরহিত একটানা হাঁটায় সে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় এসে পৌঁছোল, যখন, গুহাভ্যন্তরে নিজেরাই কুঁকড়ে ছিল ঘরের মানুষগুলি। ঘিঞ্জি ঘরদোর আর ছাতা-পড়া দেয়ালের বিবর্ণ প্রেক্ষিতে ষাট কি একশো পাওয়ারের আলোর অস্তিত্বটাও যেখানে মনে হয় নিতান্তই পিদিম, আরো বেশি করুণ লাগে মানুষগুলির চোখ।

উৎপল থমকে দাঁড়াল। তার প্রবেশে কারুর চঞ্চলতা নেই।

'আমি তখনই বলেছিলাম। বলি নি তোদের? অদ্দুরে যাবার দরকার নেই ওর। এই সোমত্তা বয়সের মেয়ে...' বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোঙাচ্ছেন মাসিমা—'সেই সকাল আটটায় দুটো সেদ্দ ভাত মুখে গুঁজে বেরিয়েছে। সন্ধে গড়িয়ে রাত হলো। এখনও...এখনও দেখা নেই মেয়ের। কোথায় গেল, কী খেলো! এই কি হবে নাকি রোজ রোজ? শরীর স্বাস্থ্য থাকবে ওর?'

'সাতটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি...' দীর্ঘশ্বাসে, দুর্ভাবনার তলানি থেকে নিজেকে টেনে তুললেন কাঞ্চনদা—'এর মধ্যে না ফেরার তো কারণ নেই কোনো...'

ওদিকের ঘর থেকে অণুকাকিমার গলা—'কী হলো তোমাদের? ভাবছ কেন অত? এসে পড়বে। প্রথম দিন । পথঘাট বুঝে নিতেও তো কটা দিন সময় লাগে মানুষের!'

'পথটাও কি একটুখানি নাকি।' কাঞ্চন উৎপলের দিকে তাকাল এবং একইভাবে সন্ত্রস্ত গলায়—'স্থলপথের সব রকম ট্র্যান্সপোর্টই তো লাগছে। বাস রেলগাড়ি রিকশ...'

বোধ হয়, একটু আগেই অফিস থেকে ফিরেছেন অণুকাকিমা। হাতে কাঁধে শাড়িশায়াব্লাউজগামছা নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন—'তাহলে তো সবটা জানো না তোমরা। কলকাতায় ট্রামবাসের যা হাল, অর্ধেক দিন তো কিছুই থাকে না হাওড়া স্টেশনের টার্মিনাসে। ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা অনেকেই লঞ্চে যাতায়াত করেন আজকাল। হাওড়া থেকে শোভাবাজারের ঘাট। সময় কম লাগে, ধাক্কাধাক্কি পরিশ্রম নেই...'

'তাহলে তো আকাশটাই লাগছে না শুধু। যদি একটা হেলিকপ্টার সার্ভিসও জুটে যেত এর মধ্যে! ব্যস, সোনায় সোহাগা...'

ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন মাসিমা। প্রায় কান্নার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন—'না বাপু, থাক—মাথায় থাক অমন সব্বোনেশে চাকরি। ভগবান করুন, ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক

মেয়ে। কাল আর আমি কিছুতেই বেরুতে দেব না ওকে। রাস্তায় তো পড়ে নেই। ডালভাত যা হোক জুটছে দুবেলা। তাই বলে ঘরের মেয়েকে এভাবে রাস্তায় পাঠাবি তোরা?'

'আঃ, কী বলছ মা?' কাঞ্চন খিঁচিয়ে উঠল—'কী সব বলে যাচ্ছো তখন থেকে? কেউ জোর করে পাঠায়নি তোমার মেয়েকে। শিপু নিজেই জোর করে গেছে।'

'হুঁ, গেছে তো বুঝলাম। কিন্তু ফিরছে না যে!'

উৎপল নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল কাঞ্চনদার পাশে।

ওদিকে ছুঁচো-ইঁদুরের গর্তে ফাটল-ধরা পিছল কলতলার মরচে-পড়া টিনের দরজার মাথায় শাড়িশায়াব্লাউজ। ভেতরে জলের শব্দ এবং অলক্ষ্যের কণ্ঠস্বর—'মেয়েদের চাকরি বৌদি। এর পরও কিন্তু ঘরসংসার দেখতে হয়। রান্নাবান্নাও করতে হবে। আপিশ থেকে ফিরলে এক কাপ চা-ও করে খাওয়াবে না কেউ। অথচ টাকার দামটা ব্যাটাছেলেদের রোজগারের চেয়ে কম নয়

মাসিমা দীর্ঘশ্বাসে চেঁচালেন—'সে-কথাই তো বলছি অণু, দরকার নেই আমার অমন রোজগারের টাকায়। মেয়ের হাড়মাস পোড়ানো টাকায় সাতব্যঞ্জন খাব? ছিঃ ছিঃ তার চে মরণ ভালো...'

'ম্‌ছ্‌...' অসহায় অব্যয়ধ্বনিতে কাঞ্চন উৎপলের দিকে তাকাল—'কী করি বলো তো এখন? এ-তো কলকাতার মধ্যেই বা কাছাকাছি কোথাও নয় যে টেলিফোন করব বা নিজেই চলে যাব...'

'ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার রেলগাড়িফাড়ির ব্যাপার...' প্রথম কথা বলল উৎপল—'কোথায় যাবেন আপনি?'

'যাই, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই একটু। ওতে ওকে তাড়াতাড়ি করে টেনে আনা যাবে না। নিজেদের জন্যেই সান্ত্বনা একটু।'

দুজনই বেরিয়ে এল। দুধারের উঁচু উঁচু বাড়িঘরের মধ্যবর্তী আড়াই-হাত চওড়া গলিটা অতি গভীর নালা বা যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখার মতো। লোকজন বিরল। পাশাপাশি চলতে বাধা। আগে-পিছে হাঁটতে হয় এবং এগোতে এগোতে কাঞ্চন উদ্বেগের কাতরতায়—'দেখো আরেক ঝঞ্ঝাট। এ-তো এখন প্রায়ই ঘটবে এ-রকম...'

কথা বলে না উৎপল। নিঃশব্দ অনুগামী।

'না না, চাকরিবাকরি করলে এ-রকম হতেই পারে। হবেও...' কাঞ্চন আপন মনে —'কিন্তু রোজ রোজ সন্ধেবেলা ওই বুড়িকে সামলাবে কে? আমার তো ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা সাড়ে-দশটার কম নয়...'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করেছে কাঞ্চন। উৎপলের দিকে বাড়িয়ে দিতেই, অকস্মাৎ দূরে স্ট্রিটলাইটের আলোয় কেউ একজন। আলোছায়ায় ক্লান্ত বিধ্বস্ত পদক্ষেপে এক যুবতীর রেখামূর্তি। কাঞ্চন চঞ্চলতায়—'ওই তো, শিপু না? শিপুই তো!'

উচ্ছ্বাস নেই। প্রসন্ন নিশ্বাসে উৎপলের অনুভব, একইভাবে সে-ও দম চেপে থাকার যন্ত্রণায় ছিল এতক্ষণ। দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনেক দূরে দূরে রাস্তার আলোগুলি। অস্পষ্ট ছায়ায় পুরোপুরি চেনা যাচ্ছিল না শিপ্রাকে।

ওর শাড়ি-ব্লাউজ মুখের আদল অথবা অতি পরিচিত মানুষের চলার ভঙ্গিমায় অবধারিতভাবে শনাক্ত করা যায় বলেই হয়তো ক্লোজ-আপের নিশ্চিত প্রতীক্ষায় ওরা থমকে রইল।

বুকে ছোট ব্যাগ, ক্লান্তি আর অবসাদে ঈষৎ বাঁদিকে ভেঙে পড়েছে শরীর, এগিয়ে আসছে শিপ্রা। যেন অনেক, অনেক দূরের পথ ডিঙিয়ে ঘরের আঙিনায় এসে পৌঁছনোর স্বাদে অবসাদ আরো অগাধ অগাধ। কাছাকাছি নাগালের মধ্যে এসে—'এ-কি! কোথায় যাচ্ছো তোমরা?'

'তোরই জন্যে তো। এত রাত হয়ে যাচ্ছে তোর!'

ক্লান্ত, সত্যি ক্লান্ত শিপ্রা। গোটা শরীরে ভেঙে পড়ার গাঢ় নিশ্বাস—'আমি কী করব? আসার জন্যে যেটুকু সময় দরকার, সে-তো লাগবেই। উড়ে আসব নাকি? স্কুল থেকে বেরিয়েছিলাম সাড়ে তিনটেয়। চারটে পঁয়ত্রিশের ট্রেনে উঠেছি...'

'এখন সাতটা কুড়ি...'কব্জিতে দ্রুত পলক ঘুরিয়ে উৎপল।

ভ্রূকুটিতে শিপ্রা একবার তাকাল মাত্র। বিশ্বজয়ের অহঙ্কারে কোনো আমলই দিচ্ছে না কাউকে। ঘরের স্পর্শে বড় খুশি-খুশি। টগবগিয়ে ঢুকল ভেতরে। ওরা হাসছে পেছনে।

উমার আগমনী বাজল না কোথাও। বরং যাঁর নিজের নামই পার্বতী, মাসিমা ফুঁসে উঠলেন—'নিকুচি করেছে তোর চাকরির। ও-ছাই চাকরি করতে যাবি না তুই। অ্যাদ্দিন যখন চলল, চলবে আরো কটা দিন।'

পায়ের চটি খোলাও হয় নি তখনও। শিপ্রা হাসল—'তুমি মায়ের-কথা বলছ মা। তোমার ওই আদরটা যদি বাইরের আর কোথাও পেতাম।'

'ও-তোদের হেঁয়ালির কথা রাখ্...' গোটা বাড়ি তোলপাড় করে চিৎকার পার্বতীর —'ফের যদি তুই বেরোবি কাল থেকে, আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব যেদিকে দু চোখ যায়। নিত্যি নিত্যি এভাবে জ্বলব নাকি তোদের জন্যে...'

শিপ্রা, আলগা হাসিটা ভাসিয়ে রেখে ক্লান্ত স্বরে—'এত মেহনত করে যা-ও একটা জুটল শেষ পর্যন্ত, এক রাত্তিরও পোহাল না, বলছ—ছেড়ে দেব!'

গা-ধোয়ার পর কিছুটা তাজা হয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন অণিমা। হাসতে হাসতে —'কি রে শিপু, কেমন লাগল তোর চাকরি? ভালো তো!'

'ভালো মানে! ফ্যান্টাস্টিক...' ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল শিপ্রা। আচমকা বিপুল উৎসাহে—'গ্রামের মানুষজন এত ভালো, কী বলব তোমাদের। আর ছেলেমেয়েগুলো? উঃ, এখনও এত ভালমানুষ থাকতে পারে পৃথিবীতে...'

'পড়ালি তুই? কী পড়ালি?' হাসতে হাসতে কাঞ্চন—'ছাত্রছাত্রীরা মানল তোকে? পেছনের বেঞ্চিতে বসে আওয়াজ দেয়নি?'

'মানবে না মানে! মুগ্ধ...' শিপ্রা ভুলেই গেছে শরীর। ক্লান্তি বা অবসাদ—'ক্লাশ ফাইভে বাংলা পড়ালাম, এইটে ইংরেজি, মাস্টারমশাই আসেননি বলে ক্লাশ টেন-এ লাইফ-সায়েন্স ঠেকনা দিতে হলো একটা। ক্লাশ টুয়েলভ-এ আমার নিজেরই ক্লাশ ছিল—ফিলসফি। এগারটা মেয়ে আটটা ছেলে...'

'দুনিয়ার সব জানিস তুই? এত পণ্ডিত?' কাঞ্চন সকৌতুকে।

'হ্যাঁ, স্কুলের দিদিমণিদের সব জানতে হয়। মাল্‌টিপারপাস স্কুলের মাল্‌টিপারপাস টিচার...' শিপ্রা মশগুল—'টুয়েলভ ক্লাশের ছেলে। বুঝতেই পারছ, বেশ ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা। রাস্তায় এমনি দেখা হলে তো 'আপনি' ডাকতাম। কিন্তু কী দারুণ ভালো যে ওরা! ছুটির পর ফিরছি। দেখি, দুটি ছেলে...আমার ছাত্র, একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে সাইকেল চেপে যাচ্ছে। আমাকে দেখে নেমে পড়ল রাস্তায়। আমার সঙ্গে পাকা-রাস্তা অব্দি গিয়ে বাসে তুলে দিলো। শুধু কি তাই? স্টেশনে পৌঁছে আমি ট্রেনের জন্যে বসে আছি, হঠাৎ দেখি, ওরা জোর সাইকেল চালিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে উপস্থিত। আমাকে গাড়িতে তুলে দেবে। খুব ধমকালাম ওদের। এমন মজা লাগছিল ওদের বকতে! এত বড় বড় ছেলেগুলো আমার বকুনি খেয়ে চুপ। জানো দাদা, ওদের বলেছি, ওদের কজনকে একদিন কলকাতা নিয়ে আসব। মিউজিয়াম দেখাব, প্ল্যানেটেরিয়াম নিয়ে যাব...'

'মেরেছে...'

প্রসন্ন কৌতুকে, হেসে, সকলেই কাঞ্চনের দিকে তাকিয়েছে। কাঞ্চন পরিহাসে—'একদিনেই এত কিছু করে এসেছিস! গাঁয়ের ছেলেগুলো দিব্যি ছিল ওদের মতো, হঠাৎ এবার তোর পাল্লায় পড়ে...'

'না না, সে-একতরফা কেন হবে? ওরাও নিয়ে যাবে আমাদের।'

'ওরা নিয়ে যাবে? কোথায়?'

'আঁটপুরের নাম শুনেছ তো! বিখ্যাত মন্দির। টুরিস্ট-ব্যুরো বিজ্ঞাপন দেয়। দেখোনি? দারুণ টেরাকোটা। সে-তো হরিপালের কাছেই। একদিন আমরা দল বেঁধে যাব সবাই। ওরা বলেছে সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

'ব্যবস্থা করার কী আছে? ও-তো আমরা নিজেরাই যেতে পারি। সবাই যায়...'

'বাঃ রে, সে-তো পারোই। আমি আমার এলেম দেখাব না একটু! আমার ছাত্ররা সব আছে ওখানে...'

'ঠিক ঠিক...' সহাস্য অনুমোদন সকলের। অনিমা হাসতে হাসতে—'আর! আর কী দেখাবে তোর ছাত্তররা?'

'জানো কাকিমা, একদিন দই খাওয়াব তোমাদের।'

'দই!' সকলেই অবাক—'দই কী? পৃথিবীর এত জিনিস থাকতে দই কেন রে হঠাৎ!'

'হরিপালের দই পৃথিবী বিখ্যাত। ধ্যাৎ, দেশের কোনো খবরই রাখো না তোমরা। কলকাতার ঘরে বসে শুধু লম্বা লম্বা বাৎ...' শিপ্রা ভারিক্কি চালে—'একা একা খাব? আজ তাই খাইনি। দাঁড়াও, প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই তোমাদের জন্যে নিয়ে আসব।'

'কী তুই করছিস, বল্ তো ওখানে!' ওদিকে ঘরের কোণে উনুনে-কড়াইয়ে ছ্যাঁকছ্যাঁক কী করছিলেন পার্বতী। খেঁকিয়ে উঠলেন—'কথা! কথা পেলে আর কিছু চাই না তোদের? নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকে না! অ্যাদ্দুর থেকে এসেছিস। গা-টা ধুবি তো আগে। বিশ্রাম করে জলটল মুখে দিবি তো কিছু...'

নিজের দিকে রান্নার গোছগাছে তৈরি হচ্ছিলেন অনিমা। কেরোসিনস্টোভে তেল-ভরার আয়োজন। চেঁচিয়ে বললেন—'ঠিক বলেছেন বৌদি। আপনার মেয়ের খলবলানি দেখে মনে

হচ্ছে না খুব কষ্ট হয়েছে ওর। চাকরির প্রথম দিন তো! খৈ ফুটছে মুখে। যাক দুটো দিন। ঘাড়টা কুঁজো হতে শুরু করবে যখন, বুঝবে ঠ্যালা...'

'ন্‌নাহ্ যাই...' শিপ্রাও হেসে ফেলল—'এখন আমি বালতি-বালতি জল ঢেলে স্নান করব আগে। তারপর অন্য কথা। উঃ, গা-টা যেন জ্বলছে মনে হয়। য্‌যা গরম...'

শিপ্রা ঢুকে যাবার পর, হঠাৎ, বারান্দার বিবর্ণ আলোয় দুই যুবক বাড়তি হয়ে গেল। গৃহকর্ত্রীরা উনুনে-স্টোভে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত নিজেদের এলাকায়। হঠাৎ কথা থেমে গেছে। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে একটা রেডিও পর্যন্ত বাজছে না কোথাও! শুধু বারান্দার কোণে কিছু একটা ভাজছেন মাসিমা। তার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দের আবহে যখন অপরিসর বারান্দাটুকু ছাড়া দাঁড়াবার বা বসার ঠাঁই নেই, দাঁড়িয়ে থেকেই কাঞ্চন আরো একবার সিগারেট এগিয়ে দিলো, যেখান থেকে পূজনীয়ারা গন্ধ পাবেন অবশ্যই, চোখে দেখবেন না।

শিপ্রার নিরাপদ ফিরে-আসায় যখন এদের নিশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি, উৎপল, যেন তার নিজেরই গ্লানি নিয়ে নিজেরই বিবরে, সঙ্গোপনে হঠাৎ বাহুল্য বনে যায়। আপাত-অনাত্মীয় এঁদের ঘরে তার প্রবেশটা এখনও অবাধ। কিন্তু তার যে-অপকর্মে বেশ বড় রকমের ভাঙচুর এদের সংক্ষিপ্ত জীবনযাপনে, সেখানে কেন এঁরা এত ভালো? এত সহিষ্ণু? ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় অবোধ-মাসিমাকে, অখিল জানা তাঁর নিজের জোরে ভ্রূকুটি নিয়ে অনেক দূরে। কিন্তু কাঞ্চনদা বা অণুকাকিমা?

কিংবা একই বেদনার বৃন্তে নীরব ভর্ৎসনা কোথাও। চুপচাপ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা! উৎপল সন্তর্পণে এগোল—'লিখলেন কিছু? নতুন?'

'কী লেখা?'

'কবিতা।'

'ধুস...' হাতের আঁজলায় দেশলাইয়ের আগুন বাড়িয়ে ধরেছিল কাঞ্চন। হাসল—'এই তো দেখছ বেঁচে থাকার চেহারা। এখানে কবিতা?'

অস্বস্তিতে বিবর্ণ উৎপল অতিসূক্ষ্ম কৃৎকৌশলে অবস্থাটা সামলে নেবার চেষ্টায় সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে মাথা তুলল—'তবু তো বেঁচে গেছেন। কখনও সুইসাইডের কথা ভাবতে হবে না আমার মতো। পাগলও হবেন না।'

সুইসাইড প্রসঙ্গের সরাসরি উত্থাপনে এবার কাঞ্চনও বিব্রত। বিস্ময়ের ভীরু গলায়—'কেন?'

'নিজের জন্যেই যা-হোক একটা সার্ভাইভালের জায়গা তবু। এ-বাজারে সেটাও কম কথা হলো! চারপাশে লোকজন তো আর মানুষের-বাচ্চা হয়ে থাকতেই দিচ্ছে না কাউকে।'

হাসিটা লেপটে ছিল। প্রতিপদের চাঁদের মতো, ভাঙা। কাঞ্চন একমুখ ধোঁয়ায়—'আমি কবিতা লিখলে বা না-লিখলে কারুর কিছু যায়-আসে না আমি জানি। খুব ভালো করেই জানি সেটা। কিন্তু ক্ষতিও তো করছি না কারুর। কিন্তু জানো, একটা কবিতা লেখার সময় কী কষ্ট কটা দিন! এত যন্ত্রণা...'

'তাই তো বলছি, কবিতা না লিখলে তো বাঁচবেনও না আপনি।'

'কে বলল বাঁচব না? আরে ধ্যাৎ, বাজে কথা। সব বাজে। বোগাস...' গোটা শরীর মুচড়ে,

কাঞ্চন, যেন একটা ঝাঁকুনি সামলাতে হঠাৎ সচকিত।

ওপাশের দরজায় ছিটকিনি এবং পাল্লা খোলার শব্দ। শায়াব্লাউজশাড়ি সাবানের বাকসো হাতে নিয়ে, গামছা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এসেছে শিপ্রা—'আমার জন্যে আজ তুমি সন্ধেয়-সন্ধেয় বাড়ি ফিরে এসেছ দাদা? অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে রাস্তায়, পথ হারিয়ে ফেলতে পারি!'

কোনো পাত্তা দিলো না বিষাদের কাঞ্চন। পাশ কেটে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে—'যা যা, যা করছিস কর। গা ধুয়ে আয়...'

আলোটা জ্বলছিল। শিপ্রার ঘর ছেড়ে যাবার রেশ টেনে পাখার ব্লেডগুলো ঝিমোতে ঝিমোতে স্থবিরতায় পৌঁছোয়নি তখনও। কাঞ্চন নতুন করে সুইচটা টিপল—'বোসো...'

রুদ্ধশ্বাস গুদোম ঘরটায় যদিও টেবিল আছে একটা, বইয়ের শেলফ এবং একটাই চেয়ার। উৎপল খাটেই বসল। কিছুটা অস্বস্তি তবু। শিপ্রার ঘরে ফিরে আসার নিশ্চিন্ত প্রশান্তির পরও দিলখোলা ভালোমানুষ কাঞ্চনদা বেমক্কা গম্ভীর। বয়সের বড়সড় ফারাকে এমন কিছু ভারিক্কি নন যে, খুব একটা সমীহ করতে হবে! বরং হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় বন্ধুর মতো। সে তাকিয়ে থাকে। এর চেয়ে যদি ফুটবল খেলার বাতিকও থাকত লোকটার কিংবা কাউকে ধরে-পাকড়ে একটা প্রেমট্রেমের গাড্ডায়ও ফেলে দেওয়া যেত কোনো রকমে, প্রাণে বেঁচে যাবার সুযোগ ছিল তবু।

জিনিসে-মানুষে ঠোকাঠুকি ছোট ঘরে কোথাও বসছে না কাঞ্চন। মাঝখানেই দাঁড়িয়ে থেকে এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে মাথার চুলে আঙুলের চিরুনি বুলোতে বুলোতে হঠাৎ—'দুটো ঘরের যেমন-তেমন একটা আস্তানা যদি যোগাড় করতে পারতাম, বেঁচে যেতাম এই ট্রিপে। আর কোনো প্রার্থনা নেই আমার। কিন্তু গত দশ পনের বছরে কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারলাম না কোথাও। বিশাল ভূমণ্ডলে পঁচাত্তর টাকা ভাড়ার এই খুপরিটুকুই আমাদের তিনজনের জন্যে বরাদ্দ...'

সিগারেটের ধোঁয়া পাক খায় পাখার হাওয়ায়। ধ্বনিপুঞ্জ ভারি হয়ে উঠছে। দুঃখু-দুঃখু টাইপ ঘ্যাম-মারা বাতাসটা অসহ্য মনে হতেই, উৎপল নেহাৎ-ই বিপাকে। সহানুভূতির বানানো তসবিরটা সাজিয়ে রাখতে হয়।

'প্রায় বছর কুড়ি আগে, আমরা খুব ছোট, শিপু তখন মা'র কোলে, আহিরিটোলায় সেই বাড়ি থেকে বাড়িওলা যখন এক রকম জোর করেই বের করে দিলেন বাবাকে, আমাদের নিয়ে বাবা তখন লিটারেলি রাস্তায়। ভাগ্যিস অখিলকাকু...বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সেই যে একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন সেদিন, এখনও আছি। বাড়িভাড়ার কোনো রসিদফসিদ নেই। স্রেফ একজন ভদ্রলোকের বদান্যতায়...'

যেহেতু মৃগী রোগীকে তার হাত-পা ছুঁড়তে দেওয়াই স্বাভাবিক বিধি, উৎপল তার নিঃশেষ সিগারেটের টুকরো নিয়ে উঠে যায় টেবিলের কাছে, যেখানে অ্যাশট্রেটা—'ব্যাঙ্কে এক ধরনের চাকরি আছে, জানেন! হেড ক্যাশিয়ার। মাঝবয়েসী অদ্ভুত একটা লোক। লাখ পনেরো কুড়ি ত্রিশ পঞ্চাশ, কোটিও হয়ে যেতে পারে, পুরো টাকাটার জিম্মাদার হয়ে ক্যাশ-ভল্টের চাবিটা নিজের কাছে রাখেন বলে মাসে একশো থেকে দুশো টাকার একটা স্পেশাল অ্যালাওয়েন্স

লোকটার। কার্ডিয়াক বা সেরিব্রাল অ্যালাওয়েন্স নিল...'

সবিস্ময়ে তাকাল কাঞ্চন। হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ কেন? মানে কী? ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় ঝপ করে বসে পড়ল সে। নিজেরই বিলাপে—'না, দেশের ধনপ্রাণ রক্ষার কোনো দায় নেই আমার শুধু শিপু আর মা। তাছাড়া দারুণ কিছুও তো চাইছি না তেমন। অ্যাট লিস্ট এর চেয়ে ভালোভাবে বাঁচার মতো রোজগারপাতি তো নিশ্চয়ই করি...'

পুরনো ডি. সি. ফ্যান। কটকট ধ্বনিটা ঝিঁঝিঁর মতো। এই মার্চ মাসের গরমে রাত আটটা সওয়া-আটটায় ঘরটা আরো বেশি ঝিম মেরে এলে, উৎপল, বীভৎস ব্যাকরণগোছের অদ্ভুত লোকটার দিকে তাকাল। ইংরেজি 'ফ্রাস্ট্রেশন' এবং বাংলা 'অভিমান' শব্দদ্বয়ের মধ্যে ফারাক কত কিলোমিটার? দুটোই কী বিরক্তিকর! অসম্ভব ন্যাকামি! ঘরের গুমোট অথবা নিজেরই বিব্রতবোধে, চলে যাবে কিনা ভাবছে যখন

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কাঞ্চন—'ওই একটা জায়গাই খোলা ছিল। পড়াশুনো কিছু করব আর একটু-আধটু লেখাজোকা। যতটুকু বেঁচে আছি, তার চেয়ে দশগুণ বেশি করে বাঁচব। ধ্বুস, হয় নাকি! ওসব হয় না এভাবে।'

উৎপল ঘাবড়ে গেল। এসব ক্ষেত্রে কোন্ ভাষায় সান্ত্বনা দিতে হয় জ্যেষ্ঠকে কিংবা যে-ঘুড়ির সুতো তার হাতে নেই, কী করে খেলতে হয় সে-ঘুড়ি, জানে না বলেই তাকিয়ে থাকে মানুষটার দিকে। কী যেন এক দুর্বোধ্য দুঃখু আছে লোকটার!

বাঁচায় শিপ্রা। বিনুনি খুলেই বেরিয়েছিল ঘর থেকে। গা-ধোয়ার পর পিঠ ভরে শুকনো এলোচুল—'এ-কী! মা এখনও চা দেয়নি তোমাদের? দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি!'

স্নানের পর এত তাজা এত ভালো লাগে মেয়েদের! উৎপল কোনো কিছু না বলে কুণ্ঠায় নীরব।

দাদাকে সরিয়ে দিয়ে স্ট্যান্ড-বসানো ছোট আরশিটা আলোর তলায় টেবিলে সেট করে শিপ্রা চিরুনিটা তুলে নিয়েছে হাতে। আরশিতে ঝুঁকে পড়ে, সিঁথির মধ্যবর্তী সীমানা চিহ্নিত করে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর কানের পাশে দীর্ঘ কেশে লম্বা আঁচড়—'কী নিয়ে তোমাদের কথা হচ্ছিল এতক্ষণ? আমার চাকরি? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। সারাক্ষণ এমন মেয়ে-মেয়ে-মেয়ে-মেয়ে করে যাচ্ছো সবাই! কেন, একটা মেয়ে চাকরি করতে গেলেই এত কথা ওঠে কেন তোমাদের?'

'আঃ...কাঞ্চন ঝাঁঝিয়ে উঠল—'কে বলল তোর চাকরি নিয়েই কথা বলছিলাম আমরা! আর কোনো কথা থাকতে পারে না মানুষের?'

'কবিতা...' উৎপল হাসল—'কাঞ্চনদার কবিতা নিয়ে একটু জানতে চেয়েছিলাম।'

'কবিতা?' পিঠের এক রাশ চুল বুকে টেনে এনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শিপ্রা—'কবিতা নিয়ে আলোচনা করছ তুমি? দাদার কবিতা?'

'কেন, করতে পারি না? এতই মুখ্যু নাকি?'

'তার চেয়েও বেশি কিছু...' বুকে, চুলের ডগা বাঁ-হাতের মুঠোয় চেপে আঁচড়াতে আঁচড়াতে থেমে যায় হাত—'পয়সা খরচ করে ছাইপাশ কতগুলো ইতর নোংরা কুচ্ছিত হল্লামার্কা রেকর্ড

কিনে রেখেছ ঘরে। বাড়ি গিয়ে প্রাণ খুলে তাই শোনো গে যাও। আমার দাদাকে অসম্মান করো না।'

সহসা, কাঞ্চন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে চড়া গলার ধমকে—'কী বলছিস? অসভ্যতা করছিস কেন ওভাবে?'

কালো ফিতের এক প্রান্ত দাঁতের কামড়ে, বাঁ-হাতের মুঠোয় ভরাট কেশের পুরো ঝুঁটিটা মাথার পেছনে চেপে ধরে শিপ্রা—'ঠিকই বলছি।'

তৃতীয় ব্যক্তি কাঞ্চন হঠাৎ বেকায়দায়। চুলের গিটটা শক্ত করে বেঁধে নিয়ে দুহাতের আঙুলে বিনুনি বাঁধতে বাঁধতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শিপ্রা এবং সে হতচকিত বিহ্বল সঙ্কোচে সহৃদয় বন্ধুর হাত রাখল উৎপলের কাঁধে। উৎপল হাসছে।

সেদিন রাতে ঘরে ফেরার পর বিশেষ সংবাদ ছিল। পিয়ন এসেছিল দুপুরবেলা। যেহেতু ব্যাঙ্কেরই খামে রেজিস্টার্ড-পোস্ট, অনেক বলেকয়ে 'ফর' দিয়ে সই করে রেখেছেন সত্যসাধন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় খুলেও ফেলেছেন।

খোদ রিজিওনাল ম্যানেজারের অফিস থেকে তলব। দেখা করতে হবে এগার তারিখ বেলা বারোটায়। ক্যালেন্ডারের সংখ্যাচিত্রে দিনটি শনাক্ত হলো—অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবারের পরের বৃহস্পতিবার।

ডালপালায়
কে কোথায়

খাওয়াদাওয়ার পর রাত প্রায় দশটায় শ্যামল নিজেই এল মা-বাবার ঘরে। জটিলতার আবর্তে সঙ্কট তো তারই। কে জানত, এভাবে তাকেও পুলিশের গাড্ডায় পড়তে হতে পারে! ইতিমধ্যেই লালবাজারে সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে যেতে হয়েছে দুদিন। ছোটখাটো নয়, বেশ বড় রকমের গড়বড় আছে একটা। সেটা শোধরাতে আই. টি. ফাইল নিয়ে ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসে ছুটোছুটি। নিজের কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। দিনের পর দিন অফিস কামাই কিংবা মিথ্যেকথায় অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে-পড়া।

এমন কি, আজও সতের টাকা ট্যাকসি-ভাড়া গচ্চা দিয়ে বিকেল পাঁচটায়, একেবারে শেষ মুহূর্তে কোনো রকমে গিয়ে ধরেছে মিঃ ধড়িয়াকে এবং সেখানেই শুনেছে, খোকন গিয়েছিল। কী-নাকি বিদঘুটে সব ধরনধারণ, কথা-বলার ভঙ্গি! ওকে তো পাগলই ঠাউরে বসে আছে সবাই!

শ্যামলের গলার স্বরে ঝাঁঝ ছিল। নিজেদের স্থবিরতায় অথবা বরফের শীতলতায় ঘরের মানুষ তিনজন। যেন নাভিমূল থেকে নিশ্বাসটা টেনে তুললেন রেণুবালা। যন্ত্রণায়—'জানিসই তো সব। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসা অব্দি ওর মাথার ঠিক নেই। কী জানি এক মাথা-খারাপের ডাক্তার দেখাবার কথা ছিল, আজ অব্দি তারও একটা ব্যবস্থা করলি না তোরা কেউ!'

'বাজে কথা বলো না। সাইকিয়াট্রিস্ট পেশেন্ট ও নয়। মস্ত সেয়ানা। ও যা বলে বেড়াচ্ছে, যেভাবে চলছে-ফিরছে, মাথা ঠিক না থাকলে ও-রকম বজ্জাতি করে বেড়াতে পারে কেউ?

কিন্তু আমারও তো অফিস আছে, কাজকর্ম আছে। সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে আমিই বা কাঁহাতক ঘুরে বেড়াব ওর জন্যে?'

কথা নেই কারুর। টিউবের আলোয় ছায়াগুলি স্থির। পাখার বাতাসে গায়ে হালকা শিরশির। চারজন এক-শিকড়ের-মানুষ যখন পঞ্চমের ভাবনায় পরস্পর সংলগ্নতায় বিচ্ছিন্ন, বেইমান তার নিজের ঘরে একা। শোকতাপের ঊর্ধ্বে উদাসীন।

'কিন্তু সবচেয়ে যেটা দুঃখের, চাকরিটা বাঁচাবার জন্যে খোকনের নিজেরই কোনো চাড় নেই...' তেতো বিস্বাদের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে শ্যামল শান্ত ম্রিয়মাণ—'এ-সময়ে অনেক বেশি ছুটোছুটি করতে হয় সবাইকে। অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ধরাধরি পরামর্শ-করা সবই খুব আর্জেন্ট। কিন্তু স্কাউন্ড্রেলটা কোথাও যাচ্ছে না। শুধু যাচ্ছে-না নয়, যদি যায়ও, এমন সব কাণ্ড করে আসছে, ক্ষেপে যাচ্ছে সবাই। নিজেরাই তো দেখলে, পুলিশের সঙ্গে কী ব্যবহারটাই না করল সেদিন। মিঃ ধড়িয়াকেও দেখলাম আজ। বেশ অফেন্ডড। হতেই পারেন। হাই অফিসিয়ালস্ এঁরা। কার দায় পড়েছে মাথা পেতে অপমান সহ্য করার?'

শ্যামলের একটানা কথার দাপটে ঝিম মেরে গিয়েছিল ঘরের মানুষগুলি। ভাবনায় ভাবনায় মাত্র কটা দিনের মধ্যে আরো বেশি জরাপ্রাপ্ত সত্যসাধন ওদিকের মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিশ্বাসে দীর্ঘায়িত গলার স্বর—'এখন তো ওই একটাই ব্যাধি ওর।'

সকলেই তাকাল।

গোঙানির তলানি থেকে রেণুবালা—'ওই প্রতাপ শিবাজী যাদের ছেলে, এখন তারাও চোর বলছে আমার ছেলেকে!'

বন্ধ-দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণা এগিয়ে গিয়ে এঁটে দিতে চাইল। ভয় ছোড়দাকে। বাড়ি নেই। যদি এসে যায়? শোনে কিছু? কিন্তু উৎপল নয়, ঘুমন্ত মেয়েকে ওঘরে একা রেখে, এ-ঘরের চেঁচামেচিতেই হয়তো চলে এসেছিল সুনন্দা। শ্যামল ঝাঁঝিয়ে উঠল—'না, তুমি না। যাও এখান থেকে, যাও...'

এবং সেই একই তীক্ষ্ণতায়—'এবার তোমরা বলো, বলো মা, আমি কী করব? তোমাদের আদরের ছেলে হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল বলে পৃথিবীর আর সব মানুষের কাজকম্মো ভবিষ্যৎ বসে থাকতে পারে না চুপচাপ...'

শব্দ নেই, কথা নেই বোবা ঘরটায়।

শ্যামল আরো তিরিক্ষি—'কো-অপারেটিভ যেভাবে এফিশিয়েন্টলি কাজ করে যাচ্ছে তাতে তো মনে হয়, আর মাত্র সাত আট মাসের মধ্যে বাড়িগুলো তৈরি হয়ে যাবে। এর মধ্যে যে খোকনের চাকরির ঝঞ্ঝাট মিটবে তারও কোনো আশা নেই। তখন প্রব্লেম যা দাঁড়াবে, সেখানে আমি কী করব?'

যদিও এই-মুহূর্তে একটা সিগারেটের আকুলতা স্বাভাবিক, কিন্তু এঘরে, বিশেষত বাবার মুখোমুখি আজীবন অসম্ভব। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল শ্যামল। আবার বসে পড়ল। যখন ঘরের মানুষগুলো তিন দিকে তিনটি স্থিরচিত্রের ছবি, নিজেকে সংহত রাখার প্রাণপণ চেষ্টায়, তাকেও থেমে যেতে হয়। গলার স্বর খাটো হয়ে আসে—'যা ভাবছ তা নয় মা। আমিও খুব

সুখে নেই। সাধ করে মরতে চাই নি বলে আমার ভালোভাবে বাঁচার ইচ্ছেটাও কম ভোগান্তির হয়ে উঠছে না। কিন্তু সে-কথা তোমরা বুঝতেই চাইছ না কেউ...'

ছায়াগুলি কাঁপছে না তবু। যেন আদালতের হাকিম বা জুরিবৃন্দ নির্দয় কঠিন। দোষস্খালনের গাওনা গাইছে ব্যাকুল অপরাধী।

তিরতির রক্তের স্রোত আপাদস্নায়ুতে। শ্যামল নির্মম অস্থিরতায়—'মাত্র কটা বছরের চাকরিতে আমিও লাখ লাখ টাকা জমাই নি ব্যাঙ্কে। অফিসের লোন ব্যাঙ্কের লোন ছাড়াও এখানে-ওখানে দেনায় মাথা বিকিয়ে আছি। দেড় লাখ টাকার ফ্ল্যাট এরই মধ্যে প্রায় দুলাখ টাকায় গিয়ে উঠেছে। শেষ অব্দি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানি না। কী চাও তোমরা? চাও তো ওই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে পারি। কিন্তু কি হবে তাতে? কোনো সুরাহা হবে তোমাদের? খোকনকে বাঁচাতে পারবে ওই টাকায়?'

চমকে, করুণ কাঙালের মতো তাকালেন রেণুবালা—'তোর বাড়ির দাম তো দু লাখ টাকা!'

'হ্যাঁ, সেটা মাস-মাস কিস্তির দাম। তাছাড়া এখন পর্যন্ত যে-আশি নব্বই হাজার টাকা খরচ করেছি, তার প্রায় সবটাই ধার। বাড়ি বিক্রি করলে লোনগুলোই শোধ করতে হবে আগে। ভাইকে বাঁচানোর জন্যে কেউ টাকাগুলো দেয়নি আমাকে। বাড়ি তৈরির জন্যেই দিয়েছিল...'

'না, সে-হয় না। তুমি বাড়িটাই করো।'

সবাই ফিরে তাকিয়েছে।

কোমর ধরে এগোচ্ছেন সত্যসাধন। তাকাচ্ছেন না ছেলের দিকে। শয্যার দিকে লোভাতুর পা—'তুমি যা করছ, সেটাই করো। মন দিয়ে করো। জোতজমি ঘরবাড়ি কবে কোন্‌কালে ছিল একদিন, মনেও পড়ে না। বংশে তবু যদি কারুর হয়। সে-না-হয় তোমারই হোক। দেখেও সুখ...'

রেণুবালাকে মাঝখানে রেখে খাটের ওপর পিতাপুত্রের লম্বিত সমান্তরাল ছায়া ঋজুতায় স্থির। অন্তর্গত ক্রোধের বাষ্প সত্ত্বেও কোথায় যেন থেমে যেতে হয় শ্যামলকেও। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে আস্তে, নম্রতায়—'খোকনের চাকরিটা ঠিকমত থাকলে এসব কথা কিছুই উঠত না বাবা...'

'নো নেভার। ওর জন্যে কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। হি ইজ এ থিফ। একটা জোচ্চোর। বংশের কুলাঙ্গার...'

ঘরের বাতাস কেঁপে উঠল। পালঙ্ক ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সত্যসাধন। আরোহণের ভঙ্গিতে পা তুলেও থমকে গেলেন। যথেষ্ট ভারি গলা—'একটা জানোয়ারের জন্যে কোনো দরদ থাকা উচিত নয় কারুর...'

নতুন পরিস্থিতিতে শ্যামল এক জটিল অবস্থায়। মা এবং কৃষ্ণার উন্মুখ চোখগুলো যখন ওদের মুখের বোবা হাঁ-জোড়ার সঙ্গে মিশে নীরব, তাকে থেমে যেতে হয়। এক প্রকার করুণাই হয়তো বৃদ্ধের প্রতি। নিজেরই বাপ। সে-রাতের পর থেকে আর লার্গাক্টিল গিলছে না বুড়ো। আরো বেশি কষ্ট।

'না, যা ভাবছ ঠিক তা নয়...' শান্তভাবে, যেন অনেকক্ষণ বাদে দূরের মানুষগুলোকে ছুঁয়ে দাঁড়াবার একটা প্রসঙ্গ পেয়ে শ্যামল কিঞ্চিৎ স্বস্তিতে—'নিজের কাজকম্মো অফিস সব ফেলে

ওর জন্যে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি সারাদিন। দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তাও কম করছি না। সব দেখেশুনে অন্তত এটুকু বুঝেছি, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই বলেই এভাবে ফেঁসে গেছে ইডিয়টটা। টাকাপয়সা চুরি করেনি। ওর এগেনস্টে সরাসরি করাপশনের চার্জ আনতে হয়তো পারবে না ব্যাঙ্ক। অন্তত পুলিশ রিপোর্ট সে-রকমই হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে কী হবে? স্টুপিডটার একটা ভুলের জন্যেই ব্যাঙ্কের প্রায় লাখ টাকার ক্ষতি। সে-তো ছেড়ে দেবে না কেউ। এন্‌কোয়্যারির কাজ শুরুর জন্যে পুরোদমে তৈরি হচ্ছে ওরা। তোলপাড় হচ্ছে ফাইলপত্র পুরনো রেকর্ড। অনেকেই জড়িয়ে যাচ্ছেন। কাগজপত্র সব রেডি হয়ে গেলেই খোকনের তলব পড়বে। এন্‌কোয়্যারি বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে ওকে...'

শ্যামল থেমে গেল। ছায়াগুলো কাঁপছে না কোথাও। নিঝুম অনিদ্রার ঘরে রাত বাড়ে না এদের ঘড়িতে। বিরক্তি নয়, অস্বস্তিই এবার। উদ্বাস্তু ভিখিরির পোঁটলাপুঁটলির মতো দলা-পাকানো কতগুলো আপন মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকার দোলাচলে, সে—'ঝগড়াঝাঁটি চিৎকার চেঁচামেচির কথা নয় মা। বোঝো, একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমরা...'

রেণুবালা, আস্তে, নিষ্প্রদীপ চোখ তুলে বোবা।

'খোকনের চাকরিটা কী করে বাঁচানো যায়, আমি দেখছি। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব। কিন্তু লড়ব যে, কাকে নিয়ে, কার জন্যে লড়ব? কোথায় সে? সবচেয়ে বড় কথা, কেউ তো কোনো কথাই বলতে পারছে না ওর সঙ্গে। ওকে ডাকো তোমরা। ডেকে জিজ্ঞেস করো, ও নিজে কী চায়?'

'না, হি ইজ ডেড...' হাড়গোড় শরীর মুচড়ে যন্ত্রণায় খাটের ওপর সোজা হয়ে বসলেন সত্যসাধন—'একটা জোচ্চোর বজ্জাত ছেলের জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে হবে না তোকে। ওর সঙ্গে কথা বলেও এখন আর লাভ নেই কিছু। দেখেশুনে নিজের ঘরবাড়িটা বানিয়ে নে। দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশোনাটা খুব দরকার। নিজের ঘরবাড়ি' চাট্টিখানি কথা! এ-জিনিস এক জন্মে একবারের বেশি দু-বার হয় না আমাদের..'

'তুমি' নয়, এবার 'তুই'। অর্থাৎ পিতা তাঁর স্বাভাবিক চারিত্র্যে। হতাশায় বিহ্বল শ্যামল নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরুবার জন্য পা বাড়াল।

হামা দিয়ে গুটি গুটি বালিশের দিকে এগোচ্ছেন সত্যসাধন। অনেকটা চতুষ্পদের ভঙ্গি। লোভ, কী অসম্ভব ঘুমের লোভ! এবং দিশেহারা প্রলাপে—'এদিকের কাবুর জন্যে ভাবতে হবে না তোকে। আমরা থাকব। এখানেই থাকব। হাতিবাগানের মতো এরকম একটা জায়গায় মাত্র একশো কুড়ি টাকা ভাড়ায় আটটা ঘরের পুরো একটা বাড়ি আজকাল আর কোথায় পাওয়া যাবে? কে দেবে? একতলাটা ছেড়ে দিতে হয়েছে তোদের কাকাদের। কম রোজগারের মানুষ। বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরাই বা যাবে কোথায়? নিজের মায়ের পেটের ভাই। ফেলে দিতে তো পারি না...'

শ্রবণ মাত্র। শ্যামল ভাবনার খেই হারাল। এপারে-ওপারে যেহেতু কোনো সেতু নেই, ফেরি নেই, খেয়া নেই, বেকুবের মতো আরো কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে বেরিয়ে আসে। বর্ষার হাঁটুজলে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়লে যেমন হয়, কিংবা ছুটন্ত গাড়ি খানাখন্দের

কাদা ছিটকে গায়ের শার্টপ্যান্ট কদর্য করে দিলে যেমন, শেষপর্যন্ত নিজের ওপরই একটা অসহায় রাগ। অক্ষম আক্রোশ।

স্খলিত বৃক্ষশাখায়

খাটের তলায় গচ্ছিত সম্পদ, পুরনো ট্রাঙ্কসুটকেসের ডালা খুললে যেমন, বহুকালের প্রাচীন ঝাঁঝাল গন্ধে ধক করে ওঠে নাকটা। গন্ধটা অনেকক্ষণ সইতে হলে অবশ্যই স্নায়ুপীড়া। ওঘর থেকে বেরিয়ে এসে শ্যামল, মানুষের কার্ডিয়াক ট্রাবল কেন হয়—আতঙ্কে, বুকের যন্ত্রণায় ভয় পেল।

এবং এক দেয়ালের ব্যবধান ডিঙিয়ে এ-ঘরে, তার নতুন আসবাব আর মূল্যবান ইলেকট্রনিকস্-এর আধুনিকতায় প্রবেশের পরও স্বস্তি নেই! প্রাক্‌নিদ্রার প্রস্তুতি শেষ করে প্রতীক্ষায় ছিল সুনন্দা। স্বামীর প্রবেশে, শায়িত থেকেই ফিরে তাকাল দরজার দিকে—'কী হলো?'

'কী আবার হবে? যা হবার তাই...' দরজায় ছিটকিনি তুলল শ্যামল। খিলটাও। ক্রোধজনিত চঞ্চল ক্ষিপ্রতা—'বললাম সব। বলেই কি লাভ আছে নাকি কোনো! যে-যার মতো ভাবছে সবাই। মাঝখান থেকে শুধু আমরাই স্বার্থপর...'

সারাদিনের পর ঘুমের বাসনায় ন্যাতান্যাতা শরীরটা ভেঙে ভেঙে পড়ছে যখন, সুনন্দা বিছানায় উঠে বসল।

এবং অনেকক্ষণ বাদে একটা সিগারেট। শ্যামল উত্তেজিত—'উঃ, কী যে করি এখন! গুণধর ভাইয়ের জন্যে ছুটোছুটিতে জান বার হয়ে যাচ্ছে আমার। বিশ্বাস করবে কেউ? স্কাউন্ড্রেলটা নিজে তো ডুবেইছে। সবাইকে সব রকমে ডোবাচ্ছে এখন। প্ল্যানফ্ল্যান যা ছিল, সবই ভেস্তে গেল। এখন কী বলছেন বাবু? তোমার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে এর মধ্যে?'

মাথার এলোচুলে আঙুল খুঁটতে খুঁটতে সুনন্দা ছোট একটা হাই-ভাঙার-আলসেমিতে আচমকা নাড়া খেল—'কী কথা?'

'ও নিজে কী চায়? কী করবে এখন?'

'কী যে বলে ছাই! ওর কথা ঠিক-ঠিক বোঝে নাকি কেউ?'

'না বুঝলে তো চলবে না। বুঝতে হবে...' শ্যামল ছিটকে গিয়ে চেয়ারটায় ঝাঁপিয়ে বসল—'এভরিথিং মাস্ট হ্যাভ এ লিমিট। এতগুলো মানুষ এক সঙ্গে সর্বনাশের মধ্যে ডুবতে পারে না ওর একার জন্যে...'

দেয়ালের গা ঘেঁষে খাটের কোণে ঘুমোচ্ছে টুনটুনি। শিশুর নিশ্চিত-নিদ্রার নিঝুমে সুনন্দা চুপ। হঠাৎ...হঠাৎই ঝলকে উঠল বুকের কাঁপুনিতে। ড্রেসিং-টেবিলের পেছনের দেয়ালে নতুন করে উই উঠছে আবার! মাত্র ইঞ্চি চারেক দেখা যাচ্ছে। এখন, ঠিক এই মুহূর্তে আচমকা চোখে পড়ার পর, বিপন্নতায়, বুকের ঝলকানিটা আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় কান্না পাচ্ছে তার। আরশির মুখোমুখি একমাত্র শাড়ির আবরণে নগ্নবক্ষ নিজেরই বিম্বিত প্রতিমা এবং ঘাড়

ফেরাতেই টিভির চকচকে শাটার, যার ঊর্ধ্বে শ্বেতপাথরের প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি। তিল তিল সঞ্চয়ে ধারদেনায় নতুন-কেনা দামি দামি জিনিসপত্র। দেয়াল থেকে অন্তত ইঞ্চি চারেক দূরত্ব বাঁচিয়ে রাখতে হয় সব কিছুর। টিভির কাঠে উই ধরলে কান্নায়ও আপশোস ঘুচবে না।

অধিক রাতের সিগারেট তেতো। শ্যামল চেয়ার ছেড়ে ঝাঁ করে লাফিয়ে উঠল আবার। চেয়ার টেবিল খাট ড্রেসিংটেবিল টিভি টেলিফোন-ঠাসা পায়চারির পরিসরহীন ছোট ঘরে অশান্ত অধৈর্যে—'এদিকে যে কী সর্বনাশটা হয়ে যাচ্ছে আমার। আজ প্রায় চার-পাঁচদিন হলো একবারও যেতে পারলাম না ঘোষদের ওখানে। এত কাজ পড়ে আছে। আজও অফিসে টেলিফোন করেছিলেন সিতেশবাবু। কীর্তিমান ভাইয়ের জন্যে আজও তো যাওয়া গেল না।'

'সেকি!' আলসেমি ছুটে যায়। বুকের কাপড় ডান কাঁধ অব্দি জড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে পা ফেলল সুনন্দা—'এখন সিতেশবাবুই তো বলভরসা আমাদের...'

'আর বলভরসা! সব বলভরসাই যাচ্ছে একে একে। সব মিলিয়ে হাজার চল্লিশেক টাকা সিতেশবাবুর কাছ থেকে নিয়েছি! অত টাকা পাওনাও হয়নি আমার। এর পর যদি সাত আট মাস কি এক বছর বাদে ফ্ল্যাটটার পজেশন নিতে হয়...'

'নিতে হয় কী বলছ? নিতে তো হবেই।'

'তুমি তো বলেই খালাস...' শ্যামল তেড়ে উঠল! গভীর রাতের নিশুতিতে একটু বেশিই উচ্চকিত—'ওই স্কাউন্ড্রেলটা যদি এখনও কিছু না করে, শেষ অব্দি ধরো, যদি চাকরিটা চলেই যায় ওর, তখন কি এবাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা অত সহজ হবে ভেবেছ? বাবার ওই সামান্য পেনশনটুকু...'

বিষাদের টানে গাঢ় নিশ্বাসে সুনন্দা—'হ্যাঁ, সে-তো এখনই শুনতে হচ্ছে।'

শ্যামলের ললাটে সপ্রশ্ন ভ্রূকুঞ্চন।

'নিচের কাকা-কাকিমারা নাকি প্রায়ই বলেন, তোমার মা-বাবাও ওই একই রকম ভাবেন কিনা জানি না—এ-সংসারে কেউই তো খারাপ লোক নয় তেমন, তোমারই অদৃষ্ট খারাপ। লেখাপড়া-শেখা বিদুষী বউয়ের পাল্লায় পড়ে লোভী স্বার্থপর হয়ে উঠছ। মুঠো মুঠো টাকা ওড়াচ্ছ বাজেভাবে...'

শেষাংশের সিগারেট-টুকরো, শ্যামল, দু-কদম এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলল। রাতদুপুর পেরিয়ে গেলেও রাস্তায় দু-চারটে লোক চলে কলকাতায়। ফুটপাথে ঘুমোয় মানুষ। বোধবিচার নেই। জ্বলন্ত সিগারেট। অথবা ছুঁড়ে ফেলে সংবিৎ। তখন জানালার শিকে মাথা ঠেকিয়ে ঘাড় নুয়ে দেখতে হয় নিঃসঙ্গ লাইটপোস্ট, জনশূন্য নিষ্প্রাণ গলির রাস্তা, ফুটপাথে শায়িত মানবসারি।

মাথাটা টনটন করে। দুহাতে চুলগুলি মুঠোয় ধরে ঘাড় উঁচিয়ে রাখার দুঃসহ যন্ত্রণা।

কথাটা কি সর্বৈব মিথ্যা? অব্যক্ত গুঞ্জন শুকনো মগজে। অথবা রক্তের স্রোতে এলোপাথারি দুর্দম ঝড়...ফ্রিজের ইন্স্টলমেন্টটা যখন ঢুকল, সেদিন আমিই বলেছিলাম, টিভিটা থাক আপাতত। একটু জিরোই। ফ্ল্যাটটা যখন শুরুই হয়ে গেল, অনেক টাকা লাগবে। তোমার মোহ ছিল। শুনলে না। এবং তখনই বলাই শীলের সংযোগে 'মেশিকো' কোম্পানির সিতেশ ঘোষের

সঙ্গে পরিচয়। বাড়তি রোজগারের একটা নতুন দরজা। তোমারও পে-কমিশনের রিপোর্ট বেরুল সে-সময়। বাকি-বকেয়া রেট্রসপেক্‌টিভ এরিয়ারের লম্বা ফর্দ। টিভিটা ঘরে এসে গেল। ফ্ল্যাটটা তৈরি হতে হতে দুবছর আড়াই বছরে বিল্ডিং মেটেরিয়ালের দাম বড় বড় স্কাইস্ক্র্যাপারের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তখন। হিসেবের বাইরে আরো প্রায় হাজার ত্রিশেক টাকা। এখনও অপূর্ণ অনেক। হরিদ্বারে সবাই যায়। কী আশ্চর্য! দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন গেলাম। ওখানে যাওয়া হয়নি আমাদের। দক্ষিণ ভারতটা পুরো বাকি। বয়স থাকতে থাকতেই নাকি এসব সেরে ফেলতে হয়। স্কুলে পুজোর-ছুটি এলেই তোমার মাথায় পোকা

শ্যামল ঘুরে দাঁড়াল। দেয়ালের দিকে চোখ রেখে সুনন্দা নিস্তেজ স্থবির। দেয়াল বেয়ে সরু দড়ির রেখায় আবার সেই সর্বনাশা উই! সে জানে, ড্রেসিং-টেবিলের পেছনে চারদিকে চারিয়ে গিয়ে রাজত্বি ওদের। জিনিসপত্র সব সরিয়ে পরিষ্কার করতে পুরো একটা রবিবারের দুপুর

রাতের প্রহর দীর্ঘ হয়। নিশুতির রাত আরো প্রগাঢ় স্তব্ধতায় শান্ত হয়ে এলে একটি ঘুমন্ত শিশুকে পাশে রেখে দেহলীন দুজন ঘনিষ্ঠ নারীপুরুষ, যেন তাদের নিশ্বাসের শব্দটুকুও লুকোতে চেয়ে যখন স্থির বিগ্রহে পাথর, দুরন্ত পাখায় ঘরের একমাত্র ধ্বনি—বাতাসের শব্দটা টিকে থাকে। দুজনেরই অনুভব—কলকাতা শহরেও ঝিঁঝি থাকে। একান্তভাবে ধ্বনিশূন্য নৈঃশব্দ্য নেই কোথাও।

দিন কয়েক আগে সদ্য-দেখে-আসা টি-সেভেন চারতলা ফ্ল্যাটের ছবিটা এখন আর কল্পনা নয়, অবচেতনের নির্বস্তু অবয়বে ভাসমান। তৎসহ পরিকল্পনার ছকগুলি—লিভিংরুমটা চমৎকার। ছিমছাম সোফাসেট থাকবে একটা। দেয়ালে একমাত্র ছবি—রবীন্দ্রনাথ। খাটো একটা বইয়ের আলমারি একদিকে, অন্য প্রান্তে টিভি টেলিফোন। স্টিরিও-সেট রেকর্ড-কেবিন সবই বাইরের ঘরে। পেতলের টবে মানি-প্ল্যান্টের চারা জানালার গ্রিল ঘেঁষে। ভেতরের ডাইনিং স্পেসে রঙিন মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম। বাইরের অলিন্দে দাঁড়ে বা খাঁচায় টিয়া। কিংবা টুনটুনিই দু-চারটে। টুনটুনির জন্য।

চোখজোড়া যেখানে বাস্তব, চেতনায় ফিরে এসে সজোরে ঝাঁকুনি খেল সুনন্দা। প্রতিদিনে, অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায় কত ইঞ্চি সুড়ঙ্গ পথ বানাতে পারে বল্মীক-শ্রমিকরা? নতুন প্রাসাদ কত বছরের প্রাচীন হলে এরা এসে বাসা বাঁধে দেয়ালে? ভাবনায় হাল ছাড়ল সে। বিজ্ঞান জানে না।

এবং বিজ্ঞানের মানুষ, শ্যামল, আপাতত ডেবিট-ক্রেডিটের গোলকধাঁধায় বেসামাল। টাকা টাকা টাকা! মাথাটা বিলকুল খারাপ করে দিলো শুধু টাকার চিন্তা। আরো অন্তত হাজার পাঁচ-সাত এক্ষুনি দরকার। ধারদেনায় কোণঠাসা হতে হতে এখন প্রায় সাঁড়াশিব্যূহে। চারদিকে নানাভাবে পাওনাদার। রেহাই নেই আগামী অসংখ্য বছরে। হয়তো আজীবন।

কথাটা সত্যি। 'মেশিকো'র মালিক সিতেশ ঘোষই যাহোক একমাত্র ভরসা এখন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াল সে—'নাও শুয়ে পড়ো। রাত অনেক হয়েছে।'

'হুঁ...' ছোট্ট অব্যয়োচ্চারণে ঘরের স্তব্ধতা কেঁপে উঠল। সুনন্দা দীর্ঘশ্বাসে—'আলোটা

নিভিয়ো না। বাথরুম যাব।'

দরজায় ছিটকিনি নামানোর ধাতব চিৎকার। সুনন্দা বেরিয়ে গেল এবং নৈঃশব্দ্যের শয্যায় লুটিয়ে পড়েও স্বস্তি নেই শ্যামলের। দপদপ করছে মাথাটা। দুর্বহ স্নায়ুচাপ।

পুষ্পিত হবার
কৃৎকৌশল

ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এন. জে. ই. ডব্লু. এক সুবিশাল অগ্রণী শিল্পসংস্থা। বিশেষত হাই এবং লো টেনশন বাসডাক্ট উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের যশপরিধি এক্ষণে খুবই ব্যাপক।

এ-হেন এক ডাকসাইটে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বাসডাক্টের ডিজাইন তৈরির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট একজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল দাশগুপ্ত তার প্রচ্ছন্ন অহংকারে ভাবতেই পারে—উল্লেখযোগ্য জীবননির্মাণের চারুকলায় সে এক নিপুণ স্থপতি। বরফের তলায় গলিত পচা মাছের মতো এঁদোগলির অন্ধকারে শুকিয়ে মরার চেয়ে অবশ্যই যা বাঞ্ছিত হতে পারে—নাগরিক শোভায় সুদৃশ্য এক উজ্জ্বল সংসার, যেখানে বিত্তই পদমর্যাদা, বিত্তই সামাজিক সম্ভ্রম, বিত্তই পৌরুষ।

অথচ নিজের আড়াই-হাজারী মাইনের অঙ্কের সঙ্গে সুনন্দার স্কুলমাস্টারির উপার্জনটা যোগ করলে যা দাঁড়ায়, মোটামুটিভাবে অবশ্যই এক সুখকর তথা নিরাপদ পরিখা জীবনের। কিন্তু ইলেকট্রনিক-সংস্কৃতির দুর্নিবার টানে অস্থাবর সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মুলুক পেরিয়ে সুখের ঘুড়ি যতই উর্ধ্বগামী, হাতে লাটাইয়ের সুতোয় টান। বড়ই অকুলান।

এবং তখনই কোনো একদিন ফ্যাক্টরির পার্চেজ ডিপার্টমেন্টের নন্-টেকনিকাল স্টাফ বলাই শীলের সূত্রে সিতেশ ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তা। এন. জি. ই. ডব্লু-রই একজন প্রভাবশালী সাপ্লায়ার সিতেশ ঘোষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগী পুরুষ। সরাসরি প্রস্তাব ফেললেন।

প্রাথমিক পর্বে কিছুটা দ্বিধা ছিল, কিছুটা সংশয়। তাছাড়া প্রস্তাবের পরিপূর্ণ চেহারাটাও রীতিমত ধোঁয়াটে।

বাসডাক্ট তৈরির ক্ষেত্রে যেহেতু ডিজাইনই মুখ্য কারুকলা, সেক্ষেত্রে সিতেশ ঘোষের জরুরি প্রয়োজন ছিল দুজন কি একজন কুশলী ইঞ্জিনিয়ারের মগজ, যা তিনি মোটামুটি চড়া দামেই ক্রয় করতে ইচ্ছুক। 'মেশিকো' নামে তাঁর একটি ছোট কারখানা। এন. জে. ই. ডব্লু-র মতো অতি বিশাল কর্মকাণ্ডের তুলনায় যার অস্তিত্বটা নিতান্তই সাহেব-বড়সাহেবদের নিত্য সহচর আর্দালির মতো ' বড় প্রতিষ্ঠানের জটিলতা নেই। বরং ছোট হবার সুবিধেই কিছুটা। ফেব্রিকেশন বা অ্যাসেমব্লির কাজটার মধ্যে খুব বেশি ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থাকার কথাও নয়। সিতেশ ঘোষের কারখানায় সেসব অবশ্যই সম্ভব। দরকার শুধু, চল্লিশ-বাই-কুড়ি ফুট মাপের একটি ফ্লোর, যা তিনি অনায়াসেই ভাড়া নিতে পারেন এবং সি. পি. আর. আই. থেকে টেস্ট সার্টিফিকেট সংগ্রহও যাঁর অনায়াসসাধ্য।

সহাস্যে হাত বাড়ালেন সিতেশ ঘোষ। সহযোগিতা প্রার্থনায় ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা—প্রথম কিস্তিতেই হাজার পাঁচেক টাকার বিনীত নিবেদন।

সুপ্রসন্ন বলাই শীলও অভয় বা প্রেরণা—'হতেই পারে। এটা হয়। আকছার হচ্ছে এদিক ওদিক...' ঘটক বিদায়ে তিনি খুশি।

আরো একজন জড়িয়ে গেলেন ত্রিভুজে। ড্রাফটসম্যান হরিপদ নিয়োগী! প্রয়োজনীয় ড্রয়িংগুলো করে দেবেন যথাযোগ্য মূল্য বিনিময়ে।

দ্বিধা জড়তার ডুবজল থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে সময় লাগল না খুব। সিতেশ ঘোষের সঙ্গে গোপন চুক্তির পর বরং আপশোস—তাহলে আর হাউসিং কোঅপারেটিভের ফ্ল্যাট কেন? এর পর বাবার অভিলাষ চরিতার্থতায় পরিপূর্ণ একটি নিজস্ব বাড়ির ভাবনাই তো ভাবতে পারত সে! ইতিমধ্যে খোকনও লম্বা চওড়া একটা চাকরি পেয়ে গেছে ব্যাঙ্কে। এইট-বি-বাই-ওয়ান কানাই মল্লিক লেনের জানালা দরজাগুলি খুলে যাচ্ছে টপাটপ। অঢেল আলো অঢেল বাতাস।

অন্যদিকে শ্যামল দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যদের নিবিড় সখ্যে তথা মূল সংস্থা এন. জি. ই. ডব্লু-রই দোহনে সিতেশ ঘোষ বা তাঁর 'মেশিকো' নানাদিকে চারিয়ে গিয়ে ডালপালা ছড়িয়ে পরিণত বনস্পতি। লাভ বাড়ে, লোভ বাড়ে। বাণিজ্যসমৃদ্ধির অপ্রতিহত গতি। সমৃদ্ধির হেতু মোটামুটি নিম্নরূপ

ক. বৃহদায়তন শিল্পের মতো মাথাভারি পেল্লাই খরচ না থাকায় সিতেশ ঘোষ তাঁর উৎপাদিত বাসডাক্ট বাজারে বিক্রি করতে পারেন এন. জে. ই. ডব্লু-র চেয়ে বেশ কিছু কম দামে।

খ. এবং যেহেতু এন. জে. ই. ডব্লু-রই ইঞ্জিনিয়ার কারিগরী সহায়তা দিয়ে উৎপাদনের তদারকি করছেন, 'মেশিকো'-র মাল গুণগত উৎকর্ষ বিচারে কিছুমাত্র নিম্নমান নয়।

গ. সুতরাং মাঝারি গোছের অসংখ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের ইলেক্ট্রিকাল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য 'মেশিকো'র বাসডাক্ট ব্যবহার করছেন। বাজারদর অপেক্ষা সুলভমূল্যে উন্নত মানের সামগ্রী তাদের পক্ষে লাভজনক।

ঘ. বাজারে ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধিতে সিতেশ ঘোষের বাণিজ্য লক্ষ্মী অচলা।

ঙ. সিতেশ ঘোষের বাড়বাড়ন্ত বা শ্রীবৃদ্ধিতে শ্যামল দাশগুপ্ত অবশ্যই একজন মহামহিম অংশীদার।

সুতরাং ছুটির পর সপ্তাহে দুচারদিন অথবা কোনো কোনো ছুটির দিনেও শ্যামলকে ছুটতে হয় সিতেশ ঘোষের কারখানায়। উৎপাদন তদারকির দায়িত্ব। সিতেশ ঘোষ গাড়ি পাঠান। এ-রকম একটা গাড়ি অচিরেই নাকি তার নিজেরও হয়ে যেতে পারে। উপঢৌকন হিসেবে একটা স্কুটার বা মোটরবাইকের অফার অনেকদিন থেকেই ছিল। কিন্তু বেঁচে-থাকার মজায় মেতে ওঠার পর স্বপ্নের অর্ধাংশ ভাগীদার সুনন্দার সুখ হারাবার ভয় বেড়েছে অনেক। স্কুটারের পেছনে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ছুটতে আপত্তি তার। স্বপ্নকে নাকি বড় করেই দেখতে হয়। জীবনে অনেক খানাখন্দ।

অনেক, অনেক স্বপ্নের বুননে জীবন যখন সত্যি মোহময়, অকস্মাৎ তালভঙ্গের দুর্বিপাক। খোকনের সাড়ম্বর পতন!

শ্যামল মুচড়ে উঠল। বিছানায় পাশবালিশটাকে আঁকড়ে ধরে বুলেটবিদ্ধ ভূমিশায়ীর মতোই যখন কাতর যন্ত্রণা, ঘরে আবার খিল-তোলার শব্দ, ছিটকিনির আওয়াজ—'জানো, ওঘরে আলো

জ্বলছে এখনও। কথা বলছে তিনজন...'

মুদিত চোখের আচ্ছন্নতা থেকে তাকাল শ্যামল—'বলতেই পারে। এ-বাড়িতে কেউ তো আর নাক ডেকে ঘুমোবার অবস্থায় নেই। কেন? খোকনের ঘরে মা ঘুমোন না আজকাল?'

'ঘুমোন তো জানি। যাননি এখনও।'

'মরুক গে যাক...' আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠেছে শ্যামল—'সিতেশ ঘোষের ফ্যাক্টরিতে আমার পার্ট-টাইমের কথা তুমি বলেছ কাউকে?'

আলো নেভাতে দেয়ালে হাত বাড়িয়েছিল সুনন্দা। থমকে গেল—'কেন?'

'বলেছ, নির্ঘাৎ বলেছ...' এক ঝামটায় লাফিয়ে উঠল শ্যামল। বিষাক্ত তিরিক্ষি গলায়—'বৃথাই লেখাপড়া শেখা তোমাদের। কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। পেটে থাকবে না তো সবকিছুই শোনার ইচ্ছে, জানার ইচ্ছে কেন? এর পর তো তোমাকেও বলা চলবে না কিছু। উঃ, এমনিতেই ঝামেলার শেষ নেই। তার ওপর একটার পর একটা বাড়িয়েই যাচ্ছো তোমরা...'

'আঃ, চ্যাঁচাচ্ছ কেন রাতদুপুরে? বলছি তো, বলিনি...'

শ্যামল নেতিয়ে পড়ল। শয্যা নিদ্রাহীন।

শরীর শিথিল হয়ে আসে। সুইচ টিপে দিয়ে এগোয় সুনন্দা। ঘর অন্ধকার। অন্ধকারের সুবিধে এই, ভয় আর ভাবনায় মুখ দেখবে না পরস্পর।

অথচ ঘরের নিঝুমে তখনও কাতর গোঙানি—'সিতেশ ঘোষের ওই হাজার চল্লিশেক টাকা...ওই, ওই টাকাটাই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার...'

বিছানায় উঠে এসে সুনন্দা হামা দেয় অন্ধকারে। বাঁদিকে শিশুসন্তান, ডান হাতে স্বামী। সাত-বাই-পাঁচ লম্বা খাটের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণতায় তার স্থান। ভেবে হদিশ পায় না, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে খেটেখুটে-আনা বাড়তি রোজগারের কথা জানাজানি হলে? পাঁজরা দুটোয় খামচি মেরে থাকে ভয়। সবাই তো নয়, গল্পে-গল্পে একদিন সে কথাটা বলে ফেলেছিল খোকনকে। খোকন জানে।

কিন্তু তখনও বিষ গেলেনি খোকন। সেদিন ওর চাকরি ছিল।

ভিজিলেন্স অফিসার অযোধ্যাপ্রসাদ পাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বেরিয়ে এসে, বহুতল প্রাসাদের ত্রিতলে, যেন এক সুরক্ষিত দুর্গ, দেড় হাজার দু-হাজার ফিট অথবা ততোধিক বিস্তীর্ণ বর্গভূমিতে কাচ আর ম্যাসোনাইট-পাঁচিল-ঘেরা সুদৃশ্য চেম্বারের খোপে খোপে, যেখানে সুউচ্চ মন্দিরচূড়ার স্বর্ণকলস পাকা-পাকা মাথাগুলি তামাম ভারতবর্ষব্যাপী জাল-ছড়ানো বৃহৎ এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের ইজারায় সমাসীন, সেখানে আশ্চর্য শীতল এক নৈঃশব্দ্যের জগতে অকুণ্ঠ চলাফেরার অবসাদে উৎপল তার পকেট থেকে রুমাল টেনে ঘাড়গর্দান কপালের ঘাম মুছল।

হাসপাতালের ঘটনার পর গত দু মাসে অন্তত বার-তিনেক তাকে আসতেই হলো ঈদৃশ স্বর্গধামে এবং প্রতিবারই পাণ্ডেসাহেবের প্রশস্ত ললাট থেকে দীর্ঘায়িত টাক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত

তকতক ফর্সা চামড়ার মসৃণতায় আদরের প্রলেপ নিকোনোর ইচ্ছে জেগেছে তার। আহা রে বেচারি! সাকসেস-ইন-লাইফের দিগদারি কত! টঙে বসে ভক্ত খুঁজে পুজো আদায়ের কী যে আকুলতা!

আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিটের আলোচনায়, আজও সম্বোধনে 'মিঃ পাণ্ডে' বলেছিল সে। 'স্যার' না-ডাকায় শেষপর্যন্ত ক্ষেপেই গিয়েছিল লোকটা। অবশ্য ভদ্রলোকই জানালেন, এবার একটা হেস্তনেস্ত কিছু হয়ে যাবে শিগগিরই। সম্ভবত মাসখানেকের মধ্যে এনকোয়্যারি বোর্ড গঠন করে দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে। যথার্থই বিচারসভা। সেক্ষেত্রে উৎপল দাশগুপ্ত তাঁর সপক্ষে ডিফেন্স-কাউন্সিল হিসেবে কাউকে নিয়োগ করতে পারেন। অবশ্যই তিনি ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশিষ্ট কোনো ব্যক্তি হবেন। বহিরাগত বা পেশাগত আইনজীবী কেউ নন।

নির্জন করিডরে দাঁড়িয়ে বেশ ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় উৎপল একটা সিগারেট ধরাল। দরজার পাশে দু-চারজন সাবস্টাফ টুলে বসে লক্ষ করছে তাকে। সে লিফটের দিকে এগোয়। এবার বাংলামতে সাততলায়। ইংরেজির ছয়।

আশি হাজার টাকা তো পকেট খসে পড়ে যাবার মতো তুচ্ছ ব্যাপার নয়। ছিনতাই বা পকেটমারের দৌরাত্ম্যও হতে পারে না। পরাক্রান্ত দস্যুরই অধিকার। সুতরাং জনসাধারণের অর্থের অছি ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থেই দুর্বৃত্তকে শনাক্ত করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু অপরাধই অপরাধীর নিশ্চিত প্রমাণ নয়। বিধিসম্মত তথ্যাদি প্রয়োজন। সংবিধানের মহান প্রতিহারী বিচারক আছেন, আছে রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরাষ্ট্র দপ্তর, থানাপুলিশ জেল-হাজতের বিপুল আয়োজন।

সর্বপ্রকার তদন্ততল্লাসি শেষে কাগজপত্র প্রস্তুত। এক্ষণে এক নম্বর বা একমাত্র আসামী উৎপল দাশগুপ্তকেই অভ্যন্তরীণ বিচারমঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হবে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। নিরপরাধ সে।

যদিও বগলের তলায় একটা স্টেনগান চেপে ধরার সমতুল্য আক্রোশ রক্তে রক্তে চারিয়ে যেতে থাকে, ট্রিগারটার জন্য ডানহাতের তর্জনীতে নিশপিশ, তথাপি দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে শান্ত রাখার দায়। আসলে...আসলে এই ক্রোধটারও কোনো মূল্য নেই। অর্থহীন।

পায়ে পায়ে, আরো এক অর্থহীনতায় প্রতিটি মন্থর পদক্ষেপে সে লিফটের দিকে এগোল। তালগোল-পাকানো ভাবনাগুলি মগজের কেন্দ্রে ঘূর্ণিঝড়। শরীর ভরে কটকটে রাগটাকেও ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না কিছুতেই। এ-যেন সেই শৈশবের চোর-চোর খেলা। চোর বানাতেই হবে একজনকে। নইলে খেলাটা জমে না অন্যদের।

তখনই দাহ। রক্তে অণুতে অণুতে দংশন।

লিফটটা উঠে এসেছিল ওপরে। মধ্যবয়সী দুজন বেরিয়ে এলেন। শূন্য-ঘরে ঢুকল সে। বোতাম টিপতেই দরজা বন্ধ হয়ে আসে। ঘরটা ওপরে উঠছে। খাঁচার মতো শূন্য-ঘরই এখন বড় মারাত্মক। যেমন-তেমন-খুশি চারপাশে লাথি মারার সাধ জাগে। ভেঙে ফেলার ইচ্ছে।

রাগটারও যদি কোনো মূল্য নেই, কোথায় সে ভাঙতে পারে এদের দুর্গ? দুরারোগ্য ব্যাধি বা অপঘাতে আক্রান্ত মানুষ, যদি সে যুবকই হয়, কীভাবে মেনে নেয় জীবনের মিথ্যেটা? কোন্

মূল্যে? প্রকৃতি যদি এতই নির্মম! আর মানুষের জন্য মানুষেরই তৈরি এই অগাধ তামাশা?

চারতলা না ছুঁয়ে লিফটটা উঠে যাচ্ছে ধীরমন্থর। কী আশ্চর্য সুন্দর এদের লিফটের ঘর! মাথার ওপর পাখার বাতাস, পেছনের দেয়ালে স্বচ্ছ দর্পণ, ঘৃতবর্ণে মসৃণ দেয়াল, সুদৃশ্য সুইচবোর্ড। ওদেরই খাঁচায় নিজেকে পুরে নিয়ে সে তার রক্তের চঞ্চলতায় দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়—মরে-যাওয়াটা যদি নিতান্তই আহাম্মকি, এই চাকরিটার জন্যই সে লড়বে। মা বাবা দাদা বোন, এমন কি শিপ্রা—কারুর জন্য নয়। জালিয়াত অপবাদে কে বা কারা ভ্রূকুটি তুলল—থোড়াই কেয়ার। জীবন নামক অর্থলুপ্ত এক বায়বীয় অস্তিত্বের সপক্ষে তার লড়াই। জোর বাড়ে। সুতরাং হঠাৎ-আহৃত সেই জোরেই দৃপ্ততেজে সে পাঁচতলায় টেবিল চেয়ার কাগজপত্র ফাইল মানুষের যৌগিক মিশ্রণ এক আপেলের বাগান বা দ্রাক্ষাকুঞ্জে ঢুকে পড়ল। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন অসীম বাগচী। কাছাকাছি পৌঁছোতেই তড়িঘড়ি ব্যস্ততায় উঠে দাঁড়ালেন—'এসে গেছেন। চলুন। আজই কথা হচ্ছিল আপনার সম্বন্ধে...'

'কোথায়?'

'দিল্লী থেকে কাল ফিরেছেন হালিমদা। এখনও বোধ হয় নিচে আছেন।'

ব্রিফকেস হাতে তুলে দ্রুত বেরিয়ে এলেন অসীম বাগচী। উৎপল নিঃশব্দ অনুগামী। বোতাম টিপে লিফটের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার অবকাশে—'ল-অফিসার হাজরার সঙ্গে কথা বলেছি আপনার কেসটা নিয়ে। হালিমদাও ছিলেন। কাল আরো একবার আর. এম.-এর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব।'

উৎপল নির্বাক। বন্ধ-দরজার শীর্ষে দশ নয় আট সাত রক্তবর্ণ সংখ্যাশব্দে লিফটের অবতরণ গতির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি।

'তবু বাঁচোয়া ম্যানেজমেন্ট বেশ র‍্যাপিডলি এগোচ্ছেন আপনার ব্যাপারটা নিয়ে। সাধারণত পাঁচ সাত আট বছর তো কিছুই না এসব কেসে...'

নিচে, দোতলায় দুটো টেবিলের ভাগাভাগিতে ম্যাসোনেট পাঁচিল-ঘেরা বড়সড় ঘরের একটা টেবিলে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অসীম বাগচী আলাপ করিয়ে দিলেন—'হালিমদা, ইনি উৎপল দাশগুপ্ত। আমাদের শিয়ালদা ব্রাঞ্চের সেই কেস...'

'চিনি। এর আগেও তো বারকয়েক কথাবার্তা হয়েছে আপনার সঙ্গে...' শার্টপ্যান্টে সাধারণ মধ্যবিত্ত চেহারার ভদ্রলোক উচ্ছ্বাস বা অনুচ্ছ্বাসে কিছুমাত্র নাড়া খেলেন না। সম্মুখবর্তী চেয়ার ইঙ্গিত করলেন—'বসুন।'

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির একজন বড় নেতা আবদুল হালিম করণিক বা অফিসার কৌলীন্যের মধ্যবর্তী অবস্থানে স্পেশাল অফিসার হলেও বেতন ভিত্তিক পদমর্যাদার অনেক উর্ধ্বে ব্যাঙ্কের এক দামাল পুরুষ। উৎপলের মনে পড়ল, ডানা-ঝাপটানোর সেই ভয়ঙ্কর দিনে লার্গাকটিলের সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার আগে বারকয়েক সে এসেছিল ভদ্রলোকের কাছে।

'আপনার দাদা তো কালই এসেছিলেন। আলোচনাও হলো কিছু।'

'আমার দাদা!' উপবেশনের সূচনাতেই এক অবিশ্বাস্য ধাক্কায় ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল উৎপল—'আপনি কোনো ভুল করছেন না তো?'

টেবিলের ওপাশে হালিম সাহেব তাঁর গম্ভীর ভারি গলায়—'এন. জে. ই. ডব্লুর-ইঞ্জিনিয়ার শ্যামলবাবু আপনার দাদা তো!'

বিস্মিত উৎপল নিজের মধ্যে, অন্তরালে, বুঝে নিতে চায় হিসেবটা। অগ্রজের পুরো চেহারাটা দৃশ্যপটে স্থির রেখে সে দ্রুত একটা সন্ধান পেতে চাইল—ব্রাঞ্চে মিঃ ধড়িয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা না-হয় বোঝা যায়। কিন্তু এখানে, রিজিওনাল হেড অফিস অব্দি ছুটোছুটি দৌড়? ব্যাঙ্কিংয়ের এত বড় সংকটে কীঈবা করার থাকতে পারে একটা কারখানার বড় মিস্তিরির?

টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলেন হালিম সাহেব—'এত বিশাল একটা মাল্টিন্যাশনাল ফার্মের ইঞ্জিনিয়ার। এখানে আর. এম. পর্যন্ত ইনফ্লুয়েন্স করার মতো ভি. আই. পি. সাহেব তো তাঁদের অফিসেও কম নেই। ওপরের তলায় কর্তাদের কাছে যাচ্ছেন। আবার আমাদের কাছেও এসেছেন। খুবই ডিস্টার্বড মনে হলো তাঁকে। খুবই খাটছেন আপনার জন্যে।'

'কী খাবেন?' বাঁদিক থেকে অসীম বাগচী।

উৎপলের ডান-বাঁ নেই। মগজে লাট্টু ঘুরছে। চোখ ফেরাল সে—'ন্‌না, কিছু খাব না! শুধু চা খেতে পারি কিংবা কফি...'

শোভন যুবক, সাব-স্টাফ একজনকে ডেকে ক্যান্টিনে তিন কাপ কফির খবর পাঠাতে বললেন অসীম বাগচী। উৎপল নিস্পৃহ স্বরভঙ্গে—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'বলুন।'

'নির্মলবাবুকে তো চেনেন আপনি? আপনার বন্ধু...'

'ওহ্‌ হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্টের জুনিয়ার অফিসার নির্মল ভদ্রকে তো ডিফেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ সিলেক্ট করা হয়েছে আপনার জন্যে। ভালো লড়াকু ছেলে। এর আগেও গোটাকতক কেসে নির্মল ভালোই লড়েছে...' নিরুত্তাপ হালিমসাহেব অ্যাশ্‌ট্রেটা টেনে নিলেন কাছে—'কেন! কী হয়েছে? নির্মলবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'কেসটা কি সিরিয়াসলি লড়া হবে? নাকি নেহাৎ-ই ইউনিয়ন থেকে একজনকে দাঁড় করাতে হয়, তাই...'

কুঞ্চিত ললাট চোখের তীক্ষ্ণতায় ছুঁচোল হলো। ঝুঁকে বসলেন হালিম সাহেব—'কেন? একথা বলছেন কেন?'

'এর আগে আরো বারকয়েক কথা বলেছি। আপনার সঙ্গে খুব বেশি না হোক, অসীমবাবুদের সঙ্গে, নির্মলবাবুর সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছে কিছু...'

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন হালিমসাহেব—'জাস্ট মেরিট দেখে এসব কেস সম্বন্ধে কোনো অনুমান করা বড় মুশকিল উৎপলবাবু। প্রায় আইডেন্টিকাল কেসে হয়তো দেখবেন—কেউ দিব্যি পার পেয়ে গেলেন কোথাও, আবার আরেক জায়গায় পানিশমেন্ট। সবটাই নির্ভর করছে, আপনার সম্বন্ধে কর্তারা কী অ্যাটিচুড স্থির করে রেখেছেন, তার ওপর...'

উত্তাপস্পর্শে থার্মোমিটারের পারদসুতোর রীতিতে ক্রোধবৃদ্ধিই সঙ্গত ছিল এর পর। উৎপল অবাক হলো, তার রক্তে চঞ্চলতা নেই।

'আরো অদ্ভুত...' বাঁদিকে সরব হলেন অসীম বাগচী—'যাঁরা আপনাব বিচার করবেন,

নথিপত্র ডকুমেন্টস সবই কিন্তু তাঁদের হাতে। সবাই মিলে একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে এককাট্টা হয়ে বসেছেন আর অন্যদিকে নির্মলবাবুকে, অর্থাৎ আপনার ডিফেন্সকে অন্-দ্য-স্পট ডিসিশনে কথা বলতে হবে। অথচ ভদ্রলোক কিন্তু প্রফেশনাল ল-প্রাকটিশনার নন। ব্যাঙ্কেরই এমপ্লয়ি...'

বাক্যটা তুলে নিলেন হালিম সাহেব—'সেটাও ভাবনার ছিল না তেমন। কেসটা যদি সাউন্ড হতো...'

উৎপল চমকে তাকাল—'অর্থাৎ আমার কেসটাকে যথেষ্ট সাউন্ড মনে করছেন না আপনারা?'

'ইউ আর আন্ডার দ্য ক্লাউড মিঃ দাশগুপ্ত...' শুকনো কুণ্ঠিত গলার স্বরে হালিম সাহেব—'সাবজেকটিভ্লি আমরা বুঝতে পারছি, ইউ আর রংলি ভিক্টিমাইজড। কিন্তু জাস্ট টু গেট মি, এসব জায়গায় ইমোশনাল হবার উপায় নেই কারুর, সবটাই ভীষণ ক্রুড। কাগজে-কলমে অপরাধটা তো আপনার নামে প্রমাণিত হয়েই আছে। ইউ সুড হ্যাভ বিন কশাস আর্লিয়ার...'

'তার মানে কোনো রাস্তা নেই? হেরে যেতেই হবে তাহলে? এটাই রিয়েলিটি?'

কণ্ঠস্বরকে তলানিতে রেখেই ধীরলয়ে প্রশান্ত হালিমসাহেব—'সে-অর্থে ব্যাঙ্কের তো কোনো মালিক থাকে না উৎপলবাবু। তাহলে লোকগুলোকে না-হয় একটু বোঝানো-সোঝানোর চেষ্টা করা যেত। যাদের নিয়ে আপনার এনকোয়রি বোর্ড, সেখানে আর. এম. বা চিফ অফিসার গোছের থাকবেন না কেউ। এনকোয়্যারি-অথরিটি থেকে প্রেজেন্টিং অফিসার সবাই শেষপর্যন্ত আপনার মতো ওয়েজ-আর্নার মিডল ক্লাস। আর চাকরিই যখন, তার প্রমোশন আছে, ক্ষমতা ফলানোর নেশা আছে। বিগ অ্যামাউন্টের এ-রকম একটা কেসে কাউকে ফাঁসাতে পারলে ম্যানেজমেন্টকে খুশি করে নিজেদের কেরিয়ার। হয়তো তাঁরা আপনারই কোলিগ...'

টেবিলে দুহাতের কনুই ঠেকিয়ে, চুলের মুঠি চেপে ধরে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকার পর উৎপল মুক্তি পেল। ক্ষুধা তৃষ্ণা পায়খানা পেচ্ছাবের মতো এবার ভেতরে ভেতরে একটা রাগ পাচ্ছে তার। যেহেতু ক্রোধটাই প্রাণ, একমাত্র জীবনীশক্তি, সে মাথা তুলল এবার।

সম্মুখবর্তী হালিম সাহেব শান্তভাবে—'এক্ষুনি এত পার্টার্বড হবার মতো কিছু ঘটেনি। জেলহাজত তো হচ্ছে না আপনার। সে-স্টেজ পেরিয়ে গেছে। এখন আপনার চাকরিটা যাতে থাকে, আমরা তাই দেখব। পানিশমেন্ট একটা দিতে চাইবেই ওরা। সেটাও কত কম হয়, আদৌ যাতে কিছুই না হতে পারে উই মাস্ট সি টু ইট অ্যান্ড দ্যাট উইল বি আওয়ার প্রাইম অ্যান্ড প্রাইমারি টাস্ক...'

'কিন্তু আমি যে এখন জেলে যেতেই চাই।'

ভদ্রজনরা হতবাক।

টেবিলে লাল নীল হলুদ সবুজ ফাইল পেনহোল্ডার পিনকুশান পেপারওয়েট অ্যাশ্‌ট্রে আর কাগজপত্রের ভিড়ে তিন কাপ কফি পৌঁছে গেছে। উৎসাহ পায় না উৎপল। ক্রোধ আর উত্তেজনার বাষ্প জমছে শরীরে। ঠিক-ঠিক বয়সের মাপে ভরাট যৌবনের স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে যখন শিরদাঁড়ায় টানটান, খুবই আলগাভাবে হঠাৎ—'একটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'ব্রাইটেস্ট পিপল অব দ্য সয়েল আপনারাও তো আছেন এখানে! অথচ...'

'আছি তো বটেই! লড়ছি...' একটু ঝুঁকে বসে হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা টেনে নিলেন হালিমসাহেব—'আমাদের এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ভালোভাবেই লড়ছে। এই তো কিছুদিন আগে আপনাদের অফিসার্স ইউনিয়নেরও কনফারেন্স হয়ে গেল হায়দ্রাবাদে। সিক্সটিন পয়েন্ট চার্টার অব ডিমান্ড রেখেছেন আপনারা...'

'ওসব লড়াই ডিমান্ডের কথা রাখুন। সে-তো সার্ভিস সিকিউরিটি পে-স্কেল ডি. এ. ইনক্রিমেন্টের কথা। হ্যাঁ, ওসবেরও দরকার আছে। নিশ্চয়ই আছে...' উৎপল উত্তেজিত। ঝামটা মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে—'আমি বলছি বড়সড় মাপের মানুষ হিসেবে আপনাদের সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির কথা, আপনাদের কমিটমেন্টের কথা...'

কার্যকারণবিহীন এবম্বিধ আচরণে শ্রোতৃপক্ষে যখন দুজনই সন্ত্রস্ত

উৎপল তার অসভ্য ইতর খিঁচুনিতে—'এরপরও তো আন্দোলন-টান্দোলন চলবে আপনাদের! চলুক চলুক। কিন্তু হতভাগা দেশের মানুষগুলোকে ডেকে বলবেন কোনোদিন—ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, স্বদেশ অবশ্যই। কিন্তু এদেশের খনিজ সম্পদ শিল্পজ সম্পদ কৃষিজ সম্পদ কিছুই আমাদের নয়। উই সার্ভ দেম টু এনজয় হার ওয়েলথ্...'

অতঃপর প্রাসাদচূড়ার পাদদেশে ভরাট দ্বিপ্রহরের অন্তহীন এক সৌরমন্ডলীর প্রান্তে এসে দাঁড়াল সে। যেখানে বি বা দী বাগস্থিত মিশন রো এক্সটেনশন এক্ষণে অতি তীব্র গতিময়তায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতিরূপ এবং অতিকায় প্রাসাদপুঞ্জ বা ক্ষিপ্রগতি বাসমোটরলরির নির্বাধ চলাচল নক্ষত্র তথা গ্রহমণ্ডলীর গাণিতিক বিশালতায় অনন্ত অপার। পার্থক্য একটাই—ধ্বনি নেই সৌরসংসারে, বড় কোলাহলময় এ-মহানগর, এই মানবপ্রবাহ।

ধ্বনিদূষণে জনতরঙ্গে তার ডানদিক নেই, বাঁদিক নেই, অগ্রপশ্চাৎ নেই। রিজিওনাল ম্যানেজার অফিসের সিংহদ্বারে সে টেনিস-ব্যাডমিন্টন বা ভলিবল কোর্টের বাইরে আছড়ে-পড়া ডেড-বলের মতো।

সেক্ষেত্রে মানবদেহের সীমাবদ্ধ আয়তন এবং তার ছিপি-আঁটা বিক্ষোভের দুর্দম ঊর্ধ্বচাপ মগজটাকে আরো বেশি ছন্নছাড়া করে তুলছে। অথচ পা ফেলতে হয়, এগোতেও হবে। দু-প্রান্তের ফুটপাথে গায়ে গায়ে ধাক্কায় প্লাবিত মানুষ, দুরন্ত গতিবেগ, গতির আওয়াজ, পোড়া ডিজেল বা পেট্রলের কালো ধোঁয়া আর গন্ধ। সুবিপুল মেট্রোপলিটান কর্মকাণ্ডে নিজেকে পরমাণুবোধে তুচ্ছ অনুভবের অন্তর্বাহী ক্রোধ, তৎসহ বিস্ময়—পরমাণুই নাকি বস্তুবিশ্বের পরমা শক্তি! অণু পরমাণুর শক্তিতেই যদি সম্ভব হয় সভ্যতার বিধ্বংসী বিস্ফোরণ, তার ক্রোধটা এত জোলো কেন তবে? আসলে ক্রোধের গভীরে একপ্রকার হিংস্র ক্ষুধা থাকা প্রয়োজন। কামড়ে ছিঁড়ে খাবার জিঘাংসা।

সে হাঁটে। লক্ষ্যহীন পদযাত্রায় আরো এক দুর্বিষহ যন্ত্রণা—নবলব্ধ বেকারত্বে অফুরন্ত দুপুর প্রতিদিন। হাঁটতে হাঁটতে চলতে চলতে নিতান্তই অবধারিত প্রক্রিয়ায় বি বা দী বাগের মোড়ে

পৌঁছে যেতেই, হঠাৎ, অদূরবর্তী ট্রাফিক সিগনালে নানা ধরনের বাস মিনিবাস ট্রাম মোটর ট্যাকসির জটলায় খুব কাছাকাছি একটা টুয়েলভ-সি বাস। চকিতে মনে পড়ল লোকটাকে এবং কোনো কিছু না ভেবেই ছুটে গিয়ে খাবলে ধরল বাসের হাতল। ভিড় ছিল। ভেতরে ঢুকে যাবার মতো ফাঁকফোকরও কিছুটা। কব্জির ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। ছুটির আগে, অন্তত শেষ মুহূর্তেও যদি গিয়ে ধরা যায় ভদ্রলোককে!

ঠিকানা জানা নেই। তদুপরি খিদিরপুর গার্ডেনরিচ মেটিয়াবুরুজ ইত্যাদি অঞ্চল তার কাছে এক অজ্ঞাত ভূগোল। তবু, শুধুমাত্র ভদ্রলোকের নাম এবং ফ্যাক্টরির নাম সম্বল করে ঈদৃশ এক বিচিত্র জগতে ভাস্কোডাগামা-জাতীয় অভিযান, বিশেষত এই পড়ন্ত রোদের বিকেলে যদিও অ্যাডভেঞ্চারই কিছুটা, তথাপি রাস্তায় নেমে দুচারজনকে জিজ্ঞেস করতেই বোঝা গেল, ভাবনাটা অমূলক। আদৌ কোনো ঝামেলা নেই। সে একটি রিকশ-এ চড়ে বসল। যা নিজে পারবে না, অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও। দিব্যি কাজ হাসিল। পয়সা-সভ্যতার নিয়ম।

কেকবুটিপেস্ট্রি থেকে আইসক্রিম কোল্ডড্রিঙ্কস পর্যন্ত নানা ধরনের সাহেবি আহার্যের সুবিখ্যাত কারখানার ফটকে তখন মিটিংয়ের সমাবেশ একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠছিল। হতকুচ্ছিত চেহারায় জনা ত্রিশ-চল্লিশ মানুষ। শার্টপ্যান্টসহ কব্জির ঘড়িতেও উনিশ টাকা নিরানব্বই পয়সার আদল পান্টায় না মুখেচোখেগায়ে, ঘামের গন্ধে।

অখিল জানাকে পাওয়া গেল। ফ্যাক্টরির অধস্তন কেরানি। সম্মানে মর্যাদায় অর্থমূল্যে অনেক খাটো হলেও খর্বতাকে মেনে নেবার কোনো গ্লানি নেই। ছুটির ভোঁ বাজার সময়! নয়া-জমানার ছেলেছোকরাদের হাওয়া গায়ে মাখেন না বা মানেন না বলেই হয়তো ভদ্রলোক তখনও টেবিলে প্রতীক্ষায়। কিন্তু মুখোমুখি হবার পর খুব একটা খুশিও মনে হলো না তেমন—'কী ব্যাপার! এখানে! এখানে কেন?'

'একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে।'

'সে-তো বুঝলাম। কিন্তু...' এপাশ ওপাশ তাকালেন অখিল জানা। নিশ্চিত ভাবেই বিরক্ত—'তোমার যা প্রয়োজন, সে-তো তুমি বাসায় গিয়েই বলতে পারতে।'

'এসব কথা বাড়িতে হয় না কাকু। মাসিমা এমন করেন, যেন আমার রোজগারেই বেঁচে আছেন ওঁরা।'

উৎপল নিজেই দমে গেল। অখিল জানার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। বরং ক্রোধটাই স্পষ্ট—'কিন্তু আমার নিজেরই দরকারী কাজ আছে এখন। ভীষণ ব্যস্ত। দাঁড়াও দেখি...'

কারখানার ভেতর অদূরবর্তী জটলায় খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন গাঁট্টাগোট্টা কয়েকজন লোক। কৃশকায় বৃদ্ধ ওদিকে কেন গেলেন, কী বলবেন ওদের, যদিও সে কিছুই জানে না, উৎপল এটুকু সময়ের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল। এখানে চাকরি? বছরের পর বছর! পাগল নাকি! বীভৎস গুমোট আর ভ্যাপসা একটা গন্ধ।

লোহালক্কড় আর যন্ত্রপাতির কারখানা নয় বলেই হয়তো বিকট আওয়াজ কিছু ছিল না তেমন। গা-ঘুলোনো গন্ধটাই বিদঘুটে। ফ্যাক্টরির কাজকর্ম আরো ভেতরের দিকে। সেখানে মিনার গোছের উদ্ধত চিমনিতে অনর্গল ধোঁয়া। ডানদিকে পর পর তিনটে লরি। সামনে সারি

বেঁধে দাঁড় করানো কয়েক ডজন রঙচঙে ছবি-আঁকা আইসক্রিমের ঠেলাগাড়ি। এরাই ঘোরে পাড়ায় পাড়ায়, পার্কে, স্কুলের দরজায়, খেলার মাঠে। শিশু ভোলায়।

'এসো...' ফিরে এলেন অখিল জানা—'যা বলার বলবে তাড়াতাড়ি। আমার সময় নেই। ছুটির পর গেট-মিটিং, তারপর মিছিল...'

'আপনি যাবেন মিছিলে?'

'যেতে তো হবেই। এক সঙ্গে এতগুলো লোক কাজ করি। ফাঁকি দিয়ে পালাব কোথায়?'

কারখানার গেটে মিটিংয়ের লোকজনদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে উৎপল আরো একবার নতুন করে দেখতে চাইল বুড়োকে। এভাবে কী করে স্বপ্নে বাঁচে মানুষ? মাথাটা প্রায় শাদা হয়ে যাবার পরও এতদিন।

'নাও, কী বলবে বলো...'

ফুটপাত দখল করে, বটগাছের তলায় নোংরা হতকুচ্ছিত একটা চায়ের স্টল। রাস্তার ওপরই দুটো বেঞ্চি। খদ্দেরের অভাব নেই। চারপাশে আরো কিছু দেহাতি মানুষ। ফুল-স্পিড ট্রানজিস্টারে হৈচৈ-তোলা উদ্দাম হিন্দীগান। দোকানের দেয়ালে লছমীগণেশকে ঘিরে বোম্বাইওয়ালা সুন্দর-সুন্দরীদের অজস্র তসবির।

কিন্তু মুশকিল, কোনো কিছু না ভেবে এভাবে হঠাৎ চলে-আসায় তার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। বুড়ো ক্ষেপে গেছে। নিজেকে সামলে নিতে চাইল এবং স্মার্টলি—'আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? যেমন তেমন, যেখানে যা-হোক একটা কিছু! খুব তাড়াতাড়ি...'

চোখ-কপালের দুঃসহ খিঁচুনিতে ঝলকে উঠলেন অখিল জানা—'ফাজলামো পেয়েছ? হঠাৎ কী খেয়াল হলো, যাই, বুড়োর সঙ্গে একটু মশকরা করে আসি! কেন? বয়সেও তো আমি তোমার চাইতে অনেক অনেক বড়...'

'না না ভুল বুঝছেন...' উৎপল তড়িঘড়ি বিষম সামলায়—'আমি সিরিয়াসলি বলছি। বিশ্বাস করুন...'

তেরচা চোখে তাকালেন অখিল জানা—'বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তোমার? কাঞ্চন শিপ্রাদের সূত্রে তোমাকে জানি বলে মনে করো না, এখানেও তোমার এসব উৎপাত সহ্য করব। যাও, বাড়ি যাও। কেন ইয়ার্কি করতে এলে হঠাৎ? আমি অসুস্থ মানুষ...'

রণকৌশলে ভ্রান্তি আছে কোথাও। হিসেবের অঙ্কে গড়বড় দেখে উৎপল বিচলিত এবার—'আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি আপনাকে?'

'ন্যায় কিছুই বলো নি...' সামনের বেঞ্চি থেকে তিনজন হঠাৎ উঠে যেতেই রীতিমত উত্তেজিত অখিল জানা কাশতে কাশতে গিয়ে বসলেন—'দেড় হাজারী দু-হাজারী মাইনের বাবু সেজে যখন ঘুরে বেড়াতে, তখন তো পার্টিবাজ ইউনিয়নবাবু বলে ঠাট্টা করতে খুব। এখনও করো। আজ হঠাৎ চাকরিটা খুইয়ে এসে মনে পড়ল, আমি...একটা পেটি ক্লার্ক, আমিও পারি তোমাকে চাকরি যোগাড় করে দিতে!'

পেছনের বেঞ্চিতে জনকয়েক ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের উচ্চকিত বাক্যালাপ। 'বিবিধভারতী'র কান-ঝালাপালা ফিল্মি-গান এবং সম্মুখবর্তী রাস্তায় গাড়িলরির অবিরাম যাতায়াতের যান্ত্রিক

প্রেক্ষিতে উৎপল অনতিবৃদ্ধের দিকে তাকাল। এখানে আসাটা নেহাৎ-ই কাঁচা কাজ হয়ে গেছে একটা এবং গণ্ডগোলটা যখন হয়েই গেছে, সে বেঞ্চিতে পাশে গিয়ে বসল। ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায়, যথেষ্ট নম্রতায়—'এখানকার ফ্যাক্টরিতে কলকারখানায় শুনেছি, তাবড় তাবড় সাহেবসুবোরাও ইউনিয়নের নেতাদের পরোয়া করেন খুব। আপনি তো এদের অনেককেই চেনেন। ভেবেছিলাম...'

'না, কাউকে চিনি না আমি। আমার কোনো ক্ষমতাই নেই পৃথিবীতে মহৎ কিছু করার...' ক্ষুব্ধ অখিল জানা বেশ ঝাঁঝাল গলায়—'আর যদি তোমার মতো দেড়-দু-হাজারী সাহেবকে চাকরি জোটাবার মুরদই থাকত আমার, তোমার মতো একটা অপদার্থকে কেন দেব? হোয়াই?'

বেশ ভালোভাবেই তেতে উঠেছে শরীরটা। অর্থাৎ রক্তের চাঞ্চল্য সত্ত্বেও উৎপল যখন তার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বুড়োকে কামড়ে ধরার ইচ্ছেটা সংযত রাখতে চাইছে

অখিল জানা ভ্রূকুটি তুললেন—'কী হলো! তোমার ব্যাঙ্কের চাকরি?'

'শুনলাম, কেসটা বাইরে যাচ্ছে না। মাসখানেকের মধ্যেই নাকি ইন্টার্নাল ইন্‌ভেস্টিগেশনের বোর্ড বসছে। সে যাকগে, যাই করুক ওরা, ও-চাকরি আমি করছি না...'

'কেন?'

'বিকজ আই রিজেক্ট দেম। কৃমির মতো বাঁচা যায় না ওভাবে।'

'আবার তোমার সেই বাছা-বাছা বাহারের কথা...'

'বাহারের কথা না, সত্যি কথা।'

'এখন গাড্ডায় পড়ে ভাবছ—কৃমির মতো বাঁচা। কেন, আগে কৃমি ছিলে না? কৃমিরও অধম। সুইসাইড করতে গিয়েছিলে? জানতে না, আগেও মরেই ছিলে!'

এবার বাঁ-হাতের ঢাল নয়, ডান হাতের তরবারি নিয়েই মরিয়া উৎপল—'কী বলতে চাইছেন?'

'শুধু শুধু তোমার ওই ব্যাঙ্কওলাদের দোষ দিয়ে লাভ কী?' অখিল জানা সুতীক্ষ্ণ চোখে, যেন অনেক দিনের রাগ তাঁর ছোঁড়াটার ওপর, ফাঁকায় ফাঁকায় হঠাৎ বাগে পেয়ে—'দুটো জালিয়াত তোমাকে ফাঁসিয়েছে। তুমি ফেঁসে গেছ! এই, এই তো গপ্‌পো?'

উৎপল, ভ্রূকুঞ্চনে স্থির।

'কিন্তু সব জেনেশুনে, বেআইনী হচ্ছে জেনেও তোমার ব্র্যাঞ্চ-ম্যনেজারকে খুশি করতে চাওনি তুমি? যে-ফাইলে বিপদ হতে পারে, সব বুঝেশুনেই ফাইলটা তুলে দাওনি লোকটার হাতে? অস্বীকার করতে পারবে? প্রমোশন, চাকরির উন্নতি, নানা রকম সুযোগ-সুবিধে, আরো বেশি মাইনে...ওপরওলাকে তোয়াজ করার উদ্দেশ্য ছিল না তোমার? ক্যান ইউ ডিনাই? নইলে একটা ফ্রড জোচ্চোর ওপরওলাকে কেন তোমার ভয়? শুঁয়ো পোকার মতো গুটি গুটি ওপরে উঠতে চেয়েছিলে তুমিও। পারো নি। এখন স্লিপ খেয়ে ধপাস পড়ে গিয়ে...'

'সে...সে-আমি কী করব?' উৎপল লাফিয়ে উঠল—'সেসব আমাকে কেন বলছেন? যান, আমার বাপ্‌কে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন...'

আচমকা ঝাপট। খকখক কাশি সামলান অখিল জানা—'এ-আবার কী কথা? কী বলছ?'

ফুঁসে উঠল না উৎপল। নিজের অহং-এ বরং কিছুটা সংযত থাকারই চেষ্টা—'ওই ভদ্রলোক, হ্যাঁ, দ্যাট ওল্ড জেন্টলম্যান, মাই ফাদার, রেলের কেরানি হয়েও ঘুষ খাবার মুরদ ছিল না। খেলেও বেশি কিছু গোছাতে পারেন নি। নিজে ভদ্দরলোক সেজে আমাকে দাদাকে কেরিয়ার শিখিয়েছেন। নিজে যা পারেন নি, তার জন্যে সেই ছেলেবেলা থেকে আমাদের কানের কাছে শুধু 'মানুষ হ মানুষ হ' বিড়বিড় মন্ত্র আউড়ে এত এত বছর ধরে লং-টার্ম ইনভেস্টমেন্ট বুড়োর। দাদাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়ে এখন, এই বয়সে, সেমসাইডে গোল খেয়ে কাৎ। কপাল চাপড়াচ্ছে রোজ। দাদা-বৌদি সল্ট লেকে ফ্ল্যাট বানিয়ে কেটে পড়ছে খুব শিগগিরই। আমিও বাপের রক্তে মানুষ। আপনি যা বলছেন, যদি তাই হয়, আমি আমার অ্যাম্‌বিশনের জন্যে ডুবেছি, সে-আমার দোষ?'

খিদিরপুর ডক এলাকা। সামনের রাস্তায় ডিজেলের ধোঁয়া ধুলোর বিষ ছড়িয়ে বিকট আওয়াজে গড়িয়ে যাচ্ছে কতগুলো মালবোঝাই গাড়ি। ধাতব চিৎকারটা বীভৎস এবং তৎসহ পেছনে হিন্দী গানের হুল্লোড় বিরতিহীন। আশেপাশের মজদুর মানুষদেরও চড়া গলায় বাতচিৎ। বিচিত্র এক হট্টগোলের আবহে নোংরা কাচের গ্লাসে দুটো চা ধরিয়ে দিয়ে গেল দোকানের ছেলেটা। যে-গ্লাসের দিকে তাকিয়েই এক প্রচ্ছন্ন ঘিনঘিনানিতে গা-টা ঘুলিয়ে উঠতে চায়।

অথচ সেই গ্লাসই পরম আহ্লাদে হাতে তুলে নিলেন অখিল জানা। লম্বা গোছের একটা চুমুকের পর যেন একটু ভিজেও এসেছে ভেতরটা। কিংবা অসময়ের উৎপাত ছোঁড়াটাকে এড়ানোই বিশেষ জরুরি বলে হয়তো কিছুটা শান্ত—'তুমি কেন এসেছ বলো তো আমার কাছে? এসব শোনাতে?'

'না, চাকরি।'

'আঃ, আবার বাজে বকছ। আমার কাছে চাকরির জন্যেই এসেছ! আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?'

'নয় কেন? আমাকেও তো বাঁচতে হবে। একটা কিছু করা দরকার।'

'দরকার তো আমি কী করব?'

মূলত ঠাণ্ডা বিষ। দু-চুমুকেই সেটা নিঃশেষ করে অখিল জানা গ্লাসটা ফুটপাথে বেঞ্চির তলায় রাখলেন। নস্যির ডিবেটা বাঁহাতের মুঠোতেই থাকে সারাক্ষণ। ডানহাতের আঙুল ঠুকতে ঠুকতে আনমনে—'ইনডিভিজুয়াল ড্রিমার। অ্যাদ্দিন তো বেশ মজা মেরে বেড়িয়েছ। এখন মুখ থুবড়ে পড়ে বলছ—বাপের দোষ! আরে বাপঠাকুদ্দার হাজারটা গোলমাল তো রয়েইছে আমাদের। নিজেরটা দেখো। এখন বিপদে পড়েছ, একটা লোক পাচ্ছো না কোথাও। দেশের তাবৎ লোক খারাপ, পলিটিকস ব্যাংক্রাপ্ট—এসব বলে তো কাজের-কাজ কিছু হচ্ছে না তোমার। একা একা বাঁচতে চাইলে সুখের পায়রাদের এমনটাই হয়। ঝড়বাদলা তো গায়ে লাগেনি কোনোদিন...'

অদূরে কারখানার গেটে বিক্ষুব্ধ মানুষজনের আওয়াজ-গর্জন শুরু হয়ে গেছে। উৎপল ভেতর থেকে উচ্চকিত হলো। নোংরা চায়ের গ্লাসটা ঠোঁটে ছোঁয়াতে পারেনি সে। অগোচরে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে রাখার কায়দা খুঁজতে আবার গিয়ে পাশে বসল। বুড়োর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মস্ত একটা সুযোগ—'আপনি কেন অ্যাদ্দিনের এত কিছুর পর এত একা, এত

নিঃসঙ্গ কাকু?'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন অখিল জানা।

'কত কী করলেন জীবনে! ইংরেজ আমলে জেল খেটেছেন, মার খেয়েছেন। স্বাধীনতার আমলেও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কাটিয়ে আবার জেলে। এখন কেন পার্টির বাইরে? মগজে ছাড় কোথাও আর রাজনীতি নেই?'

'সেসব নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব কেন?'

আচমকা হকচকিয়ে উৎপল নিজেকে সামলায়—'না, সে-তো বটেই। কিন্তু ড্রিমার বলছেন আমাকে! আপনাদেরও কী যেন একটা স্বপ্নটপ্ন ছিল আমার বয়সে!'

'সেই স্বপ্নের মানে তুমি বুঝবে না।'

'কিন্তু আপনাদের স্বপ্নভঙ্গের দায় যদি আমাদের বইতে হয়?'

নস্যির কথা বিস্মৃত অখিল জানা। নিষ্পলক চোখজোড়া দূরে, রাস্তার ওপারে, ফুটপাথে ভিন্ন এক কারখানার পাঁচিল ঘেঁষে অপুষ্টবৃদ্ধি বিবর্ণ বটবৃক্ষে। শহরের রাস্তায় আমকাঁঠালের বেশি ইজ্জত পেল না বেচারি! কোথাও সবুজ নেই। দীর্ঘ খরায় ধুলোর পর ধুলোর পলেস্তারায় কারখানার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় প্রতিটি পাতা ধূসর। ঝড়ের বাতাস চাই। কিংবা বর্ষার জল পেতে হবে ওকে নিজেকে ফিরে পাবার জন্য। সশব্দ নস্যি-টানার আওয়াজ! কারখানার গেটে শ্লোগান গর্জন থেমে গেছে। বক্তৃতা দিচ্ছেন কেউ। ভাঙা লাউডস্পিকারে উদাত্ত জেহাদ।

'তোমার এখানে আসার মতলবটা বোঝা গেল না কিছুই। তাহোক...' উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ—'তুমি এসো এবার। আমার কাজ আছে। মিটিংটা শুরু হয়ে গেছে...'

'আপনি বক্তৃতা দেবেন?'

'দুঃ, আমি কে? সে-জন্যে তো নেতারা রয়েছেন...' পকেটে হাত ডুবিয়ে দোকানির দিকে এগোলেন অখিল জানা। চায়ের দাম মেটাবেন। খুবই নরম গলায়—'এখানে এত এত মানুষ রয়েছে, লড়ছে। ওদের পাশে কোনো রকম এক চিলতে জায়গা পেলেই আমি খুশি। শুধু এটুকুই জানি ব্রাদার, আগে তো গোটা জাতটা তোমার মতো কুপোকাৎ হয়ে বড় রকমের একটা গাড্ডায় পড়ুক, আমার পার্টির লোকজনদেরও বাদ দিচ্ছি না। সুখের ঘরগুলো ভাঙুক, তবে যদি একটা কিছু...'

কোনোভাবেই আর উত্তেজিত হওয়া নয়। উৎপল শিশুবৎ—'আপনি ওখানে কী করবেন এখন?'

'শুনব।'

'পৃথিবীর সব সত্যিকথাগুলো বুঝি বলা হয় ওখানে?'

'মিথ্যে কিছু বলে না জানি।' ফিল্‌মি গানের মাতলামি থেকে অদূরে শ্রমিকনেতার দৃপ্ত ভাষণের দিকে এগোবার পথে বৃদ্ধ তার গতি-মন্থরতায় শান্তভাবে—'কারখানার একটা সেকশন বন্ধ করে দিতে চাইছে মালিকরা। একশো দেড়শো লোক হঠাৎ ছাঁটাইয়ের মুখে। ইয়ার্কি নাকি? এ-বাজারে এতগুলো মানুষের চাকরি! নিজের গায়ে আঁচ লাগছে না বলে পালিয়ে যাব? নিজে বোঝো না? তোমার মতো হোমরাচোমরা সাহেবি চাকরি না হোক, ছোট মাপের মানুষগুলোর

এই-ই রুজিরোজগার, বৌ বাচ্চা নিয়ে ওদেরও বেঁচে থাকা...'

পিতৃব্যপ্রতিম বৃদ্ধের গা ঘেঁষে চলতে চলতে উৎপল নিজের গভীরে সত্যি বিপর্যস্ত কিংবা দেখছিল এক দুঃখী মানুষকে।

কারখানার গেটে ফাটা-লাউডস্পিকারে শ্রমিকনেতা হিন্দী ভাষায় মালিকের দুরভিসন্ধি উদঘাটন করে যাচ্ছেন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে। একটা খাটো টুল মঞ্চসদৃশ। বক্তার নিজের হাতেই স্পিকার। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চোঙাটা কাঁধে ধরে আছেন অন্য একজন। শ্রোতারা উৎকর্ণ মনোযোগী।

আরো এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজে থমকে দাঁড়ালেন অখিল জানা! কুৎসিত নোংরা রুমালটা নাকে আলতো করে ঘষে নিয়ে নাসিকাতৃপ্তির স্বরে আনুনাসিক—'তুমি বরং ব্যারাকপুর যাও না একদিন। যোগেশকে বলো...'

'যোগেশদা! কেন?'

'বাচ্চাটাকে নিয়ে ওরা এসেছিল সেদিন। কী যেন বলছিল তোমার কাকিমাকে। ওদের স্কুলে না কোথায় যেন হায়ার-সেকেন্ডারি সেকশনে মাস্টারমশাই নেবে কজন। দেখো চেষ্টা করে। যদি হয়...'

'বাঃ...' উৎপল উদ্দীপিত—'ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তো। অ্যাদ্দিন মাথায়ই আসেনি যোগেশদার কথা। হবে, নির্ঘাৎ হবে। যাব ব্যারাকপুর...'

'স্কুলের মাস্টারি তো শুনেছি ভালোই আজকাল। সে-আমার জামাইবাবাজি আর মেয়েও দেখি কিছু কমতি যান না! টিভি ফ্রিজ আরো কী সব আছে তোমাদের? অনেক কিছুই নাকি কিনেছে শুনেছি। বাড়িতেও দুবেলা ইশকুল বসিয়ে মস্ত এডুকেশন-ইন্ডাস্ট্রি। মাইনে তো নেয় স্কুল থেকেও? পড়ায় কখন?'

'না না, আমি ওসব টিভি-ফ্রিজ কিছুই ভাবছি না...' উৎপল সহাস্যে বিনীত—'বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছি মাসের পর মাস। কোথাও জুটছেই না কিছু। যোগেশদাকে ধরলে নিশ্চয়ই হবে। শুধু তো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মাস্টারমশাই-ই নন। অত বড় শিক্ষক নেতা! ডিস্ট্রিক্ট লিডার বলে কথা...'

বৃদ্ধকে তার স্বস্থানে, মানুষের উদ্যানে সংস্থাপিত রেখে উৎপল যখন পিছু ফিরল, ঘন হয়ে সন্ধ্যা নামছে কলকাতা-বন্দর বা শিল্প এলাকায়। হাঁটতে হাঁটতে কার্ল মার্ক্স সরণিতে পৌঁছোনোর পর সে তার নিরবয়ব বিশ্বের কোলাহলময় শূন্যতায় প্রবেশ করল! দুপাশের দোকানপাট বা রাস্তার আলো, হরেক গাড়ির অবিরাম স্রোত বা মানুষ—লাখো লাখো মানুষের পদচারণায় নিজের দুটো পা-কে খুঁজে না পেয়ে বাসে চেপে, বাস বদলে, আবার বাসে বাসে দীর্ঘপথে ভাসতে ভাসতে দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতায় পৌঁছে যখন দেখল খোকাদার চায়ের দোকানে বন্ধুরাও কেউ নেই, 'একটু আগেও সবাই ছিল, এই মাত্তর চলে গেছে...' শ্রবণে, তার নিজস্ব কলকাতা পুনরায় এক নির্জন অরণ্য। তার চাকরি খোয়াবার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্যে আরো এক ঝঞ্ঝাট—শিপ্রাকে রেলগাড়ি খেয়েছে। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে সে বড় ক্লান্ত আজকাল।

কিংবা আজই ও-বাড়িতে যাবার কোনো মানেও হয় না। বিকেলবেলা এতদূর ছুটে গিয়ে

বুড়োকে খামোকা খোঁচানোর কোনো মন্দ-অভিপ্রায় তার আদৌ ছিল না। হঠাৎ-ই ঘটে গেল। নিষ্কাশিত ক্রোধে আঘাত করার মতো একটা লোকও নেই চারপাশে। জলাভূমির প্যাচপেচে কাদায় ওই একজনই আস্ত মানুষ, সবল বৃক্ষকাণ্ড—আঘাত করলে যিনি কুড়ুল ফিরিয়ে দিতে জানেন।

কিন্তু প্রতিহত উৎপল আজ নিজেই বড় এলোমেলো। ঘরের আঙিনায় পৌঁছে আরো বেশি ছন্নছাড়া দেহের শিথিলতায়। কিছু একটা চাই-ই আজ তার। সন্ধেবেলা, খোকাদার দোকান থেকে বন্ধুদের সদলে উঠে যাবার অর্থ সে জানে। নিয়মিত না হবার সংযমে প্রায়ই এমন হয়। সান্ধ্য-মজলিশ বসে অঞ্জনদের বাড়ির একতলায়। মেজাজ এলেই এর ওর পকেট হাতড়ে চাঁদা তুলে চট করে চলে যায় কেউ। কাছাকাছি অনেক দোকান। কিনে আনে। অঞ্জনের ঘরে একটা আলমারির নিচের তাকে আনুষঙ্গিকও প্রস্তুত থাকে। চাকরিবাকরি ব্যবসা বা ভালো রোজগারপাতির শেষে যখন ঢালাও অবসর এবং কারুরই করার নেই কিছু, হীরের-টুকরো ছেলেদের নিষ্পাপ আসর। অবশ্যই নিষ্পাপ। দেহমনের শ্রান্তিতে গোটা শরীর জুড়ে হঠাৎ একটা আমন্ত্রণ পেল সে কিংবা ভীষণভাবে একটা লোভ। সবে সন্ধে সাতটা। এগোল। অলিগলির শর্টকাটে পায়ে হেঁটেই চলে যাওয়া যায় বিবেকানন্দ রোড।

হৈ হৈ চিৎকারে আমন্ত্রণটা প্রসারিত হলো—'কি রে, কোথায় থাকিস তুই আজকাল? বাড়ি গেলেও পাওয়া যায় না!'

উৎপল আমল দিলো না। ভারিক্কি চালে—'খাওয়া দেখি একটু। মেজাজটা শালা খিঁচড়ে আছে সকাল থেকে...'

'আলবৎ, আলবৎ গুরু। তুমি শালা আসবে না, উড়ে বেড়াবে আকাশে। তোমাকে ধরে এনে কোলে বসিয়ে ঝিনুকে মাল খাওয়াবে কোন্ শালা?'

সাকুল্যে পাঁচজন। উৎপল ষষ্ঠ সংযোজন। দুটো মাত্র ফায়েল ছোট মাপের। সঙ্গে চানাচুর ছিল। জোরদার ক্ষিদে সত্ত্বেও দু-চার বারের বেশি তুলল না সে। বরং একটু বেশি পরিমাণেই দাবি করল আসল বস্তু। বন্ধুদের কথাবার্তায় আড্ডায় বম মেরে বুঁদ হয়ে থেকে 'ইহাদের ক্ষমা করো'-গোছের ঋষিত্বে পৌঁছনোর সাধ। শুধু একবার, একবারই মাত্র দাবড়ে উঠল সরোষে।

স্নায়ুশিরায় বা হাঁটুতে দুলুনি জাগে নি তখনও। দাঁতে শুকনো চানাচুর চিবোনোর মুড়মুড় ধ্বনি এবং বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়ার মশগুল মজলিশ। কিঙ্করই বলল হঠাৎ—'শিপ্রার খবর কি রে? অনেক দিন দেখি নি ওকে...'

হাতের গ্লাসটা ঠোঁটে ছোঁয়াতেই, নিরর্থক লোকসংস্কার যেমন, সেরিব্রায় আচমকা তীব্র ঝাঁকুনি। উৎপল গ্লাসটা টেবিলে রাখল, কিছুটা অতিরিক্ত আওয়াজ তুলে অথবা মৌন হুঙ্কারে। গোপন পাপের মতোই মানুষের যা-কিছু একান্ত আপন এবং সুন্দর, তাকে সঙ্গোপন রাখার দায়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। নিশ্বাসের গাঢ়তায় ভারি হয়ে ওঠে তরল বাতাস—'কে কোথায় কেমন আছে, আমি জানি না। কিছুই জানি না দুনিয়ার...'

থেমে যায় নিষ্পাপ বন্ধুরা। কোনো অপরাধ ছিল না যাদের।

ঘরে ফিরতে রাত হলো। কোনো পরোয়া নেই। গৃহস্থ প্রাণীগণের প্রতি যথার্থই করুণা। এমন

কোনো হাহুতাশেরও হেতু নেই তাদের। কেন না, লার্গাক্‌টিল সিদ্ধান্তের আগেও সে অনেকবার অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে একই ভাবে। অদ্যকার মতো।

অখিল জানার প্রস্তাবে—যোগেশ সান্যাল। মাহিষ্য শ্বশুরের বারেন্দ্র বামুন মাস্টারমশাই বাবাজীবন। বিপ্লবী বিবাহ সুবাদে আজীবন প্রগতিশীল। এই দুর্দিনে ভদ্রলোক একটি স্কুলমাস্টারি হয়তো যোগাড় করে দিতে পারেন। হয়তো নয়, অবশ্যই পারেন। কিন্তু অসম্ভব। মুখে যাই বলুক, প্রস্তাবটা সে মনে মনে নাকচ করে দিয়েছে। এর চেয়ে অন্য যে-কোনো চাকরি ভালো।

বরং কুকুর। সম্ভ্রমে সারমেয়।

চায়ের দোকানের আড্ডায় মাধবই বলল একদিন—আজব শহর কলকাতা। কত কিছু চলে এখানে। ওদের পাড়ায় কে একজন ভদ্রলোক শুধু কুকুর নিয়েই দিব্যি কাটিয়ে দিলেন জীবনটা। লালনপালন নয়, ব্যবসা! প্রাথমিক বিনিয়োগও নাকি কম। সংসার প্রতিপালনের পরও ছেলেদের যার-যতটা-দৌড় লেখাপড়া, মেয়েদের বিয়ে, তৎসহ নিজের নিয়মিত মদ্যপান। এরপরও নাকি জমি কিনেছেন বাগুইআটির দিকে কোথায়। বাড়ি করবেন শিগগিরই।

আড্ডায়, নিতান্তই ফুরফুরে সিগারেটের ধোঁয়ায় একটা কথা। বন্ধুরা উড়িয়ে দিয়েছিল। পাগল নাকি? এ-কোনো ভদ্দরলোকের কম্মো নয়। ননসেন্স। এবং সেখানেই উৎপলের উদ্যোগ। এ-রকম উদ্ভট একটা কিছুই চাইছিল সে। পাকড়াল মাধবকে। সে যাবে। কথা বলবে একদিন!

গাঁট্টাগোট্টা চেহারায় পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের মানুষটা খোশমেজাজে দিব্যি আছেন। নাকের তলায় অঙ্কের সেকেন্ড-ব্র্যাকেট গোছের মোটা একটা গোঁফ সরু হয়ে ঝুলছে ভারি ঠোঁটের দুদিকে। মাথায় পাতলা চুল। কালো চামড়ায় সর্বাঙ্গে লোম। রঙচঙে বাটিকের লুঙ্গি আর উদোম গায়ে রকে বসে চা খাচ্ছিলেন। সকালবেলাও বোঝা যায়—রাত্তিরের ঘুমে খোয়ারি ভাঙে নি এখনও। প্রথমদিকে আমল দিলেন না খুব। পরে যা বললেন—ভয়াবহ।

'সেন্ট বার্নার অ্যাল্‌সেশিয়ান বুলডগ বুলটেরিয়ার বক্সার ডোবারম্যান গ্রেহাউণ্ড এসব হাইব্রিড ছাড়াও আছে নানান ধরনের লোব্রিড স্পিৎজ লাসা অ্যাপসো ককার স্পেনিয়াল পম্। হবেক জাত মশাই কুকুরদের। সব মিলিয়ে চুয়ান্নটা নাম জানি আমি। সব নিয়ে তো কারবার করি না। অনেকগুলো চোখেও দেখিনি। ফোটো আর ছাপা বইয়ে চিনেছি। হাজার বায়নাক্কা মশাই শাল্লাদের। বাঁধা মেয়েমানুষের মতো তুলতুলে নয়তো খেঁকুড়ে। অনেক যত্নআত্তি তোয়াজ তোশামোদে রাখতে হয়। তবে পড়ে থাকে না কোনোটাই। আমি তো পুষি না, বেচি। পয়সা পাই...'

'কাদের কাছে বেচেন?'

'ঈশ্বরের কাছে। ওনারাই আমার খদ্দের।'

উৎপল ভড়কে গেল। এ-তো আরেক আজব!

'হেলাফেলা করবেন না মশাই, এ-বড় সেয়ানা জীব। জন্তুজানোয়ারদের রাজত্বিতে অবিশ্যি

এরা হেরে গেছল প্রথমদিকে। পরে বাজিমাৎ...'

ধরেই নিলো উৎপল—সকালটা পণ্ড। এর কাছে বাণিজ্যশিক্ষা? মানে জীবনটা আরো ঝরঝরে।

'মা দুগগার বাহন সিংহ নয়, জানেন তো! বাঘ। শাস্ত্রে আছে। বাঘ বলুন হাতি বলুন...আমাদের দেশে যা সব আছে আর কি...যাঁড় পেঁচা হাঁস ময়ূর যে যেমন পারল সগ্‌গে ছুটে গিয়ে এক-একজন ঠাকুরদেবতাকে পাকড়ে নিয়ে মজাসে পার পেয়ে গেল। দেখুন না, অমন যে ইঁদুর, যাকে মারবেন বলে কলের ফাঁদ পেতে ঝাঁটা উঁচিয়ে থাকেন, সে-ও কেমন গণেশঠাকুরের পায়ের তলায় পুণ্যি নিয়ে আছে। গাধা! গালাগাল মশাই! সে-ও কিনা মা-শেতলাকে কাঁধে নিয়ে তোফা ফুল-নৈবিদ্যি পেয়ে যাচ্ছে রোজ রোজ। বেড়ালটা অব্দি ষষ্ঠিঠাকরুণের কোলে! আর এ-কুকুর ব্যাটা কুত্ত তো কুত্তাই। এত ছোটে, পুলিশে গোয়েন্দা হয়। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক মত ছুটতে পারল না। কুরুক্ষেত্তর যুদ্ধের পর একবার অবিশ্যি যুধিষ্ঠিরঠাকুরের চামচা হয়ে হড়কে যাবার চেষ্টা করেছিল। সেও কপাল খারাপ। সগ্‌গের বি. এস. এফ. আটকে দিলো...'

এত কথা শুনছে কেন সে? উৎপল মাধবের দিকে তাকাল। কিংবা লোকটাই অত্যাবশ্যক। এমনি ঠোঁট বাজিয়েই করেকম্মে খাচ্ছে বৌ-বাচ্চা নিয়ে? ব্যবসার প্রথম পাঠে এরই তো তালিম দরকার।

অথচ লোকটা মশগুল। রকে জোড়াসনে বসে হাঁটু কাঁপাতে কাঁপাতে—'হলে হবে কী? শেষ অব্দি কিন্তু এই কুকুর ব্যাটাই টেক্কা মেরে দিলো সব্বায়কে। সগ্‌গের খিড়কিতে হত্যে দিয়ে বেচারি যখন কাঁদছিল কুঁই কুঁই, আসন টলল বৈকুণ্ঠের। সগ্‌গের দেবতারা বললেন—'যা ব্যাটা যা। তুই তোর দেশেই ফিরে যা। তোদের মত্‌তেই তাবড় তাবড় সব ঈশ্বর তৈরি হয়ে যাবেন শিগ্‌গির। তাঁরা, আর কাউকে নয়, তোদেরকেই কোলে পিঠে মাথায় তুলে রাখবেন। ভালো ভালো খাবারদাবার যত্নআত্তি, মানুষের বাচ্চা হয়ে তোদের দেশের লোকে যা পায় না, সব তুই পাবি। কী বলব মশাই, জোয়ানমরদ বয়স আপনাদের। সব ত খোলামেলা বলাও যায় না। কী ভাবতে আবার কী ভেবে বসবেন...'

মজা কি বিপজ্জনক! দুই বন্ধু পরস্পর চোখে সপ্রশ্ন তাকাল। তাদের বয়স এবং কুকুর? দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘোরাল এবং জটিল। উৎপল সাগ্রহে—'বলুন না, বলুন। কাজের কাজ কিছু হোক আর না-ই হোক, শুনতে বেশ ভালোই লাগছে আমাদের।'

'ল্যাপডগ জানেন? লোমওলা ছোট ছোট কুকুর?'

উৎপল ঘাড় নাড়ল।

'ওরা আপনাদের চেয়ে ভাগ্যবান মশাই। এই তাজা জোয়ান বয়সে আপনারা যেখানে পৌঁছনোর জন্যে অষ্টপহর চুকচুক করছেন, জন্মো থেকেই ওরা সেখানে পৌঁছে গেছে। মেমসাহেবদের তুলতুলে বুকে কোলে, তেনাদের বিছানায়...'

'গ্‌গুরু গ্‌গুরু...' হাসতে হাসতে খুশির গমকে মাধব গিয়ে রকে, ভদ্রলোকের পাশে জাঁকিয়ে বসল—'এই না-হলে আমাদের কুঞ্জদা! জবাব নেই...'

উৎপল অনুচ্ছ্বাসে—'কিন্তু আপনি ওদের ঠাকুরদেবতা বলছেন কেন? বলুন সাহেব। আপনি

যাদের নিয়ে ব্যবসা করেন সবই তো বিলিতি কুকুর। কলোনির আমলে সাহেবরা দিয়ে গেছে আমাদের।'

'অ্যাই, অ্যাই, এট্টা কতার মতো কতা বলেছেন এতক্ষণে...' কুঞ্জবাবু আরো উদ্দীপিত—'আরে মশাই, আমাদের সাহেবরা দিশি মানুষ হলে কী হবে, পোশাকেআশাকে চালেবোলে ফাঁটে কমতি কিসে? ওনারাই তো বুঝবেন এদের। এ-কি আমার মতো মুখ্যু বাংলা-বলা নেড়িকুত্তা নাকি? কেঁউ কেঁউ করে ন্যাজ নাড়বে! অ্যাল্‌সেশিয়ানগুলোর আওয়াজ শুনেছেন? গাঁকগাঁক ইংরেজি। কী দাপট!'

'ঠিক বলেছেন কুঞ্জদা...' মাধব হঠাৎ—'বিওয়েয়ার অব ডগ মার্কা ঘরবাড়ি দেখলে আমি আর সে-বাড়ির ধারে কাছে নেই। ওরে বাপ্‌স্‌...'

'অ্যাই, অ্যাই ত ভুল তোমাদের...' মাধব পাড়ার ছেলে। কুঞ্জবাবু এবার উপদেশদানের ভঙ্গিতে—'বুলডগ বুলটেরিয়ার অমন যে শিকারী নেকড়ের মতো, এমনিতে কামড়ায় না কাউকে। মালিকের গোলাম আসলে মালিকেরই মতো। ওই ডগ আর গড—বানানটারই একটু যা ওলটপালট, এই তফাত। গাঁকগাঁক ইংরেজি আর ফক্করিবাজি টাকার গুমর। বুঝলে কিনা, আসলে দুটোই ভেড়ুয়া...'

এবার বিরক্ত উৎপল। আর চলে না। কোনোভাবে কেটে পড়ার তাল খুঁজল সে। কুঞ্জবাবু সিগারেট ধরিয়েছেন—'আমি এসব ঠাকুরদেবতাদের বাহন সাপ্লাই দিই। খেস্টর জীব, ওরাও সাহেবের ঘর পায়, কেষ্টর জীব আমারও পেট চলে।'

'ইন্‌ভেস্টমেন্ট, মানে খরচাপাতি কী রকম আপনার ব্যবসায়?'

'খচ্চা? হুঁ, সে-আর বলতে...' নড়েচড়ে, অ্যালসেশিয়ান গর্জনে তেড়েফুঁড়ে উঠলেন ভদ্রলোক—'এই এক-একটার জন্যে শুধু খাইখচ্চা কত জানেন? ঠিক সময়মতো বিক্রি হলো ত ভালো। না হলো ত আমাশা ছুটিয়ে দেবে পাছায়। এই দেখুন না, গোটাকয়েক ডোবারম্যান আর লাসা পম নিয়ে কি ঝঞ্ঝাটেই না পড়েছি। এক জায়গায় পাকাপাকি কথা ছিল। সবগুলো গেল না। এখন ওদের ঘরে রেখে কেজি পাঁচেক দুধ আর কেজি খানেক বিস্কিট যোগাতে হচ্ছে রোজ। যদ্দিন না খদ্দের পাচ্ছি, দাম বেড়ে যাচ্ছে। গাঁটের পয়সা গচ্চা দিয়ে ত পুষব না মশাই...'

'তাহলে কী করবেন?'

'ও-চলে যাবে। সেজন্যে ভাবি না...' নাকে গালে অদ্ভুত খিঁচুনি দিয়ে ডানদিকের ভ্রুতে ঢেউ নাচালেন কুঞ্জবাবু—'ওদের গড ওদের বিহিত করবেন। আমারও ভগবান আছেন।'

উৎপল শান্তভাবে—'এখানে কোথায় রাখেন ওদের? আপনার শোরুম আছে?'

'শোরুম! হুঁ...' ভেংচে উঠলেন কুঞ্জবাবু—'অত ফাঁট দেখাবার পয়সা কোথায়? থাকে ওই চিলেকোঠায়, ছাদে।'

'এখানে এই ঘিঞ্জি গলিতে খদ্দের পান? ঠাকুরদেবতারা আপনার! আসেন?'

'না এলে চলবে কেন? সে-যাদের দরকার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে চলে আসবে ঠিক। আবার আমাকেও দশ জায়গায় ঘুরে ঘুরে খোঁজখবর নিতে হয়। তবে বহুৎ মেহনত। কেনল্‌ ক্লাব আছে সেখানে যাই, ফিবছর ডগ-শো হয়। সেখানে প্রাইজ পেতে হয়, পাইয়ে দিতে হয়...'

অসম্ভব! কিছুমাত্র পিছুটান না রেখে স্বল্পতম ভদ্রতায় কথাবার্তা গুটিয়ে নিয়ে সরে এল উৎপল এবং চোখের আড়ালে এসে মাধবকে এক লাথি—'ইয়ার্কি শালা! কুকুরের ব্যবসা?'

'না রে, বিশ্বাস কর। এই ব্যবসা করেই লোকটার এত পয়সা। রোজ কত টাকার মাল টানে জানিস?'

'ধ্যাৎ, এই যদি করব তো পোলট্রি ভালো।'

'করবি তো কর না। তাই কর। তোকে বারণ করছে কে?'

'ন্না, আর জন্তুজানোয়ার নয়। অনেককাল শালা কাটালাম ওদের সঙ্গে।'

অতঃপর প্রথাসিদ্ধ পিরামিড-নাটকের তৃতীয় অঙ্ক শেষ দৃশ্য একদিন।

আহা-মরি কিছু নয়। বরং এতগুলি মানুষকে নিয়ে এক সঙ্গে বসার পক্ষে ঘরটা ছোট, খুবই ছোট। গোছগাছে ভি. আই. পি. চেম্বার। চতুষ্কোণ বর্গভূমির দেয়ালে দেয়ালে হালকা গোলাপী রঙের আস্তরণে ছিটেফোঁটা ক্ষত নেই। কীটপতঙ্গও অবাস্তব। শাদা সিলিং থেকে লম্বিত পাখার ঘূর্ণ্যবৃত্তে কৃত্রিম বায়ুমণ্ডল। এবং আলো। সম্মুখবর্তী দেয়ালে অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে আয়তক্ষেত্র প্রশস্ত জানালায় ইস্পাতের ফ্রেমে কাচের শার্শি। অনাবশ্যক রোদকে ঠেকাতে ভিনিসিয়ান-ব্লাইন্ড যবনিকা সদৃশ। পেলমেটে দুপাশে গুণ্ঠিত ভারি সবুজ পর্দা। দুপুরের পর্যাপ্ত রোদ সত্ত্বেও ঘরের আলোগুলি জ্বলছিল। আসবাবপত্রের মধ্যে ঘরের কোণে জলপাই রঙের একটি বড়সড় আয়রন সেফ, অন্য দেয়াল ঘেঁষে চতুঃস্তর ফাইল-কেবিন একটি। মধ্যবর্তী অবস্থানে সুবিশাল টেবিল ঘিরে ডজন খানেক চেয়ার। এত চেয়ার এখানে থাকে না। আজকের বিশেষ দিনের আয়োজন। টেবিলে কাগজপত্র ফাইল টেলিফোন ছাড়াও বিসদৃশ ভাবে একটি পেল্লাই টাইপরাইটিং মেশিন। এটিও আজ বিশেষ দিনের প্রয়োজনে। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে নিযুক্ত একমাত্র নির্বাক ব্যক্তি শ্রীমৃন্ময় পাল পিয়ানো বাজাবার ভঙ্গিতে আঙুল নাচিয়ে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের সমগ্র বাদানুবাদ নথিবদ্ধ করবেন।

শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের নিজস্ব কক্ষ। এখানেই তুষার তালুকদার বসতেন। এক্ষণে তাঁর স্থলাভিষিক্ত শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ধড়িয়ার অবস্থান। ধড়িয়াসাহেব নিজেই আজ গৃহচ্যুত। তাঁর আসনে তদন্ত-পর্ষদের প্রধান মাননীয় শ্রীসূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠী। বয়স পাঁচের দশকে মাঝামাঝি। ভারি মেদল শরীরে দীর্ঘ টাক। দুটো কানের সরলরেখায় অবশিষ্ট কেশসম্পদে, বোঝা যায়, এখনও চিরুনি চলে। টকটকে ফর্সা দেহবর্ণে উজ্জ্বল হলুদ জামা। শাদা স্ট্র্যাপ খয়েরি রঙের নিখুঁত চওড়া টাই-এ অবশ্যই সুপুরুষ।

বেলা বারোটার আগেই একে একে সভাসদবৃন্দ সকলেই উপস্থিত হলেন। বাঁদিকের দেয়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আদলে একটি ঘড়ি। নির্দিষ্ট সময়ের লক্ষ্যে পৌঁছোবার প্রস্তুতিতে ঘড়ির কাঁটাদুটো ক্রমশই তাদের কৌণিক ব্যবধান ঘুচিয়ে পক্ষীচঞ্চুর ন্যায় অতি ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ শুরুর শুরুতেই কিছুটা সময় ছিল হাতে। জীবিকাসূত্রে একই প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যে সম্ভ্রান্ত ভদ্রজনরা

পরস্পর দেখাসাক্ষাতে হাসলেন, হৃদ্য-সংলাপে মশগুল হলেন, অথবা নির্ধারিত আসনে উপবেশনের পর ধূমপানের মৌজে নিমগ্ন থেকে কেউ কেউ প্রস্তুতি হিসেবেই ফাইলপত্র পরখ করে নিচ্ছিলেন শেষবারের মতো।

টেবিলের দক্ষিণে কর্তৃপক্ষ তরফে প্রেজেন্টিং অফিসার এবং তাঁর সহকারী। সি. বি. আই. প্রতিনিধি এবং ম্যানেজমেন্ট উইটনেস, বলা বাহুল্য, তাঁদের পার্শ্ববর্তী। অন্যপ্রান্তে সাসপেন্ডেড-অফিসারসহ ডিফেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ! এন্‌কোয়্যারিং অথরিটির মুখোমুখি, অর্থাৎ টেবিলের দ্বিতীয় লম্বিত প্রান্তে দুটি শূন্য চেয়ার। ডান দিক বা বাঁদিক থেকে সমদূরত্বে। অন্যান্য মান্যজনরা বসবেন সেখানে, তালিকাভুক্ত সাক্ষী যাঁরা।

সি. বি. আই. প্রতিনিধি শ্রীসত্যব্রত নিয়োগী তাঁর কালো টিনের ট্রাঙ্কটা নিজের পাশে নিয়ে বসেছিলেন। অভিযুক্ত উৎপল দাশগুপ্তকে চার্জশিট দেবাব অব্যবহিত পরেই মামলাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় নথিপত্র তথ্যপ্রমাণ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। ট্রাঙ্কটা যদিও ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজারের হেফাজতেই রক্ষিত আপাতত, মূল্যবান চাবিগুচ্ছ, যতদিন না তদন্ত কর্মের নিষ্পত্তি ঘটছে সত্যব্রত নিয়োগীর পকেটেই থাকবে।

সুতরাং গুঞ্জন ছিল। মাননীয়দের আলাপচারিতা বা স্মিতবাক্যবিনিময় নিশ্চিত ভাবেই কোনো প্রকারে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস নয়। সেটা নিতান্তই মনে-হওয়া। উৎপলের মনে হলো।

দেহেমনে কোনো প্রতিক্রিয়াই অনুভব করছে না সে। মানুষগুলির ঊর্ধ্বে সরাসরি দৃষ্টির লক্ষ্যে লাল-নীল ইলেক্‌ট্রনিক ফোঁটা-কাটা কচি কলাপাতা রঙে এমার্জেন্সি এলার্ম। সভার মধ্যমণি মাননীয় সূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠীর পশ্চাদ্‌বর্তী দেয়ালে, বরাভয়মুদ্রায় সহাস্য গান্ধীজির পাশে। এই টেবিলেরই তলায় নাকি কলিং-বেল গোছের বোতাম আছে একটা। ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের হাতের নাগালে। ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়লে বোতামে আঙুল পড়বে। চারদিক কাঁপিয়ে বীভৎস চিৎকৃত কর্কশ আওয়াজ। জনাকীর্ণ শিয়ালদা এলাকাটাই কেঁপে উঠতে পারে। অবশ্য সবটাই শোনা কথা। যন্ত্রটা নতুন বসেছে। এই ব্র্যাঞ্চেই এতদিন চাকরি করে উৎপল কোনোদিন সেই বীভৎস ধ্বনি বা আওয়াজ শোনে নি। কেউই শোনে নি। কেন না, লুটেরারা কখনও আসেনি এখানে।

ঘড়িতে মিনিটের-কাঁটা ঘণ্টার-কাঁটার বাঁদিকে হাঁ-করা কাঁচির সাদৃশ্যে সঙ্কীর্ণতর হতে হতে যখন পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ, চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেল। মাননীয় ভদ্রজনরা যে-যার অবস্থানে উৎকর্ণ প্রস্তুত।

মাননীয় এন্‌কোয়্যারিং অথরিটি সূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠী উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা—'অ্যাজ পার সিডিউল, উই স্টার্ট দ্য এন্‌কোয়্যারি অ্যাট টুয়েলভ্‌ নুন দিস ডে, মনডে, ফোর্থ অব এপ্রিল, নাইটিন এইটি টু অ্যাট আওয়ার শেয়ালদা ব্র্যাঞ্চ! মিঃ প্রেজেন্টিং অফিসারকে অনুরোধ করছি, তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করুন...'

মৃন্ময়ের আঙুলে খটাখট টাইপ বেজে যেতে থাকে। শব্দগুলি ধরতে গিয়ে থেমেও যেতে হয় হঠাৎ হঠাৎ। কেন না, ভাঙা-ভাঙা উচ্চারণে অতর্কিতে বাংলা ভাষা। বাক্যটি ডিক্টেট করা হবে পরে!

আনুষ্ঠানিক আয়োজন কিছু নেই। বরং মনে হতে পারে, সরকারি অনুমোদনেই জনকয়েক ভদ্রলোক একটা টেবিলকে ঘিরে আড্ডায় বসেছেন। আড্ডাটাই চলবে। প্রেজেন্টিং অফিসার শ্রীমধুসূদন সরকার, বট্‌ল্‌-গ্রীন প্যান্ট ধবধবে শাদা শার্টে নিতান্তই একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, উঠে দাঁড়ালেন। সাস্‌পেন্ডেড অফিসার শ্রীউৎপল দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের আনীত অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত বিবরণ সরকারিভাবে পেশ করার সূত্রে আস্তে আস্তে পাঠ শুরু করলেন

তথ্যানুসন্ধান পর্বঃ

শ্রীসূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠী	: এন্‌কোয়্যারিং অথরিটি
উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ	
শ্রীমধুসূদন সরকার	: প্রেজেন্টিং অফিসার
শ্রীপ্রতীক বর্মন	: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেজেন্টিং অফিসার
শ্রীউৎপল দাশগুপ্ত	: চার্জশিটেড অফিসার
শ্রী নির্মল ভদ্র	: চার্জশিটেড অফিসারের পক্ষে ডিফেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ
শ্রীশিবশঙ্কর বাৎসায়ন	: ম্যানেজমেন্ট উইটনেস
শ্রীসত্যব্রত নিয়োগী	: ডি. এস. পি. (সি. বি. আই.)

প্রতিবেদন শ্রবণে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সভাস্থল শান্ত ছিল। কিন্তু প্রেজেন্টিং অফিসার মধুসূদন সরকার আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ডিফেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্মল ভদ্র লাফিয়ে উঠলেন—'মিঃ এন্‌কোয়্যারিং অথরিটি, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! প্রতিবেদনের এক জায়গায় বলা হলো, মেসার্স খাস্তগীর অ্যান্ড সন্স-এর ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শিয়ালদা ব্র্যাঞ্চের জনৈক ব্যবসায়ী কাস্টমার শ্রীবিপদবারণ সুবুলের একটি বিবৃতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার বিশদ জানা অত্যন্ত জরুরি...'

মধুসূদন : শ্রীবিপদবারণ সুবুলের বিবৃতি যথাযথ উপস্থাপিত হয়েছে। লিস্ট অব ডকুমেন্ট-এর বাইশ নম্বরে তার উল্লেখ আছে!

নির্মল : লিস্ট অব ডকুমেন্টস-এর বাইশ সংখ্যক দলিল হিসেবে যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা নিছক একটি টাইপ কপি। যদি এই দলিল সাক্ষ্য হিসেবে একান্তই আবশ্যক হয়, তবে অবশ্যই আলোচ্য ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতির মূল পাঠ উপস্থিত করতে হবে।

মধুসূদন : ব্যাঙ্কের তদন্তকারী অফিসার যে বিবৃতি গ্রহণ করেছিলেন, আমি অবশ্যই তার ওরিজিনাল কপি উপস্থিত করব। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ প্রয়োজন ভারতীয় দণ্ডবিধি একশো ষোল ধারামতে এই এজাহার গৃহীত হয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ সর্বদা জরুরি না-ও হতে পারে। অথচ বিচার-বিভাগীয় কাজকর্মে এ-জাতীয় বিবৃতির গুরুত্ব আইন মোতাবেক গ্রাহ্য।

নির্মল : অবজেকশনেবল্, হাইলি অবজেকশনেবল্। মিঃ এন্‌কোয়্যারিং অথরিটি, আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে মারাত্মক এক বিভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি। আমি এ-ধরনের বক্তব্যের ঘোরতর প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য। এটা আমাদের ব্যাঙ্কের নিজস্ব তদন্তসভা এবং এর কার্যবিধি ব্যাঙ্কের সার্ভিস রেগুলেশন দ্বারা স্থিরনির্দিষ্ট। কোর্ট হাইকোর্টের বিধিবদ্ধ আইনকানুন এ-ধরনের তদন্তের ক্ষেত্রে কোনোমতেই কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু প্রেজেন্টিং অফিসার সি. আর. পি. সি. আইনবিধির সুযোগ নিয়ে আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এমন একজন ব্যক্তির সাক্ষ্যের উল্লেখ করেছেন, যিনি ব্যাঙ্কের ঘরোয়া ব্যাপারে বহিরাগত তো বটেই, অবাঞ্ছিতও নিঃসন্দেহে...

সূর্যনারায়ণ : ডিফেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ কিন্তু অত্যন্ত মৌলিক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আমি প্রেজেন্টিং অফিসারকে অনুরোধ করছি, তিনি বিষয়টির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করুন।

মধুসূদন : ডিফেন্স কাউন্সিলের উত্থাপিত প্রতিবাদের যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করছি। একথা ঠিক, আইন-আদালতের মতো প্রতিটি কথা প্রতিটি বাক্যের প্যাঁচপোঁচ চুলচেরা বিচার বা বাকবিতণ্ডা নিয়ে এ-জাতীয় তথ্যানুসন্ধান অবশ্যই চলে না। চলা সঙ্গতও নয়। বরং আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত—যথার্থ সত্য উদ্ঘাটন এবং তার কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে আমাদের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির ওপরই নির্ভর করবে।

নির্মল : যেহেতু আমরা সকলেই একই প্রতিষ্ঠানের একই পেশায় সহকর্মী...

মধুসূদন : এগ্‌জাক্টলি...

নির্মল · কতগুলো আইনের কচকচিতে আমরা নিশ্চয়ই এর মানবিক দিকগুলো ভুলে যাব না।

মধুসূদন : অবশ্যই না। আমি ডিফেন্স-কাউন্সিলের সঙ্গে একমত। তবে কেন, কোন্ অবস্থায়, কী কারণে একজন ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করা যায় নি, এ-বিষয়ে সবাইকে অবহিত করার প্রয়োজনেই আমি সাধারণভাবে সি. আর. পি সি-র উল্লেখ করেছিলাম।

সূর্যনারায়ণ এটা বেশ লক্ষ করার মতো, সভার শুরুতেই আমরা ক্রমশ বড় জটিল এবং কতগুলো মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। এ-রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিষয়ে আমি আমার রুলিং আপাতত স্থগিত রাখছি। পরে কোনো সময়ে আমার বক্তব্য জানাব। এখন বরং সভার কাজ যেমন চলছে, চলুক...

সভা চলে। শেষ পর্যন্ত আর এমন হৃদ্যতায় রইল না সব কিছু। যেন এক বিচিত্র ক্রীড়া। ফাইলের পর ফাইল নাড়াচাড়া হলো বিস্তর। যে-ডকুমেন্ট নিয়ে এক পক্ষের সংশয়, অপর পক্ষে সেটাই হয়তো-বা বেদকোরানবাইবেল। উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় অথবা বসে বসেই জিজ্ঞাসা-প্রতিজিজ্ঞাসায়, চাপান-উতোরে, প্রতিপক্ষের গালের বিকল্পে টেবিলে থাপ্পড় মেরে নিজেরই হাতে চোট। বুদ্ধির কুস্তি বা বাকশক্তির বিপুল অপচয়, চিৎকার হল্লা ঝড়।

উৎপল তার নিজের জাড্যে পাথর বনে গিয়ে কিছু শোনে অথবা শোনে না। একান্ত মনোনিবেশে দেহের সমুদয় রসরক্ত স্নায়ুশীর্ষে টেনে তুলে ক্রোধ সঞ্চারের চেষ্টা। যে-ক্রোধ তার দেহের উত্তাপ বা তার একমাত্র সঞ্জীবনী। কিন্তু উষ্ণতার হদিশ মেলে না। বড ঠাণ্ডা, ডিপ-ফ্রিজের গভীরে কোথাও অবস্থান তার!

বেচারী মৃন্ময়! ভঙ্গিটা যদিও পিয়ানো বাজানোর মতোই, সুরগমকমূর্ছনা নেই। দশটা আঙুল হাবুডুবু খাচ্ছে চিৎকারে। কানমলা নয়, কিন্তু হামলে পড়ে তার দুপাশের দুটো কান নিয়ে মাননীয়দের টাগ-অব-ওয়র। নিজেদের বক্তব্য যথাযথ অভিব্যক্ত করার বাসনায় পুরো বাক্য বা সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ ডিক্টেট করে যেতে চাইছেন সকলেই। শব্দ প্রয়োগে ব্যভিচার ঘটলে অপর পক্ষের প্রবল আপত্তি। আবার তর্ক। তুমুল হট্টগোল। সম্মিলিত প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় নির্মল ভদ্র, অভিযুক্ত পক্ষের একমাত্র প্রতিহারী, নিঃসঙ্গ অভিমন্যু।

উৎপল তথাপি নিশ্চুপ। সাড়ম্বর তামাশায় এখনও স্পষ্ট নয় তার কাছে—বিবাদী কে? কে ফরিয়াদী?

দৃশ্য মজাদার। চেয়ারের হাতলে কনুই, হাতের তেলোয় গাল, অধীশ্বর সূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠী মশাই বিতর্কমগ্ন ভারি গর্দানটা ডানে বাঁয়ে ঘুরিয়ে যাচ্ছেন স্প্রিংয়ের পুতুল যেমন। মাঝেমাঝে সংযত হবার আবেদন। রুলিং চাইলে দিশেহারা।

কফি টোস্ট ডিমসেদ্ধ।

এক সময় দুর্বিষহ। কেন না, তখন ক্রোধ।

কিছু-না-বলার শপথে দাঁত চেপে অগ্নিময় থাকার যন্ত্রণায় উৎপল যখন সত্যি মরিয়া, প্রায় ঘণ্টা তিনেক একটানা হৈহল্লার শেষে দাঁত-চিবোনো ইংরেজিতে সূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠী মশাইর ঘোষণা—'সভা আজ এখানেই মুলতুবি। তিন সপ্তাহ পরে পঁচিশে এপ্রিল, সোমবার ঠিক

এগারটায় পরবর্তী বৈঠক। দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য যে-দীর্ঘ সময় গ্রহণ করা হচ্ছে, পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটা না-হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উভয় পক্ষের কাছে অনুরোধ—এই তদন্তকার্য দীর্ঘ মেয়াদী করবেন না। এক্ষত্রে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য...'

মুক্তি, যথার্থই মুক্তি অতঃপর।

অথবা মুক্তি নেই।

ঘুম আসছিল না কিছুতেই। যখন সে সত্যি ঘুম চায়।

বিকেল থেকে একটি শব্দও সে উচ্চারণ করেনি কোথাও। এমন কি, বাসকন্ডাক্টরের সঙ্গেও না। বন্ধুদের কাছে যায় নি অনেকদিন। ইচ্ছে ছিল না। তবু শিপ্রাদের গলি পর্যন্ত পৌঁছেও, কি ভেবে, ফিরে এসেছে সন্ধেবেলা। আস্তে আস্তে কি রকম খাটো হয়ে আসছে চারপাশটা। বিচ্ছিরি লাগে চড়ুইভাতির কলরব।

একটু বেশি রাত করে ঘরে ফিরে উন্মাদের মতো জলের পর জল ঢেলে স্নানের শেষেও যখন স্বস্তি নেই, খেয়েদেয়ে খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বই। বইগুলি যদিও আজ আর তার সঙ্গে কথা বলে না তেমন, তবু নিজের নির্জনে মুখ ঢেকে থাকার একটা ভদ্র আবরণ।

অনেক রাত। বাবা বা দাদা এখন পর্যন্ত কেউই এলেন না আজকের শুনানী সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায়। দাদা, নিজেরই কেন যে এত গরজ ভদ্রলোকের, নিশ্চিতই ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন। খবরটবর নিজেই সংগ্রহ করে এনেছেন নিজের মতো করে।

মা শুতে আসেন রোজ। হাসপাতালের ঘটনার প্রায় চার পাঁচ মাস পরে আজও মেঝেব বিছানায় রাতের পাহারা! বিরক্তিকর মহিলাও আজ হঠাৎ উধাও।

নদী বা পুকুরে, জালের ভেতর দিয়ে যেমন বেরিয়ে যায় মাছের ঘর—জল, আটকে যায় মাছ, সংসারটাও তাকে ফেলে সরে যেতে চাইছে জানালা-দরজার বাইরে। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ ঘরটুকুও আর অবশিষ্ট থাকছে না। পাঁচিলবিহীন সুবিশাল বন্দীশালায় দেয়ালঘেরা মুক্তি!

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। চৌকাঠে পায়ের শব্দ। চোখ টেরিয়ে দেখল সে—মা একা নন। সঙ্গে বাবা এবং ওঁদের একমাত্র কাছের মানুষ—কৃষ্ণা।

'একটা কথা বলবি বাবা...' যথেষ্ট ভয় রেণুবালার গলার স্বরে—'কথাটা রাখবি আমার?'

বইয়ের আবরণ থেকে মুখ ফেরায় না উৎপল। উৎকর্ণ থাকে।

রেণুবালা স্বামীর দিকে তাকালেন। সত্যসাধন তাঁর সংগৃহীত আত্মবিশ্বাসের ঋজুতায়—'অনেক মেহনত করে আনা হয়েছে তোমার জন্যে। মায়ের মন! তাঁরও তো একটা শান্তি চাই। আরো একটা শনিপূজো দেব এ-সপ্তাহে! তার আগে এটা ধারণ করার কথা...'

মুখ ফেরাল উৎপল। মা-র হাতে কালো কারের সুতোয় সোনার কিংবা তামার কিংবা পেতলের চকচকে মাদুলি। সেই সঙ্গে আরো কী দুটো-একটা। রেণুবালা আকুল—'বড় খারাপ সময় যাচ্ছে বাবা তোর। মেজঠাকুরপো এনে দিয়েছেন। কারুর জন্যে কেউ এতটা করে না

আজকাল। সেই ক্যানিং না কোথায়, সেখান থেকেও বাসে চেপে যেতে হয় অনেকদূর। উপোসী পেটে গিয়ে তোর মেজকাকা নিয়ে এসেছেন। সিদ্ধবাক সাধুবাবার আশীর্বাদ বাবা। সবাই যখন বলছে.. হাতে গলায় তো পরতে হচ্ছে না তোকে। কোমরে প্যান্টের তলায় রাখবি...'

নিশৃতির বোবা ঘরে দেবমন্দিরে মাথা-ঠোকার মতোই কাতর কণ্ঠধ্বনি। উৎপল কিছুই বলল না। চিৎপাত শুয়ে থেকেই বইয়ে মনোযোগ রেখে বাঁহাতে পায়জামার দড়িটা খুলে টেনে নামিয়ে দিলো ইঞ্চি দুয়েক।

উৎসাহিত ওরা। নিচু হয়ে খাটের ওপর ঝুঁকে পড়লেন রেণুবালা। কৃষ্ণা সাহায্যে এগোল। শয্যাশায়ী রোগীকে বেডপ্যান-দেওয়া-গোছের একটা কাণ্ড এবং ওদের প্রতি সহযোগিতায় উৎপলকেও সক্রিয় হতে হয়। শিরদাঁড়ায় টান রেখে কোমরটা উঁচিয়ে তোলা কিঞ্চিৎ।

বড় সহজ সাফল্যে যখন ওরা তিনজনই খুশি, রেণুবালা শিয়রের দিকে এগোলেন। সন্তানের মাথায় সস্নেহ হাত—'ভুল করেও কোথাও টক খাবি না কিন্তু। নিষেধ আছে। অমাবস্যে পূর্ণিমে একাদশীতে নিরিমিষ্যি। বলা তো যায় না, বাইরে দোকানেফোকানে কী সব খেয়ে বেড়াস!'

'হ্যাঁ, মানতে হলে সবটাই মানতে হয়। নইলে কাজ দেবে কেন এসব!' সত্যসাধন শান্ত গলায়।

উৎপল, হঠাৎ, লাফিয়ে বসল—'তোমার ওসব বিছানাপাতি নিয়ে কাটো তো এখান থেকে। হাটাও। আমার ঘরে আমি একা শোব।'

ভালোবাসার প্রহরীরা তিনজনই পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো অতর্কিতে।

খাট থেকে নেমে মেঝেতে সোজা হয়ে দাঁড়াল—'ভয় নেই। সুইসাইড করব না। কেন করব? তোমরা খাবে কী? সল্ট লেকের ফ্ল্যাট তো কম্পলিট!'

দপ করে জ্বলে উঠতে পারতেন সত্যসাধন। অন্তত তাঁর চাউনিতে স্ফুলিঙ্গটা একবার ঝলসেও উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে স্থিরপলকে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন রেণুবালা। ফিনকি দেওয়া রক্তের তেজে আরো কিছু কথা, বিষাক্ত বাষ্প গলগলিয়ে উঠতে পারত রাতদুপুরে।

কিন্তু সকলেই মিতবাক।

এবং উৎপল, বাক্যটা আচমকা ছুঁড়ে মারার পর আহতদের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে ছোটখাটো একটা যুদ্ধই প্রত্যাশা করেছিল হয়তো এবং যখন কোনো প্রতিবাদ নেই, সে ওপাশে বুকশেলফটার ধার ঘেঁষে টেবিলের দিকে এগোল। দেয়ালের মুখোমুখি।

জীর্ণদেহের তলানি থেকে গাঢ় শ্বাস টানলেন সত্যসাধন। আলতো করে দুহাতে স্ত্রী আর মেয়েকে ঠেলে দরজার দিকে এগোবার নির্দেশ দিয়ে তাকালেন পেছনে —'বেশ, তাই হবে। তুই যখন চাইছিস, থাক্ একা।'

ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ওঁরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল উৎপল। বগলে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে জনৈক যুবতী। সঙ্গে কৃশকায় ভঙ্গুর বৃদ্ধদম্পতি। অসহায় উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর দৃশ্য। এ-চেহারায় বাঙালীদের বেশ মানায়ও ভালো।

নিজের ঘরকে ফিরে পাওয়া! নিজের নিভৃতিকে! আপাতত ঘুম চাইল না সে। রাত গভীরতর হলে বাথরুমে এল। কারুর জন্যেই কেউ জেগে নেই যখন, অন্ধকারে, ছোট করে সুইচটা টিপতে

বা দরজার ছিটকিনি তুলতেও কানে বাজে। বাথরুমে, নিজের নগ্নতার ঘরে মানুষ তার নিজের কাছে বড় বেশি আপন। আত্মপীড়নের নির্মম প্রদাহশেষে সর্বাঙ্গের কোষে কোষে অবসন্ন কুঞ্চন। হ্যাঁচকা টান মারল নবলব্ধ মাতৃপ্রেমে। কারের সুতোয় ফাঁস বেশ মজার। টানলেই আপসে বড় হয়ে যায়। দাঁতমুখ খিঁচুনির টানে ছিঁড়ে ফেলতে যদিও কষ্ট কিছুটা, রীতিমত জ্বালা চামড়ায় চামড়ায়। আচমকা ফেটেও গেল ফটাস করে। মাদুলিই নয় শুধু, গোল-করে-কাটা হরিতকীর মতোই আরো একটা কিছু। গাছফাছের ডাল-শেকড়ই হবে হয়তো। আসল বস্তুটাও সোনা নিশ্চয়ই নয়। তামা বা পেতলের চকচকে কবচটা সে ধরল আলোর তলায়। আর যদি সোনাই হয়। কী এল-গেল। দলা পাকিয়ে সবটাই ফেলে দিলো প্যানের গর্তে। পেচ্ছাব করল। জল ঢালল। সাধুবাবা নিঃশব্দে উধাও।

বাড়তি কোনো ঝামেলাও থাকবে না এর জন্যে। হাতে বা গলায় তো নয়। মূর্খ মাতাঠাকুরাণী একই ভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সন্তানের বাধ্যতায়। আছে, নিশ্চয়ই আছে। যতই মা-ফা হোন, প্যান্টপায়জামার তলায় হাতড়াতে আসছে না কেউ। সাতাশ বছরের একজন যুবক অবশ্যই পুরুষমানুষ।

অধ্যাপক বন্ধু সোমনাথের মামা কলকাতার এক অতি বিশাল দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। অর্থ যশ প্রতিপত্তিতে ডাকসাইটে বুদ্ধিজীবী। সোমনাথই নিয়ে গেল একদিন। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এলাকায় গোছগাছে সুমনোহর ফ্ল্যাট।

শেষ-চল্লিশের ঘরে একটি বয়স। নাতিফর্সা গাত্রবর্ণে ঈষৎ মেদল। টাক পড়েনি। মাথা ভরে ঝাঁকড়া চুলে জুলপি দুটো পুরো শাদা। ধবধবে পায়জামা পাঞ্জাবির আবরণে সুখী মানুষের প্রচ্ছদ। ডিভানে শুয়ে 'বাংলা থিয়েটারের প্রকরণ বৈশিষ্ট্য' বিষয়ক একটা বই পড়ছিলেন। উঠে বসলেন—'হ্যাঁ, বাবলির কাছে শুনেছি তোমার সব কথা। কিন্তু কী ব্যাপার? এমন সব হয় নাকি আমাদের দেশে? ব্যাঙ্কের চাকরিটা কি চলেই যাচ্ছে?'

'এখনও বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। ইন্টার্নাল ইন্‌ভেস্টিগেশনে হিয়ারিং গোটা তিনেক হয়ে গেল।'

পরিচয় করিয়ে দেবার পরই বাবলি, ওরফে সোমনাথ ভিতর-ঘরে। ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন—'তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আমি নিজেও খুব খুশিই হতাম। কিন্তু...'

অবধারিত সেই 'কিন্তু'। পার্শ্ববর্তী সোফায় বসে অলৌকিক সেই 'কিন্তু'-র চেহারা জানার জন্য উৎকণ্ঠ উৎপল।

'ওভাবে তো কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় না কাগজের অফিসে। হবে না কেন? হয়। সে-হলো প্রেসের টেকনিক্যাল স্টাফ, অফিসের নন-টেকনিক্যাল ক্লার্ক, প্রুফ রিডার। সেসব তো করবে না তুমি?'

'কেন করব না! পেলেই করি।' উৎপল ছোট করে হাসল।

কেমন একটু নাড়া খেলেন ভদ্রলোক—'না না, সেকি! শার্প ইন্টেলিজেন্ট ইয়াংম্যান। ওভাবে

জীবনটা নষ্ট করবে কেন? সাবজেক্ট কী তোমার?'

'ইকনমিকস।'

'ও, ন্‌নাইস। এম. এ.-ও তো করেছ?'

উৎপল ঘাড় নাড়ল।

'বাঃ, চমৎকার। এ-ধরনের ছেলেদেরই চাইছেন ওঁরা—ইকনমিকস পল্‌-সায়েন্স হিস্ট্রি ফিলসফি...'ভদ্রলোক উৎসাহিত এবার—'এখনকার জার্নালিজমে আগের মতো বুড়োধাড়ি পণ্ডিতদের দিন আর নেই। বুঝলে, এখন তোমাদের মতো ছেলেদেরই চাই। শার্প ইন্টেলিজেন্ট ডেসপারেট। ফ্‌ফাটাবে। বুঝলে, হট ব্লো-আপ। চারপাশের হট্টগোলের মধ্যে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে লোকজনদের। তাহলেই কাগজের কাটতি। তোমার ক্যারিয়ার। ইংরেজিটা আসে কেমন?'

হকচকিয়ে তাকাল উৎপল। কী উত্তর হয় এসব প্রশ্নের? সবিনয় হেসে—'ওভাবে তো কিছু ভাবি নি কখনও...'

'হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে। ইকনমিক্‌সে এম. এ. করেছ! সে-তো আর ফাঁকি দিয়ে হয় না অতটা...' আরো জাঁকিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। কিঞ্চিৎ ঝুঁকে, সেন্টার-টেবিলে অ্যাশ্‌ট্রের কোণে আলতোভাবে সিগারেটের ছাই ঘষতে ঘষতে —'তুমি বরং একটা কাজ করো। বেশ ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়ে একটা লেখা তৈরি করে ফেলো দেখি চটপট। দেখবে, ইংরেজিটা যেন জোরালো হয়। ওটাই আসল। কন্টেন্ট আর কী? ও-সবাই সবকিছু জানে আজকাল। মানুষজন খুব চালাক হয়ে গেছে। আসলে তোমার লেখা...লেখার কায়দাটাই সব। কীভাবে স্টোরিটা তৈরি করলে! মাস্‌সে ঠিকঠিক খেলো কিনা। সব দিকেই নজর রাখতে হবে...'

চোখ তুললেই সম্মুখবর্তী দেয়ালে যামিনী রায়ের পাশে পিকাসো-মাতিস কেউ হবেন হয়তো, বড় মাপে সুন্দর বাঁধানো দুটো ছবি। সবগুলোই প্রিন্ট নির্ঘাৎ। ওপাশে জানালার একদিকে দেয়ালে কী-জানি-কেন রথের মেলা কিংবা বাজারে কেনা কতগুলো শস্তা মাটির পুতুলের সঙ্গে লক্ষ্মীর সরা! এবং বই। তিন দেয়াল জুড়ে আলমারি র‍্যাক শেল্‌ফ সব ভরাট করেও কুলোয় নি, অদূরের টেবিলে বই কাগজপত্র ফাইলের পাহাড়! এক কোণে মেঝেতেও পুরনো আর নতুন পত্রপত্রিকার স্তূপ। পঞ্চাশ বছরের চৌকাঠ ছুঁয়ে এত এত বইয়ের শুধুমাত্র পাতা উল্টে গন্ধ শুঁকলেও আস্ত একটা অ্যারিস্টটল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যাঁর, এ-হেন এক মনীষীর সন্নিধানে উৎপল অতি কষ্টে নিজেকে সংক্ষিপ্ত রাখতে চেষ্টা করল। বিনীত প্রশ্ন—'কিন্তু আমাকে ইংরেজিতে লিখতে বলছেন কেন? আপনাদের তো বাংলা পত্রিকা?'

'হাসলেন ভদ্রলোক—'না বাবলির কাছে যা শুনেছি তাতে...সে-তোমার হবে না। ল্যাংগুয়েজ ডেইলিতে কাজ করতে হলে একটা লিটারেরি ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার। গল্প উপন্যাস কবিতা কিছু লেখো?'

উৎপল ঘাবড়ে গেল—'না।'

'তাহলে?'

কিংবা ভদ্রলোকের আদবকায়দায় কিছুটা মজাই পেল সে—'হ্যাঁ, ফুটবল ক্রিকেট রেপ ভায়োলেন্স সবই তো এখন চলে এসেছে বাংলা কাগজেব ফার্স্ট পেজে। সুন্দর সুন্দর থ্রিলারের

সঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় কবিতাও ছাপা হচ্ছে রোজ...'

'এগ্‌জাক্টলি! ঠিক ঠিক ধরেছ ব্যাপারটা...' এর পরও উৎসাহ নেভে না? উৎপল অবাক। ঝুঁকে পড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিচ্ছেন ভদ্রলোক—'নিউজ! নিউজ কোথায় আজকাল? আগের দিন রাত্তিরেই তো রেডিওতে বারচারেক, টিভিতে বারতিনেক দুনিয়ার সব খবর জেনে গেছে সবাই। ফ্লাশগুলো জেনে গেলেই হলো। ডিটেল আর কে চায়? লেখাফেখা আর কষ্ট করে পড়ে না কেউ। অথচ আমাদের কাগজটা ভরে তুলতে হবে। চাকরি করি। তুমি পড়ো? পড়ো আমাদের কাগজ?'

'না।'

মাতুল আহত কিঞ্চিৎ। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। আবার চাঙ্গা হয়ে—'কিন্তু যারা পড়ে আমাদের কাগজ, দে আর ম্যাড আফটার ইট। লাখ লাখ কপি ইম্প্রেশন। এই পপুলারিটিই অ্যাসেট আমাদের। হোয়াট উই সে, উই ক্যান মেক দ্য পিপল বিলিভ ইট অ্যাজ আনকোশ্চেনবেল ট্রুথ। একটা কাগজকে এরকম একটা জায়গায় তুলে আনা কি সোজা কথা?'

চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন অল্পবয়সী একজন বৌ। চেহারা বা শাড়ির দীনতায় বোঝা যায় এ-বাড়ির 'কাজের-লোক'। চায়ের-কাপ আর বিস্কুটের প্লেট টেবিলে সাজিয়ে দেবার ফাঁকে মাতুলকে আরো একটু মনোযোগে দেখতে চাইল উৎপল। সিগারেট ধরাচ্ছেন। ভদ্রলোক কি সিরিয়াসলি কিছু করবেন? এত বেশি কথা বলেন কেন? ঝুঁকে পড়ে লাইটারটা টেবিলে রেখে ভদ্রলোক তাকালেন। কিছুটা গম্ভীর—'ইফ ইউ আর রিয়েলি সিরিয়াস লেখাটা তৈরি করে ফেলো। আমাদের হাউস থেকে যে-ইংরেজি কাগজটা বেরোয় তার নিউজ এডিটর স্নেহদা...স্নেহময় মিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি...'

'কী নিয়ে লিখব?'

'সে-আমি কী বলব? বেছে নাও কিছু একটা। ওসব পভার্টি স্লাম-ডুয়েলার্স শ্রমিক কৃষক একদম না। ও-তোমরা জানোও না কিছু, লোকেরও ইন্টারেস্ট নেই। কত কত নতুন নতুন সাবজেক্ট ছড়িয়ে আছে। চোখ খুলে দেখো, বেছে নাও একটা...'

উৎপলের মজা বেড়ে যায়—'কী রকম? একটা উদাহরণ...'

'এই ধরো...' আঙুলের কাঁচিতেই সিগারেট। চেয়ারে কনুই-ঠেকানো হাতের বুড়ো আঙুলে ললাট রেখে ভ্রূকুঞ্চনে কী ভাবলেন। তারপরই সচল—'হ্যাঁ, ধরো ড্রাগ অ্যাডিক্ট ইয়াংমেন। সাবজেক্টটা আমারই মাথায় ঘুরছে অনেক দিন ধরে। এই তো বয়স তোমাদের। চেনো জানো ইয়াংমেনদের...'

'সত্যি কথাগুলো সব বলা যাবে তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ফ্রি প্রেস। কেন বলা যাবে না?'

'সুন্দর কথা চাইছেন? না সত্যি কথা?'

'বাঃ, বেশ স্মার্ট উইট আছে তো তোমার...' নড়েচড়ে উঠলেন মাতুল। প্রসন্নতায় —'তোমাদের জেনারেশনের ছেলেদের কাছে তো আশাই করা যায় না। ন্‌নাইস। কিন্তু সত্যি কথা আর সুন্দর কথায় তফাতটা কোথায়?'

'আপনারা যা লেখেন, সত্যিকথা সব?'

'এই, এই দেখ, তুমি যে আমাকেই পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করলে?'

ছোট করে হাসল উৎপল—'কিছুই তো জানি না দুনিয়ার। এ-রকম ভালো একটা প্রফেশন, অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছে করে।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই...' ভদ্রলোক উৎসাহিত আবার—'আরে বাবা, এ-তো তোমাদের ন্যাশানালাইজ্‌ড ব্যাঙ্ক কি সরকারি চাকরি নয়। আমাদের তো মালিক আছেন একজন। কাগজটা ওঁদের ব্যবসা...'

'এই যে তাহলে ফ্রি প্রেসের কথা বললেন?'

'কন্‌ট্রাডিকশানটা কোথায়?' ভ্রু কুঁচকোলেন মাতুল—'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তো একটা ভাইটাল ব্যাপার। বলতে পারো চেস্টিটি অব ডেমোক্র্যাসি। সেটা আমাদের থাকতেই হবে। কী লিখব বা ছাপব তার জন্যে পরোয়া করি না কাউকে। গর্ভমেন্ট কি রুলিং পার্টিকেও কসুর নেই...'

'মালিকরা তো আপনার লেখার কাটছাঁট করতে পারেন?'

'সে-তো পারেনই। চারদিক সামলে চলতে হয় ওঁদের। এত বড় এস্টাব্লিশমেন্ট।'

'তাহলে ফ্রিডম অব প্রেস মানে সংবাদপত্রের মালিকের স্বাধীনতা! আপনাদের নয়?'

চশমাটা নামিয়ে টেবিলে রাখলেন ভদ্রলোক। কপালের ভাঁজে ভাঁজে প্রায় বুজে এসেছে চোখ—'পোলিটিকস করো?'

'না।'

'এই বয়স! কোনো ইনভলভ্‌মেন্ট নেই?'

'না।'

পাঞ্জাবির কোণে চশমার কাচ মুছছেন মাতুল। ভ্রূকুটির দৃষ্টিটা যে তারই দিকে কৌণিক, লক্ষ করেই উৎপল কিছুটা অস্বস্তিতে। টেবিল থেকে পত্রিকা তুলে নিলো একটা। বোম্বেখ্যাত মোটাসোটা ইংরেজি পাক্ষিক। প্রথম মলাট থেকে শেষ মলাটে, ভেতরের পাতায় পাতায় ছবিতে ছবিতে বিজ্ঞাপনে সত্যি রঙ, রঙের ছয়লাপ। অফসেট ফোটোপ্রিন্টের বিস্ফোরণ! শুধু ছবি দেখেই সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। নিরক্ষরও তৃপ্ত হতে পারেন মুদ্রণ চারুকলার ঈদৃশ উন্নয়নে।

সোমনাথের প্রবেশ। বিচিত্র দৃশ্য—ভয়ঙ্কর গরম কী একটা মুখে পুরে সামলাতে পারছে না ঠিকমতো। ভাজাগোছের বাকি অর্ধাংশ এখনও হাতে আঙুলের ডগায়। গাল পুড়ছে জিভ পুড়ছে। দাঁতব্যথার যন্ত্রণার ভঙ্গিতেই হাঁউমাউ—'ডালের ধোঁকা। খাবি? খুউউব গ্‌গরম।'

হেসে মাথা নাড়ল উৎপল—না।

'তাহলে একদিন চলে এসো আমাদের অফিসে! টেলিফোন করে এলেই ভালো...'

উৎপল ফিরে তাকাল। কী আশ্চর্য। এরপরও

ভাগ্নের জোকার-ভঙ্গিমায় কিছুমাত্র আমল দিচ্ছেন না মাতুল। উৎপলের দিকে মনোযোগ—'তোমাদের মতো অ্যারগান্ট সিনিক অ্যাংগ্রি ইয়াংম্যানদেরই ওরা এখন প্রেফার করছেন বেশি। লেফট লিনিং পোলিটিকসের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে আরো ভালো! যা হোক, তুমি এসো একদিন। স্নেহদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিয়ে ডিস্টার্বড আছো,

তাই এখন ওসব লিবার্টি ফ্রিডম বড় বড় কথা মগজে হৈচৈ করছে। লেখালেখিতে নেমে যাও। মজে যাবে! নিজের রাগটাই দেখবে ফেটে ফেটে বেরোচ্ছে। লেখাজোকার এত দাপট এখন...'

অবাধ্য বস্তুটাকে গালের মধ্যে অনেকটা বাগে এনে ফেলেছে সোমনাথ। চেঁচিয়ে উঠল—'হবে? হবে তো? একটা হিল্লে করে দেবে ওর? কথা দিচ্ছো?'

'হবে না কেন? ওভাবে হঠাৎ কিছু তো হয় না কাগজের অফিসে। এভাবেই শুরু করতে হয়। ঘোরাঘুরি ফ্রিল্যান্সিং চলুক দু-চার বছর...'

'চা...আ...র বছর?' সত্যি সত্যি ধোঁকা খেল সোমনাথ—'তাহলে কী হবে? ওর তো ইমিডিয়েটলি কিছু দরকার।'

বিরক্ত হলেন মাতুল। ডিভানে গা এলিয়ে—'তাতে কী? শুধু ফ্রিল্যান্সিং করেই তোদের বয়সের কত ছেলে বিয়েটিয়ে করে সংসারও চালিয়ে যাচ্ছে দিব্যি। এত নতুন নতুন কাগজ বেরুচ্ছে! এত ভালো লেখালেখি চলছে সব...'

তাকালেন উৎপলের দিকে—'এজন্যেই ইংরেজি ধরতে বলছি তোমাকে। ইংরেজি, বুঝলে, মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট অ্যান্ড ভাইটাল ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন ইন্ডিয়া। খুব একটা পণ্ডিত হবার দরকার নেই। লেখার অভ্যেসটা একবার রপ্ত করে নিতে পারলে দেখবে দিল্লী বোম্বে মাদ্রাজ...ইংরেজি জানার সুবিধে কত বেশি...'

বেরিয়ে এসে উৎপল—'তোর মামা সংস্কৃতে এম. এ. নাকি রে? নাকি পালি?'

'পল্ সায়েন্স। কেন?'

'তাহলে এত কম্‌প্লেক্সে ভোগেন কেন ভদ্রলোক?'

সোমনাথ সাহস পায় না ঘাঁটাবার—'মামা বাদ দে। কাজের-কাজ কী হলো বল্। ফ্রিল্যান্সিং-ই মন্দ কী? দেখ্ না চেষ্টা করে...'

'তোর মামার চাইতে ইংরিজি অবিশ্যি ভালোই জানি। সো হোয়াট...' উৎপল থমকে দাঁড়াল—'দেশটা চলছে কী করে বল তো। কারা চালায়? এই তোর এত হাঁকডাকের জার্নালিস্ট মামা?'

'তুই মর শালা। তোকে উদ্ধার করবে কে?'

'উদ্ধার করতে তো বলিনি কারুকে। তোর যদি আর দু-চারটে মামা থাকে এ-রকম, প্লিজ, রেহাই দে আমাকে...'

কিংবা নিজের মধ্যেই খটকা। এল্‌ডোরাডোর মণিমুক্তো হাতের নাগালে যদি এতই সহজ সুলভ, শিরদাঁড়ায় কত রস তোমার বাছাধন! বলবে—চাই না?

উদ্দাম প্রাণের উচ্ছ্বাসে হৈহৈ করে উঠল খোকাদা—'এ কি গুরু, অ্যাদ্দিন বাদে। আজকাল যে দেখাই পাওয়া যায় না তোমার! এসো বোসো বোসো। চা খাবে? স্পেশাল লাগাচ্ছি তোমার

জন্যে...'

'না না, স্পেশাল-ফেশাল নয়। জলগোলা দুধ আর কতগুলো চিনি তোমার। স্রেফ লেবু চা।'

'জিয়ো হিরো, জিয়ো...' শুধু খোকাদা নয়, এ-পাড়ার ছেলেরা—তিনু বাপি বীরু বিপুল সুখেন আরো অনেকেই ছিল। খোকাদার প্রীতিভাজন খদ্দের বা দোস্তরা। ওদের উচ্চকিত অভ্যর্থনার হট্টগোলে উৎপল ভেতরে ঢুকল।

মধ্যবয়সী দুজন অচেনা মানুষ চা খাচ্ছিলেন দরজার ধারে একটা বেঞ্চিতে। উৎপল তাদের পাশে এসে বসার আগেই লক্ষ করল, ছেলেছোকরার ভিড়ে সেই ফ্রিডম-ফাইটারদাদু। ভদ্রলোককে সে চেনে। এখানে প্রায়ই আসেন চা খেতে অথবা বকতে। বুড়ো, খুবই বুড়ো। ভালো রকমই ছিটফিট আছে মাথায়। আদ্যিকালের ছেঁড়াফাটা শার্টপ্যান্ট, হাতে একটা ছাতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ-সংক্রান্ত কোনো গ্রন্থ। একটাও দাঁত নেই। নড়বড়ে বাঁধানো দাঁতে বকে যাবেন—মুষলপর্ব চলছে দেশে। কোনো ভবিষ্যৎ নেই। দেশ ছিল আগে। তাঁদের যৌবনে। দেশের জন্য ফাঁসিকাঠে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম ভগৎ সিং মাস্টারদা। বুড়ো নিজেও নাকি জেল খেটেছেন। দেশপ্রেমের ভাতা পান। চায়ের দোকানের ছেলেরা বিশ্বাস করতে চায়নি। তাম্রপত্র আর সরকারি মানপত্র বগলে বয়ে এনে ওদের দেখিয়ে গেছেন একদিন।

'অনেকেই গেল, আপনি কেন ফাঁসি গেলেন না দাদু? পেনশনের বদলা এস্ট্যাচু হতেন ময়দানে। আমরা দেখতাম...'

সুখেনরা যখন হ্যা-হ্যা করে হাসছে, বাঁদিকের অপরিচিত দুজনও অনর্গল বকে যাচ্ছেন নিজেদের কথা। উৎপল তার মধ্যবর্তী অবস্থানের নির্লিপ্তিতে ন্যাতান্যাতা বাংলা সংবাদপত্রটা তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু নিভৃতি দুর্লভ। ডানদিকে ক্ষেপে গেছে স্বাধীনতার-বুড়ো। কথা বললেই নিচের পাটির বাঁধানো-দাঁত লাফায়। অনর্গল থুতুবৃষ্টি—'মজা করছ? মশকরা? ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হয়ে বাপের হোটেলে গিলছ আর বসে বসে গ্যাঁজাচ্ছ এখানে। স্বাধীনতা! স্বাধীনতার মর্ম তোমরা কী বুঝবে?'

ইনট্র্যানজিটিভ ভার্ব? যুবকদের সঙ্গে উৎপলও খবরের-কাগজে চোখ রেখে উৎকর্ণ তখন! ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়—কাজ করার জন্যেই জন্মায় মানুষ। এজন্যেই ক্রিয়াপদ ছাড়া মানুষের বুলি তৈরি হয় না কোথাও। হাত পা নাক মুখ চোখ নিয়ে ক্রিয়াপদ তৈরি হলো। কিন্তু তার কর্ম নেই। সে-আবার কেমন কথা? তোমরা তাই। অপদার্থ। একটা ন্যায় নীতি আদর্শ ছিল আমাদের সময়ে। তখন পুজো করতেন একজন, ঢাক বাজাত অন্যরা। এখন দেখি, যে পুজো করে সেই ঢাক পেটাচ্ছে। গলাবাজি...খালি গলাবাজি...'

চায়ের গ্লাসটা হাতে তুলে দিয়েছে খোকাদা। শীতল নিস্পৃহতায় মৃদু হাসল উৎপল। মজা। মানুষ ব্যাপারটাই এমন মজাদার!

খোকাদার চায়ের দোকান নামক খুপরিটি ঠিক রেস্তোরাঁ নয়। ভেতরে-বাইরে কোনো চেয়ারটেবিল নেই। ঘোমটাটানা লেডিজ-কেবিনহীন 'জেন্টস ওনলি'-গোছের উদোম দোকান যথার্থই পান্থজনের সখা। দোকানের নামও 'অতিথি'। বাইরে রঙচঙে সাইনবোর্ড। টালির ছাদের তলায় এক চিলতে খুপরিতে দেয়ালে গাঁথা কাঠের তক্তা। দুটো-তিনটে বেঞ্চি আছে যদিও,

সকালের দিকে পাড়ার ছেলেরা ছাড়া কেউ বড় বেশি বসে না সেখানে। দাউদাউ ফার্নেস। ভদ্রজনেরা সকলেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে খদ্দের। সন্ধের পর জমজমাট। মাংসের টিকিয়া মটনরোল এগরোল। সকালের দিকে ঘুগনি আর আলুর দম। ত্রিশ-বত্রিশের যুবক খোকাদা হৃদয়বান যুবক। ভালোবাসেন ভালোমানুষদের।

যেহেতু শস্তার চায়ের দোকান, উৎপীড়নও থাকবে কিছু। পাড়ার ছোঁড়াদের গুলতানি। সাপ্তাহিক দিনে সকালটা দুপুরের দিকে এগোলে, বেলা প্রায় দশটার পর টুলবেঞ্চির রাজ্যপাট এদেরই দখলে। ত্রিশ বত্রিশ, এমন কি চল্লিশ পেরিয়েও আছেন দু-চারজন। সকলের দলা পাকিয়ে বাঁচা। চাকরিবাকরি রোজগারপাতি নেই। পিতৃরক্তের ধারাবাহিকতায় অর্জিত সর্দিকাশি কোলাইটিসসহ নিজস্ব উপাদান—ফিলম ফুটবল ফ্যাশন—তিন 'এফ'-এর চর্চায় হর্ষোচ্ছল থেকে গোপন বিষাদ ঢেকে রাখতে চায় গায়ে-গা লেপটানো আড্ডায় প্রতিদিন। মাঝেমধ্যে ফ্রিডম-ফাইটারদাদুর মতো কাউকে পেলে ভালো। মোরগা বানানোর সুখ।

খবরের-কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপনে চোখ বুলোতে বুলোতে উৎপল সহসা উৎকর্ণ হলো। কী কাণ্ড! হট্টগোলে খেয়ালই হয়নি এতক্ষণ. ঠিক তারই গা ঘেঁষে বাঁদিকে আরো একটি মুর্গি জবাইয়ের কাজ চলছে অলক্ষ্যে। হাতের মুঠোয় বাগে এনে ফেলার পরও মুর্গিটা জবাই হতে নারাজ। আড়চোখে একবার সে দেখে মিল ওদের। ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ সেই মানুষটার! কাঁচাপাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পাতলা চুল, হতকুচ্ছিত ছেঁড়া নোংরা ধুতি-পাঞ্জাবিতে কণ্ঠা-চাগানো হাড়-গিলগিলে চেহারায় প্রায়-বৃদ্ধ। আস্তে আস্তে, খুবই খাটো গলায় বোঝাচ্ছেন অন্যজনকে—'বিশ্বাস করুন। আপনি ঘরের লোক। বাজে কথা কেন বলব আপনাকে। এ-দিশি মাল নয়। পুরনো জার্মান মেশিন। এখন পাবেন কোথায় এসব? শস্তায় হাতে এসে গেছে, তাই আপনাকে বলা। পনের ষোল হাজার আর এমন কি আপনার কাছে! যদি ধরে রাখতে পারেন, ঠকবেন না। লাইনটাও ভালো। ঠিকমতো চালাতে পারলে দু-আড়াই হাজার হেসেখেলে প্রতিমাসে। কারবারী লোক আপনারা। সে-আপনি আমার চাইতে ভালোই বুঝবেন...'

ডানদিকে হাসাহাসির তামাশায় মজে আছে ওরা। এবং যখন, ওদের চাখুমচুখুম মজা মশকরার মধ্যে হজম হয়ে যাচ্ছেন ফ্রিডম-ফ্রাইটার

অন্য দিকে মোটামুটি ভদ্র বেশভূষায় গাড়ল চেহারার সুখী-সুখী লোকটা, যিনি মুর্গি হতে নারাজ, গরমে হাতপাখা নাড়ার মতো অনবরত মাথা নেড়ে যাচ্ছেন—'না দাদা, সেসব তো অনেকবার শুনেছি। বাজার বড্ড খারাপ। নিজের অ্যাদ্দিনের কারবার সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছি। সামনের মাসে আবার মেজ মেয়েটার বিয়ের দিন ঠিক হবার কথা। বিশ হাজার তো নগদই চাইছে ওরা...'

ডানদিকে যুবকদের শক্ত দাঁতে চর্বিত হচ্ছেন ফ্রিডম-ফাইটার। অন্যদিকে, উৎপল চমকে তাকাল—খাঁচা ছেড়ে রাস্তায় লাফ মেরেছে মুর্গি এবং সেই বুড়ো. নিশ্চিতই মেশিনপত্তর কেনাবেচার দালাল, একবারও চেষ্টা করলেন না পিছু ছোটার। ট্রাইব্রেকারে হেরে-যাওয়া গোলকিপারের ভঙ্গিতে লেপটে বসে পড়েছেন-মুখ থুবড়ে। উৎপলের তাকিয়ে থাকার মধ্যেই বোধ হয় কিছু একটা ছিল। কেন না অন্যান্য চোখগুলোও হঠাৎ নির্বাক

এবং ভদ্রলোক, এতগুলি যুবকের হল্লামাতামাতি হঠাৎ থেমে যেতেই সচকিত বিস্ময়ে কেঁপে উঠে, বিদঘুটে অস্বস্তি, হাতের আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে মারলেন রাস্তায়। গা-পোড়া আক্রোশ—'আরেকটা চা দিন ত ভাই। ডবল হাফ।'

'কী যেন একটা মেশিন বিক্রির কথা বলছিলেন আপনারা?'

চমকে তাকালেন ভদ্রলোক। গায়ের লাগোয়া উৎপলের দিকে চোখ—'আজ্ঞে?'

'আপনারা কথা বলছিলেন, কানে এল। কী মেশিন?'

'ছোট বড় দুটো ট্রেডল নিয়ে পুরো একটা প্রেস। টাইপপত্তর অবিশ্যি খুব বেশি নেই। কালার প্রিন্টিং-এ এক সময় খুব নাম ছিল প্রেসটার।'

'আপনি বেচবেন?'

'পরের জিনিস আমি বেচব কী? সে-মুরদ থাকলে এভাবে কপাল চাপড়াই দাদা। ও-আমি আধপেটা থেকেও নিজে চালাতাম। ও-রকম চালু একটা প্রেস। এমন একটা জার্মান মেশিন কেউ হাতছাড়া করে?'

সুখেন হঠাৎ—'আপনি দালালি করেন?'

লোকটা বেমক্কা ক্ষেপে গেল—'আপনাদের কী মশাই? আপনারা কেন কথা বলছেন? ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে আমি কেন দালাল হতে যাব? ভালো চোখে দেখতে পারেন না কিছু?'

ভড়কে গেছে সকলেই। অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে ফ্রিডম-ফাইটার বুড়ো—'কী হল! আপনি চটে যাচ্ছেন কেন? দালালি কী খারাপ কাজ নাকি?'

'খারাপ-ভালো দেখার ত দরকার নেই আমার। আমি দালাল নই।' চড়ুইভাতির লোভী যুবকদের আসরে হঠাৎ মুর্গি বনে যেতে না-চাওয়ার বিপদ—লোকটা অসহায়। অবশ্যই উঠে যেতে পারত

কিন্তু চায়ের গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে, নিতান্তই খদ্দের ভজনায় খোকাদাকে সক্রিয় হতে হয়। রীতিমত ধমক—'সবতাতেই ফিচলেমি কেন বল্ দেখি তোদের। উনি এসেছেন, চা খাচ্ছেন, কথা বলছেন, তাতে তোদের কী? যা ভাগ্, ভাগ্ এখন। ও দাদু, আর কেন! বারোটা বাজল। যান, বাড়ি যান...'

কিন্তু নড়ছে না কেউ।

খুবই শান্তভাবে এগোল উৎপল—'কিছু মনে করবেন না। আমিই প্রথম কথাটা তুলেছিলাম আপনার কাছে...'

বিস্বাদের তেতো মুখে, যেন খালি পেটেই ভরদুপুরে চা-গুলো গিলছেন ভদ্রলোক। রাগ বা বিরক্তি বা দুর্ভাগ্যের ক্ষোভ।

মধ্যস্থতায় আবার খোকাদা—'হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা বলতে হয় এর সঙ্গে বলুন। আরাম পাবেন। এম. এ. পাশ। ব্যাঙ্কের অফিসার ছিল। বরাত, বুঝলেন দাদা, সব এই কপাল। দু-হাজার আড়াই হাজার ট্যাকা মাইনের চাকরি এই মর্দা বয়সে। ভাগ্যে সইল না। ফালতু মোরগা বনে গেল।'

লোকটা তথাপি চুপচাপ।

উৎপল আরো সূক্ষ্মতায় লোকটাকে বুঝতে চাইল একটু। বয়সে পঞ্চান্ন ছাপান্ন বড়জোর।

মাথার চুল সবই হাওয়া। দাড়ি কামাবার সময় বা পয়সা, অথবা দুটোরই অভাব। লিকলিকে চেহারায় নিবিড় আত্মীয়বিয়োগের শোকাতুর মুখ নিয়ে স্বাভাবিক বেঁচে-থাকা। বাঁহাতে চায়ের গ্লাস এবং আঙুলের কাঁচিতে আরো একটা বিড়ি নিভে আছে। ডান হাতের তেলোয় নিচু মাথার কপালটা ধরে ছিলেন। হঠাৎ সরব হলেন—'কী বলব দাদা, জীবনভর নানান জায়গায় কাজ করে করে গত আট-আটটা বছর এই প্রেসটায় আছি। মায়া পড়ে গেছে মেশিনটার ওপর। এত ভালো একটা মেশিন! কালার প্রিন্টে ফার্স্ট ক্লাস কাজ হয় এমন! মালিক এখন গোটা প্রেসটাই বেচে দিতে চাইছে। খদ্দেরও আসছে দু-চারজন। পনের হাজার দর উঠেছে এখন অব্দি। বলুন দেখি, কার হাতে গিয়ে পড়বে মেশিনটা! নতুন মালিক কালারের কাজ করবে কিনা, না-কি শুধু বিয়ের আর ছেরাদ্দের নেমন্তন্নপত্তর ছাপবে! তাই তো ছাপবে। ফোটোপিরিন্ট অফসেট কি যেন ছাই সব হয়েছে আজকাল! ব্লক বানিয়ে কালারের কাজের কদর তো উঠেই যাচ্ছে দিন-কে দিন...'

উৎপল একটা সিগারেট ধরাল—'আপনি বুঝি মেশিনম্যান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তিরিশ বছর ধরে এ-কম্মো করছি। অনেক প্রেস ঘুরেছি। শেষ অব্দি এখানেই এমন করে বসে গেছে মনটা! সব ওই মেশিনটার জন্যে...'

'তা এত চালু ছাপাখানা। মালিক বিক্রি করছে কেন?' চুপ করে থাকা কঠিন বলেই হয়তো বিপুল আবার নাক গলাল।

'আর মালিক! মালিক বললেই তো রাজাবাদশা কেউকেটা কিছু ভাবে সব্বাই। আমার মালিকের অবস্থা আমার চাইতেও খারাপ এখন। যেমন বেতো ঘোড়া, তেমনি তার সহিস...' দুধ চা হাতে-হাতেই ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ভদ্রলোক এক চুমুকে সবটা টেনে নিলেন—'আগুন নিজেও তো দগ্ধায় মশাই, জলও তো ভেজে? না-কী?'

'হেভি ডায়লগ মাইরি...' দুপাশের তিনু আর সুখেনকে কোঁৎকা মেরে চাগিয়ে উঠল বাপি। কানে কানে বলল ছোট করে। উৎপল শুনতে পেল।

কিন্তু লোকটা বিভোর—'আসল মালিক ত বুড়ো মানুষ। আশির ওপর বয়স। প্রেসটা উনিই করেছিলেন। সে-অনেক কাল আগে। অ্যাদ্দিন ওনার বড় ছেলে প্রাণকেষ্টবাবুই দেখাশোনা করতেন সব। কী বলব দাদা, কপাল পোড়া যার, তার সবতাতেই কপাল পোড়ে। মাস চারেক আগে, এই গেল জুলাই মাসে বলা নেই কওয়া নেই, আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে মানুষটা...প্রাণকেষ্টবাবু হুট করে মরে গেলেন। হার্ট স্টোরোক আর কি! বুড়োর আরেক ছেলে রেলের চাকরিতে থাকে মোগলসরাই। এখন কে দেখবে প্রেস? বুড়ো ত নামতেই পারে না দোতলা থেকে। তার ওপর পুত্তুরশোকের এত বড় একটা দাগা...'

'কত দাম বললেন প্রেসটার? পনের হাজার?' উৎপল উন্মুখ হলো।

'আজ্ঞে না...' কোনো বিড়িই ঠিকমতো জ্বলছে না হাতে। আরো একটা নিভে গেল। বারদুয়েক শুকনো টানের পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকালেন ভদ্রলোক—'সে-আপনি গেলে তাই হবে। কিন্তু বুড়োকত্তা সেদিন বললেন আমাকে—অমন উপযুক্ত ছেলেটাই চলে গেল, টাকায় আর আমার লোভ নেই রে বিজয়। অ্যাদ্দিন ধরে আছিস তুই, নিজের মতো করে দেখছিস, দে, হাজার দশেক টাকা যোগাড় করে আন। ও-আমি তোকেই লিখে দেব...'

'ওই ভদ্রলোক কে? যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

'আমার এক ভায়রাভাই। বড়বাজারে দড়ির কারবার ওদের। অঢেল পয়সা।'

'দড়ি!' সকলেই নড়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, সুতি বলুন নারকেল-ছোবড়া বলুন নাইলন বলুন, সুতো থেকে জাহাজবাঁধার কাছি অব্দি হরেক ধরনের দড়ি বিক্রি করে পাইকিরিতে। পয়সার অভাব নেই। কত বড় বাড়ি গোয়াবাগানে। এত করে বোঝালাম, কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে। আমিই সব দেখব। কাস্টমাররা সবাই ছুটে ছুটে আসে দাদা। মেশিন দুটো বসে থাকে না কখনও। আপনাদের পাঁচজনের আশীব্বাদে বিজয় সাহার একটা হাতযশ আছে। তা দাদা ওঁদের বোঝাতে পারলাম না। সাতদিন ধরে ছুটোছুটি করলাম, এত করে বোঝালাম, প্রেসটা দেখতে পয্যন্ত গেলেন না একবার। দেখলেন ত, কীভাবে চলে গেলেন...'

থামলেন ভদ্রলোক। নিচু মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কী এক যন্ত্রণায়—'টাকাটা ত মার যেত না ওনার। এমন জিনিস আর কোথায় পাবেন এত সস্তায়? ওদিকে আমার হাতেই থাকত মেশিনটা। ও-ত আমারই মেশিন। আমি ছাড়া আর...আর কে পারবে ওটাকে চালাতে?'

রোমাঞ্চিত উৎপল। ভরাট বিস্ময়ে যখন তাকিয়ে থাকে মানুষটার দিকে

ঝাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন বিজয় সাহা। পকেটে হাত—'কত হলো ভাই? তিনটে চা।'

'এ-কি! উঠছেন?'

'হ্যাঁ যাই। দেখুন দেখি খামোকা নষ্ট হলো সকালটা। অথচ হাতে এত কাজ জমে আছে কদিন ধরে...' খোকাদাকে এক টাকার নোট দিয়ে খুচরো ফিরিয়ে নেবার ফাঁকে ঠোঁট দুটো ছুঁচোল করে বিড়ি ধরালেন আবার।

সবাই তাকিয়ে আছে।

বেরিয়ে যাবার মুখে বিজয় সাহা হঠাৎ এক ভিন্ন মানুষ। রাস্তায় নেমে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। জ্বলছে চোখজোড়া—'রং দাদা, চারদিকে এত রং। আর্টিস বাবুরা তো এঁকেই খালাস। মেশিনে সেই রং বানাতে হয়। এক চুল এদিক ওদিক হলে চলবে না। ব্লকের গড়বড় থাকলে তারও ম্যানেজ দিতে হবে। রং দাদা, শুধু রং ঘেঁটেছি সারাটা জেবন! এখন কি আর বিয়ের আর ছেরাদ্দের নেমন্তন্নপত্তর ছাপলে মন ভরবে? না-কি পেট ভরবে? কিন্তু দেখুন না, তাই বোধ হয় লেখা আছে কপালে। ওই যে অফসেট না ববছাট কী-সব যন্তর বেরিয়েছে আপনাদের হিড়িক পড়ে গেছে বাজারে...'

লোকটার অদ্ভুত বাচালতায় খোকাদাশুদ্ধু সকলেই বোবা চোখে পাথর অথবা হাঁ-করা মুখের ভঙ্গিতে সপ্রশ্ন বিস্ময়—পাগল নাকি লোকটা? না-কি আরেক ফ্রিডম-ফাইটার?

উৎপল ঝাঁপ দিলো রাস্তায়—'সবই তো হলো। কিন্তু আপনার প্রেসটা কোথায়? কী নাম? যাব একদিন।'

'আসুন না, আসুন..' উৎসাহ পেলেন ভদ্রলোক—'কত বড় বড় আর্টিসের ভালো ভালো সব ডিজাইন ছাপা চলছে। বইয়ের মলাট, মাসিক সাপ্তাহিকের কভার। চলে আসুন একদিন, এই ত কাছেই। দর্জিপাড়ায় গোপী মিত্তির লেন। বাহাত্তর নম্বর। ব্ল্যাক স্কোয়ার জানেন তো!

যে-কাউকে জিজ্ঞেস করবেন সেখানে গিয়ে। সবাই চেনে ময়ূরাক্ষী প্রেস...'

লোকটা চলে যাচ্ছে। উৎপল তার প্রস্তরতায় অবশ হয়ে এল। নিশ্চিত, বিজয় সাহা নামক ব্যক্তিকে সে ভুলে যাবে। খুব সম্ভব আজ বিকেলের আগেই। ফালতু ময়ূরাক্ষী প্রেসের সন্ধানেও সে যাচ্ছে না কস্মিনকালে। তবু চলমান জনতায় মিশে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকার নিষ্পলকে সে তার চেতনায় রক্তে রক্তে থিতু হয়ে আসে। ন্‌না, দালাল নয় লোকটা। পরের পকেটে হাত বুলিয়ে বাঁচে না ছোটকাকার মতো। অন্যের রোজগারে ভয় দেখিয়ে বাঁচার মুরদ নেই, প্রতাপ-শিবাজীরা যা পারে। তাহলে বেঁচেই বা আছে কী করে মানুষটা? মেশিন? কী বস্তু সেটা? বেশভূষা বা শরীর স্বাস্থ্যের এমন সর্বাঙ্গীণ দুঃস্থতায় স্বপ্ন দিতে পারে সে-কোন্ লোহালক্কড়?

গত মাস কয়েকের মধ্যে এন্‌কোয়্যারি বোর্ডের গোটা চারেক বৈঠক শেষ হবার পর শরীর ভরে অসম্ভব ক্লান্তি ছিল সেদিন। বয়েলিং পয়েন্ট ছাপিয়ে নিত্য-অভ্যাসে ক্রোধের আর কোনো নতুন মাত্রা নেই। অঙ্গীভূত।

শুনানির পর হালিম সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো আজ। শোনা গেল, বোধ হয় আর দুটো কি তিনটে বৈঠকের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে বিষয়টার। অনেকগুলি ক্রশ কারেন্ট এসে মিশেছে এক জায়গায়। তদন্তকর্তা সূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠী তাঁর নিজের রাজ্য উত্তর প্রদেশে বদলি হয়ে যাবার যে-সম্ভাবনাটা উজ্জ্বল করে তুলেছেন, সেটা ফসকাতে চান না বলে তিনি নিজেই এখন কেসটা দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে উৎসাহী। ম্যানেজমেন্টও বোধ হয় এগোতে চাইছে না খুব বেশি। হয়তো মাঝারি ধরনের একটা পানিশমেন্টে মিটে যাচ্ছে ব্যাপারটা। এক্ষেত্রে সুইসাইডের ঘটনাটা বড়কর্তাদের কাছে একটা মানবিক দোহাই। তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নেবার সুবিধে। নইলে পাঁচ-সাত বছরও তো টানাহ্যাঁচড়া চলতে পারে এরকম কেস নিয়ে...

তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল মগজটায়—'তার মানে? তার মানে আমার রেহাইটাও ওদেরই করুণায়?'

হালিমসাহেব হেসেছিলেন—'সাচ ইজ দ্য টাইম। তাছাড়া পুজো এসে যাচ্ছে। অকারণ টেনশন থেকে রিলিভ পেতে মিঃ ত্রিপাঠীর সঙ্গে কোঅপারেট করতে ডিফেন্সেরও অনুমোদন থাকবে। দেখাই যাক না, কী হয়।'

পাক খেতে খেতে ফিরল উৎপল। যেহেতু তার নিজস্ব বৃত্তে কোনো দিগন্ত দৃশ্যমান নয়, স্থিরকেন্দ্র চাই-ই একটা। ঘুরতে ঘুরতে সেখানেই চলে আসা। অখিল জানা বা কাঞ্চনদা কেউ ছিলেন না সন্ধেবেলা। ভিজিটিং আওয়ারের শেষ মানুষটি বিদায় নিলে যে-প্রশান্তি হাসপাতালের কেবিনে, সেখানে কর্তব্যপরায়ণ নার্স-গোছের অণুকাকিমা সারাদিনের অফিসের পর স্টোভ ধরিয়েছেন বারান্দার খুপরিতে।

মনমেজাজ খিঁচড়ে ছিল বিচ্ছিরি। তবু, পাতালপুরীর জিম্মাদার আধাবুড়িকে নজরানায় সময় দিতেই হয় কিছুটা। আবোলতাবোল কিছু বিলাপের পর অণুকাকিমা অনুচ্চস্বরের নিভৃতিতে

জিজ্ঞেস করলেন চাকরিবাকরির সর্বশেষ সংবাদ। তদন্ত না বিচার কী-সব চলছে—ভাসা ভাসা শুনেছেন। বোঝেন না সবটা।

ভণ্ডামির দায় নেই। পরিচ্ছন্ন জবাব—ভবিষ্যৎ নামে কোনো শব্দে সেভাবে আর মাদকতা বোধ করছে না সে। তদন্ত চলছে। কর্তারা যে-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন, ব্যাঙ্কে ফিরে যাবার বাসনা আদৌ তার নেই।

'তাহলে?'

'তাহলে আর কী? দেখা যাক কী হয়...'

এটাই সত্যি। হালিমসাহেবের শেষ বাক্যটিই একমাত্র ভবিষ্যৎ অধুনা মানুষের। ঘরের আলো জ্বেলে ঘুমোচ্ছিল ওরা—মা আর মেয়ে। প্রবেশের ধাক্কায় ভীষণভাবে থতমত খেয়ে যেতে হয়। ওপাশে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শিপ্রার শায়িত শরীর, এদিকে খাটের প্রান্ত ছুঁয়ে শাদা থান-কাপড়ে মেঘময়ী মাসিমা। থমকে দাঁড়িয়ে সে কী করবে ভাবছে যখন

মাসিমা মোচড় খেলেন—'এসো বাবা, এসো। কখন এলে?'

'এক্ষুনি...' উৎপল বিব্রত এবার—'না না, আপনি শুয়ে থাকুন। বিশ্রাম করুন...'

আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসেছেন মাসিমা। খাট থেকে নেমে পড়েছেন। কাতর ভঙ্গি—'না বাবা, বিশ্রাম আর কী? বিশ্রামই তো করছি সারাদিন। এই দেখ না, কী হয়েছে মেয়ের। সন্ধেবেলা ফিরে এসে অব্দি কারুর সঙ্গে কথা নেই। গা-হাত ধুয়ে ফেলে-ছড়িয়ে চা জলখাবার খেল একটু। তারপরই শুয়ে পড়েছে। ঘুমুচ্ছে...'

চোখ টেরিয়ে তাকাল উৎপল। ব্যবধানের শূন্যতায় নিষ্কম্প রমণীয় শরীরের সঙ্গে ধীর লয়ে গড়ে-ওঠা অনুভবের সাঁকোটা তখনও কাঁপছে থরথর। বালিশে উর্ধ্বমুখী এলোচুলের তলায় মসৃণ ঘাড়ের চামড়া, লাল ব্লাউজের আবরণ ভেদ করে ব্রেসিয়ারের স্পষ্ট স্ট্র্যাপ অথবা কচি বাছুরের ওষ্ঠাধরের উপমায় শায়া শাড়ির নিচে গোড়ালির উঁকিঝুঁকি...ইত্যাদি দৃশ্যে বিষাক্ত ভাবনার চঞ্চলতায় যখন নিজের মধ্যেই অস্থিরতা, নড়েচড়ে উঠল—'থাক, আমি তাহলে আজ যাই মাসিমা। পরে আসব...'

'এ-কি ছেলে! যাই কী? আপিশ থেকে এসেছ? না-কি বাড়ি গিয়েছিলে?'

আবার একটা ঝাঁকুনি। অধিকতর আরো দুটি অবোধ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার দীনতায় শরীর শীতল হয়ে আসে। পুজোআচ্চা হাঁড়িকড়াই হাতাখুন্তি নিয়ে উনুনের পাশে বসে থাকার ছবিটাই একমাত্র চিত্রকল্প যে-মহিলার, কোনো সজ্ঞান অন্যায়ের রেখাপাত নেই যাঁর আদ্যোপান্তে, পঞ্চাশ-পেরোনো নিষ্করুণ শিশুর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকার গ্লানি নিজের মধ্যেই। পাপ সে মানে না। পুণ্যে বিশ্বাস নেই। অহেতুক প্রতারণা কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা!

'কী হলো তোমার?' হাসলেন পার্বতী—'দেখছ কী হাঁ করে? আচ্ছা পাগল ছেলে তো! তোমারও কি কাঞ্চনের মতো পোকা আছে নাকি মাথায়?'

করুণভাবে হলেও এরপর হেসে ফেলতে হয়। মাসিমাকে দরজা পেরোতে দিয়ে নিজেও বেরোবার মুখে থমকে দাঁড়াল। পিছু ফিরে তাকাতেই নিঃশব্দে খাটে উঠে বসেছে শিপ্রা। কাঁচা-ঘুম ভাঙার কাতরতায় বিরক্তি মুখে চোখে।

'চলো, বেরোও তো একটু। কথা আছে...'

ভ্যাবাচ্যাকা শিপ্রা তখনও বুঝে উঠতে পারেনি সবটা। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে কিছুটা কর্কশ ঝাঁঝেই—'কোথায় যাব? পাগল নাকি?'

'কেন, চাকরি করছ বলে মাথা কিনে নিয়েছ? ঘরে এসেই সন্ধেবেলা ঘুমোবে রোজ রোজ!'

কোনো সাড়া নেই। শিথিল দেহভারে বুকের-আঁচল সামলে খাট থেকে গড়িয়ে নেমেছে শিপ্রা। নেমেই দরজার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছো?'

শিপ্রা তেরচা তাকাল—'শখের তো শেষ নেই। সকালে বিকালে চল্লিশ কিলোমিটার রেলগাড়ি ঠেঙিয়ে এসে এখন মজা করতে বেরুব?'

শিরদাঁড়ায় সোজা থেকে দাঁতে দাঁত চাপল উৎপল। শিপ্রার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার দৃশ্যে অনুভূতি ভোঁতা। অসহ্য স্নায়ুপীড়া। মনে হয়, এ-ও এক শত্রুশিবির। আরো কতিপয় দুঃসহ মানুষ! এখনও বাঁচার কথা বলে এরা। বেঁচে থাকার লোভ ছড়ায়!

কিংবা জেলখানার কন্‌ডেমড-সেল গোছের ঘরটাই বীভৎস এদের। ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। অবশ্যই যায়। কিন্তু প্রবেশের পর এবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াও কি আদৌ সম্ভব? রেলগাড়ি কি মারাত্মক। শিপ্রা সুদুর্লভ।

আরো একটু বাতাসের জন্য উৎপল হাত বাড়াল দেয়ালে, সুইচবোর্ডে। নড়ল না. ফুলস্পিডেই ঘুরছে পাখাটা। তবু গলগল ঘাম জামাগেঞ্জির তলায়। অসহ্য গুমোট। বিস্তীর্ণ খাটটা কোনো বিশ্রামের প্রলোভন নয়। দু-কদম এগিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। যে-ঘরে তিনটি মানুষের ভালোভাবে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, সেখানে বই? সামনের টেবিলে স্তূপীকৃত। পাশেই বন্ধ-জানালার খাঁজে দেয়াল ঘেঁষে বুক-শেলফে। কী সর্বনাশ! রীতিমত আঁতকে ওঠার মতো ঘটনা। দেয়ালে আবার উই? দেয়াল ফুঁড়ে সবে যাত্রা শুরু করেছে ওরা। গুটি গুটি উঠছে ওপরের দিকে। এই বল্মীকবাহিনীই এ-বাড়িতে ভয়াবহ কাণ্ড বাঁধিয়েছিল একদিন। বছর খানেক আগে কোনো একদিন হঠাৎ-ই আবিষ্কার—ভেতরে ভেতরে খাক হয়ে গেছে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা বই। কাঞ্চনদার সযত্ন সংগ্রহ। ঝেড়েপুছে রোদে দিয়েও বাঁচানো যায়নি। এলিয়ট এল্যুয়র নেরুদা ব্রেখ্‌ট সব ডাস্টবিনে। তারপর থেকেই সেই আলমারিটা, বাইরের বারান্দার এক কোণে থাকত যেটা, কোন্ এক বন্ধুর বাড়ি চালান। এখন নিজেরই রবীন্দ্র-রচনাবলীর পাতা ওল্টাতে ভদ্রলোককে ট্রামবাস ঠেঙিয়ে আরেক বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তে হয়।

চায়ের কাপ আর সুজির হালুয়া নিয়ে ঢুকল শিপ্রা। খুবই কাছাকাছি এসে, গা ছুঁয়ে টেবিলের ওপর রাখার শব্দটা ওর নিঃশব্দ অস্তিত্বের। তাকাল উৎপল—'কী হয়েছে তোমার?'

'কী আবার হবে? কিছু না।'

'মাসিমা বলছিলেন...'

কোনো সাড়া নেই। ঘর ছেড়ে বেরিয়েও যায় না শিপ্রা। খাটের বাজু ধরে থমকে দাঁড়িয়ে যেন নিজেরও কী এক অস্থির স্থবিরতায় নিশ্চুপ। ঊর্ধ্ববর্তী দেয়ালের আলোয় ছায়া দীর্ঘতর হতে পারে না এদের ঘরে। অপরিসর চতুষ্কোণে নাগালের মধ্যেই যদিও, সাদায়-কালোয়

চক্রাবক্রা—মূলত সবুজ শাড়ি লাল ব্লাউজের অতি ঘনিষ্ঠকে অশোভনভাবেই আজ বড় শরীর-শরীর মনে হচ্ছে তার।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল উৎপল—'ন্যাকামো রাখো। বলবে তো, কী ট্রাবল তোমার?'

শিপ্রা একই তিক্ততায়—'জানো, জানো তুমি! এ-বাড়িতে তুমি নিজেই একটা কত বড ট্রাবল।'

'সে...সে-আমি কী করব?' কিছুমাত্র বৈকল্য নেই। উৎপল একইভাবে তীক্ষ্ণ—'ট্রাবলগুলো নিজে তৈরি করিনি আমি।'

'হ্যাঁ, তোমার মরে-যাবার ইচ্ছেটার মতো একা একা বাঁচাও যেমন তোমার একারই ইচ্ছে...' সোজাসুজি তাকাল শিপ্রা। ভয়ঙ্কর ঝাঁঝে—'কী তোমাদের এনকোয়্যারি ফেনকোয়ারি চলছে ব্যাঙ্কে। একদিন কী সব শোনালে! তারপর থেকে আজ অব্দি আর কোনো পাত্তা নেই।'

বেকায়দা থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, উৎপল যথাসাধ্য ক্রীড়াবশে—'এই দ্যাখো, এনকোয়্যারি চলছে? সে-তো চলছেই। গোটা কয়েক সিটিংও হয়ে গেল। কিন্তু কোথাও একটা কিছু না দাঁড়ানো পর্যন্ত ওসব বলেই বা কী হবে...'

'কিন্তু এর মধ্যে দাদার কাছে অন্তত একবার আসতে পারতে। জানি, দাদা কিছু না। ওসব শোনাতে চাইলে শুনতও না সবটা। তবু...তবু জাস্ট একটা কনসোলেশন। একটা ভদ্রতা। একেবারে অন্ধকারে তো হাঁটছে সবাই...'

এবার গুটোতে হয় নিজেকেই। উৎপল, যেন ইলেকট্রনিকসের সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম কলাকৌশল নিয়ে খেলতে হচ্ছে তাকে, কিছুটা গাঢ়তায়—'বেশ তো, আমি আছি এখন। থাকব। কাঞ্চনদার সঙ্গে দেখা করেই যাব।'

'কোনো দরকার নেই। ডিসিশন তো নিয়েই নিয়েছ একটা।'

উৎপল ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

'কর্তারা যে-রায়ই দিন, ব্যাঙ্কের চাকরি তুমি আর করছ না।'

'এরই মধ্যে অণুকাকিমা রিলে করে দিয়েছেন?'

'দেবেনই। এ-বাড়ির যন্ত্রণাটা তোমার বাড়ির লোকজনদের কারুর চেয়ে কম নয়...' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শিপ্রা—'অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিসাইডেড? এ-চাকরি তুমি করবে না?'

'ডিসাইডেড।'

'তোমার ওই পাগলামির সঙ্গে পাল্লা দিতে যদি আর কেউ রাজি না হয়?'

সংশয়ে তাকাল উৎপল। কেন না রক্তের চাপ বেড়েছে। ক্রোধ বা বিরক্তি বা নিজেরই অসহায়ত্বে জ্বলুনি! সংজ্ঞা জানা নেই। বিচিত্র এক স্নায়বিক চাপে দৃষ্টিকে প্রখর রেখে—'খুব ভেবেচিন্তেই বলছ কথাটা?'

অন্য পারে শব্দ নেই। কোনোদিকে বিন্দুমাত্র কাঁপুনি ছাড়াই নাগালের ব্যবধান দূরবর্তী হতে থাকে। খাটের বাজু ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে শিপ্রা। যেন অনেক কথা আছে তার। কিছুই বলতে না-চাওয়ার স্তব্ধতায় চোখজোড়া বিছানারই কোনো এক বিন্দুতে নিবদ্ধ অপলক।

ভাড়া করা পুরনো ডি. সি. পাখার কার্বনে গণ্ডগোল কোথাও। কটকট শব্দটা তীব্র। পাখার

বাতাসে কাঁপছে ওর এলোচুলের রেণু। তাকিয়ে থাকার ক্লান্তিতে উৎপল ধৈর্য হারাল। দু-কদম এগোল সে। যথেষ্ট দাপটে—' কী বলছ! স্পষ্ট করে বলো...'

'কিছুই বলছি না...' ঘনিষ্ঠ উত্তাপ থেকে শিপ্রা অব্যাহতি চায়—'নাও, সরো। যেতে দাও। চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে থাকলে খেয়ে নিতে পারো।'

হাত বাড়াল উৎপল। পথের বাধা—'না, বলো কী বলতে চাও।'

'কী আবার বলব? অ্যাদ্দিন ধরে স্রেফ মজা হয়নি নিশ্চয়ই। লম্বা লম্বা কথা বলে বেড়াও, বোঝো না, এ-বাড়িতে মা এখন কী চান? কী চাইতে পারেন!'

'কিন্তু...কিন্তু সে-আমি কী করব?'

'কিছুই করবে না। বুঝবে, বোঝার চেষ্টা করবে। দিনরাত শুধু ঘ্যানর-ঘ্যানর করছেন মা। সত্যিই তো বলারও কিছু নেই। মা তো তাঁর ছেলের কথাও ভাবতে পারেন এখন। দাদা নিজেও তো ওর নিজের জন্যে চাইতে পারে কিছু। বয়স বাড়ছে...'

রেলগাড়ি স্টেশনে পৌঁছোবার ধাতবধ্বনি যেমন, আস্তে আস্তে থিতোতে থিতোতে থেমে যায় শব্দগুলো। গাঢ় নিশ্বাসের বেদনায় গলাটা ভারি হয়ে এলে শিপ্রা আবার ওর স্তব্ধতায় নিঝুম। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অপার দিগন্ত বুঝি হাত তিনেক দূরের ছাতাপড়া স্যাঁতসেতে দেয়ালের গায়ে আটকে গেছে কোথাও, চোখজোড়া সেখানেই নিষ্পলক

এবং শিপ্রার থমকে-যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার অবসাদে উৎপল বদ্ধঘরের গুমোটে অস্থির হয়ে উঠল। অনেক কাল বাদে শিপ্রাকে বড় বেশি দূরবর্তী মনে হচ্ছে আজ। ওপারের সুখদুঃখকে ছুঁতে যাবার মধ্যবর্তী সাঁকোটাই যখন ভেঙে ভেঙে যায়।

অক্ষম ক্রোধের ক্ষুব্ধতায় সে একটা সিগারেট ধরাল। প্রথম ধোঁয়ার পর সিগারেটটা ঠোঁটে রেখেই মরা-ইঁদুরের লেজ ধরার ভঙ্গিতে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরে থাকে ডানহাতে। তীক্ষ্ণতায় চোখ রেখে ওকে নিভে যেতে দেয়, যতক্ষণ না আগুন আঙুল স্পর্শ করছে তার। অনন্ত মহাকাল এমনি একটা মুহূর্তের মধ্যে সিঁধিয়ে গিয়ে যদি অসম্ভব জটিল আর দুর্জ্ঞেয়, এতাদৃশ কালক্রীড়া বড়ই জরুরি নিঃশব্দ মুহূর্তে। কিন্তু নিভে যায়। দেশলাই-কাঠির শেষ সাদাটুকু আর ছাই হয় না। ফেলে দিতে হয়।

'আজ তুমি যাও। যাও প্লিজ...' অপর পারে আচমকা নড়ে উঠল শিপ্রা—'আজ আমার এক ভীষণ ভীষণ খারাপ দিন...'

'কেন? কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। তুমি যাও।' বুকের গভীর থেকে উত্তোলিত নিশ্বাস শিপ্রার।

'ন্যাকামো ছাড়ো। বলো কী হয়েছে। মাসিমা বলছিলেন...' ঘরের গুমোট ভেঙে নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে উৎপল তার দাপট চাইল।

একই ভাবে খাটের বাজুটা দুহাতে আগলে দাঁড়িয়ে আছে শিপ্রা। ক্রোধ নয়, দাঁতে ঠোঁট চেপে এবার কান্নাই হয়তো-বা

'কী? কোনো অসুখবিসুখ?'

'না। তাহলে মাকে বলা যেত। মেয়েদের অসুখবিসুখের কথা মাকেই আগে বলে মেয়েরা।'

নিজেকে ভাঙল শিপ্রা। খাটের বাজু ছেড়ে শরীরে মোচড় দিয়ে যখন এগোবার জায়গা নেই, এগোল টেবিলটার দিকে, যেখানে খাতাপত্র কাগজকলম উই-ধরা বইয়ের ডাঁই। জীবনযাপনে যেখানে কাঞ্চনদার খামোকা কাব্যি।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত বেড়েছে। ঘরের নিঝুমে বেজে ওঠে শব্দগুলো। কিছুমাত্র কান্না নয়। আপাত তাচ্ছিল্যে ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অস্বীকারের ভঙ্গিতেই যেন নিজের জন্য, নিজের প্রয়োজনেই শব্দগুলো—'চারটে আটাশের ট্রেনটা পেলাম না। পরের গাড়ি পাঁচটা চল্লিশ। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই সন্ধে হয়ে গেল। টার্মিনাসে একটাও বাস নেই, ট্রাম নেই। পুরো এলাকা জুড়ে গিজগিজ করছে কাতারে কাতারে মানুষ। বড়বাজার না পোস্তার বাজার কোথায় কী সব হয়েছে বড় রকমের গোলমাল। কোনো ট্রাম বাস আসছে না এদিকে। গেলাম মিনিবাসের জন্যে। বাসটাস এলেও আমি উঠতে পারব নাকি? যা অসভ্য ভিড়। কী যে করি। এত কান্না পাচ্ছিল আমার। হঠাৎ বেলাদি আরতিদিদের সঙ্গে দেখা। ওঁরা সিঙ্গুর যান রোজ। শোভাদিই বললেন...আজ আর উপায় নেই। লঞ্চে যাই, চলো। লঞ্চ! বুকটা কেঁপে উঠেছিল আমার। জীবনে কোনোদিন নদী পেরোই নি। কিন্তু সত্যি তো উপায় ছিল না। এলাম ওঁদের সঙ্গে। উঃ বাসস্ট্যান্ড থেকে সাবওয়ে দিয়ে স্টেশন ঘুরে লঞ্চের ঘাট যে কত দূর। সেখানেও হাজার হাজার মানুষ। লম্বা লাইন...'

সিগারেট হাতে নিয়ে উৎপল বেকুব। কী হলো তাতে। কলকাতার বসবাসে এ-তো নিত্য ঘটনা। নাটক কেন এত?

অপর পারে ভয়ের চোখজোড়ায় তখনও দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। যেন সেই অন্ধকারের ভরাট নদীতে এখনও ভাসছে শিপ্রা। কুঁকড়ে আসে—'এদিকে হাওড়া ওদিকে কলকাতা। অন্ধকারে জ্বলছিল দুটো শহর। সিন্দুকের মতো মস্ত একটা গর্তের ভেতর গাদাগাদি হয়ে ভাসছি আমরা পাঁচশো ছশো লোক। গরুছাগলেরও অধম। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না নদী। কে যেন বলল, বড় রকমের বান এসেছিল সকালবেলা। রাত্তিরের দিকে আবার আসতে পারে। রেডিও-এ বলেছে। লঞ্চটা ভীষণ দুলছিল। হঠাৎ থেমে গেল। চিৎকার চেঁচামেচি আর মানুষের ভিড়ে চেপ্টে গিয়ে এমন ভয় করছিল আমার, বেলাদিকে জড়িয়ে ধরে ছিলাম। সাঁতার জানি না। পুকুরে একটা ডুব দিয়েও দেখি নি কস্মিনকালে। অনেক বেশি লোক নাকি উঠে পড়েছে। ওপরের ডেকে দাঁড়াবার নিয়ম নেই। কিছু লোক সেখানেও উঠে গিয়ে ঝগড়া করে মারধরের ভয় দেখিয়ে খালাসিদের বাধ্য করেছে লঞ্চ ছাড়তে। মাঝনদীতে চেঁচাচ্ছে খালাসিরা—একদিকে ঝুঁকবেন না, বেশি নড়াচড়া করবেন না...উৎপল, কী ভয়ঙ্কর সেই কুড়িটা মিনিট! একদিকে হাওড়া অন্যদিকে কলকাতা। কী যে হিংসে হচ্ছিল তোমাদের জন্যে। তোমরা সবাই ডাঙায় আছো। কত সেফ...'

ঘাড়টা উঁচু হয়ে উঠেছিল শিপ্রার। বুজে এসেছিল চোখজোড়া। নিশ্বাসে নিশ্বাসে শব্দগুলি আলগা আলগা হয়ে খসে পড়ছিল। নৈঃশব্দ্যের এ-ঘরে প্রতিটি ধ্বনিই কী বিষাক্ত দংশন। ম্যাটমেটে তামাটে আলোয় শিপ্রার ঘনিষ্ঠ মুখ বা মুদিত আঁখিপল্লবের দিকে তাকিয়ে থাকার অবসাদে, দীনতায়, নিজেরই মধ্যে উৎপল সহসা অস্থির। যদি হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখতেও ভয়

এবং এক সময় ভয়ঙ্কর সেই গুহা থেকে ছিটকে এসে, বাইরে, দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের

অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে বিধান সরণির আলোয় আলোয়, জনারণ্যে তাড়া খাওয়া চোর বা জানোয়ার যেমন, ট্রামবাসমোটরলরির কোলাহলে হারিয়ে গিয়ে নিরাপদ ডাঙায় বাঁচার দম চাইল সে। সর্বাঙ্গে ঘাম। দুঃসহ দাহ। কলকাতায় বাতাস নেই।

কিংবা যথার্থই মুক্তি...মুক্তির নিশ্বাস। সঙ্কীর্ণ ফুটপাথে ছুটতে গিয়ে মানুষে-মানুষে ধাক্কা। অসংখ্য অগুন্তি মানুষ। অথবা মাছ। ঘরবাড়ির ডাঙাকে দুপাশে রেখে ফুটপাথশুদ্ধ সুপ্রশস্ত রাজপথটাই খরস্রোতা অন্ধকারের নদী। দুরন্তগতি যানশকটের অব্যাহত যান্ত্রিক চিৎকারে নিরন্তর কলোচ্ছ্বাস। মাছেরা ছুটছে। দোয়াড়ি পাতা আছে নিকটে কোথাও! কিংবা চোরাস্রোত—জেনে বা না-জেনে চঞ্চল মৎস্যপ্রবাহ। যেখানে ভয় পেয়েছিল শিপ্রা। ডাঙাকে ঈর্ষা

তাতানো লোহার শরীরে যে-দাহ এবং উত্তাপ, সর্বাঙ্গে জ্বলতে জ্বলতে উৎপল এখন সেই জনস্রোতে জলস্রোতে। আশ্চর্য সে-স্রোতোধারা, যেখানে অগ্নি নির্বাপিত নয়। কিংবা বিরল বাড়বাগ্নি সে—মাছদের মধ্যে থেকেই অবগাহনের বসবাসে চিনে ফেলেছে জলস্থলের ফারাক এবং রহস্য তার। তখন ডাঙার সুখে ঈর্ষা নয়, ক্রোধ। ঘৃণাই হয়তো-বা

ওপর থেকে লম্বিত সুতোয় ঝুলবে সুখাদ্য। নেমে আসবে নিচের দিকে। দুলবে জলে জলে, কাঁপবে ঢেউয়ে ঢেউয়ে! প্রসারিত প্রলোভন। ছুটে যাবে লোভাতুর মাছেরা। সবাই পাবে না। নিজেদের ভাগ্যবান জেনে গিলবে যারা, হ্যাঁচকা টানে হতভাগ্যরা কোথায় উড়ে যাবে। ফিরবে না কেউ। বঞ্চিতদের হাহাকারে দাঁড়িয়ে, যদিও সে নিজেও তাদেরই একজন, বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না আপনজনদের—সে জেনেছে জলের ওপরতলা। সেখানে, ডাঙায়, ফাৎনার দিকে দৃষ্টির স্থিরতায় নিষ্পলক যাঁরা, সভ্যতার বিধানে নাকি তাঁরাই মানুষ। আমরাই সুখাদ্য তাদের

অন্যায় অন্যায়। পুরুষানুক্রমিক শীতল মৎস্যরক্তে কেন যে বৃথা আস্ফালন? নিজের কাছেই নিজের ক্রোধস্ফীত আগ্নেয় শরীরটা দুর্বহ মনে হল। স্নায়ুক্রিয়া যথাসম্ভব সংহত রেখে রাস্তাটা পেরোল সে এবং অন্য পাড়ে পৌঁছেও বৈচিত্র্যহীন একই প্রকার ঘরবাড়ি দোকানপাট মানুষজনের ভিড়ে একাকার মিশে গিয়ে লম্বা বেঁটে, কালো ফর্সা, কৃশজীর্ণ অথবা মেদের বস্তা, হর্ষোচ্ছল কিংবা গোমড়ামুখো ভাসমানদের দিকে নজর রেখে এগোতে এগোতে মনে হলো তার—শুধু অদৃশ্যলোকের প্রভুরাই নন, এখানকার সহবাসেও আছে হাঙরের-দাঁত কুমিরের-হাঁ। মাৎস্যন্যায় আজও

এগোবার পথে, অন্তর্গত বিষাদে শিপ্রার ভয়ার্ত চোখজোড়া লেপটে থাকে চোখে। অন্ধকারের নদীতে বিপন্ন সে-মেয়ে হাবুডুবু ডুবে যেতে যেতে হাত বাড়িয়েছে তার দিকে, তাকে লাইফ্-সেভার জেনে। গোটা শরীরে মোচড় খেল উৎপল

কোথায় অখিল জানারা? কিংবা হালিম সাহেব? কথা ছিল, উথালপাথাল তোলপাড় তুলে ঝড় উঠবে একদিন। সত্যি সত্যি প্রবল বন্যা। ডোবাপুকুর নদী পাবে। নদী সমুদ্র।

মাছের টুকরো ছোট থেকে আরো ছোট হয়ে আসছিল প্রতিদিন। আস্ত ইলিশ বা বড় মাপের

কাটা-পোনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবার পর ট্যাংরা গুজরালি বাটা মাথা গুনে গুনে। সপ্তাহে একদিন দুদিন নিরামিষ আহার যে স্বাস্থ্যের কল্যাণেই আবশ্যক—তত্ত্বটা প্রচার করলেন সত্যসাধন। এতকাল একবাটি করে দুধ বরাদ্দ ছিল সকলের জন্যেই। তাছাড়া সন্ধেবেলা একটু ঘরে-কাটা-ছানা বৃদ্ধের দীর্ঘকালীন অভ্যাস। ঘরে যেহেতু টুনটুনি ছাড়া নিতান্তই-শিশু আর কেউ নেই, আসছে মাসে ছয় বোতল থেকে তিনটে বোতল ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দিলেন রেণুবালা। গলাধঃকরণের প্রতিটি গরাসে সবাই পরস্পরের চোখে তাকায়। কেন পরান্ন মনে হয়? অপরাধী কে? আমরা কেউ নই অথবা আমাদেরই কেউ।

প্রতি বিন্দু পয়সার গোনাগুনতিতে মিতব্যয়ী সত্যসাধন দুই ছেলের গৌরবে বড় বেশি বেহিসেবী হয়ে উঠেছিলেন ইদানীং। বাজারের ভিড়ে চেনা দোকানিদের এড়িয়েই চলতে চান আজকাল। চালকুমড়োর ফালি আর আস্ত চালকুমড়োর ফারাক বুঝতে শুরু করলেন আবার। সংসারের এই বিপর্যয়ে বড়ছেলে বা বৌমা ওদের বরাদ্দ বাড়ায় নি একটি পয়সাও। সাসপেনশন পেরিয়ডে ছোটছেলের মাইনের অঙ্ক ধাপে ধাপে কমে আসছে। তাঁর পেনশনের টাকা-কটা কতকাল বাদে আবার নতুন করে অপরিহার্যতায় মূল্যবান!

হেঁসেলে ফ্রিজের ডালা খুলে শীতলতার ঘ্রাণে নিজেই বরফের মতো গলতে থাকেন রেণুবালা। গ্যাসের আগুন বা উত্তাপে ওম পান না। বুড়ো বয়সে এ কী শাস্তি ভগবান! নিত্যি নতুন ব্যঞ্জনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দশজনকে খাইয়ে, দশজনের তৃপ্তিতে অপার আনন্দ আজীবন। বৃথা অপচয়ের অজুহাতে স্বামীর কাছে তিরস্কৃতও হয়েছেন বহুবার। তবু নেশা, নেশার মতোই সুখ। বছরকার দিনে পিঠেপায়েস, খুশিমতো নাড়ুমোয়া, ছুটিছাটা রবিবারে ভালোমন্দ রান্নাবান্না। রান্নাঘরটাকে ঠাট্টা করে বলত খোকন—'মা-র ল্যাবরেটরি' কিংবা কোনো কোনো দিন খেতে খেতে—'তোমার এই সুক্তোটা সভ্যতার এক বিরাট আবিষ্কার মাদাম ক্যুরি...'

মাছের সুক্তো বড় ভালোবাসে ছেলেটা

এবং সেই রান্নাঘরই আজ তাঁর নীরব দুঃখঘর। এ-বেলার আনাজ কুটে ঝুড়িটা নেড়েচেড়ে ভাবতে হয় ও-বেলার কথা। তেলের শিশি নাকের ডগায় তুলে, বারবার পরখ করে ফোঁটায় ফোঁটায় ঢালতে হয় কড়াইয়ে। মাসে ছ-কেজি সাত কেজি সত্যি বড় বেশি। একটু বুঝেশুনে চলা দরকার। শেষ পর্যন্ত কোথায় যে গিয়ে দাঁড়াবে সংসারের হাল!

ইলেক্‌ট্রিক বিলের টাকা জমা দিতে গিয়ে সত্যসাধন সকাল গড়িয়ে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘরে ফিরলেন না। ছেলেরা কেউ ঘরে নেই। বৌমা স্কুলের মাস্টারিতে। কৃষ্ণা কলেজে। উতলা রেণুবালা! হাতিবাগান থেকে শ্যামবাজারের মোড় অব্দি পৌঁছোতে, হেঁটে গেলে, এমন কি তিনিও জানেন, বড়জোর পনের থেকে কুড়ি মিনিট। অথচ ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল...

শিবাজীকে ডেকে আনা হলো পাড়ার মোড় থেকে। ট্রামে গিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে খবর নিয়ে এল ছেলেটা—'টাকা জমা দেবার লাইন আছে এখনও। কিন্তু জ্যাঠামশাই নেই।'

একতলা থেকে উঠে এল সকলেই। দুঃখ জটলার মধ্যে অনুযোগ মেজগিন্নির—'বুড়োমানুষ কেন যান একা একা? প্রতাপ শিবাজী তো বসেই থাকে পাড়ায়। ওদের বললে এইটুকুন কাজ করে দিতে পারত না ওরা?'

জবাবে সাহস পান না রেণুবালা—টাকাকড়ি দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না তোমাদের ছেলেদের। কী করেই বা বলবেন সে-কথা? নিজেই যখন আশি হাজার টাকা চোরের মা।

ঘরে ফিরে উদ্‌ভ্রান্ত উৎপল। পায়ের জুতোটা পর্যন্ত খোলার অবকাশ নেই। সিঁড়ি থেকে পিছু ফিরে আবার ঝাঁপিয়ে রাস্তায়। কিন্তু এ-বিশাল জনারণ্যে খুঁজবে কোথায় বুড়োকে? সুবিধে শুধু, গন্তব্যের নিশানা এবং পথটা জানা। দুপাশ দেখতে দেখতে, পায়ে হেঁটে ইলেক্‌ট্রিসিটির অফিস অব্দি ঘুরেও এল এক পাক।

ইতিমধ্যে রিকশ করে অচেনা কারা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে বুড়োকে। বিলের টাকা জমা দিয়ে ফেরার পথে ফুটপাথে টলে পড়েছিলেন। ধরাধরি করে একটা দোকানের ভেতর তুলে নিয়ে গিয়েছিল ফুটপাথের হকার-যুবকরা। ডাক্তারও ডেকেছিল। সেবাশুশ্রূষা যত্নআত্তির পর জনগণই রেখে গেল যথাস্থানে। নিরাপদ জিম্মায়।

উৎপল প্রখর সত্যের মুখোমুখি। স্নান খাওয়া বরবাদ। ছিটকে বেরিয়ে পড়ল আবার। ভরদুপুরে আরেক বুড়োর ওপর উৎপাত।

ঠুনঠুন রিকশ-এ চেপে পাড়ার-ডাক্তার ঘোষমশাই এলেন কর্তব্যের টানে। ডাক্তার খারাপ নন। বড্ড বকেন! বুক পেট চোখ জিভ পাল্‌স্‌-বিট পরীক্ষার শেষে প্রেশারের মাপ। প্রেসক্রিপশন লেখালেখির পরও চেয়ার ছাড়ে না বুড়ো। তাঁর সেই বিখ্যাত বকবক—'হার্টের রোগী! তার ওপর বয়স হয়েছে। এখন কি আর এত খাটাখাটুনি হাঁটাহাঁটি এসব মানায়? এই তো যুগের হাওয়া। আলো-পাখার তলায় শুয়ে-বসে, রাস্তায় আড্ডা মেরে কাটাবে জোয়ান ছেলেরা। ওদিকে ইলেক্‌ট্রিক বিলের টাকা জমা দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে মরবে বুড়ো বাপ! স্বামীজি নেতাজীর দেশে আর আদর্শ কোথায়? সব পোলিটিকস, পোলিটিকসই খেল দেশটাকে...'

ডাক্তার বিদায় হলে শয্যাশায়ী সত্যসাধন কাছে ডাকলেন ছেলেকে। শীর্ণ কম্পিত হাত ঊর্ধ্বে উঠে কিছু একটা খুঁজছে, ধরতে চাইছে। উবু হয়ে উৎপল বাড়িয়ে দিলো মাথাটা।

'কিছু নয় বাবা, এ-কিছু না। গ্যাস, পেটের গ্যাস থেকে! তুই মন খারাপ করবি না। চিরটা কালই কি এক রকম যায় রে মানুষের! আপদ-বিপদ তো থাকবেই একটু আধটু। ভগবান আছেন। তাঁর ওপর ভরসা রাখ্‌। তিনিই দেখবেন...'

শাঁখাসিঁদুরমার্কা বাংলা বায়োস্কোপের একটি নিটোল সিকোয়েন্স। ঘটনাটা নিজের কাছে যতই বোকা-বোকা ফালতু মনে হোক, বিপন্ন মায়ের মুখ অথবা হলুদলঙ্কার-গন্ধমাখা কাকিমাদের দিকে তাকিয়ে পাঁজরার গভীরে কোথায় একটা খিঁচ। ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের তদন্তকর্ম, বাগবিস্তারে মহাজনী সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি সৌরজাগতিক ক্রিয়াকাণ্ড-বিষয়ে এঁদের অজ্ঞতা সীমাহীন। অথচ তারই টানে আক্রান্ত মানুষগুলির নিয়ত দুঃখতাপ তাকে এক নিকৃষ্ট গোছের অপরাধী বলে শনাক্ত করছে বিবেচনায় যখন নিজের মধ্যেই সংশয়ের তোলপাড়

সে ভাইঝিকে কোলে তুলে নিল। দুপুরে ঘুমোয়নি টুনটুনি। নাতনীর দৌরাত্ম্যে নাজেহাল রেণুবালা। নিজের ঘরে ফিরে এসে উৎপল সরল শিশুর অর্থহীন হাসি হল্লোড় লাফালাফির সঙ্গে সমান পাল্লায় খেলতে খেলতে অবচেতনের তলায় আরো এক বড় নিরর্থক নিয়ে ভাবিত হলো। কদিন বাদেই এনকোয়্যারি বোর্ডের ডেট। এবার নাকি তাকেই জেরা করা হবে শেষ বারের

মতো। আজই একবার হালিমসাহেব এবং নির্মল ভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ জরুরি কথাবার্তা। কিন্তু আপাতত বাড়ি ছেড়ে বেরোবার কথা ভাবাই যাচ্ছে না যেহেতু, সে টেলিফোনে জানাল—বাবা অসুস্থ। আজ নয়, কাল...

এবং আজ নিপাট অবসরের দুপুরে সে শিশুর সঙ্গে অদ্ভুত এক খেলায় মেতে উঠল। ঘরের মেঝেতে নিচু হয়ে দুটো হাঁটু আর দুহাতের পাঞ্জায় শরীরের ভর নিয়ে যেন সত্যি সত্যি চতুষ্পদ। সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল বাচ্চাটা। একেবারে পিঠে—'হট্ হট্ ঘোড়া, আমার ঘোড়া হট্ হট্...'

হামা দেবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে সংশোধন করে দিতে হয়—'ঘোড়া নয় গো মামণি, বলো গাধা।'

যে-যার মতো সবাই চাপছে ওটার পিঠে। তুমিই বা বাদ যাবে কেন?

তথ্যানুসন্ধান পর্ব৫

শ্রীসূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠী	: এন্‌কোয়ারিং অথরিটি
উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ	
শ্রীমধুসূদন সরকার	: প্রেজেন্টিং অফিসার
শ্রীপ্রতীক বর্মন	: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেজেন্টিং অফিসার
শ্রীউৎপল দাশগুপ্ত	: চার্জশিটেড অফিসার
শ্রী নির্মল ভদ্র	: চার্জশিটেড অফিসারের পক্ষে ডিফেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ
শ্রীশিবশঙ্কর বাৎসায়ন	: ম্যানেজমেন্ট উইটনেস
শ্রী সত্যব্রত নিয়োগী	: ডি. এস. পি (সি. বি. আই)

মধুসূদন : আপনি তো ইকনমিকস-এ এম. এ.?

উৎপল : হ্যাঁ। চুয়াত্তরে অনার্স গ্র্যাজুয়েট, ছিয়াত্তরে এম. এ। না টুকে...'

মধুসূদন : আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

উৎপল : বাবা মা দাদা বৌদি ছোটবোন আর বাচ্চা ভাইঝি। পোষা বেড়াল বা সাহেবি কুকুর নেই।

মধুসূদন : বাবা কী করেন?

উৎপল : রেলের রিটায়ার্ড 'কেরানি। যদ্দুর জানি, ঘুষ খেতেন না।

মধুসূদন : তিনি জীবিত?

উৎপল : হাজত বা হাসপাতাল না ছুঁয়ে নাউ অ্যাবাভ সেভেন্টি...

মধুসূদন : বাড়তি কথাগুলো কেন বলছেন?

উৎপল : ইন্‌ডিসপেন্‌সিবল ব্রাকেটস। ওগুলো না থাকলে, ভয় হয়, ঠিক মতো প্রেজেন্ট করতে পারব না নিজেকে।

মধুসূদন : নিজেকে একসেপশনাল কিছু ভাবেন?

উৎপল : একেবারেই না। ভেরি মাচ অ্যাভারেজ অ্যান্ড নর্মাল। আপনাদের এ-ঘরটা চুয়াত্তর সালে আমার বি. এ. পরীক্ষার হলঘরটার মতো। এত সব তাণ্ডব আর হল্লার মধ্যে বোঝাব কি করে দ্যাট আই অ্যাম অনেস্ট অ্যান্ড সাফিসিয়েন্টলি ইডিয়ট।

সূর্যনারায়ণ : হচ্ছে কী এসব? উই আর নট প্লেয়িং কার্ডস অর চেজ ইন আওয়ার হলিডে ড্রয়িংরুম। সব কিছুরই একটা সিরিয়াসনেস আছে।

নির্মল : মিঃ এন্‌কোয়্যারিং অথরিটি, আমি লিস্ট অব ডকুমেন্টস-এর ন-নম্বর আইটেমের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মধুসূদন : মাননীয় এন্‌কোয়্যারিং অথরিটি, আমি বিষয়টাকে এখনই খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইছি না। বলুন না, যেভাবে বলতে চান উনি। বরং এত সব কচকচি আর বোরডমের মধ্যে কিছুটা রিলিফ। চমৎকার কথা বলেন উনি।

উৎপল : চমৎকার কথা নয়। সত্যি কথা।

মধুসূদন : থ্যাঙ্কস্। সত্যি কথাই প্রত্যাশা আমাদের। যা আমরা অনেকেই বলছি না এখানে। আচ্ছা, মিঃ দাশগুপ্ত, আপনারা ভাড়াবাড়িতে থাকেন? না নিজেদের বাড়ি?

উৎপল : ভাড়াবাড়ি তো বটেই। ভাঙা আর পুরনো। কিন্তু টিভি আছে টেলিফোন আছে ফ্রিজ আছে স্টিরিও আছে গ্যাস-ওভেন...'

মধুসূদন : এসব কী করে হলো? আপনি কিনেছেন?

উৎপল : না। দাদা।

মধুসূদন : আপনার দাদা কী করেন?

উৎপল : এন. জে. ই. ডব্লু-র ইঞ্জিনিয়ার।

মধুসূদন : কী হলো! আপনার প্রেশাস ব্র্যাকেটস্?

উৎপল : আমার জেনারেশনের মানুষ। লেস সেইড ইজ বেটার।

মধুসূদন : নিজের জেনারেশনের ওপর এত অবিশ্বাস? স্ট্রেঞ্জ!

উৎপল : প্রডাক্ট অব দ্য ওল্ড অর্ডার। পুরনো ফাইলপত্রে গোলমালগুলো হয়তো আগেই ছিল। ধুলো ঝাড়তে গিয়ে ফেঁসে যাচ্ছি। বোঝা যাচ্ছে না, দোষটা কোথায়? কাদের?

সূর্যনারায়ণ : মিঃ প্রেজেন্টিং অফিসার, আই মাস্ট ডিস্টার্ব ইউ। সবটাই ঠাট্টা-তামাশায় নিয়ে যাবেন না, প্লিজ। অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে।

মধুসূদন : আমার কোনো প্রশ্নই অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাছাড়া আমরা প্রায় আমাদের নিজেদের জায়গায় পৌঁছে গেছি।

সূর্যনারায়ণ : অলরাইট, এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ যদি দরকার হয় পরে আবার তুলতে পারবেন। আপাতত কাজের কথায় আসুন।

সভাস্থলে গুঞ্জন ধ্বনিত হলো। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়ে কোনো উষ্মা বা বিরক্তি নয়, বয়স্ক-কৌতুকের শোভন অভিব্যক্তি—সংযত স্মিত ওষ্ঠ। প্রেজেন্টিং অফিসার মধুসূদন সরকার হাসতে হাসতে প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করেছেন। কপালের ঘাম মুছে নিতে নিতে—'মিঃ দাশগুপ্ত, তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি আমাদেরই মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একজন মানুষ

হ্যাভিং এ রোমান্টিক ডিসকন্টেন্ট অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড...

উৎপল : মিঃ পি. ও., আপনি একজন সাসপেন্ডেড অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন। তার অ্যাঙ্গার বা অ্যাগনি সবই রোমান্টিক আপনাদের কাছে।

মধুসূদন : স্যরি, আমি ঠিক তা বোঝাতে চাই নি। আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত, আমাদের ব্যাঙ্কে আপনি কবে এসেছেন?

উৎপল : ফার্স্ট মার্চ নাইন্‌টিন সেভেনটি নাইন। সকাল সাড়ে নটায়।

মধুসূদন : এর আগে কী করেছেন?

উৎপল : যা আপনারা করান। স্টাফ-ট্রেনিং কলেজে মাস দেড়েক। তারপর, কলকাতারই তিনটি ব্রাঞ্চে ইন-ব্র্যাঞ্চ-ট্রেনিং বছর দেড়েক...

মধুসূদন : অর্থাৎ আমাদের শিয়ালদা ব্র্যাঞ্চেই আপনার ফার্স্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

উৎপল : হ্যাঁ।

মধুসূদন : আপনি সেখানে কী দায়িত্বে ছিলেন?

উৎপল : বিল সেকশন ইনচার্জ।

মধুসূদন : বিল পার্চেজের সাধারণ পদ্ধতিটা জানতে পারি কি? বোথ ইন ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস...

উৎপল : কোনো পার্টি তাঁর ব্যবসার মালপত্র বাইরে কোথাও পাঠিয়ে বিল আর. আর. অ্যান্ড আদার ডকুমেন্টস সব আমাদের কাছে জমা দিয়ে যাবেন। আমরা রিসিভিং পার্টির কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায় করে নিই।

মধুসূদন : আদায়ের পদ্ধতি?

উৎপল : ব্যাঙ্ক মারফতই সেটা হবে। যেখানে আমাদের নিজেদের ব্র্যাঞ্চ নেই সেখানে অন্য ব্যাঙ্কের মারফত...

মধুসূদন : এর বাইরে অন্য কোনো রকম প্রসিডিওর কি বৈধ?

উৎপল : কী ধরনের প্রসিডিওর-এর কথা বলছেন?

মধুসূদন : নর্মাল কোর্স যা বললেন, তার থেকে এনি ডিভিয়েশন? এই ধরুন, এখানে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে! ও. ডি. পেমেন্ট হয়ে গেছে! অথচ বিলের টাকাটা আদায় হয়নি। এ-অবস্থায় র‍্যাপিড পেমেন্টের জন্যে পার্টিকে তার কাগজপত্র ফিরিয়ে দেওয়া...

উৎপল : অন্যায়। ঘোরতর অপরাধ!

মধুসূদন : হ্যান্ডওভারিং-এর ডক্যুমেন্ট হিসেবে যদি পার্টির কাছ থেকে কিছু লিখিয়ে রাখা হয়?

উৎপল : তাহলেও অন্যায়। সবটাই বেআইনী।

মধুসূদন : মিঃ এনকোয়্যারিং অথরিটি, হি ইজ অ্যাবসোলুটলি কারেক্ট। ভেরি মাচ জাস্টিফায়েড। আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত, আপনাদের ব্র্যাঞ্চে এ-রকম কতজন বিল-পার্চেজের পার্টি আছেন? রাফলি?

উৎপল : জনা দশেক।

মধুসূদন : সকলের ক্ষেত্রেই কি নর্মাল প্রসিডিওর চালু?

উৎপল : অবশ্যই না। খাস্তগীর অ্যান্ড সন্স মাঝে মাঝেই এ-ধরনের কিছু ইল্‌লিগাল অ্যাডভান্টেজ নিয়েছেন।

মধুসূদন : মিঃ খাস্তগীর যে এভাবে সুযোগ নিচ্ছেন, আপনি কিন্তু জানতেন, সবই অন্যায়।

উৎপল : আমি জয়েন করার আগেই ভদ্রলোক অন্যায়গুলো ব্র্যাঞ্চে কনভেনশন বানিয়ে ফেলেছিলেন।

মধুসূদন : কিন্তু একজন রেসপনসিবল অফিসার হিসেবে আপনার একটা দায়িত্ব ছিল।

উৎপল : আমি প্রতিবাদ করেছিলাম।

মধুসূদন : তার প্রতিক্রিয়া?

উৎপল : বি. এম. বলতেন—আর. এম. ও. থেকে অনুমোদন আছে। বাইরের ভি. আই. পি. প্রেশার আছে। মিঃ খাস্তগীর ভেরি ইন্‌ফ্লুয়েন্‌সিয়াল পার্সন। শিবঠাকুরকে চটালে দক্ষযজ্ঞ। দিজ ওয়েয়ার অল একস্ট্রা কন্‌স্টিটিউশনাল আর্গুমেন্টস। তাছাড়া মিঃ খাস্তগীরও এসব ব্যাপারে বেইমানী করেন নি কখনও।

মধুসূদন : তারপরই আপনি কাজটা করলেন?

উৎপল : আমি কখনোই করিনি।

মধুসূদন : সে-কী করে সম্ভব? আপনি কন্‌সার্নড অফিসার। কাগজপত্রগুলো আপনি ছাড়া আর কে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারেন?

উৎপল : এখানেই এর আগে অনেকবার বলা হয়েছে, তখনকার বি. এম. আগে থেকেই রেডি ফাইলটা নিজের কাছে নিয়ে রেখেছিলেন।

মধুসূদন : প্রমাণ করতে পারবেন?

উৎপল : ব্র্যাঞ্চের অফিসার বা কর্মীরা যদি নির্ভয়ে সত্যি কথা বলেন।

মধুসূদন : এটা কি কোনো কথা হলো মিঃ দাশগুপ্ত? আপনার নিজস্ব দায়িত্বের ভার আপনি আরেকজনের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। অথচ কংক্রিট কোনো প্রুফ দিতে পারছেন না। একজন সাক্ষীও হাজির করতে পারছেন না নিজের ডিফেন্সে।

নির্মল : মিঃ ইন্‌ভেস্টিগেটিং অথরিটি, সব কিছুরই তথ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারা হয়তো যায় না। সেহেতু এ-জাতীয় বিচারের ক্ষেত্রে সারকামস্টেন্‌শিয়াল এভিডেন্সও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেদিন মিঃ তালুকদারের সাক্ষ্য থেকে, তার পরেও মিঃ খাস্তগীরকে প্রশ্ন করে এখানে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি, ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা ব্যাঙ্কের স্বার্থে খুবই সন্দেহজনক। রিটায়ারমেন্টের পর মিঃ তালুকদার দমদমে একটি বিশাল বাড়ি করেছেন। আমাদের ব্যাঙ্কে তাঁর অ্যাকাউন্টটা খুব ছোট। তাঁর আর কোথায় কী আছে আমরা জানি না। কিন্তু অন্য ব্যাঙ্কে তাঁর স্ত্রীর নামে যে দুটি ফিক্সড-ডিপোজিট রয়েছে সেটা দৃষ্টিকটু ভাবেই বিশাল। এ-ছাড়াও প্রাইভেট ইন্‌ভেস্টমেন্ট ইউনিট বা কয়েকটি কোম্পানিতে টাকার লগ্নী। পুলিশ রিপোর্টও সন্দেহ করছে, সব মিলিয়ে টাকার অঙ্কটা তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন থেকে উপার্জিত অর্থের তুলনায় অত্যন্ত ভারি। সম্প্রতি তাঁর এক ছেলে নতুন লরি কিনে যে-ট্র্যান্সপোর্ট বিজনেস শুরু করেছেন, মিঃ খাস্তগীরের নতুন

ব্যবসার সঙ্গেও তার আশ্চর্য মিল! ঘটনা দুটি নেহাৎ-ই এমন কোনো কাকতালীয় নয় যে...

মধুসূদন : মাননীয় এন্‌কোয়্যারিং অথরিটি, আমার কাছে কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না। ডিফেন্সের বক্তব্য থেকে কি এমন কিছু প্রমাণিত হয় যে, মিঃ খাস্তগীরের হাতে বেআইনীভাবে ডকুমেন্ট তুলে দেবার দায়িত্বটা মিঃ তালুকদারের! মিঃ দাশগুপ্তের নয়।

নির্মল : এটাও কি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মিঃ দাশগুপ্তই কাজটা করেছেন? একজন বি. এম. হিসেবে মিঃ তালুকদার কি ফাইলটা চেয়ে নিতে পারেন না? নিউলি অ্যাপয়েন্টেড একজন জুনিয়ার অফিসার কোন্ সাহসে তাঁকে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করবেন? তাহলে তো কোনো কাজকর্মই চলতে পারে না কোথাও। অথচ সংশ্লিষ্ট অফিসারকে দিয়ে ফাইলটা রেডি করিয়ে নিয়ে তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেআইনী কাজটি করেছেন, এমন ধারণা করাটা কি খুবই অবাস্তব?

মধুসূদন : বেশ। ডিফেন্সের যুক্তি মেনে নিলাম। লিস্ট অব ডকুমেন্টস-এ শিয়ালদা ব্র্যাঞ্চের বিল-পার্চেজ রেজিস্টার এবং লেজার দুটোই আছে। আমি মিঃ নিয়োগীকে অনুরোধ করছি, তিনি বলুন—মিঃ খাস্তগীরের হাতে ডকুমেন্ট তুলে দেওয়া হয়েছিল কবে? তারিখটা কত?

প্রস্তুতই ছিলেন সত্যব্রত নিয়োগী। ঝাঁ করে তুলে নিলেন বিশাল ভারি লেজারটা। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় কাগজের টুকরোর পেজমার্ক পর্যন্ত নিখুঁত। খুলে ফেললেন—টুয়েন্টি থার্ড নভেম্বর, নাইনটিন এইটি ওয়ান।

মধুসূদন : আমি জানতে চাই, মিঃ দাশগুপ্ত সেদিন অফিসে এসেছিলেন কিনা।

একইভাবে উনিশ শো একাশির অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার টেবিলে পেশ করলেন সত্যব্রত নিয়োগী। ফাঁকি নেই। নিশ্চিত প্রমাণ—এসেছিলেন। স্বাক্ষর এখনও উজ্জ্বল।

মধুসূদন : মাননীয় এন্‌কোয়্যারিং অথরিটি, তাহলে এটা বিশ্বাস করা যায় কি করে যে, মিঃ খাস্তগীরকে যেদিন ডকুমেন্টগুলো দেওয়া হলো, মিঃ দাশগুপ্ত অফিসে উপস্থিত থেকেও এ-বিষয়ে কিছুই জানলেন না!

নির্মল : কী আশ্চর্য! একজন ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার তাঁর ঘরে বসে কার সঙ্গে কখন কী কথা বলছেন, কী করছেন, একজন অফিসারের কাজ কী সেখানে ওত পেতে থাকা? সেটা কি সম্ভব?

মধুসূদন : খুবই সঙ্গত কথা। সম্ভব নয়। মিঃ তালুকদারের মতো একজন ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার, যাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে পুলিশ সন্দেহ প্রকাশ করছে, ডিফেন্স সরাসরি যাকে অসাধু বলে অভিযুক্ত করছেন, বিভিন্ন সাক্ষ্যে ব্র্যাঞ্চের বিভিন্ন অফিসার এবং কর্মীরা যাঁর সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নেবেন আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, কদিন বাদেই এ-রকম একজন বি. এম. রিটায়ার করছেন জেনেও এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোনো অফিসারের পক্ষে নিশ্চেষ্ট বসে থাকা কি আদৌ সম্ভব? মিঃ দাশগুপ্ত কি তাঁর এই ভুলের দায়িত্ব এড়াতে পারেন?

দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে ঠিক যে-জায়গায় আটকে যাবার কথা, সেখানেই স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে

বসে পড়লেন নির্মল ভদ্র। টেবিলে স্থাপিত দুহাতের কনুই, পিলসুজের মতো দুটো হাত উর্ধ্বে উঠে গিয়ে আড়াআড়ি-জোড় দুটো হাতের তেলোয় থুতনি। জীবনবীমার প্রতীক নয়, হাড়িকাঠে গলা। অবধারিত পরাভব যদিও, তবু উঠে দাঁড়াতে হলো। বেদনা নয়, ক্রোধকে সংহত রাখার যন্ত্রণায় শান্ত অবসন্ন গলার স্বর—'মিঃ এনকোয়্যারিং অথরিটি, দিস টাইপ অব ইন্টার্নাল অ্যান্ড ডোমেস্টিক ইন্‌ভেস্টিগেশন শুড নট বি গাইডেড বাই দ্য সফেস্টিকেটেড রুলস অব জাস্টিস। প্রথম দিন মিঃ প্রেজেন্টিং অফিসারের এই মূল্যবান উক্তিটি আমি আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আমাদের আলোচনায় ঘটনার মানবিক দিকটাই আরো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। ভেবে দেখুন, মাত্র বছর দেড়েকের চাকরিতে সাতাশ-আটাশ বছরের একজন ইয়ং অফিসারের যে-কাজটা বিরাট একটা ভুল বলে নির্দিষ্ট হচ্ছে, সেটা কি সত্যি কোনো ভ্রান্তি? যদি ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজারের মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা তিনি প্রতারিত হন? একজন বি. এম...হাইয়েস্ট অথরিটি অব দ্য ব্র্যাঞ্চ...'

রীতিমত বিরক্ত সূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠী। দীর্ঘ ললাটে ভাঁজ—'মিঃ ডিফেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ, এটাই বা কী ধরনের যুক্তি আপনার? কারুর প্রতিই আমাদের কোনো ক্রোধ বা বিদ্বেষ নেই। আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাই—যা সত্য, যা ঘটনা। কোনো রকম তথ্যনিষ্ঠ প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র মুখের কথায় একজনকে বিশ্বাস করব? অন্যজনকে করব না? ইজ দ্যাট ফেয়ার? উই নিড টু বি গাইডেড বাই কারেক্ট রিজনিং, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড...'

বসে পড়েছেন নির্মল ভদ্র। কপালে রুমাল ঘষছেন। হাই-ভাঙার মানসিকতায় সকলেই যখন হালকা হয়ে জলের গ্লাস টেনে নিয়ে অথবা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে চেয়ারে বিচ্ছিন্ন সংলাপে মনোযোগী, ক্যান্টিনের লোকটা ঢুকল ট্রে-হাতে। সকলের জন্য চা স্ন্যাকস্।

এবং উৎপল, শবযাত্রা পৌঁছে যাবার পর একমাত্র জড়দেহেরই যেমন কোনো দহনের ভীতি নেই, অবিচল স্থৈর্যে সে পেস্ট্রিতে কামড় দিলো অতিরিক্ত লোভীর মতো, বিচ্ছিরি ধরনের হাঁ তুলে। চায়ের কাপের চুমুকে অকারণ শিশধ্বনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। অনেকটা ওয়াক-আউটের প্রতিবাদী ভঙ্গি।

অপরাপর চোখগুলি তার দিকে নিবদ্ধ ছিল এবং তার নাটকীয় প্রস্থান-মুহূর্তে মধুসূদন সরকার, হঠাৎ বিচলিতবোধে অর্ধভুক্ত প্লেট এবং চায়ের কাপ ফেলে রেখে তড়িৎ ক্ষিপ্রতায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন—'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই, চাকরি তো যাচ্ছে না আপনার।'

প্রতীক বর্মন নির্মল ভদ্রও বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। উৎপল নিরুত্তাপ।

নিজের উৎসাহেই প্রাণিত মধুসূদন সরকার—'একটা জিৎ তো হয়েই গেছে আপনার। এতবড় পুকুরচুরিতে আপনি যে কোনো রকম ভাবে কিছুতেই ইন্‌ভলভড নন, নির্মলবাবু সেটা বেশ ভালোভাবে, বেশ জোরদার করে এস্টাব্লিশ করে দিয়েছেন।'

'কিন্তু শেষরক্ষাটা হলো না...' নির্মল ভদ্র কুণ্ঠিত বেদনায়—'একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে মধুসূদনদা এমন একটা ধাক্কা মারলেন। পুটিংটাও ব্রিলিয়ান্ট। কিছুই করার ছিল না আমার।'

ওঁদের ইচ্ছায় অথবা চাপে আবার ফিরতে হলো। আরো কিছু আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম বাকি ছিল তখনও। এক পাশে সূর্যনারায়ণ ত্রিপাঠীর সঙ্গে দীর্ঘ নিভৃত কথাবার্তা বললেন নির্মল ভদ্র

এবং এক সময়, বেলাশেষে নিচে নেমে এসে মধুসূদন সরকারই ট্যাকসিটা ডাকলেন। শিয়ালদা থেকে চৌরঙ্গি। দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তোরাঁর মসলাদোসা আর কফির ধোঁয়া।

পুজো এসে গেল। পল্লিতে পল্লিতে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের বিজ্ঞাপনে রাস্তা জুড়ে লাল-সাদা ফেস্টুন দুলছে বাতাসে। কলকাতায় বাতাস এখন বড্ড জরুরি। বোনাস আর পুজো অ্যাডভান্সের খোলামকুচি উড়ছে হাওয়ায়। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য—দেদার খরচে ঘর্মাক্ত গৃহিণীরা।

কাগজে-কলমে শরৎ হলেও, আশ্বিন-শুরুর বৃষ্টিতে তিন দিন ধরে ভিজছে কলকাতা। থৈথৈ জল অলিতে-গলিতে রাস্তায়। শ্রেণীবদ্ধ প্রাসাদপুঞ্জকে অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে অরণ্যের বৃক্ষশ্রেণী। কিংবা ট্রামে-বাসে পায়ে-চলায় অগণিত মানবসকল সুনির্মল পুষ্করিণীর জলে সঞ্চরমান দলবদ্ধ হংসযূথ—সারাক্ষণ সাঁতার কেটেও দেহ সিক্ত নয় যাদের। ডাঙায় উঠে গা-ঝাড়া দিলেই জল কাদা সব সাফ। হঠাৎ-ই প্রত্যয়—সে নিজেও শহরের অভিজাত হংসশ্রেণীরই একজন। ঊর্ধ্বগ্রীব রাজহংসই হয়তো-বা। গুগলি খুঁজে বাঁচলেও অপরাপর সুধীজনদের ভোজে বা উপভোগে ফুটফুটে সাদা ডিম পেড়ে যেতে হবে জেনে নিজের শুভ্রতা বাঁচিয়ে রাখার দায়।

এবং জন্মলব্ধ সাদা পালকের সম্ভ্রম রক্ষায় দশটা-পাঁচটার একটি সন্তরণক্ষেত্র যেহেতু অপরিহার্য জীবনে, সংবাদপত্রপাঠে বিশ্বপরিক্রমা বাতিল হলো। ডাকখরচ বাড়ল। সিচুয়েশন ভেকেন্ট দেখে নানা জায়গায় আবেদন—আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্ত শ্রমবিক্রয়ে ইচ্ছুক। সুদূরতম কোনো গ্রামফ্রাম, গুজরাট কেরালা হরিয়ানা বা অরুণাচল, এমন কি, পোর্টব্লেয়ারেও আপত্তি নেই। বরং বাঞ্ছনীয়। শিপ্রাকে সে রাজি করাবে। কিন্তু প্রার্থী হিসেবে এক জায়গায় সে বড়ই পঙ্গু। পরীক্ষার রেজাল্টফেজাল্ট মোটামুটি ভদ্রগোছের এক রকম। অভিজ্ঞতার কলমটা ফাঁকা। লেখা তো যায় না—ব্যাঙ্কের সাসপেন্ডেড অফিসার। প্রশ্ন উঠতেই পারে—আটাশ বছর বয়স হলো। বিদ্যেবুদ্ধির তকমা এঁটে পাঁচ ছ-টা বছর কী করছিলে বাছা?

বরং গত আট-ন মাসের উপার্জন-ভাবনায় জ্ঞানলাভ হলো বিস্তর।

ক্যাটারিংয়ের ব্যবসাটা আজকাল চলছে খুব। রাস্তায় ফুটপাথে স্ন্যাকট্রলি সাজিয়ে সন্ধেবেলা মটনরোল এগরোলের পসার জমাচ্ছে সুবেশ হংসশাবকরাই। প্লাস্টিক কি রবারের-চটি তৈরির কারখানাও নাকি ভদ্রলোকদেরই কারবার ইদানীং। সুভাষ ওর স্টিভেডারদাদুর কথা বলছিল। খিদিরপুরে কোটিপতি। ওরকম দু-চারটে আদাব ব্যাপারিকে সত্যি সত্যি জাহাজ চিনিয়ে দেবার যথেষ্ট মুরদ রাখেন। ওসবে যদি ইজ্জত যায় তো আরো আছে। প্রেস্টিজের লাইন। রবীন্দ্রসদন কি কলামন্দির ভাড়া নিয়ে অমুক-নাইট কি তমুক-ফেস্টিভাল লাগিয়ে দেওয়া যায় মাঝেমধ্যে। হাজার দশ-পনের নিজে ঢেলে বড়সড় বিজনেস-হাউস পাকড়াও কাউকে। টাকার মার নেই। প্রফিট, তৎসহ নামযশ। আরো এক কালচারাল

কারবার—ইনটেরিয়ার ডেকোরেশন। মেলাফেলা তো লেগেই থাকে সারা বছর। তার ওপর যে-হারে দোকানপাটের রোশনাই বাড়ছে চারদিকে, বেশ কদর বাড়ছে এ-লাইনে। এ-ছাড়াও হাজারগণ্ডা ফেরেববাজি দালালি অর্ডারসাপ্লাই লেবর-কন্ট্রাক্ট। অন্যায় অবৈধ নয় কিছুই। সবই চলে। তলিয়ে যেতে না চাও, আছে। অতি সহজ সরল লাইনে নিজেকে একটু বাজিয়ে দেখতে প্যারো—বিজ্ঞাপনের কপিরাইটিং থেকে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চরকিবাজি। যা জোটে।

কিছুই জোটে না। অত সহজ নয় জোটানো।

সন্ধেবেলা, খোকাদার চায়ের দোকানে একাই ছিল উৎপল। রতন কাহালী এসে বসলেন পাশে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মানুষ। গাল ভরে কালো কুচকুচে দাড়ি। ভরাট চুল। কাছাকাছিই থাকেন কোথাও। কাজকম্মো কী করেন কিছুই জানা নেই। খোকাদার স্থায়ী খদ্দের। বড়ই রসিক বলে নিজস্ব অহংকার আছে একটা। বলছিলেন—'কোনো মাতুল ছাড়াই পাণ্ডবরা মাত্তর পাঁচ ভাই মিলে কুরুক্ষেত্তরটা জিতে নিয়েছিল? ঢপ দেবার আর জায়গা পাওনি শালা! বললে বিশ্বাস করবে কেউ? নাটবল্টুর মগজওলা অমন আস্ত একটা শকুনিকে দলে নিয়েও মাঠের মধ্যে পড়ে পড়ে লাট খেল দুর্যোধনরা একশো ভাই! ধ্যাৎ, যত্তো বানানো গপ্পো শালাদের...'

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, উৎপল, হাসতে হাসতে—'পাণ্ডবদের দিকে যে কেষ্ট ঠাকুর—স্বয়ং ভগবান! ওরকম কেষ্টবিষ্টু কেউ একজন যদি সঙ্গে থাকেন...'

'কেষ্টবিষ্টু! অ্যাঁ, এইটে একটা কতার মতো কতা বলেছ ঠিক...' রতন কাহালী উচ্ছ্বসিত—'মহাভারতের কেষ্টবিষ্টু স্বাধীন ভারতেও চাই কাউকে। বলি, তাই কিনা? এ-একটা জব্বর কতা...'

ইত্যাদি প্রলাপকথন নিতান্তই সান্ধ্য-অবসর। এবং মাতুল সন্ধানে, হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে ভাঙাচোরা জনকয়েক কেরানি ভদ্রলোকের কথা মনে পড়তেই যখন বেচারিদের ভাবনায় উৎপল নিজেই পীড়িত, দীর্ঘকাল বাদে কোত্থেকে হঠাৎ শৈলেন এসে হাজির। ভাস্কর আর অঞ্জনই পাকড়ে নিয়ে এসেছে ওকে। সঙ্গে অন্যান্য বন্ধুরা।

শৈলেন। শৈলেন বিশ্বাস মানে ধুমধাড়াক্কা ঝড়। বিস্তর টাকা আর বেজায় ফুর্তি। এত বছর বাদেও সেই একই রকম। হৈ হৈ মেজাজ। মজবুত শরীর। বোধ হয় এখনও ব্যায়াম করে। আঙুলে আঙুলে গ্রহরত্ন। প্যান্টশার্টজুতোয় জেল্লা নেই তেমন। খুব দামী না হলেও মোটামুটি ভালো সিগারেট।

'মরে গিছ্লি কী বে! তুই...তুই শালা মরে গিছ্লি? অ্যাঁ!'

এমন কি, উৎপলকেও হেসে ফেলতে হয়—'হুট্ করে কোত্থেকে এলি তুই? নে বোস্, চা খা...'

'চা খাব কী বে! দাঁড়া দাঁড়া, দেখি তোকে...' উৎপল যেন উৎপল নয়। যথার্থই মৃত বন্ধুর ফোটো। ঘোর কাটে না শৈলেনের—'এমন একটা কাণ্ড করে বসেছিলি তুই? অ্যাঁ! অ্যাদ্দিন হলো, আমি কিছু জানতামই না মাইরি। ভাগ্যিস ভাস্কর অঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ...'

স্কুলে একই সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত শৈলেন। টগবগে নির্মেদ শরীরে দুর্ধর্ষ ফুটবল প্লেয়ার, -ওড়ানোয় পয়লা নম্বর আর্টিস্ট। হায়ার সেকেণ্ডারির পর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সেই যে

বাপের টিমটিমে ব্যবসায় ঢুকে পড়ল, আস্তে আস্তে আড্ডায় আসা প্রায় বন্ধ। শৈলেনই বন্ধুদের মধ্যে সকলের আগে সাবালক। বছর দেড় দুই আগে ওর বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল বন্ধুদের। বিয়ের আগেই শ্যামপুকুরের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজেদের বিশাল বাড়ি বানিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বনহুগলী। দেখাসাক্ষাৎ তারপর থেকেই কদাচিৎ। শোনা যাচ্ছিল, মাত্র কটা বছরেই নাকি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মস্ত বানিয়ে ফেলেছে পৈতৃক ব্যবসা। গাড়ি কিনেছে। মাঝেমধ্যে এলে খানাপিনায় হৈহুল্লোড়ে মাতিয়ে যায় বন্ধুদের। দেদার টাকা। আজ হঠাৎ এসেই আসর জাঁকাবার কর্তালি—'কী হয়েছিল? প্রব্লেমটা কী তোর? চাকরি? গুলি মার শালা চাকরিতে! ও-চাকররা করে।'

চারপাশ কাঁপিয়ে কথা বলা শৈলেনের স্বভাবের ধাঁচ। উৎপল বিব্রত হলো।

'তুই চ'...চল আমার সঙ্গে। কালই চল্।'

'কোথায়?'

'নরকে শালা...' দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণে অসম্ভব জোর ছিল শৈলেনের। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে একবার—'একটা ফোরটুয়েন্টি চিটিংবাজ হিড়িক মারল তো শালা বিষ গিলবি তুই? অ্যাঁ। আমি শ্‌শলা ভাবতেই পারছি না। তুই চ' আমার সঙ্গে। আমি যে-ব্যবসা করি, সেখানে লাইন ধরিয়ে দেব। অ্যাদ্দিন চাকরি করছিস, বেশি নয়, হাজার দশেক ছাড়তে পারবি তো ইনিশিয়ালি?'

উৎপল নিরুত্তর। হাতে লেবু-চা ফুরোয়।

'ব্যস, বাকিটা আমার...' শৈলেনের হাতে চাবির রিংটা নাচে। পরিত্রাতার কণ্ঠস্বর—'হাই কমপিটিশনের মার্কেটে এ-কেউ করবে না চাঁদ। আশি হাজার টাকা কী বে। ও-একটা টাকা হলো? তোর ওই ব্যাঙ্কের মতো দু-চারটে ব্যাঙ্ক তোর পকেটে থাকবে দু-পাঁচ বছর বাদে। তোর তো সুবিধে আছে রে অনেক। এম. এ. পাশ। ইংরেজি জানিস। তোর মতো হলে আমি ক্যান্টার করে দিতাম শালা। গ্লোবাল টেন্ডারে খেলতাম।'

বন্ধুরা হেসে উঠল। নিস্পৃহ উৎপল। বড় বেশি কলরব তাকে ঘিরে। সে-কি এখনও হাসপাতালে?

পেয়ারের বা প্রেস্টিজের খদ্দের বলেই হয়তো প্রতিদিন সন্ধেবেলা দুটিমাত্র বেঞ্চির ওপর ঈদৃশ যুবকদের মৌরসিপাট্টা অনেকদিনের। কিন্তু আজ তারা নিজেরাই শৈলেনকে নিয়ে সরে এল তফাতে। উল্টো দিকের বন্ধ দোকানের রকে। নির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে শৈলেন। বন্ধুরা উদ্দীপিত।

শৈলেন ঝপ করে বসে পড়ল উৎপলের পাশে—'তবে হ্যাঁ, তোদের মতো ভদ্দরলোকের ছেলেরা সেখানে টিকতে পারলে হয়। বড্ড খচরা লাইন শালা। টিকরমবাজি চিটিংবাজি চুরি জোচ্চুরি, বড় বড় অর্ডার বাগাবার জন্যে আরো বড় বড় সব ছিপ-বঁড়শি...'

'তোকে তো রোজই ঘুষ দিতে হয়। আজ খাইয়েছিস কাউকে? কাকে? কত?' উৎপল হঠাৎ কথা বলল।

'ঘুষ!' শিশুর মূঢ়তায় শৈলেন হাসল তাচ্ছিল্যে। 'ঘুষ' শব্দের উচ্চারণে মধ্যবর্তী স্বরবর্ণে

প্লুতস্বর—'ঘুষ কি বলছিস? তোর মতো দু-চারটে পাতি অফিসারকে যারা বিষ গেলাতে পারে, তারা ঘুষ ঘুষি সব খাওয়ায় শালা। সবই এই এক হাতের দাওয়াই...'

শৈলেন যখন উদ্দাম উচ্ছ্বাসে গ্লাভস ছাড়াই ওর হাতের গাবদা কব্জি বাড়িয়ে একা হাসছে, বন্ধুরা সতর্ক হলো। তাকাল উৎপলের দিকে। এবার নিশ্চিতভাবেই একটা ধাতানি খাবে শৈলেন। অনেক দিন দেখেনি উৎপলকে।

বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে উৎপল। তার চুপচাপ উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি, মুখ চোখের কুঞ্চন চিহ্নিত করে—নিশ্চিত ভাবেই সে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তের দিকে—'ঠিক আছে। আমি আছি তোর সঙ্গে। আমাকে কী করতে হবে?'

'কিছুই করতে হবে না! কোম্পানির একটা নাম ঠিক করে প্যাড চালান বিল ভাউচার ছাপা আর গোটাকয়েক রবার স্ট্যাম্প। কর্পোরেশনের একটা ট্রেড লাইসেন্স...'

'ব্যস, এই?'

'এই নয় চাঁদ। খাটতে হবে। আমাশা ছুটিয়ে দেবে পাছায়!'

'খাটতে তো হবেই। টাকা কি এমনি-এমনি আসে নাকি?' উৎপল কিছুটা প্রসন্ন মৃদুতায়—'খাটলে টাকাকড়ি বাড়িগাড়ি বৌবাচ্চা সব হবে তো তোর মতো? গ্যারেন্টেড। অলরাইট আমি রাজি। ঘুষ থেকে মাগীবাজি সব লাইন তুই চেনাবি ঠিকমতো?'

সন্দিগ্ধ শৈলেন। ডান চোখ কুঁচকে আসে—'ঠাট্টা করছিস?'

'আরে, ঠাট্টা কেন...' হাসছে উৎপল—'এই যে শুনি, সবই নাকি হয়।'

'ফোট্ শালা, ফোট্...' শৈলেন তার ঋজুতায়। ঘুরে দাঁড়াল—'অঞ্জনের কাছে খবরটা শুনে খারাপ লেগেছিল, তাই এসেছিলাম। বেশি পাঁয়তারা কষবি তো য্যা শালা, আমার বয়ে গেছে।'

আলোয় আলোয়, বিবিধ মানুষের সমাগমে সোরগোলে খোকাদার জমজমাট চায়ের দোকানে হাসিঠাট্টা সান্ধ্য হল্লা। উৎসবের ঢং-এ ক্যাসেটে ঝমঝমাঝম গানের চিৎকার। কেউ শুনছে না। কারুর শোনার জন্যও নয়। কান বধির হয়ে এলে এতাদৃশ চিৎকারই বড় প্রয়োজন মানুষের। আসলে বান্ধবমিলনে আড্ডারও কোনো ভাষা নেই আজকাল। শব্দ বা বাক্য দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সভ্যতায়।

এবং শৈলেন, বিত্তমহিমার উঁচু মাথায় পেছনে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করে না খুব বেশি। আঁতেল বন্ধুদের এসব কথাবার্তায় তার মেজাজও থাকে না বেশিক্ষণ। হৈচৈ বাধিয়ে হুজুগ তুলে বন্ধুদের নিয়ে সে গাড়িতে পুরল। অ্যাদ্দিন বাদে এসেছে যখন, আজই বা বাদ যাবে কেন? খাওয়াবে। খোকাদার দোকনের হেঁজিপেঁজি রোল-টিকিয়া নয়। রিয়েল খানাপিনা—সাহেবি বা মোগলাই বা চাইনিজ এবং তৎসহ...

কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না উৎপলের। বন্ধুরাই টানল। একরকম জোর করেই তাকে গাড়িতে তোলা হলো।

অতঃপর বাঘের থাবার মতো শক্ত কব্জিতে স্টিয়ারিং। পার্কস্ট্রিট বা চৌরঙ্গির দিকে যাত্রাপথে শৈলেন বিষয়টা বিশদ করল আরো। ব্রেক অ্যাকসিলেরেটরে পা, সামনের কাচে একাগ্র চোখ—বাপের আমলের পুরনো ব্যবসা। জাল ছড়াতে ছড়াতে এখন ব্যাপ্ত বহুদূর। বুকে পেস-

মেকার এঁটে বুড়ো বাপ বসে আছেন বাড়িতে। তিনভাই গলদঘর্ম। বস্তুত কার্বন সাপ্লাই-ই ওদের বড় কারবার। বাড়ির কাছে বরানগরে একটা ফ্যাক্টরিও করেছে ইদানীং। নানা দিক থেকে বাণিজ্যের বিস্তার। তবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসেবে সবকিছুর ওপর দেখ্ভাল তদারকির মূল মগজটা শৈলেনেরই। অঘোষিত ম্যানেজিং ডায়রেক্টর। রেলের সাপ্লাইটাই সবচেয়ে বড়। এ-ছাড়াও দুর্গাপুর বার্নপুর কুলটি আসানসোল ছোটবড় নানা জায়গায় লোক ফিট করা আছে। পার্চেজ অফিসার থেকে কোম্পানির ডিরেক্টর বা জি. এম. পর্যন্ত তাবড় তাবড় মান্যজনকে ভক্তিশ্রদ্ধা সেলাম যুগিয়ে যেতে হয়। কাজের চাপ বেড়ে গেলে টু-পার্সেন্টি থ্রি-পার্সেন্টি কি তারও বেশি বিনিময়ে খুচরো অর্ডার কিছু ছেড়ে দিতেই হয় অন্যদের। এরকম একটা জায়গায় সে সরাসরি বসিয়ে দিতে পারে উৎপলকে। তবে বাজার খুব খারাপ। আজেবাজে এত লোক এসে গেছে লাইনে। নতুন কাউকে তো ঢুকতেই দেবে না। মারামারি পেটাপিটি পর্যন্ত চলে। তার ওপর পোলিটিকাল দাদা কর্তাদের চাপ। নতুন ইন্ পেতে হলে এক-একজনকে কম-সে-কম পাঁচ বছর সাত বছর শুধু ঘষাঘষিই চালিয়ে যেতে হবে লাইনে। মস্ত মস্ত সাহেবরা বড় হোটেলে গিয়ে সাঁতার কাটবেন, তাকে টাকার যোগান দিতে হয়। এ-রকমই এক সুইমিং পুলে অনায়াস সন্তরণে সে ডাকছে বন্ধুকে। ভাবনার কিছু নেই। কারখানার সঙ্গে কথা বলে দর দেওয়া নিয়ম। তার নিজেরই কারখানা। ছোটভাই নসুর নামে। লোয়েস্ট কোটেশন কত যাচ্ছে সে-ই খবর এনে দেবে। টেন্ডার বাকসোয় ফেলার দরকার নেই। বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হাতে-হাতে দিয়ে আসবে মোক্ষম জায়গায়...

ভাস্করই বলল হঠাৎ, খুবই আস্তে—'কিন্তু উৎপল নিজেই যে ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিয়ে সিয়োর হতে পারছে না কিছু। ওদের এন্কোয়্যারি-ফেন্কোয়্যারি শেষ। এখন রিপোর্টটা...'

'ধ্যাত্তেরি তোর ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের ইয়ে মারি শালা। চাঁদি, এই চাঁদিই শালা আসল। রুপেয়া মিন্স্ রুপ, মানিই হলো মান...' ডানদিকে দূরাগত ডবলডেকার সত্ত্বেও একটা ট্রামকে ওভারটেক করার ঝুঁকিতে হঠাৎ স্টিয়ারিং ছেড়ে প্রবল আবেগে ডান হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টোকা প্রদর্শনে শৈলেন ভয়াবহ একটা বিপদই ঘটিয়ে ফেলছিল প্রায়। গায়ে-গা-লেপটানো সাত-সাতজন যুবক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে দোল খেয়ে ডুবজলের নাকানিচোবানি থেকে মাথা তুলল যখন, গাড়িটাকে ঝাঁকিয়ে-বাঁকিয়ে নিখুঁত সামাল দিয়ে শৈলেন স্বাভাবিক—'লাইফ ইজ ফর এনজয়মেন্ট। লাইফটাকে উল্টেপাল্টে দে—এফ আই এল ই। ও-শালা কেরানিদের জন্যে। হ্যাংলা শালারা। এক নম্বর হারামি...'

ধর্মতলার মোড়ে আবার...আবার একটা বাসকে পাশ কাটাতে গিয়ে শৈলেন যখন ভেড়াছাগলের মতো বন্ধুদের দলা পাকিয়ে নাচায়, কেরানি বাপের সুসন্তানরা সকলেই নিশ্চুপ। বলার কিছু নেই। স্টিয়ারিং যার হাতে, দুনিয়াটা তার। লাইফ ইজ ফর এন্জয়মেন্ট—শুদ্ধ ইংরেজি বাক্যটা শৈলেনের আশৈশব প্রিয়।

সুতরাং জীবন উপভোগের পানপাত্রে সেদিন অনেক টাকাই খরচ করতে চেয়েছিল শৈলেন। বন্ধুরাই রাজি ছিল না। বরং অবাক হলো—টলোমলো অবস্থায় স্টিয়ারিংয়ে শক্ত থাবা রেখে অনাহত সুহৃদবর্গকে সে পৌছে দিয়ে গেল হাতিবাগানের মোড়ে। রাত প্রায় বারোটায়।

সন্তর্পণে ছিল উৎপল। ডুবজলে নামতে চায় নি অমিত সংযমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা হবার, তাই হলো। আত্মসংযমের অহঙ্কারটুকুও বৃথা। অবতরণের পর রাস্তায় পা ফেলতেই রাজপথ প্রশস্ত নদী। সেখান থেকে শাখানদী, ছোট গলির ভেতর ঢুকতেই দুদিকের ডাঙায় ঘরবাড়ির জানালায় মধ্যরাতের কালো রং। যদিও হাঁটছে সে, আসলে জলযানে টলছে শরীর। হাঁটুজোড়া বড় বেশি বেসামাল। পায়ের তলায় দুলছে মাটি, মাথার ওপর টলছে আকাশ। এতটা হবার কথা ছিল না। তবু হলো।

আসলে শৈলেন। যে-করেই হোক, পকেট ভরে রেস্ত থাকলে অনেকটা জায়গা জুড়ে এভাবে দাবড়ে বেড়ানো যায় কলকাতার মতো মস্ত শহরে। পৌরাণিক দুষ্মন্ত অথবা মধ্যযুগের মুঘল পাঠান।

'ওপেন সিসেম'-এর দরজা খুলে দিতে চাইছে বন্ধু। শুধু একটা নয়, এ-রকম অসংখ্য গোপন গুহা আছে কলকাতার খাঁজে খাঁজে। লুটে নিতে পারো—মণি-মুক্তো হীরাজহরত, মুঠো মুঠো সোনা। মেম্বারশিপের কড়াকড়ি সত্ত্বেও চল্লিশ চোরের দলে একচল্লিশ করে নিতে পারি তোমাকে। মস্তকে উষ্ণীষ দেব, কটিবন্ধে তলোয়ার। পাবে দুরন্ত ছুট তাগড়াই আরবী ঘোড়া। কাঁপিবে মেদিনী।

বিবমিষা। কী ভীষণ একটা অস্বস্তি শরীরে। নাড়িভুঁড়ির খিঁচুনিতে কণ্ঠনালীটা টেনে নিচ্ছে পেটের ভেতর। তলানি থেকেও কণ্ঠনালীতে উঠে আসতে চাইছে কিছু। অ্যাসিডিটি! বমি! অথবা প্রচণ্ড ক্ষিধে! অনুভূতির অস্পষ্টতায় নিজেরই মতো মধ্যরাতের গলিটাকে বিস্তীর্ণ রহস্য মনে হলো। শক্ত শিরদাঁড়ায় নিজেকে সোজা রাখার প্রাণপণে চেষ্টায় অবাধ্য হাঁটু দুটোকে টেনে হাঁটার পথে নিজেরই ছায়ার সঙ্গে লড়াই। স্ট্রিটলাইটের তলায় ভূলুণ্ঠিত ছায়াটা যখন টলছে, মনে করতেই হয়, সে টলছে না।

রাত বারোটার পরও গলির নির্জনে দু-চারজন বিচ্ছিন্ন মানুষ। দূরে দূরে অথবা পাশ ঘেঁষে। নিশাচর মাত্রেই তার মতো খারাপ লোক নয়। বরং সে ঝাঁটার মতো নিজেরই ছায়া টেনে রাস্তা সাফ করে এগোবার পথে মগজটা চাঙ্গা রাখতে চাইল। এটা তার পাড়া। আজন্ম পরিচয়ের গলি। কোনো কেচ্ছা চলবে না এখানে।

রাতদুপুরের শূন্যতায় একমাত্র কুকুরগুলিই সচল সরব। গোটাতিনেক কুকুর অন্য একটাকে তাড়া করে তার গা ঘেঁষে চলে গেল। কী বীভৎস চিৎকার ওদের!

চমকে উঠল। দূরে কারা? মণি মিস্ত্রি লেনের রাখাল পোদ্দারদের বাড়ির সামনে এত রাতে এতগুলি মানুষ! প্রায় সকলেই যুবক। কী করছে ওরা?

যদিও টলমলানির আবেশটা কেটে যাবার পর আস্তে আস্তে, একটু একটু করে অশরীরী ভরটা নেমে যাচ্ছে দেহরক্ত থেকে, এগোবার পথে চিনতে পারল—সবাই চেনামুখ। প্রতাপ শিবাজী বাসু, হারু সত্য শিবু বিমল—পাড়ারই ছেলেরা। যেহেতু নিজের ওপর নিজেরই আস্থাটা প্রবল নয় খুব, পিঠটানে সোজা হবার চেষ্টা করল সে। না, চিনে নিতে কিছুমাত্র ভুল হচ্ছে না তার—ওদের সঙ্গে বয়স্ক মানুষও দু-চারজন। তিমিরদা, নানু মিত্তির, জগন্নাথ পাইন, বিষ্টু বিশ্বাস। রাজনীতির মাতব্বর। তামাম ওয়ার্ড জুড়ে, এমন কি উত্তর কলকাতার বিশাল চত্বর জুড়ে এরাই নাকি মস্ত নেতা। বহুৎ হাঁকডাক।

ওদেরই পাশ কেটে যেতে হবে তাকে। ঘরে ফেরার একমাত্র রাস্তা। কিছুমাত্র গ্লানি নেই। থোড়াই কেয়ার। নিশ্চিতই জানে—অল্পবিস্তর সকলেই টলছে ওরা। অন্যান্যদের তো বটেই, নিজের ভাইদের সে চেনে। প্রতাপ বীভৎস। কোনো রাতেই বাদ যায় না ওর। বাড়ির সবাই জানে। শাসন তিরস্কার বাতুলতা। সব কিছুর মতো এটাও মেনে নেওয়ার মধ্যে। বুড়োবুড়িরা চুপ। সুতরাং সে যথাযথ এগোয়।

এবং এগোতে এগোতে ঘনিষ্ঠ হবার মুহূর্তে কোনো সুযোগই হলো না ওদের দিকে তাকাবার। কেননা সমবেত চোখগুলি নিবদ্ধ তারই দিকে। স্তব্ধ রাতের শূন্যতায় এভাবে, শাণিত বর্শাফলকেরও অধিক, এতগুলি যুবকের দলবদ্ধ চোখের সমারোহ যে-কোনো নাগরিককেই বিনা অস্ত্রপ্রয়োগে, শুধুমাত্র কার্ডিয়াক ধাক্কায়ই, ফেলে দিতে পারে হয়তো, সে কিছুমাত্র বিচলিত নয়।

আচমকা, একেবারেই অতর্কিতে, মুখোমুখি হামলে পড়ল গণশা—'কী! খুব যে ফিট হয়ে আছ গুরু। মাস্তি করে ফিরছ! ধোঁয়াফোঁয়া ছাড়...'

বয়সে পাঁচ-সাত বছরের ছোট গণশার এতটা সাহস বরদাস্ত করার কথা নয় তার। তবু, কুছ পরোয়া নেই। সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে ওর হাতে তুলে দিয়ে, গণশাকে আমল দেবার প্রয়োজন নেই, সোজাসুজিই তাকাল মানুষগুলির দিকে। রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে একই বালতি থেকে মুঠোর ন্যাকড়ায় লেই তুলে তুলে ছাপা কাগজগুলোতে মাখাচ্ছে প্রতাপ আর বাসু। পোস্টারগুলো দু-আঙুলে তুলে নিয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে হারু সত্য বিমল। রাখালবাবুদের বাড়ির দেয়ালটা আগেই শাদা রং করে রেখেছিল হয়তো। কালো কালিতে ব্রাশ টেনে শিল্পসুষমায় দেয়াল লিখছে শিবু। দু-চার ছত্র চিঠি লিখতে হাত কাঁপবে যার, কলম ছেড়ে তারই হাতে তুলি বা তলোয়ার।

প্রতাপের পরনে গাঢ় সবুজ রঙের প্যান্ট, ছাইরঙা জামা। ঝাঁ করে মগজে এসে গেল ভাবনাটা। সেই গেঞ্জিটা কোথায় ওর? টকটকে লাল—বিগ বয়েজ প্লে অ্যাট নাইট! বাক্যটার সেদিন কোনো অর্থ ছিল না। আজও নেই!

কিংবা আছে। গভীর রাতে কী করছে বুড়ো খোকারা?

'বিলাইতি টানছ গুরু! পকেটে ট্যাসকির লোট! এজ্জতই আলাদা। লাখ রুপেয়া লগদ আর চল্লিশ ভরি সোনা! সঙ্গে একটা জ্যান্ত পরী মাইরি খুপসুরৎ! কী কপাল নিয়ে জন্মেছ রাজা...'দেশলাইটা ফেরত দিয়ে গণশা সরে গেল—'চলি বস, গুড লাইট...'

নির্বোধ শূন্যতায় উৎপল ঘরের দিকে পা ফেলল। ওপাশের দেয়ালে শিবুর তুলিতে হরেক রঙের দেয়াল-লিখনে সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে জনগণমহিমায় অমৃতবাণী। কী কুচ্ছিত, কী বিচ্ছিরি ভুল বানানের ভেংচিগুলি! ময়দানে বিশাল জনসভা। সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের ভাষণ। নানু মিত্তির প্রতাপদের আমন্ত্রণে জনগণ যাবে সেখানে। নিশ্চিতই যাবে। মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ। ট্রাফিক জ্যাম। উত্তাল কলকাতা! পাণ্ডব অথবা কৌরব—মহারণে এরা আছে। থাকবেই একপক্ষে। সে কোথাও নেই।

বন্ধুদের মনে পড়ল। আজই, আজ সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রিটের সাহেবি সরাইখানায় শৈলেনের পয়সায় অঢেল উৎসব। ঘরের দরজায় পৌঁছোনোর আগেই ঘন কুয়াশার আস্তরণ ছিঁড়ে সে তার স্বাভাবিক স্বচ্ছতায় ফিরে আসছে মনে হলো। ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে, অন্ধকার

সিঁড়িতে পা রেখে ওপরে উঠতেও কোনো আচ্ছন্নতা নেই। ইতিপূর্বে এভাবেই সে অসংখ্যবার ঘরে ফিরেছে মধ্যরাতে। ক্বচিৎ কদাচিৎ হলেও বান্ধব-আসরে একদা মধ্যমণির দাপট ছিল তার। গ্লানি নয়, তবু সে অনেকটাই গুটিয়ে ছিল আজ।

স্বর্গভ্রষ্টকে স্বর্গ ফিরিয়ে দেবে—বলেছে শৈলেন! শৈলেন বিশ্বাস

বিষের উদ্‌গারে নামটা মনে পড়লেও, ঘরে ঢোকার পর একই ভাবে মগজের কেন্দ্রে সেই বন্ধু! অত সহজে খারিজ করে দেওয়া যায় না লোকটাকে। জীবনের এই সঙ্কটে সাহস কই? কোন্ অধিকারে?

আসলে কী ভীষণ শক্ত আমার-মতো-আমি হয়ে বাঁচা!

জনোচ্ছ্বাসে উন্মাদ কলকাতা। সপ্তমীর মধ্যরাত পেরিয়ে ঘরে ফিরেছিল উৎপল। তখনও লাখো লাখো নারীপুরুষ রাস্তায়। সারারাত্রিব্যাপী ট্রামবাসের চলাচলে, চায়ের দোকানে খাবারের দোকানে প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে আলোয় আলোয় দিলখোলা প্রাণের উৎসবে দারিদ্র্যসীমার দুর্লক্ষণ ছিল না কোথাও। শহরের পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ জুড়ে প্রলয় মত্ততায় মানুষ, সবাই রাজা-উজির, শুধু মানুষ।

এমন সন্ধ্যায় শিপ্রা ছিল না। ওদের ছোটমাসি এসেছেন বিলাসপুর থেকে। পুজোর সময় বছরে একবার আসেন। মাকে নিয়ে পয়সাওলা মাসির বাড়ি দমদম গিয়েছিল শিপ্রা। এই মাসির কাছে নাকি ওদের অপরিশোধ্য ঋণ বেঁচে-থাকার!

সুতরাং রাগ ছিল। সেই রাগ নিয়ে প্রথম দফায় খোকাদার চায়ের দোকানে বন্ধুদের আড্ডায় কিছুক্ষণ, তারপর বন্ধুদেরই সঙ্গে উৎসবের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে রাত প্রায় সাড়ে বারোটা।

পরদিন, অপ্রতুল নিশীথনিদ্রার শেষে মহাষ্টমীর ভোরে চায়েরও আগে দরজায় সুনন্দা—'খোকন, খোকন দরজা খোলো। তোমার টেলিফোন...'

টেলিফোন! সদ্য ঘুম-ভাঙার চোখে শব্দটা শুনেই লাফিয়ে উঠতে হয়। এ-বাড়িতে এমনিতেই যন্ত্রটা এক শৌখিন সামগ্রী। দু-চারটে রং-নাম্বার এলেও যেখানে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সেখানে এত ভোরে তাকে টেলিফোন? ধড়ফড়িয়ে উঠে দরজা খুলতেই সুনন্দা তখনও ঘুমের জড়তায়—'কাঞ্চনবাবু। শিপ্রার দাদা না?'

'হ্যাঁ...' ছুটে গিয়ে বৌদির ঘরে, যেখানে পাশবালিশ জাপটে দাদা তখনও অফিস-ছুটির আয়েশে চোখ বুজে। খাটের অন্য প্রান্তে বেহুঁশ টুনটুনি। মধ্যবর্তী, বৌদির মাথার টোল-খাওয়া ফাঁকা বালিশের শূন্যতাকে চোখের পাতায় খুব একটা আমল না দিয়ে রিসিভারটা তুলে নিতে হয়। দূরে কানাই মল্লিক লেনের পুজো-প্যাণ্ডেলের কর্তাদের কী সাধু আচরণ, মাইকে সানাই।

আঁতকে ওঠার মতো সংবাদ। অখিল জানা বাড়াবাড়িভাবে অসুস্থ আচমকা।

কাল রাতেই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারত। কিন্তু এখনও ঘটেনি। সারা রাত ওরা ঘুমোতে পারে নি কেউ। রাতদুপুরে বাড়ি এসে উৎপলকে ডেকে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও উঠেছিল এক সময়। যেহেতু যে-কোনো রকম একজন ডাক্তারকে খুঁজে বের করাই অত্যধিক জরুরি ছিল

তখন, সেটা আর সম্ভব হয়নি। পাড়ার কয়েকজন যুবক এসে গিয়েছিলেন। দুঃসময়ে খুবই সাহায্য করেছেন তাঁরা। এঁদেরই দুজন ব্যারাকপুর চলে গেছেন ভোরবেলার ফার্স্ট বাসে। বুলাদি যোগেশদাকে খবর দিতে।

বলা বাহুল্য, সকালবেলার প্রথম চা এবং তৎপরবর্তী প্রাতঃক্রিয়া সবই বরবাদ। এলোমেলো পায়জামার ওপর একটা জামা চড়িয়েই উৎপল রাস্তায়।

এখন শান্ত সব। ঘুমের জন্য শেষপর্যন্ত একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। গোটা রাত্তির বীভৎস দাপাদাপির পর ভোরবেলার দিকে একটু ঘুমিয়েছেন। শায়িতের শিয়রে মেঘময়ী মাসিমা। পুরো রাতই নাকি একইভাবে প্রস্তরবৎ। তাকানো যাচ্ছে না ওদের কারুর দিকে। পাড়ার দু-চারজন যুবক তখনও জনসেবায় মোতায়েন। বাড়িওলার ষণ্ডামার্কা ছেলেটাও উৎসবের দিনে নিজের ক্যাসেট আর ফুর্তি ভুলে এদের ভিড়ে।

সেপ্টেম্বর শুরু হলেই, ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় ব্যাপারটা। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরো শীত চলবে এভাবে। বীভৎস হাঁপানির টান। কাল সকাল থেকেই বলছিলেন—শরীর খারাপ। পুজোর ছুটিতে ফ্যাক্টরি চারদিন বন্ধ। বেরুতে বারণ করেছিলেন সবাই। কিন্তু রাজনীতির পুরনো বন্ধু, বর্তমান এম. এল. এ. সুখেন্দু কোনার মৃত্যুশয্যায়। খবরটা পাবার পর থেকেই অস্থির ছিলেন। বেরিয়ে পড়লেন সাতসকালেই। কাছাকাছি তো নয়। রেলগাড়ি ঠেঙিয়ে সেই বর্ধমান জেলার বৈঁচিগ্রাম। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। থেকে যেতেও পারতেন। ভয়ঙ্কর একটা মনের জোর ছাড়া অন্য কোনো সম্বল নেই। রাত প্রায় এগারোটায় কোনো রকমে বাড়ি পৌঁছেই শুয়ে পড়লেন। তখনও ভয়াবহ কিছু নয়। একটা-দেড়টা নাগাদ বুক-চাপা কফের টানে যখন দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো, বীভৎস সে-দৃশ্য। চোখ উল্টে দাপাদাপি। শুতে পারেন না। বসে থাকলে আরো বেশি কষ্ট। কর্টাসমিল নামক ট্যাবলেট ঘরে ছিল। ডেথ-পিল জেনেও একটি নয়, দুটি গিলেছেন। কিছুটা রেহাই পাবার কথা। পান নি। অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশ বাড়াবাড়ি দেখে রাতদুপুরে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথাই স্থির হয়েছিল প্রথম। চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা এসে গিয়েছিলেন কেউ কেউ। পাড়ার ছেলেদের জোরজুলুমেই স্থানীয় ডাক্তার নলিনী পাল আসতে বাধ্য হলেন। বছর দুয়েক আগে বুকের এক্সরে হয়েছিল একবার। আবার প্লেট নিতে বললেন। এই বয়সে এখনও ই. সি. জি. এবং ব্লাড সুগার কলেস্টারোল চেক হয়নি জেনে অবাক হলেন। প্রেসার মেপে দেখলেন—বেশ লো। প্রেসক্রিপ্‌শন দিলেন। ওষুধ এলো শ্যামবাজারের মোড় থেকে নাইট-সার্ভিস মেডিকেল শপের কলাপসিবল গেটে ধাক্কাধাক্কি করে। তাৎক্ষণিক স্বস্তির জন্য ইঞ্জেকশন ফুঁড়ে ঘুম পাড়ালেন ডাক্তার। সেই ঘুমই চলছে এখনও।

ঘরের নিভৃতে গলার স্বরে আরো ভারি হয়ে এলেন কাঞ্চনদা—'শেষ রাত্তিরের দিকে যখন বেশ একটু শান্ত হয়ে এসেছেন, তক্তপোশের তলা থেকে ছোট টিনের সুটকেশটা বের করতে বললেন অণুকাকিমাকে। আমিই বের করলাম। কাকুর হাবিজাবি সব কাগজপত্তর থাকে ওটায়। ব্রাউন রঙের লম্বা একটা খাম ছিল। কাকুর উইল...'

'উইল!' উৎপল চমকে উঠল—'কাকুর উইল মানে!'

সিগারেটের ধোঁয়ায় কাঞ্চন ম্লান হাসল—'অদ্ভুত মানুষ। তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, আজ প্রায় বছর দুয়েক আগে নিজের চোখজোড়া আই ব্যাঙ্কে দান করার কথা লিখে রেখেছেন একটা

কাগজে। এর একটা কপিও নাকি যথাযোগ্য স্থানে আছে মেডিকেল কলেজে। আশ্চর্য! অ্যাদ্দিন কাউকেই বলেন নি কোনো কিছু। অণুকাকিমাও জানতেন না। কালই হঠাৎ...'

'আমার ভয় করছে...' শিপ্রা, বুকের ছমছমে—'এর আগেও তো এরকম হয়েছে অনেকবার। গত বছরও খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। এবার কিন্তু কাকু নিজেই বুঝতে পারছেন, আর বেশি দিন নেই। নইলে নিজের স্ত্রীকেও যা বলেন নি অ্যাদ্দিন...'

'খামটা হাতে তুলে দেবার সময় কাল যা বললেন, আমি চমকে উঠেছিলাম। হি ইজ এ পোয়েট, গ্রেট পোয়েট...' কাঞ্চন শান্ত গলায়—'মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালের কাছে কবে কোন্ কালে পৈতৃক ঘরবাড়ি সব ছিল। তার সঙ্গে তো কোনো সম্পর্কই নেই আজ প্রায় বছর কুড়ি-পঁচিশ। বিনা যুদ্ধে ভাইদের কাকাদের ছেড়ে দিয়েছেন। রাজনীতি করেছেন, জেলে জেলে কাটিয়েছেন। নিজের গ্রামে গিয়ে দু-চার দিনের বেশি থাকেন নি কখনও। কাল বলছিলেন—জীবনে কী পাইনি সেটা বড় কথা নয়। যা পেয়েছি, সে-ই অনেক। অনেক মানুষকে নানাভাবে দেখলাম জানলাম। কোনো ক্ষোভ নেই আমার। কিন্তু কাউকে কিছু দিয়ে যাবার মতো কিছুই তো নেই, শুধু এই দুটো চোখ। চোখ দুটো নাকি ঈশ্বরবিশ্বাসীদের আত্মার মতো। এরা বেঁচে থাকতে পারে। এ-দুটোই রেখে গেলাম। তোমরা নষ্ট করো না। চক্ষুষ্মান করো একজন অন্ধ মানুষকে...'

কাঞ্চন থামল। তাকাল শিপ্রার দিকে—'কাগজটা কোথায় রে?'

'কাকিমার কাছে। আনব?'

'না, এখন থাক। ওটা একবার দেখে নিয়ো উৎপল। বাকিটা ওই কাগজেই লেখা আছে। দি হাইয়েস্ট ফর্ম অব পোয়েট্রি। মানুষটাকে অনেকদিন ধরে চিনি জানি। সব মিলিয়ে একটা কবিতা...'

নিভৃত শব্দপুঞ্জের শ্রুতিতে উৎপল নির্বাক।

'আমার এ-চোখজোড়া কে পাবে—নারী বা পুরুষ, ধনী বা নির্ধন কোনো পক্ষপাত নেই আমার। নেতারা ভুল করতে পারেন। দেশজোড়া হট্টগোল নৈরাজ্যের মধ্যে দেউলে করে দিতে পারেন মানুষের সমস্ত শুভবুদ্ধিকে। কিন্তু সত্তর কোটি মানুষ তো মিথ্যে নয়। দেশের রঙ বদলাবেই একদিন। মানুষের জয় হবে। এই চোখজোড়া যেন সেই নতুন ভারতবর্ষকে দেখতে পায়। অন্তত ততদিন যেন কোনো দীর্ঘজীবী মানুষের আধারে চোখজোড়া বেঁচে থাকে...'

সকালবেলার অতি প্রয়োজনের প্রথম চা-টা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন অণুকাকিমা। বিষাদের মেঘে গম্ভীর। শেষ বাক্যটা শুনেছেন। কাপ দুটো টেবিলে রাখতে রাখতে আস্তে বললেন—'শুধু উইলেই তো সবটা হবে না। সত্যি যদি এদিক-ওদিক একটা কিছু ঘটেই যায় হঠাৎ, সঙ্গে সঙ্গে নাকি খবর পাঠাতে হবে আই ব্যাঙ্কের লোকদের। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা না করলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দেখো তোমরা, অ্যালার্ট থেকো...'

উৎপল নড়ে উঠল—'আচ্ছা, সবাই মিলে এরকম করছেন কেন বলুন তো আপনারা? ডাক্তারবাবু কি বলেছেন, সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেতে পারে?'

'ই. সি. জি. এক্সরে এসব না হলে তো বলা যাচ্ছে না কিছু...' কাঞ্চন অণুকাকিমার দিকে

তাকাল—'ডাক্তার পালও বললেন,—হার্টের কন্ডিশানটা কী রকম না বুঝলে...'

'বেশ তো, তাহলে এখানে বসে ফালতু বকবক না করে সেসবই করা যাক এখন...'উৎপল রীতিমত ক্ষিপ্ততায়—'একেবারে গোড়াতেই এমন শুরু করে দিয়েছেন আপনারা...'

বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অণিমা জানা। ফিরে তাকালেন—'আরো একটু দেখো। বুলা যোগেশকে খবর পাঠানো হয়েছে। ওরা এলে ভেবেচিন্তে সবাই মিলে একটা কিছু করো বরং...'

চায়ে চুমুক দিয়েছিলেন কাঞ্চনদা। উৎপলও কাপটা টেনে নিলো। ভোরবেলা থেকেই বড় জরুরি ছিল এটা। কয়েক চুমুকের পর দাঁতজিভশুদ্ধু গালের ভেতরটা সুস্বাদে ভরে ওঠার পর গোটা শরীরটাই যখন চাঙা, চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে কিঞ্চিৎ স্বস্তি চাইল উৎপল। সিগারেট ধরিয়ে—'চোখদুটো ডোনেট করার ব্যাপারটা নিয়ে এত হৈচৈ করার কিছু নেই কাঞ্চনদা। আসলে ছোট জায়গায় বড় মানুষকে চিনে নেবার অভ্যাসই নেই আমাদের। ও-রকম রেওয়াজই নেই কোনো। নইলে অখিল জানার মতো একজন মানুষের কাছে এ-এমন কিছু না। ভেরি নর্মাল ব্যাপার।'

অণুকাকিমার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল শিপ্রা। নইলে হয়তো তর্ক বাধিয়ে দিত। খাট থেকে নিঃশব্দে নেমে দাঁড়াল কাঞ্চন। খাটের তলায় শূন্য কাপটা রেখে উবু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল।—'বাঃ, বেশ ভালো বললে তো! খাঁটি কথা।'

'হ্যাঁ, খাঁটি কথার বাজারদর এখন কাঁচা লঙ্কা আর হিঞ্চে শাকের চেয়ে একটু বেশি। পুঁটি মৌরলার চেয়ে কিছু কম।'

উৎপলও উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে। বাইরে হঠাৎ লোকজনের চলাচলে, কথাবার্তায় সরব ব্যস্ততা। দুজনই বেরিয়ে এল। বাচ্চাটাশুদ্ধু বুলাদি যোগেশদা পৌঁছে গেছেন। একেবারে ব্যারাকপুর থেকে সরাসরি ট্যাকসিতে মাইল পনের কুড়ি। সকলেরই প্রতীক্ষা ছিল। এমন কি, অণুকাকিমা নিজেও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। যা হবার এবার হোক। একমাত্র সন্তান বুলাদিসূত্রে যোগেশ সান্যাল তাঁদের জামাই এবং মাতব্বর গোছের একজন মানুষ।

হাসপাতালে পাঠাতে রাজি ছিলেন না কেউ। টাকার ভাবনাটা অণুকাকিমা একাই ভাবলেন। সঙ্গে রইলেন। সকাল থেকে দুপুর এগারটা সাড়ে-এগারোটা অব্দি বিরতিহীন ছুটোছুটি সকলের। স্ট্রেচার ছাড়াই দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের সরু গলি পার করে ভদ্রলোককে ট্যাকসিতে তোলা এবং সেখান থেকে সাবধানে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে এক্সরে ই. সি. জি. ইত্যাদি। সব কিছুর শেষে ঘরে পৌঁছে আবার ডাক্তার। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটায় সকলের সঙ্গে এখানেই খেয়ে যেতে বললেন অণুকাকিমা। মাসিমার আপত্তি ছিল—'সে-কি কতা! মহাষ্টমী আজ। বছরকার দিনে মায়ের ছেলে মায়ের কাছে খাবে না? না বাবা, তুমি ঘরেই যাও। বুলাকে যোগেশকে এখন তো দুটো দিন থাকতেই হবে। বরং কাল দুপুরে এখানেই দুটো ডালভাত খাবে। তোমার সঙ্গে আমারও তো দুটো কথা ছিল বাবা। কিন্তু সে-তো...'

ঘরের দিকে যাচ্ছেন মাসিমা। শেষ বাক্যে জনমণ্ডলীর কয়েকটি চোখে কম্পন লক্ষ করল উৎপল। মাসিমার কথা। তার সঙ্গে? কি কথা থাকতে পারে মাসিমার? কিন্তু সেটা যে তার অস্তিত্বের শিকড় তুলে টান, বোঝা গেল, যখন খুব কাছাকাছি থেকে সঙ্গোপন কটাক্ষে তাকাল শিপ্রা। কানের কাছে—'বিকেলে আসবে?'

'হয়তো না। একটা কাজ আছে।'

'তাহলে দাঁড়াও একটু।'

শিপ্রা ডাকল দাদাকে। অনিচ্ছার কাঞ্চনদা ভ্রূ কুঁচকোলেন—'কী করছিস যা-তা। এত ঘোরাঘুরি খাটাখাটনির পর ওকেও তো বাড়ি ফিরতে হবে। তাছাড়া কাকুর আজ এ-অবস্থা...'

'না না আজই। এক্ষুনি...' নাছোড় শিপ্রা দাদাকে টেনে আনে।

অন্যান্যদের চোখের আড়ালে কিংবা জ্ঞাতসারেই হয়তো, বাইরে, ওদের কানাগলিটা যেখানে দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে ভাঙা পাঁচিলের তির্যক ছায়ায় গড়ানো দুপুরের নির্জনে যখন একটা কাকের ডাকও নেই কোথাও, শিপ্রা সরাসরি চোখ রাখল—'আমাদের ছোটমাসি এসেছেন, জানো?'

'শুনেছি! কাল গিয়েছিলে দেখা করতে।'

'হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরই পুজোর সময় একবার দেশে আসেন। এবার কিন্তু ডেফিনিট একটা পার্পাস আছে আসার...'

'আঃ শিপু, থাম্ থাম্ তো তুই...' বিরক্ত কাঞ্চন। কিছুটা অসহায়ও বটে—'যাও তো উৎপল, তুমি যাও। আমিই সব বলব তোমাকে। আজ বিকেলে নয়তো কাল সকালে...'

শিপ্রার ক্রোধ কানায় কানায়। দজ্জাল দাপটে সে আগলে দাঁড়াল—'শোনো, মাসিমা এর আগেও বার দুই তিন চিঠিতে লিখেছিলেন মাকে। আমি জানতাম না। কাল একেবারে মুখোমুখি বসিয়ে বললেন মাকে—কালীপুজো অব্দি আছেন কলকাতায়। এর মধ্যে ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে ফিরতে চান। মেসোমশাইর বিশেষ জানাশোনা পরিবার। ওরা তিন ভাই। বড়ভাই বৌছেলেমেয়ে নিয়ে আফ্রিকায় নাইরোবি না কোথায় থাকে। মেজভাই চণ্ডিগড়। স্বামীস্ত্রী দুজনই ডাক্তার। ছোট ছেলেও এম. ডি.। মেডিকেল কলেজে আছে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, পাইকপাড়ায় নিজেদের বাড়ি...'

উৎপল অতর্কিতে বিচ্ছিরি রকম বেকায়দায়। কাঞ্চনদাকে সাক্ষী রেখে শিপ্রা এত খোলাখুলি আজ! কিছুটা টানটান থেকেই—'কিন্তু এসব...এসব আমাকে শোনাচ্ছ কেন?'

'শোনাচ্ছি, শোনাতে হচ্ছে...' শিপ্রা হাঁপায়। শরীর ছাপিয়ে উপচে পড়ছে জ্বালা—'মাসিমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এভাবেই ওঁরা ভালোবাসেন মেয়েদের। এখন সমস্যাটা আমার, আমাদের...'

'কিন্তু আমি কী করব?' উৎপল তিক্ত হলো—'ইউ নো মাই ট্রাবলস্।'

'জানি। জানি বলেই তো জানতে চাইছি, এখন আমি, আমরাই বা কী করব? অখিলকাকুকে নিয়ে বাড়িতে এই বিপদ। জানি না, কী হবে। একই সঙ্গে একই দিনে আমাদের অশান্তিটাও কম নয়। এর পর দু-চার দিন বাদে মাসিমা মেসোমশাই সবাই মিলে এসে ঘাড়ের ওপর পড়বেন, মায়ের ওপর চাপ বাড়বে। মা কী করবেন? মাসিমাকে ফিরিয়ে দেবেন? জানো এ-মাসি কে? বাবা মারা যাবার পর মাসের পর মাস যিনি আমাদের টাকা পাঠিয়ে গেছেন। আমরা বেঁচে গেছি। দাদার তখন কত আর মাইনে?'

একটু বেশিই উত্তেজিত শিপ্রা। দুপুরের তাতানো রোদ্দুরে ঝাঁঝাঁ করছে মগজটা কিংবা মোমের মতো সর্বাঙ্গে গলে গলে পুড়ছে মাথার ঘিলু। পকেটের রুমাল টেনে কপালের ঘাম

মোছে উৎপল, যখন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে বোনের বিতিকিচ্ছিরি অসভ্যতায় কাঞ্চন আরো বেশি অসহায়।

কিংবা তেতো বিষগুলো গা থেকে উগরে তোলাই হয়তো বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বমনশেষে নার্ভগুলোর বিবিধ প্রতিক্রিয়ায় শিপ্রা আরো ভয়ঙ্কর। কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল বাড়ির ভেতর। ঝাঁঝাল রোদের দুপুরে ঘেরা-পাঁচিলের শূন্যতায় আরো এক নতুন ফ্রন্টে অদৃশ্য শত্রুর ষড়যন্ত্র লক্ষ করল উৎপল। এসব মাসিফাসির উৎপাতগুলো আসে কোত্থেকে হঠাৎ? কেন আসে? শত্রুকে চেনা নেই। অথচ যুদ্ধ, যুদ্ধ চারপাশে! প্রিয়জনরাই সম্মুখসমরে! ভালোবাসাই কাদের যেন ঢাল-তলোয়ার!

নিজের জড়তা ভেঙে পা বাড়াল সে। সাধারণ ভদ্রতায় কাঞ্চনদার দিকে তাকানোর সম্ভ্রমটুকুও নেই। অথচ কাঞ্চন পাশাপাশি, নিজের সঙ্কোচে—'মনে করো না কিছু। জানোই তো ওকে। ছেলেবেলা থেকেই ও এ-রকম! রাগলে আর ঠিক থাকে না মাথাফাতা...'

উৎপল চুপচাপ হাঁটে। শব্দ নেই। ইচ্ছেও করে না কথা বলতে।

কাঞ্চন নিজের বিলাপে—'মাসিমাকে রিজেক্ট করতে হবে। সে-না-হয় করাও যাবে। অসম্ভব দুঃখ পাবেন। হয়তো কোনো সম্পর্কই রাখবেন না এর পর...'

গলি থেকে বেরিয়ে এসে উৎপল ঘুরে দাঁড়াল—'আপনি আর এগোচ্ছেন কেন? বাড়ি যান। সবাই বসে আছেন...'

জটিল বিভ্রমে কাঞ্চন কিছুটা এলোমেলো—'তোমার চাকরিটা কী হলো? এন্‌কোয়্যারি তো হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ, এবার কর্তারা ওদের ডিসিশন জানাবেন। শুনছি তো পুজোর পরই...' হাতে পায়ে শরীরের গাঁটে গাঁটে মোচড় দিয়ে তাকাল উৎপল—'সে-আর কী হবে! কী করব জানি না। কিন্তু ব্যাঙ্কে আর ফিরছি না। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিসাইডেড।'

'সে-তো শুনেছিলাম একবার। কিন্তু...'

'জীবনের পিদিমে পলতে হয়ে ঢুকে জ্বলেপুড়ে মরব, অন্যেরা কারা আলো পাবে বলে? আমি আর এর মধ্যে নেই। এজন্যে যা খোয়াতে হয়, যত কিছু ছাড়তে হয়, ছাড়তে রাজি। দেয়ার মাস্ট বি সাম মিনিং অব এভরিথিং...'

পশ্চাৎবর্তী মোহ ছিঁড়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল উৎপল। এবং শরতের প্রসন্ন দুপুরে, বল্গাবিহীন দুরায়ত্ত সেই যুবকের চলে-যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে কাঞ্চন তার নিজের সঙ্কটে। উত্তর যে একটা পেতেই হবে ওর কাছ থেকে। নচেৎ তার নিজেরও হিসেব মিলছে না।

শরীর ভরে ঘাম ছিল। দাউদাউ আগুনে জ্বলছে চামড়া। যা কিছু আমার, একান্তভাবেই আমার, একে একে সব কিছুই কেন কেড়ে নেবে ওরা?

আসলে নিরর্থক। ক্রুদ্ধ হবারও কোনো মানে নেই। একটা স্টেনগান যেহেতু যথার্থই দুর্লভ, উৎপল শান্তদর্শন একটা স্টেনগানকেই মগজে সঙ্গোপন রেখে ঘরে ফিরে স্নানাহার জাতীয়

প্রাত্যহিকগুলো সেরে ফেলল চুপচাপ এবং গোটা দুনিয়াকে নস্যাৎ করে সে আরো একবার নিজের জন্য, শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনে চটজলদি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চাইল। সম্ভব-অসম্ভবের চুলচেরা বিচার ছাড়াই বেপরোয়া ভাবে।

অদ্ভুতভাবে মনে পড়ল লোকটাকে। সে-ও দুটো চোখ। একজোড়া চোখেরই গল্প। নামটাই মনে আছে শুধু। ঠিকানাফিকানা গোলমেলে হয়ে গেছে। ব্ল্যাক স্কোয়ারের কাছাকাছি কোথাও। শুধুমাত্র নাম ভরসা করে কলকাতা শহরে কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা এক অবাস্তব চিন্তা। তবু, যেহেতু নিজেরই পাড়ার কাছাকাছি, ভরাট দুপুরের আগুনকে মাথায় বয়ে ব্ল্যাক-স্কোয়ার শব্দটুকুর অবলম্বনে অজ্ঞাতের সন্ধানে ছুটল এবং আধ ঘণ্টার ওপর বিস্তর পরিশ্রমে খুঁজেও পাওয়া গেল তাকে। ময়ূরাক্ষী প্রেস, বাহাত্তর নম্বর গোপী মিত্তির লেন। ভাঙাচোরা পুরনো দোতলা বাড়ির নিচে গ্যারেজ গোছের একটা কিছু। রং-চটা প্রাচীন এক বিবর্ণ সাইনবোর্ডে নামটা পাঠযোগ্য হলেও, মুশকিল, ভারি ভারি কাঠের পাটাতনে সবটাই বন্ধ। তদুপরি কলাপসিবল গেট এবং গোটা পাঁচেক সুবৃহৎ তালা।

অগত্যা পাশের দরজায় কড়া নেড়ে যা জানা গেল, সেটা আরও মারাত্মক। পুজোর ছুটিতে প্রেস বন্ধ আপাতত। খুলবে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন। ইতিমধ্যে বিজয় সাহার এখানে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাঁর বাসস্থান সাঁজিরহাটে বঙ্কিমপল্লি। মধ্যমগ্রাম স্টেশন থেকে যেতে হয়। ত্রিশ নম্বর বাস অথবা রেলগাড়ি। মিনিবাসও নাকি চলছে আজকাল।

উৎপল আজ মরিয়া। সকাল থেকে গোটা দুপুরে পুরো একটি ঘণ্টাও গৃহে অবস্থান নয়। বিশ্রাম বাতিল। সে ছুটল। পথে পথে স্রোতোধারায় এরই মধ্যে নেমে পড়েছে উৎসবের জনতা। তার উৎসব নেই, কলকাতা নেই, স্বদেশ নেই। স্বদেশ তাকে বানিয়ে নিতে হবে।

ভাঁটায়, আপ ট্রেনে শূন্যতা ছিল। বনগাঁ লোকালে যা একান্ত দুর্লভ।

যথার্থই দুর্গম অভিযান। স্টেশন থেকে মোটামুটি দীর্ঘপথ রিকশ-এ এসে যখন সাঁজিরহাট নামক এক অজ্ঞাত স্থানে এসে পৌঁছানো গেল, পশ্চিম আকাশে মহা সমারোহের সূর্যাস্ত দেখল সে। তারপরও মানুষজনকে প্রশ্ন করে করে ছোট একটা খালধার ঘেঁষে চারদিকে গাছপালা ঘরবাড়ি উদ্বাস্তু-কলোনির ভেতর দিয়ে অলীক যাত্রায়, কোথায় যাচ্ছে সে বা যাবার আদৌ কোনো মানে আছে কিনা, সংশয়ে, এগোতে এগোতে এক সময় কোনো এক প্রৌঢ় ব্যক্তির সহায়তায় সে পৌঁছল কোথাও। ভদ্রলোকই পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বিজয় সাহা পরিচয়বাহী এক ব্যক্তি সেখানে সত্যি থাকেন।

সমস্ত আকাশ মুছে গিয়ে কখন যে সন্ধ্যার সূচনা, টেরই পাওয়া যায় নি কিছু। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। দূরাগত মাইকের আওয়াজে কাছাকাছি কোথাও সর্বজনীন দুর্গোৎসব।

এখানে উৎসব নেই। বরং বেশিই চুপচাপ। ছায়া-আলোয় অস্পষ্টতায় গাছপালা ঘরবাড়ি মিলিয়ে লোকালয়ের পুরো চেহারাটা চেনা যাচ্ছিল না ঠিক-ঠিক। বেশির ভাগই টিনের চাল আর দর্মার বেড়ায় কাঁচা ঘর। দুটো-একটা পাকাবাড়ি। কারা যেন থাকে এসব ঘরদোরে! ছিল একদা, এখন নেই। সব কিছু ফাঁকা রেখে ভেসে গেছে উৎসবের কলরবে। মাঝারি মাপের একটা উঠোনের পাশে লন্ঠন নয়, কুঁড়েঘরের দাওয়ায় লম্ফটা জ্বলছিল। প্রবেশমুখে এত ঝোপজঙ্গল, পা বাড়াতে সাহস পেল না উৎপল। বারকয়েক নাম ধরে ডাকতেই হাড়জিরজিরে উদোল গায়ে

লুঙ্গি পরে যে-মানুষটা তড়িঘড়ি বেরিয়ে এলেন, খোকাদার দোকানে ক্ষণিক পরিচয়ের স্মৃতিতে এক ঝলকে চিনে নেওয়া সম্ভব নয় তাঁকে। পুজো উপলক্ষে খোঁচা-খোঁচা দাড়িটা কামিয়েছেন বোধ হয়। তথাপি ভাঙা চোয়ালের শ্রীহীন বদখত মুখমণ্ডলে গর্তে-ঢুকে-যাওয়া দুটো চোখ অন্ধকারে তেল-ফুরোনো লণ্ঠনের লালচে আলোর মতোই ভীষণ। এই চোখজোড়াই হতে পারে একজন মানুষের আইডেন্টিফাইং মার্ক। অনেক, অনেক দূরের মহাকাশ যার নাগালের সীমানায়।

'আমি কলকাতা থেকে আসছি। হয়তো মনে নেই আপনার...'

'আজ্ঞে...' নির্ঘাৎ পুলিশের লোক কিংবা কোনো লোকাল ভি. আই. পি-র চেলা ভেবেছে মানুষটা। কণ্ঠনালীর আতঙ্ক।

'খোকাদার চায়ের দোকানে আলাপ হয়েছিল...'

'কে খোকাদা?' কুঁকড়ানো ভয় থেকে লোকটা আরো বেশি ঘাবড়ে গিয়ে—'কী চাই বলুন।'

'বলব কী! আপনি তো চিনতেই পারছেন না আমাকে। ময়ূরাক্ষী প্রেসটা বিক্রি হবে বলে আপনি কথা বলছিলেন আপনার ভায়রাভাইয়ের সঙ্গে...'

গাছপালার ডগায় ভাঙা চাঁদটা ঝুলছিল আকাশে। স্যালুট গোছের হাতটা তুলে ভ্রূরেখায় চার আঙুলের ঝাঁপ তুললেন বিজয় সাহা। সভ্যতা-ভব্যতার বালাই নেই। নাকটা উঁচিয়ে নিয়ে এলেন উৎপলের মুখের কাছে—'হ্যাঁ, বুঝেছি। সেদিন অনেকে ছিলেন আপনারা। আমাকে দালাল ঠাউরেছিলেন!'

ঝোপজঙ্গলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জোনাকির ঝলমল দেখল উৎপল। ঝিঁঝিঁরা ডাকছে।

'আজ পুজোর দিনে এত রাত করে আমার বাড়িতে কেন বলুন দেখি! এখানকার খবর পেলেন কোথায়?' লোকটা কাঁপছে।

'আপনার প্রেসে গিয়েছিলাম। ওরাই বললেন।'

'কিন্তু কেন? আমার কাছে কী?'

'প্রেসটার বিক্রি নিয়েই একটু কথা বলতে চাই।'

'এজন্যে অ্যাদ্দুর ছুটে এসেছেন কলকাতা থেকে?' ভিরমি খেলেন ভদ্রলোক। একটু সামলে নিয়ে নিশ্বাসের গাঢ়তায়—'সে-তো হয়ে গেছে শুনেছি।'

'হয়ে গেছে!' ধাক্কা খেল উৎপল—'এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেল?'

'হয়েছে বলতে, কোন্ এক পার্টির সঙ্গে নাকি কতাবাত্রা সব ঠিক হয়ে গেছে। পুজোর পরই লেখাপড়া হবে।'

'এত হৈচৈ করে আপনার কাছে ছুটে আসা সবই পণ্ডশ্রম তাহলে...'

'কেন, আপনি কিনবেন?'

'না, আপনিই কিনবেন। আমি আপনার পার্টনার।'

সংশয়ের ভ্রূকুটিটা ললাটে তীক্ষ্ণতর। প্রসন্ন জ্যোৎস্নায় উৎপল স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে—কী অবাস্তব লাঞ্ছনা লোকটার! একজন ভদ্রলোককে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কথা বলতে হচ্ছে! অথচ সাহস পাচ্ছেন না ঘরে ডেকে নিয়ে যেতে এবং হঠাৎ-ই—'আসুন আসুন, ঘরে এসে বসুন। ছাপোষা মানুষ আমরা। কোত্থেকে এসে কী যে সব বলতে শুরু করলেন! এ-যে বুঝতেও পারছি না কিছু...'

পায়ে পায়ে এগোল উৎপল। কাছে-দূরে ইতস্তত লণ্ঠন বা প্রদীপের ঝিলিক এপাশ-ওপাশ। গাছের ফাঁকে বিজলি বাতির তেজ ওদিকের দোতলায়। গা-ছমছম অজ্ঞাতস্থানে ঘরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছোলেন বিজয় সাহা। ছেঁড়াফাটা একটা মাদুর গুটোনোই ছিল দাওয়ার একপাশে। ছড়িয়ে দিলেন লম্বা করে—'ছেলেমেয়েরা কেউ নেই। ঠাকুর দেখতে গেছে। ওদের মাকেও নিয়ে গেছে। নিন বসুন...'

ঘরটা বানাতে একটাও কি ইট লেগেছিল? প্রায় বুক-ছোঁয়া মাটি থেকে বেঢপ উঁচুতে মেটে দাওয়ার ধার ঘেঁষে উৎপল তখনও উঠোনে দাঁড়িয়ে। এ-ধরনের গ্রামীণ বা উদ্বাস্তু বা গরিব মানুষদের ঘরদোরে ইতিপূর্বে সে আসে নি কখনও। মনে তো পড়ে না। দেখছিল চারপাশ। গোটাকয়েক পাকা বাঁশের খুঁটির ওপর ঢেউ-খেলানো টিনের চাল। চতুষ্কোণে দর্মার বেড়া। দরজা জানালার কপাট নেই। বাঁশের ঝাঁপ। বারান্দা মানে বাইরের দিকে এক চিলতে নিকানো মাটির রোয়াক। খুব একটা সমতলও নয়। উঁচু নিচু টোপলা মাঝেমধ্যে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। নয়াদিল্লী বা কলকাতা কত আলোকবর্ষ দূরে এখান থেকে?

দূরবর্তী পূজামণ্ডপে কোথাও ফিল্মি গানের মাতাল চিৎকার এবং মশা।

'ঝেড়ে কাশুন দেখি এইবারে। বলুন, কী বলছিলেন...' দাওয়ার ওপর ক্ষীণপ্রাণ লম্ফর আলোয় যেন আলো-আঁধারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজয় সাহা। এবার শরীরটা ভাঙলেন। নুলোর মতো দুটো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে, কোমরটা মুচড়ে আস্তে আস্তে বসে পড়তে চাইছেন মাদুরে। প্রসারিত হাতে মাটিটা ছুঁলেন প্রথম। অনেকটা হামা দেবার ভঙ্গি। লেপটে বসলেন। ভয়ঙ্কর চোখজোড়া উৎপলের দিকে—'আমাকে চেনেন না, জানেন না। কবে কোথায় একটা চায়ের দোকানে একটু আলাপ-পরিচয় হয়েছিল মাত্তর। তাই থেকে...'

এরই মধ্যে কখন গোটাকয়েক মশা কামড়ে গেছে বাঁহাতে, ঘাড়ের কাছে। বিব্রত উৎপল চুলকোতে চুলকোতে বিরক্ত হয়ে, অবশেষে, ওদিকের অন্ধকারে বোঁচা নাকের মতো সিঁড়ি গোছের কিছু-একটা দেখল যদিও, এগোল না। অনেকটা ঘোড়ার জিনে চেপে বসার ভঙ্গিতে বুক-উঁচু দাওয়ায় লাফিয়ে উঠল। মাটি ঘেঁষড়ে প্যান্টটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অথবা হড়কে পড়ে হাঁটু-কোমর ভাঙারও সম্ভাবনা। ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটু ভেঙে মাদুরে জাঁকিয়ে বসে দুহাতের তালি বাজিয়ে হাতের তেলো ঝেড়ে নিলো। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে—'নিন ধরুন...'

'না, ও-আমি খাই না।' দাওয়ার কোণ থেকে বিড়ির কৌটোটা টেনে নিয়েছেন বিজয় সাহা। উৎপল সিগারেট ধরাল—'খোলতাই করে আসল কথাটাই তাহলে বলি আপনাকে। আমি একটা চাকরি করতাম। সেটা গেছে। হ্যাঁ, গেছেই বলতে পারেন। কিন্তু করতে তো হবে একটা কিছু। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই মাথায় ঘুরছিল। এটা একটা ফিজিবল্...মানে সম্ভবপর একটা-কিছু। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে হাজার দশেক টাকা আমি দিতে পারব হয়তো...'

'দশ হাজার!' ড্যাবড্যাব চোখে তাকালেন বিজয় সাহা—'ওতে কী হবে? এখন দর উঠেছে আঠার হাজার।'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আপনি নিলে হাজার দশেকের মধ্যে ছাড়বে ওরা...'

'তাই তো বলেছিলেন বুড়োকত্তা। দশ হাজারে না হোক, হাজার তিন-চার কমে ত পাবই।'

'কেন?' ভ্রূকুটি তুলে উৎপল ঝুঁকে বসল—'জাত ব্যবসায়ী ওরা। এত ভালো লোক? আপনার জন্যে চার হাজার টাকা এমনি ছেড়ে দেবে?'

'সে-কি কেউ ছাড়ে দাদা?' কৌটো খুলে একটা বিড়ি বের করলেন বিজয় সাহা—'টাকা বলে কতা! টাকার জন্যে কি কেউ ঘরের বৌ-ছেলেমেয়েকে ছেড়ে কতা কয় আজকাল?'

'তবে?'

'আমাকে চার হাজার ছাড়লেও ওদের আখেরে লাভ।'

'কেন?'

'যেসব পাট্টির সঙ্গে কতা হয়েছে, ওরা ত সবাই বড় বড় প্রেসের মালিক। দুটো মেশিনশুদ্ধু আর যা যা আছে টাইপ-ফাইপ কেসশুদ্ধু সব তুলে নিয়ে যাবে। আমি ত কলকাতা শহরে এমন একটা ঘর পাব না কোথাও...'

'ঘর কোথায়? ও-তো গ্যারেজ একটা!'

'কিন্তু ওই গ্যারেজটুকুরও ভাড়া আছে দাদা! কিছু না হোক, দুশো আড়াই-শো টাকা ভাড়া তো এর জন্যে গুনতেই হবে মাসে মাসে। চার হাজার টাকায় মাসে আড়াই-শো টাকা সুদ দেবে কোনো ব্যাঙ্ক?'

অত্যন্ত বিশ্বস্ত যুক্তি। লোকটার ওপর নির্ভরতা বাড়ে। নড়েচড়ে বসল উৎপল—'আপনার আর অত ভাবনার কী বিজয়বাবু? প্রেসটা অন্য কোথাও বিক্রি হয়ে গেলে আপনাকে তো বেরুতেই হতো চাকরির ধান্ধায়। আপাতত সেসব ভাবতে হচ্ছে না কিছু। টাকাটা আমি দেব। নিজের মতো করে আপনিই চালাবেন। জাস্ট পার্টনারশিপ বিজনেস। আপনি ওয়ার্কিং পার্টনার...'

চোখ ঠিকরে ঝুঁকে পড়েছেন বিজয় সাহা। স্তব্ধ বিস্ময়ের হেতু—পুরাণ কথায় লেখা থাকে এমন সব ঘটনা! পাথর অহল্যাকে ছুঁতে এসেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, ঈশ্বরী পাটনীকে দেখা দিয়েছিলেন স্বয়ং ভগবতী।

'দেখুন না তাহলে। যদি বিক্রিটা আটকাতে পারেন!'

'পারা-পারি কী বলছেন? আটকাতে হবেই। আমি কাল সকালেই কলকাতা যাব বুড়োকত্তাকে ধরতে...' সহসা উদ্বেল বিজয় সাহা—'এভাবে আপনি এসে পড়েছেন গরিবের ঘরে! আজ বছরকার দিন! মহাষ্টমী বলে কতা! আমি ত ভাবতেই পারছি না। সব মা, মায়ের ইচ্ছে...' ললাটে করজোড় তুললেন বিজয় সাহা।

দূরাগত হিন্দী ফিলমি-গানের উত্তাল তাণ্ডব সত্ত্বেও ঝিঁঝির-ডাক শুনছে উৎপল। দুটো একটা জোনাকি উঠোনের এপাশে ওপাশে। ধবধবে জ্যোৎস্নায় বুঝি কাঁথা সেলাই চলছে আলোর সুতোয়। লম্ফটা জ্বলছিল। লম্ফর মুখে লাল ফুল। ফুলটার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে সিগারেটে নিমগ্ন সে। সংশয় তার নিজের মধ্যেও। আঠার হাজার! চার হাজার কমে গেলেও যে-অঙ্ক, হিসেবের টানে বেড়ে গিয়ে আবার বাড়তি চার হাজার থেকে যায়! কোথায় এত টাকা? ভাবতেই হবে তাকে। আরো বেশি অন্যায়—নিরীহ মানুষের স্বপ্ন নিয়ে অহেতুক জুয়া।

'এখন...এখন আমি কী করি বলুন দেখি?' প্রাণিত বিজয় সাহা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন হঠাৎ।

'কেন? কী হলো?' উৎপল ঘাবড়ে গেল।

'দেখুন দেখি, কী লজ্জার কথা। কষ্ট করে পায়ের ধুলো দিলেন আপনি! এক কাপ চা অব্দি দিতে পারছি না আপনাকে!'

'না না, ওসব কী বলছেন..' লাফ মেরে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমেছে উৎপল—'সে-হবে অন্য একদিন। প্রেসটা যদি হয়, তাহলে তো আপনাকে ছাড়া চলবেই না আমার। তখন চা কেন, বৌদির হাতে রান্না খেয়ে যাব। কিন্তু বিজয়বাবু, ওদের সঙ্গে আপনার কী কথাবার্তা হলো কী করে জানব আমি?'

'হ্যাঁ, সে-ও ত একটা কতা! ঠিকানাটা রেখে যান তা'লে। বুড়োকত্তাই সব। ওনার সঙ্গে কতাবাত্রা বলেকয়ে আমি যাব আপনার কাছে। কালই যাব..'

দরমার বেড়ায় কঞ্চির খাঁজে একটা কাটারি ছিল। তারই পাশে ভাঁজ করা দলা মোচড়ানো ঠোঙা বা কাগজপত্র। এক ঝটকায় তুলে নিলেন বিজয় সাহা। একটু শাদা অংশ খুঁজে নিয়ে পাট করলেন মাটিতে ফেলে।

ডট-পেন সঙ্গে ছিল। লম্ফর ম্লান আলোয় ঠিকানা লিখছে উৎপল, যখন কানের পাশে ঝিঁঝির মতোই ব্যথিত প্রলাপ—'এমনটা হয় না দাদা। ঘরবাড়িতে কেউ থাকবে না গেরস্ত সংসারে? কক্ষনও হয় না। বারাসাতে কোথায় যেন পেরেকের পিতিমে বেলেডের পিতিমে সব হয়েছে। তাই দেখার হিড়িক পড়ে গেছে কলোনিতে। পাড়ার বাচ্চা-বুড়ো মেয়েছেলেরা সবাই গেছে দল বেঁধে। অভাবের সংসারে সারাটা জেবন ধরে ত জ্বলে পুড়েই মরল বুড়ি। তাই আমিও বললাম—যাও, তুমিও যাও। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখে এস। তা দাদা, খেস্টানরাও কি দুগ্‌গা পুজো কচ্চে নিকি আজকাল? যিশুখেস্টর মতন পেরেক কেন মায়ের গায়ে? নাকি পকেটমারদের পুজো। বেলেড-ফেলেড?'

ঘরদোর পড়ে রইল ফাঁকায়। ঝাঁপ বন্ধ করলেন বিজয় সাহা। শেকল টেনে ঠুনকো একটা তালাও আঁটলেন! মূল্যবান অতিথির জন্য এত বড় ঝুঁকিও নিতে পারে মানুষ? কিন্তু উৎপলও নিরুপায়। এত রাতে অকুস্থলে তার একার পক্ষে বাসরাস্তা বা রেলস্টেশনে পৌঁছোনো নিশ্চিতই অসম্ভব।

এবং রাস্তায়, প্লাবিত চাঁদ বা স্ট্রিটলাইটের আলোয় মাখামাখি ঝোপজঙ্গল গাছপালা ঘরবাড়ির গা ছুঁয়ে ঢ্যাঙা দুটো মানুষের ছায়া পায়ের তলায় মাটি লেপটে আছাড়িবিছাড়ি এগোয়। এরই মধ্যে মেঠো পথের নির্জনে স্বপ্নে হাঁটে একজন মানুষ—ব্যবস্থা একটা হবেই। হতেই হবে। ঠিকঠাক লেখাপড়া করে মেশিন দুটো হাতে এসে গেলে জান কবুল করে দেবে সে। দেখিয়ে দেবে, রং-বেরঙের ছবি ছাপার দুটো যন্তর আসলে টাকশালে নোট ছাপার দুটো মেশিন। শুরুর দিকে সংসারের খরচা বাবদ মাসে মাসে হাজার দেড়-দুই সে তুলে দিতে পারবে উৎপলের হাতে। তারা বাপ-ব্যাটাই প্রেসের কর্মী। বাড়তি কোনো লোকের দরকার নেই।

এবম্বিধ আত্মকথনে উৎপল আরো অবগত হলো—বড় ছেলে চাঁদু ক্লাশ সেভেন না এইট পর্যন্ত পড়ে এগোয় নি আর। বছর পাঁচেক হলো, নিজের হাতে ধরে ধরে ছেলেকে মেশিনের কাজে তালিম দিয়েছেন তিনি। ছোঁড়া মেশিনটা বুঝেওছে বেশ। কিন্তু হলে হবে কী! কালার প্রিন্টিংয়ের মজাটা রক্তে ঢোকেনি এখনও। সে-কি এমনি হয় কারুর? অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে চোখদুটোকে রঙের নেশায় মাতিয়ে তুলতে হয়। ওই নেশাটা যদি

ঠিকমতো পেয়ে যান একবার, দেখবেন দাদা, কী ফূর্তি! কী খেলেন কী পরলেন মাথায়ই থাকবে না কিছু। দুঃখু-দুঃখু করে পাগল হতে হবে না আপনাকে। আগেই পাগল হয়ে আছেন...'

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। উৎপল নাড়া খেলো।

'বলুন ত দাদা, আপনারা লেখাপড়া-জানা জ্ঞানীগুণী মানুষ। আপনারাই বলতে পারবেন। আমার ত যেমন-তেমন যা হোক করে কেটে গেল জেবনটা। দুটো মোটা ভাত-কাপড়ে বেঁচে থাকতে পারবে ত ছেলেটা?'

ছমছম নিশুতির আবহে অদ্ভুত ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে হাসল উৎপল—'কেন ভাবছেন অত? একটা হাতের-কাজ শিখে ফেলেছে আপনার ছেলে! স্কিল্‌ড-ওয়ার্কার...'

'না দাদা...' চারপাশের নিঝুম থেকে ভয়ের দলাটা উঠে আসে বিজয় সাহার কণ্ঠনালীতে—'অফসেট ফোটোপিরিন্ট গুষ্টীর-পিণ্ডি কী সব হয়েছে আজকাল। যেভাবে ছেয়ে ফেলছে বাজার। এর পর আর কেউ ত আসবেই না আমাদের কাছে। বলকফলক সব উঠে যাবে শুনছি! কী সুন্দর সুন্দব ছাপা ওদের...'

'আচ্ছা মানুষ তো আপনি...' উৎপল এবার ধমকে হাসল। নিঝুম বায়ুতরঙ্গে কাঁপল চারপাশ—'এজন্যে ঘুম হচ্ছে না আপনার? ধ্যাৎ মশাই, এ-গরিব দেশে আপনি কোথায় দেখছেন অত অফসেট? সে-তো লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার ভাবনা যাদের, তাদের ব্যাপার। সে-আর কজন? এত এত ছোটখাটো মাঝারি ব্যবসায়ীরা সবাই যাবে কোথায়? ওদের তো আসতেই হবে আপনাদের কাছে। ছেলের জন্যে ভাবছেন? এদেশ থেকে ওই ট্রেডল্‌-মেশিন বাতিল হতে হতে আপনার ছেলের ঘরের নাতিও বুড়িয়ে যাবে...'

'বলছেন? বলছেন আপনি?'

'ধ্যাৎ, চলুন তো। এগোন...' উৎপল নিজেই উদ্যোগ নিলো পা বাড়াবার।

অথচ সেই অহেতুক ভয়ের দলাটাই কীভাবে যেন আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলছে তাকে। উৎপল নিজেও বেহুঁশ। অনিশ্চিত স্বপ্নের দিকে আর কতদূরে সে টেনে নিয়ে যাবে এ-মানুষটাকে অথবা চালচুলোহীন এ-মানুষই বা তার সঙ্গী কতটুকু? যা হোক তবু অভাব-অনটনে দুঃখে নিজের মতো করে ছিলেন এক রকম, তাকে ঘর থেকে টেনে এনে অন্যায়ভাবে অন্য এক খেলায়, নিজের খেলায় মাতিয়ে তোলা? পায়ে পায়ে সংশয়। গ্রাম-শহরের মেশামেশি উদ্বাস্তু কলোনির বনপথে হাঁটতে হাঁটতে পাশেই দোতলা বাড়ির অন্দরে টিভির পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। মেমসাহেবি ববছাট চুলের সেই সুন্দরী মহিলা নিশ্চিতই খবর পড়ছেন। বিশ্বসংবাদ।

বড় রাস্তায় উঠে এসে এবার মুক্তি। হাজার হাজার নারীপুরুষ চলেছে দুপাশে। উৎসবের দিকে। গোটা দেশ জুড়ে এখন উৎসব। বিস্তীর্ণ ফাঁকায় এসে কিছুটা নিশ্বাস। বিপুল আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ মাথার উর্ধ্বে।

আকাশে এক খণ্ড মেঘ দেখল উৎপল। মহাষ্টমীর চাঁদ মহাশূন্যপটে নিঃসঙ্গ একা। জ্যোৎস্না রাত সে দেখেনি কতকাল! আরো অদ্ভুত লাগে, টর্চলাইটের মতো দুটো মাত্র চোখকে সম্বল করে বেঁচে থাকা সংলগ্ন মানুষটিকে। আকাশের দিকে তাকালে যেমন পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক বিশ্বের মগজে, সত্যি অদ্ভুত, লোকটা অফসেটে ভয় পায়!

সকালের দিকেই ঘটল ঘটনাটা। বেলা প্রায় দশটা নাগাদ।

শ্যামল যথারীতি বাড়ি ছিল না। ভোর সাতটায় হাতিবাগানের মোড়ে তার ফ্যাক্টরির গাড়ি আসে। অফিসারদের কুড়িয়ে নিয়ে যায়। স্কুলের জন্য বেরোবে বলে অত্যাবশ্যক সাজগোজ এবং প্রসাধনশেষে সুনন্দা সবেমাত্র প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, নিচে সদর দরজায় কড়া নড়ল। খুড়তুতো বোন ছায়ার হাঁক—'তোমার চিঠি ছোড়দা। রেজিস্টিরি...'

একতলা থেকে উঠে গিয়ে ধ্বনিতরঙ্গ ধাক্কা মারল দোতলায়। পায়ের তলায় মাটি কাঁপল না, ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মানুষগুলি। দীর্ঘ প্রত্যাশার সেই চিঠিই হয়তো-বা। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রেণুবালা। নিজের ঘব থেকে সুনন্দা। বাথরুমে ঢুকে সবে গায়ে জল ঢালতে শুরু করেছে কৃষ্ণা। সে-ও শুনল। অসমাপ্ত স্নানেই তার বেরিয়ে আসার তাড়া। শুধু সত্যসাধন, হার্টের রোগী, আকস্মিক উত্তেজনা বা উদ্বেগের চাপে বুকের ধড়ফড় বেড়ে যেতে পারে জেনেও যখন ছেলেকে নেমে যেতে দেখলেন দ্রুত, ঘর থেকে বেবোলেন।

সদর দরজায় ভেঙে পড়ল গোটা বাড়ি। উৎপলকে ঘিরে সবাই। একতলার কাকারা, হলুদলঙ্কার-গন্ধমাখা কাকিমারাও কৌতূহলী জটলায়। যেহেতু লম্বা ব্রাউন রঙের খামের ওপর ব্যাঙ্কেরই মুদ্রিত নাম, চোখে চোখে দম-চাপা রুদ্ধশ্বাসে উৎকণ্ঠা বাড়ে।

সইসাবুদের পর জনসমক্ষেই খামটা ছিঁড়ল উৎপল। শুরু করল পড়তে।

ব্যাঙ্কেরই প্যাডে টাইপ-করা অক্ষরে অক্ষরে দীর্ঘ পত্র। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে একের পর এক বাক্যসমষ্টির ক্রমান্বয় বিস্তারে গড়ে-ওঠা ভাষার চতুষ্কোণ থেকে এতগুলি নরনারী, একটি সম্পূর্ণ পরিবার জেনে নিতে চায় তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের সুখশান্তি বা নিরাপত্তার আশ্বাস। অথচ পাঠের দীর্ঘ সময়ে সমান্তরাল বাক্যগুলির প্রতিটি সরলরেখায় পলকলেহনে উৎপলের কুঞ্চিত ভ্রূরেখা কিছুমাত্র কাঁপল না। সমবেত চোখগুলি সেদিকেই তাকিয়ে থেকে, যেন চিঠিটাই কোনো আগন্তুক ব্যক্তি, তাকে বুঝে নিতে চাইল।

কোনো চঞ্চলতা নেই। বিকারহীন বিশুষ্ক ঔদাসীন্যে কাগজটা বাবার হাতে তুলে দিয়ে উৎপল ঊর্ধ্ববর্তী শূন্যতায় তাকাল একবার। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল।

আর্তনাদ করে উঠলেন রেণুবালা—'কি রে, কী হলো? বল্...'

দৃকপাতহীন নির্মমতায় পরিজন ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে ছেলে, দেখেও সত্যসাধন, চশমাটা আনা হয়নি বলে চিঠিটা হাতে নিয়ে অন্ধই যখন, সুনন্দা হাত বাড়াল না। ইংরেজির শব্দার্থ নয়, এসব আপিশকাচারির ভাষা দুর্বোধ্য জটিল। ছুঁয়ে দেখতেও ভয়।

বরং সকলেই সত্যসাধনের অনুগমনে উঠে এল দোতলায়, যেখানে আপাতনিরুদ্বেগ উৎপল রেলিংয়ে ভর রেখে বারান্দায় স্থির।

পড়লেন সত্যসাধন। একবার নয়, বার দুই তিন। বুঝতে চেষ্টা করলেন। যেভাবে যেটুকু বুঝলেন, মর্মার্থ তার—চাকরিটা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে। তবে শর্ত সাপেক্ষ। শর্তাবলি অদ্ভুত—অনুপুঙ্খ সন্ধান সত্ত্বেও আশি হাজার টাকা তছরুপের ক্ষেত্রে যেহেতু উৎপল দাশগুপ্তের কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যোগাযোগ প্রমাণিত হয়নি, আইনানুগ

ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বেহাই দিলেও তদন্তকারী অফিসারগণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, অভিযুক্ত অফিসারেরব অনবধানতা বা ভ্রান্তির নিমিত্তই এই বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি। জনসাধারণের সম্পত্তির অছিসংস্থা নির্বিচারে এবম্বিধ অন্যায় মেনে নিতে পারে না। সুতরাং তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পদে পুনর্বহাল হলেও নিম্নোক্ত শর্তাদি কার্যকর থাকবে।

ক আগামী তিন বছরের জন্য বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট স্থগিত।

খ অর্থনৈতিক লেনদেনের দায়িত্ব থেকে চির অব্যাহতি এবং শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজকর্মে ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সীমাবদ্ধ।

গ পূর্বতন ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস।

শীতশেষে বসন্ত-বাতাসে অকস্মাৎ আন্দোলিত হতে চায় সংসারের বেণুবন।

ছোড়দা যুগ যুগ জিও। উৎপল দাশগুপ্ত জিন্দাবাদ...' উচ্ছল খুশিতে ছোড়দাকে জড়িয়ে ধরে একটা পাক খেয়ে ফেলল কৃষ্ণা। সদ্য স্নানের পর মেয়েটা বড় তাজা—'উঃ ব্বাঁচা গেল। কত দিন বাদে যে খোলামেলা নিশ্বাস পেলাম একটু! বাব্বা! পড়াশুনা তো লাটেই উঠে গেছে। মাত্র দুমাস বাদে টেস্ট .'

ভগ্নীর উচ্ছ্বাস চঞ্চলতায় এতটুকু কাঁপুনি নেই সংশ্লিষ্ট যুবকের।

বরং মেয়েটা ধমক খেল। চিঠির তাৎপর্য নিয়ে ভাবনার শুরুতেই ছানির চোখে ঝাপসা দেখছেন সত্যসাধন এবং মগজ খননে বিষযটা যত বেশি গাঢ় হয, অন্ধকার বাড়ে। ঘোর তমসা! খোকনের বর্তমান বেতন বহাল থাকছে। থাকলই বা। তিন বছর ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকলে...কী সর্বনাশ! ভবিষ্যৎ ঘুলিয়ে যায়। বছরে প্রায় দুশ টাকা বেতন বৃদ্ধির নিয়মে প্রথম বছরেই প্রায় আড়াই হাজার, দ্বিতীয় বছরে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি! আনুমানিক হিশেবে তিন বছরে সাত হাজারেরও বেশি টাকা অকারণ ক্ষতির পরও বাকি জীবন ধরে শুধু ক্ষতি, ক্ষতি... ক্রমাগত ক্ষতির খানি চক্রবৃদ্ধিহারে

শেষপর্যন্ত অন্যায় অসম্মানের গ্লানি এড়ানো গেল না কিছুতেই। প্রাচীরবিহীন বন্দীশালায় নিজের অবস্থান বুঝে নিয়ে উৎপল তার শাণিত চোখের তীক্ষ্ণতায় বাবার দিকে তাকিয়ে ফ্রিজ। তিন বছর ইনক্রিমেন্ট স্টপড! ব্যাঙ্ক বা যে-কোনো চাকরিতেই কুচ্ছিত ধরনের শাস্তি। সিনিয়রিটিতে তিন বছর পিছিয়ে যাচ্ছে সে? শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, কেরিয়ারের লম্বা দৌড়ে পেছনের ছেলেরা একে একে টপকে যাবে! সামাজিক অসম্মান! অমর্যাদায় বেঁচে থাকা আজীবন

শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে কিছুটা ঘোমটা তুলতেই হয় ঘরের বৌকে। নিদেন খোঁপাটুকু ঢেকে অবগুণ্ঠন-সংক্ষেপ। এমন শুভদিনে স্কুলে-যাওয়া বাতিল হলো সুনন্দার। চিঠির অর্থ বা ব্যঞ্জনা নিয়ে নানাবিধ গবেষণা-গুঞ্জনে তারও বলার থাকে কিছু —'তবু তো মন্দের ভালো। মাত্র আটাশ বছর বয়সে খোকন যা মাইনে পায়, সেখানে পৌঁছতে হলে আমাদের স্কুলের চাকরিতে এম এ. বি. এড পাশ করে বছর দশেক অপেক্ষা করতে হয। নিরুপমাদি আজ প্রায় বাইশ বছর আমাদের স্কুলে আছেন। এম এ। ছেষট্টি না সাতষট্টি সালের বি টি.। এই তো সেদিন, বছর দেড়েক হলো বোধ হয়, পে-বিলে প্রথম ফোর-ফিগার দেখলেন ভদ্রমহিলা। এখন সাড়ে বারোশো ব কিছু বেশি পান। সব কেটেকুটে বারো শো...'

অভিভাবকের নির্দেশেই নিজের ঘরে ঢুকল সুনন্দা। টেলিফোন করে জানাতে হবে

মেটিয়াবুরুজের কারখানায়—সুসংবাদ। ভাইয়ের চাকরির ভাবনায় নিজেও তো এতদিন সুস্থ ছিল না মানুষটা!

হঠাৎ উৎপল, পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য মূর্খগুলির সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই, এবং তার সরে-যাবার দমকা বাতাসে কাঁপল ঘরের মানুষজন। কেন না, চাকরিটা শেষ পর্যন্ত খোকনের। অথচ কোনো কথাই বলছে না সে। ওদিকে, দুর্যোগের মেঘ কেটে গেছে বা চোরচামার নয় তাঁর ছেলে, ধম্মো আছে প্রমাণ হলো সেটা, মুখ তুলে তাকিয়েছেন ভগবান...ইত্যাদি প্রচারে, নিচের তলার দেওর বা জা-দের শোনানোর অভিপ্রায়ই হয়তো, মাত্রাতিরিক্ত চড়া গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে রান্নাঘর থেকে ছুটে আসছিলেন রেণুবালা। অপরিসর বারান্দায় ছেলের সঙ্গে সজোর ধাক্কা। হেসে, ছেলের থুতনি ছুঁয়ে আদর খাবার জন্য হাত বাড়ালেন উঁচুতে। সন্তান আমল দিলো না। মাতৃহৃদয় ভয়াবহ। গলা ফাটিয়ে জানাচ্ছেন—আসছে বছর শ্রাবণ মাসে কোনো এক সোমবার শেওড়াফুলির নিমাইসন্ন্যাস ঘাট থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার বাঁক বয়ে হেঁটে যাবেন বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে। অনেক আগে হাসপাতালেই মৌন মানত ছিল। এই শ্রাবণে হয়নি। চাকরিটা ফিরিয়ে দিয়ে বাবা ফের মনে করিয়ে দিলেন। ওটা বাবার পাওনা।

নিজের ঘরে ঢুকে সর্বাঙ্গের দাহে লাথি মেরে চারপাশটা ভেঙে ফেলার দুর্দম প্রতিহিংসা যেহেতু ভেতর থেকে এক দুঃসহ চাবুক—যন্ত্রণায়, দুহাতের পাতায় আঙুলগুলো কিছু একটা খাবলে ধরার উত্তেজনায় কাঁপে—ব্যাঙ্কের চাকরিতে একজন অফিসারকে অপারেশন সাইড থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেকশনে সরিয়ে নেওয়া কী তীব্র অপমান! শার্টপ্যান্টের মতোই এই অসম্মানকে গায়ে আঁটোসাটো জড়িয়ে নিয়ে ছাপোষা কেরানি বনে থাকার গ্লানি আজীবন? ছোট হতে হতে, নিচু থেকে আরো নিচু হয়ে বেঁচে-থাকার নিয়ত অভ্যাসে অতি খর্বকায় এক মানুষ! মেনে নাও, মেনে নাও, সব কিছু মেনে নিয়ে বাঁচো। যন্ত্রণাটা চারিয়ে যেতে থাকে। প্রশ্বাসের ফুসফুস থেকে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। হাঁটুর গাঁটে গাঁটে একটা লাথি উঁচিয়ে উঠতে চায়। ডান হাতের কব্জিতে ঘুষি—দুর্নিরীক্ষ্য শত্রু:

আত্মহত্যা পাপ, হত্যা অপরাধ, জীবন মহৎ

কতগুলো সাজানো বানানো কেতাবী বুজরুকি শালাদের। মগজের খাঁচায় নেকড়ের হিংস্রতাকে শাসনে বেঁধে রেখে বহিরঙ্গের শান্তশিষ্ট সুবোধ চেহারাটা জিইয়ে রাখার কঠিন চেষ্টায় সে তার প্যান্টটা টেনে নিল। কেন না ক্রুদ্ধ হয়েও আর লাভ নেই কোনো। চারপাশ ভোঁতা

বরং ঘুরে আসবে কোথাও। গৃহ দুঃসহ। অথচ এই মুহূর্তে তার কোনো বাহির নেই। পায়জামা-গেঞ্জি থেকে প্যান্টশার্টে, ঘরের-মানুষ থেকে বাইরের-মানুষে নিজেকে পাল্টে নেবার মুহূর্তে বারান্দায় পিতৃদেব সত্যসাধনের গলার স্বর শুনতে পেল। কী যেন বোঝাচ্ছেন কাউকে। ওরা উৎসবে মেতেছে।

অর্থহীন সেই রাগটাই চামড়ায় চামড়ায় চিড়বিড়িয়ে একটা অর্থ পেতে থাকে এরপর। হ্যাঙার থেকে জামাটা টেনে নিয়ে সে গায়ে জড়িয়ে নিলো দ্রুত। জীবন যদি এতই মহৎ, জীবনকে তুমিই বা কী ফিরিয়ে দিয়েছ শ্রীযুক্ত সত্যসাধনবাবু? কেরানির চাকরিটা এমন কিছু খারাপ কাজ নয়। ভদ্রজনরাই করেন। কিন্তু স্বভাবে-গাড়ল ভালোমানুষী তসবিরটাকে জিইয়ে রাখতে নিজের

পেশাকেও সম্মান দিতে পারলে না কোনোদিন। পাখির মতো গাছের ডগায় বাসা বেঁধে শুধু মেনে নিয়ে মেনে নিয়ে মেনে নিয়ে জীবনভর সব কিছুই মেনে নিয়ে রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের বাইরে সুখ বুঝলে না কোনোকালে। জীবনে কোনোদিন, অন্তত একবার, সামান্যতম প্রতিবাদ করেছ কোথাও? শাবকদের রক্ষা করেছ? আসলে করো নি। নিজের মতোলে গুডবয় বানিয়েছ একজন—শ্যামলচন্দ্র

পাখির চেয়ে জানোয়ার ভালো। সে তার বাচ্চাকে শিকার চেনায়।

সঙ্কীর্ণ বারান্দায় সবাইকে ঠেলে দুরন্ত বেগে তার বেরিয়ে যাবার দৃশ্যে আতঙ্কিত হলেন গৃহবাসীরা। চিৎকার করে ডাকলেন রেণুবালা, পিছু-ডাকা অন্যায় জেনেও। সিঁড়ি ভেঙে পিছু পিছু ছুটল কৃষ্ণা।

উৎপল তখন রাস্তায় বেগবান।

বেলা প্রায় আড়াইটায় একটু ঢিলেঢালা মেজাজেই ছিলেন সহকর্মীরা। উঠে দাঁড়িয়ে, এগিয়ে এসে কুশল প্রশ্নে আগ্রহী হলেন সকলেই। ঝোপজঙ্গল এড়িয়ে উৎপল ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজারের খাসকামরায় ঢুকল।

'কনগ্র্যাটস্, কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্ মিঃ দাশগুপ্ত...' হাত বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ধড়িয়া—'এই তো, এই একটু আগে আপনার দাদা টেলিফোন করেছিলেন '

কিছুমাত্র আকৃষ্ট হলো না উৎপল। চেয়ারে বসল।

বেল টিপলেন মিঃ ধড়িয়া। দরজায় 'জো হুজুর' নবকান্ত।

'কী খাবেন? চা না কফি?'

'যা খুশি।'

'দো কফি বানাও আচ্ছাসে। জলদি...' দু-আঙুলের 'ভি' তুলে বাঁদিকের নির্দেশ দান থেকে মিঃ ধড়িয়া ঝুঁকে তাকালেন ডানদিকে—'আপনি কি আর. এম. ও. গিয়েছিলেন?'

'না!'

'ইউ আর লাকি টু হ্যাভ সাচ এ লাভিং ব্রাদার! আজকাল তো দেখাই যায় না এরকম...' রাজকীয় হেলান। বুকের বোতাম খোলা। ধবধবে গেঞ্জির ওপর রোমশ বুকে আঙুল বুলোতে বুলোতে মিঃ ধড়িয়া—'অফিস থেকেই টেলিফোন করেছিলেন। এখন খোদ আর. এম.-কে ধরার চেষ্টা করছেন। বোধ হয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও হয়ে গেছে। কাল যাবেন...'

'একটা কথা ছিল আমার!'

'হ্যাঁ, বলুন।' মিঃ ধড়িয়া সাগ্রহে উদগ্রীব।

'আমার চাকরিটা কিন্তু এখন আর আনকণ্ডিশনাল নয়...'

'হ্যাঁ শুনেছি...' খুশির গমক থেকে এবার নিজেকে একটু বিন্যস্ত করলেন মিঃ ধড়িয়া—'তবু তো যা হতে পারত, লিগাল অ্যাকশন, সেসব কিছু হয়নি।। উই আর হ্যাপি...'

ভ্রূকুটিতে তাকাল উৎপল।

টেবিল থেকে অকারণেই ডটপেনটা তুলে নিয়েছেন মিঃ ধড়িয়া—'এ-রকম সিমিলার কেসে হাইয়েস্ট পানিশমেন্ট পাঁচ বছর পর্যন্ত ইনক্রিমেন্ট স্টপড হবার দুটো একটা ঘটনা, এ-তো আমি

নিজেও জানি...'

'আমার তিন বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রেখে ব্যাঙ্কের যে-হাজার হাজার টাকা বেঁচে যাবে, ওতে আশি হাজার টাকা পুষিয়ে নিতে কত বছর লাগবে আপনাদের?'

ধড়িয়া চুপ।

'নাউ আই অ্যাম ওনলি টুয়েন্টি এইট। বছর দশ বারোর মধ্যে টাকাটা শোধ হয়ে যাবার পরও চাকরিটা থাকবে। এই ভূতের দেনা মেটাতে মেটাতে আমার কত লক্ষ টাকা ক্ষতি আজীবন?'

'আহা...হা, অত ভাবছেন কেন?' জ্যেষ্ঠের হৃদ্যতায় ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেন মিঃ ধড়িয়া—'শুনেছি তো আপনার তিন বছরটাও কমাবার চেষ্টা চলছে। হালিমসাহেবরা কথা বলছেন, অফিসার্স ইউনিয়নও ডেপুটেশন দেবে। অ্যাবাভ অল, শুনছি তো আর. এম. নিজেও নাকি সিম্‌পেথেটিক। আপনার ওই সুইসাইড অ্যাটেম্পটটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে আপনাকে। মেডিকেল রিপোর্ট পুলিশ রিপোর্ট সবাই বলেছে ইট ওয়াজ এ সিরিয়াস অ্যাটেম্পট টু এমব্রেস ডেথ...'

'অল ননসেন্স। বোগাস...'

ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ হলেন মিঃ ধড়িয়া।

'ওটা আদৌ কোনো সিরিয়াস কিছু ছিল না মিঃ ধড়িয়া।'

'কী বলছেন? হোয়াট...হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'সে-তো আরেক স্টুপিডিটি। সো ইন্‌সিনসিয়ার, বিষ গেলাটাও হলো না ঠিকমতো। ফসকে গেল।'

এবম্বিধ নাট্যকলার স্থান অফিস নিশ্চয়ই নয়। ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর হলেন মিঃ ধড়িয়া—'এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন?'

'বলার মতো মানুষ আপনাকেই কাছে পাচ্ছি বলে।'

'এন্‌কোয়্যারি রিপোর্ট তো বলে নি—আপনি নির্দোষ। আপনার একটা মারাত্মক ভুলের জন্যেই ব্যাঙ্ককে ব্যাড ডেট ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে আশি হাজার টাকা...'

'তামাম ভারতবর্ষ জুড়ে কয়েক ডজন ব্যাঙ্ক আপনাদের। হাজার কয়েক ব্র্যাঞ্চ। বলতে পারেন, এভাবে কত কোটি কোটি টাকা আপনারা ব্যাড-ডেট ডিক্লেয়ার করছেন প্রতি বছর?'

কফির ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে নবকান্ত। স্বস্তি খুঁজতে একটু নড়ে উঠেছিলেন মিঃ ধড়িয়া। আবার ঝাপট

'আর সারা বছরে গোটা কয়েক ব্র্যাঞ্চে যে ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হয়, তাতে কত কোটি টাকা ক্ষতি সরকারের?'

'হাউ ডেঞ্জারাস! তাই বলে...তাই বলে ব্যাঙ্ক রবারিকে ছোট করে দেখছেন আপনি?' এমার্জেন্সি অ্যালার্মের তলায় বসে গোল-গোল চোখে মিঃ ধড়িয়া—'জানেন, কী ভীষণ ব্যাপার সেটা?'

'জানি খারাপ, খুবই জঘন্য অ্যান্টিসোশ্যাল কাজকারবার সব...' নিরুত্তেজ শান্ত উৎপল—'আমি বলছি, মাই আম্‌বল্ কোশ্চেন স্যার, এত সব আমর্ড-সেন্ট্রি নাইট-গার্ড স্ট্রংরুম

ভল্ট শাটার কলাপসিবল গেট পেল্লাই পেল্লাই তালা ঝুলিয়ে হোয়াট ট্রেজার ইউ সিক টু প্রটেকট অ্যান্ড ফর হুম?'

গঙ্গাপ্রসাদ ধড়িয়া এবার ধৈর্য হারালেন। রীতিমত গর্জনে—'হোয়াই ডু ইউ আস্ক মি অব দ্যাট? আর. এম. ও যান। সেখানে খোঁজ নিন...'

উত্তেজনার ঝোঁকে যখন কিছুটা শান্ত উৎপল

ঝামেলা এড়াতেই মিঃ ধড়িয়া একটু সংযত এবার—'এখন আমাকে গালমন্দ দিয়ে কোনো লাভ নেই মিঃ দাশগুপ্ত। যেটুকু পেরেছি, আমার ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু সম্ভব ছিল, সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি আপনার জন্যে...'

'থ্যাঙ্কস।'

মধ্যবর্তী কফির কাপে অবিরাম পাখার বাতাস। মাননীয়দেব ওষ্ঠের উত্তাপে বেচারির দেবার কিছু নেই। সে নিজেই জুড়োয়।

এক চুমুকেই নিজেরটা শেষ করে এক ঝটকায় লাফিয়ে দাঁড়াল উৎপল—'সত্যি ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাঙ্কস। এখন চলি..'

দীর্ঘ ললাটে ভাঁজ তুলে, শান্তভাবে ডটপেন নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন মিঃ ধড়িয়া। ভাঁজগুলো আরো তীক্ষ্ণ হলো—'আপনি জয়েন করছেন তো তাহলে?'

'ভেবে দেখিনি। হয়তো না।'

বিচলিত গঙ্গাপ্রসাদ উঠে দাঁড়িয়েছেন—'আরো একবার ভেবে দেখবেন মিঃ দাশগুপ্ত...'

'গার্জিয়ান হিসেবে আমি আর কাউকে মানি না মিঃ ধড়িয়া। অ্যাডাল্টস আর অল লাইক ফরেনার্স উইদাউট ভ্যালিড পেপার্স অর ভিসা...'

দরজা পর্যন্ত এগোলেন মিঃ ধড়িয়া। রীতিমত সন্ত্রস্ত—'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

'ধন্যবাদ।'

তার উপস্থিতিতে কাচঘরের বাইরে পুষ্পিত কাননে দোল খেলো সবল বৃক্ষসকল, জীবিকার জমিতে দৃঢ় প্রোথিত থাকার সুখী ভাবনায় পত্রপল্লবে বর্ণময় যাদের ডালপালা। গুটি গুটি এগিয়েও এলেন কেউ কেউ। উৎপল তার নিজের বিস্বাদে, অন্তর্দাহে, ছিটকে বেরিয়ে এল সীমানা ডিঙিয়ে বাইরের বৃহতে—মরে গেলে হারাতে হয় অনেক কিছুই। বেঁচে থাকলে এখানে, এই মায়াবী উদ্যানে, পরভৃত বসবাস।

এমন খরায়

এবং বহির্দেশে, জন-অরণ্যের কলকাতায় আলিঙ্গন নেই। বরং খোলা আকাশের কয়েদখানায় যে-কোনো আলিঙ্গনই সর্বদেহের কুঞ্চনে ঘৃণা এখন! বিতৃষ্ণায় নিষ্ঠীবন।

রণাঙ্গন প্রস্তুত। আগুনে আগুনে জ্বলছিল দুপুর। রাস্তার দুপাশে ঝলসানো ঋজুদৃঢ় শ্রেণীবদ্ধ প্রাসাদ-অট্টালিকা লৌহবর্ম সেনাবাহিনী শত্রুর—ওদের ভারি বুটের চাপে গলিত তপ্ত কালো পিচে, যেন এদেরই ইচ্ছায় অথবা নির্দেশে ট্রাম বাস মোটর ট্যাকসি লরি এবং মানুষ...চিৎকার কোলাহলে ধ্বনিদূষণে বায়ুদূষণে দূষিত নগরীর দিগন্তশূন্য প্রশস্ত সড়কে, উৎপল, নিজের কাছেই

নিজে এক অপহৃত যুবা, আত্মসন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে, কোনো পরশপাথর নয়, লটারির যাদুবিত্তও নয়, 'ওপেন সিসেম'-এর দরজা থেকে দূরে, অরণ্যে, পাথরে পাথর ঠুকে সেই আদিবিদ্যার মোহিনী আবিষ্কারে মরিয়া—আগুন চাই, দাবানল শিখা! যদি পুড়িয়ে লোপাট করে দেওয়া যেত সব! ভণ্ডামি মাতলামি বাকতাল্লার মুখোশ চিরে চিরে উদোম আর ন্যাংটো করে দেওয়া যেত ওদের গলিত কুষ্ঠের ক্ষত

এবং তখনই, দুরন্ত-বেগ একটা বাসের হাতল আঁকড়ে ধরে আচমকা সে লাফিয়ে উঠল বিপজ্জনক ঝুঁকিতে। যদি বাঁচা, এভাবেই বেঁচে-থাকা। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে ভেংচি কেটে, পদাঘাতে প্রতিদিন

এবং নাতিদীর্ঘ পথের শেষে বাস থেকে নেমে, মঞ্চে প্রবেশের আগে বিদূষক-ভূমিকায় অভিনেতার জামা পাল্টানোর মতোই নিজেকে বদলে, আগ্নেয় ক্রোধের চড়া থেকে একেবারে খাদে নামিয়ে এনে গড়েপিটে তৈরি করে নিতে হয় মেজাজটাকে। প্রায় পুরোপুরি একটি ভাঁড়ই হয়তো-বা! কষ্ট, ভীষণ কষ্ট যদিও, অনন্যোপায়। দেশ আর জনতার জীয়নকাঠি যদি এদেরই হাতে!

ভাগ্যই মানতে হয় এর পর। লোকটা ঘরে ছিল।

চিৎপুরে দশতলা স্ট্যাফোর্ড বিল্ডিং-এর তিনতলায় রহস্যজনক সব কাজকারবারের হাটে ছোট একটা খুপরিতে একজন টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্ক বুড়ো ভদ্রলোক, দুটো টেবিল, একটি আলমারি, গোটাকয়েক চেয়ার নিয়ে অফিস। মেদবহুল এক বিশাল ভদ্রলোককে সামনে রেখে ফাইল কাগজপত্র ভারি ভারি লাল-মলাটে খেরো-খাতায় পাহাড় নিয়ে অনর্গল কী বকে যাচ্ছিল তাপস। অভাবনীয় শ্যালককে দরজায় দেখেও কিছুমাত্র বিচলিত নয়। এমন কি, চোখের কাঁপুনিতে চেয়ারের ইশারা ভিন্ন অন্য কোনো কর্তব্যও তার নেই। একটা চেয়ারে বসে থাকার দীর্ঘ সময়ে উৎপল ধৈর্য হারাল। দশটা মিনিটও যেখানে দুঃসহ, আধঘণ্টা পেরিয়ে যায়। বিস্তর ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি, অডিট-রিপোর্টের চুলচেরা বিশ্লেষণ, যেসব ভাউচার নিয়ে কূটতর্ক তার মুশকিল-আসান ইত্যাদি শ্রবণেও যখন ভ্রূকুঞ্চন থেকে ললাট আর মসৃণ হয় না ক্লায়েন্টের, বাগবিস্তার বৃদ্ধি পায় তাপসচন্দ্রের। ইংরেজী বাংলা হিন্দী, কোনোটাই যথার্থ কিনা সংশয় যদিও, অনর্গলতায় খামতি নেই। চা আসে, সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ে, দশ লাখ পনের লাখ ত্রিশ লাখ শব্দগুলি পিংপং বলের মতো খেলতে থাকে টেবিলে।

উৎপল তাকিয়ে থাকে। হীরের বোতাম নেই, দামী জর্দার সুঘ্রাণ নেই, তবু কোনো আনুষ্ঠানিক পরিচয় ছাড়াই সম্ভ্রান্ত অতিথি তার চেনা। খুবই চেনামুখ। পরম আহ্লাদের ভগ্নীপতি যাঁর কোষাগার-প্রহরী

এবং ভগ্নীপতি স্বয়ং তার পরিচিত পৃথিবীর এক গোলমেলে ধাঁধা। দুই মেয়ের পর অতি সম্প্রতি তার সহোদরা অগ্রজা তৃতীয় কিস্তিতেও আরো একটি কন্যা-সন্তানের জন্ম দেবার পর বড় রকমের একটা দুর্যোগের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল কানাই মল্লিক লেনের ভদ্রজনেরা। উৎপল তার সবটা জানেও না ঠিক-ঠিক। প্রচণ্ড কিছু যে ঘটে নি তার নিশ্চিত প্রমাণ—মা-বাবা দাদা-বৌদি কৃষ্ণার সাম্প্রতিক আচরণে এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো দুর্লক্ষণ নেই।

বরং মনে পড়ল, সেই শিশুকে, আজ প্রায় চার-পাঁচ মাস পেরিয়ে যাবার পরও সে নিজেই

যাকে দেখে নি এখনও। বছরে একদিন, ভাইফোঁটার বাধ্যতামূলক দিনটি ছাড়া ওবাড়িতে যাবার ইচ্ছে তার থাকে না কখনও। গোটা বাড়িটাই অদ্ভুত। গোলগাল চৌকো তিনকোণা চ্যাপ্টা-মোটা বেঁটে-লম্বা ফর্সা-কালো বাড়িশুদ্ধ বিচিত্র সব নারীপুরুষ। ছোট বড় সকলেই দেওঘরের কোন্ এক ঠাকুরবাবার শিষ্যশিষ্যা। সন্ধেবেলা দল বেঁধে ঠাকুরের নাম গায়। সর্বাধিক সরেস কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি—মানস। উৎপলের ধারণা, বয়সে দু-চার বছরের বড়ই হবে হয়তো। বি. কম. না কী যেন পড়েছিল এক সময়। পাশ-ফেল জানা নেই। যেহেতু অদ্যকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. হবার চেয়ে দেশজনতার এম. এল. এ. হওয়া সহজতর, অবিচল শ্রমে এবং নিষ্ঠায় মানসবাবু তাঁর নিজস্ব এলাকায় প্রখ্যাত যুবনেতা। অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

অবশেষে এক সময় আলোচনা ভাঙল ওদের। ফাইলপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তাপস। কোথায় বেরুবে। উৎপলও প্রস্তুত।

'হ্যাঁ বলো, কী বলবে?'

'একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।'

'নতুন ভাগ্নী হয়েছে একটা। অন্তত তাকেও তো একবার দেখতে যাওয়া যেত। দিদির শরীরটা ভালো নেই। অসুখবিসুখে ভুগছে। তারও খোঁজখবর নেই! হঠাৎ এসে কথা?'

উৎপল হাসল—'আচ্ছা, রাগ করছেন কেন? জানেনই তো আমার অবস্থা। মাথাফাথা কি কিছু ঠিক থাকে নাকি কারুর এ-অবস্থায়?'

দুর্জ্ঞেয় শ্যালককে সামাল অথবা বটবৃক্ষ মক্কেলের তুষ্টি, বিব্রতবোধে তাপস ডান দিকে তাকাল—'আপ বৈঠিয়ে। ইয়ে হামারে শালে হৈ। কিসি কাম কে লিয়ে আয়ে...'

'ও, শালে সাহাব!' ভারি চেহারায় গমকে গমকে হাসছেন ভদ্রলোক—'বহুৎ পিয়ারে আদমি হৈঁ। আচ্ছা ফির বড়িয়াসে খানাপিনা হো। চলিয়ে, মেরে গাড়ি বাহার হ্যায়...'

মূলত পরান্নভোজী তাপস, কী আশ্চর্য, কিছুমাত্র লুব্ধ হলো না।

বাইরে, লিফ্‌টের পাশে এসে দাঁড়াল দুজন। বিশাল জানালার ধার ঘেঁষে। কোনো রকম ভণিতা ছাড়াই উৎপল একেবারে সরাসরি—'হাজার পাঁচ-সাত টাকা দিন তো। খুব জরুরি।'

আচমকা বাম্পার সামলাতে হিমশিম তাপস ফ্যালফ্যাল তাকাল—'সাত হাজার? কী বাজে কথা বলছ! এত টাকা আমি কোথায় পাব হঠাৎ?'

'ধ্যাৎ, আপনাব টাকার অভাব? ছাড়ুন তো, ছাড়ুন মালকড়ি। আমার দরকার। ভয় নেই। এমনি নেব না। ব্যাঙ্ক রেটে ইন্টারেস্ট দেব। এক-বছর দেড় বছরের মধ্যেই পেয়ে যাবেন...'

'না না, সেটা কথা নয়। কিন্তু কী করবে তুমি অত টাকায়?'

'সে-করব একটা কিছু। বলব সবই ডিটেলে বলব আপনাকে...' উৎপল তার মেজাজে ঢেউ খেলানো হালকা চালটা জিইয়ে রাখে। যস্মিনজনে যদাচার—'আমি তো গালাগাল নই আপনার। আইন মোতাবেক শালাই। সে-যদি টাকাটা মেরেই দিই, তারপর না হয়...'

তাপস বড়ই বিপাকে। বিপন্ন অবস্থায় সুকৌশল পরিত্রাণ খোঁজে। বললেই তো হবে না, ব্যাঙ্ক রেটে ইন্টারেস্ট দেবে। এসব তেজারতি চলে না কুটুমবাড়িতে। কিন্তু নাক-উঁচু আঁতেল শালা এভাবে হঠাৎ তার কব্জায়! সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল—'তোমার চাকরি? চাকরির কী হলো?'

'সে-তো চিঠি এসে গেছে। চাকরিটা ফিরিয়ে দিচ্ছে ওরা।'

'গুড, ভেরি গুড নিউজ...' ঘুরে দাঁড়াল তাপস—'ব্যস, তাহলে আর কী! কবে চিঠি এল?'

'আজই সকালে...' চলে যাচ্ছিল তাপস। উৎপল খাবলে ধরল—'এ-কি যাচ্ছেন কোথায় আপনি?'

'আরে, দেখলে না বসে আছে লোকটা। কাকে টুপি পরাতে গিয়েছিল, এখন লাখ লাখ টাকায় ফেঁসে গেছে শালা। এক্ষুনি ওর সঙ্গে বেরুতে হবে। গাড়ি নিয়ে এসেছে।'

'বাঃ, নন্‌ক্রিডেন্সিয়াল শালার জন্যে এত করছেন! আর আমি?'

'আঃ, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে হয় নাকি এসব? এত টাকার ব্যাপার...' ঠিকমতো বিরক্ত হতেও সাহস পায় না তাপস—'একদিন এসো বাড়িতে। ডিটেল সব শুনি। তবে তো..'

'অলরাইট যাব। কাল কি পরশু সকালের দিকেই চলে যাব। আপনি কথা দিচ্ছেন তো?'

'সে-দেখা যাবে। আগে তো শুনি সব...'

'শুনিটুনি না। আই ডিপেন্ড অন ইউ।'

তাপস চলে গেল। লিফটের লাইনে এসে দাঁড়াল উৎপল। মগজের মধ্যে তখনও পিলপিল পিঁপড়েরা হেঁটে যায়। এ-টাকা আদায় করবে সে। করতেই হবে। শ্রীযুক্ত সত্যসাধন দাশগুপ্তের গৃহকুঞ্জে প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের সম্ভাবনা জেনেও দৃঢ়সংকল্প তার। এছাড়া উপায় নেই। কেন না বেঁচেবর্তে থাকার কায়দাটা যখন এভাবেই চালু করে দিয়েছেন সবাই, সুখসন্ধানের কোনো নিয়ম বেনিয়ম নেই।

ইতিমধ্যেই শৈলেনের কাছে গিয়েছিল দুদিন। শৈলেন বিশ্বাস—মানেই টাকা। পাঁচ হাজার দেবে বলেছে। অঞ্জন হাজার তিনেক। কন্ট্রাকটর বাপের অঢেল পয়সা। বাপের ফার্মে অঞ্জন নিজেও একজন বড়সড় কর্তা। কী আর করা যাবে? টাকা ছাড়া চ্যালেঞ্জের জোরটাও পাওয়া যাচ্ছে না যেহেতু।

বরং ভালো নিজেকেই আরো বেশি নিঃস্ব করে তোলা। জীবনের গোছগাছে তার একমাত্র দূরদর্শিতার কর্ম—বছর কয়েকের সংক্ষিপ্ত চাকরিতে যে-হাজার ছয়েক টাকার সঞ্চয় গড়ে উঠেছিল তার, সাসপেনশনের দীর্ঘ সময়ে দাঁতে দাঁত কামড়ে রক্ষা করেছে সিংহভাগ। হাজার চারেক তার নিজস্ব। কিন্তু

কিন্তু মোটামুটি কুড়ি হাজার টাকা তো অবশ্যই প্রয়োজন।

জনা সাতেক নারীপুরুষের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি লিফটে অবতরণধারায় যেন স্নায়ুর রক্তস্রোত নেমে আসছে তার। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে তোলা যাবে হয়তো। তারপর? তার পরের তারপরগুলিও নিরাপদ চাকরির মতোই একইভাবে অনিশ্চয়ের ভবিষ্যৎ।

রাস্তায় নেমে ঝাঁপিয়ে উঠল একটা বাসে। ঘড়িতে এখন মাত্র তিনটে দশ। বেকার দুপুরে অঢেল সময়।

নিষ্পত্র বৃক্ষশাখায়

এসপ্ল্যানেড থেকে ময়দানের দুরন্ত বাতাসে খিদিরপুর বাবুবাজার মুদিয়ালি ইত্যাদি ডিঙিয়ে

গার্ডেনরিচের শিল্প এলাকায় পৌঁছোনোর পর ইতস্তত কিছু সবুজ গাছপালা সত্ত্বেও ধুলোধোঁয়ার রুক্ষতায় ভিন্ন এক জগৎ। জেলখানা গোছের উঁচু উঁচু লম্বা পাঁচিল, দেয়ালে দেয়ালে বিবিধ ভারতীয় ভাষায় দাবিদাওয়ার অগুন্তি শ্লোগান। দামি দোকানপাট রেস্তোরাঁ না থাক, রাস্তায় রাস্তায় ঠাণ্ডা সিঙ্গারা আর লাড্ডু, চায়ের স্টল, পানবিড়িসিগারেটের দোকান। প্রায় সর্বত্রই হিন্দী ফিলমি গানের আবহগীত এবং কসমোপলিটান বাতাস।

সুবিশাল ফ্যাক্টরির সিংহদ্বারে বলবান সিকিওরিটি, অন্দরে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট—পায়ে পায়ে ঠোক্কর সামলে প্রতীক্ষার ঠাণ্ডা ঘরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম বড়ই সুখকর মনে হচ্ছিল তার। সংবাদ-তাড়িত শ্যামল ছুটে এসে লণ্ডভণ্ড করল সব—'তুই? চিঠিটা এনেছিস?'

'কী চিঠি?'

ভ্রূ কুঁচকোল শ্যামল—'তোর বৌদি টেলিফোনে বলল, ব্যাঙ্ক থেকে চিঠি এসেছে। কী কতগুলো কণ্ডিশন দিয়েছে ওরা!'

এবং উৎপল, এই প্রথম, দীর্ঘপথের অকারণ ক্লান্তিতে খামোকা এত দূর চলে আসার অর্থহীনতায় বিব্রত হলো—'কাল আর, এম.-এর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে তোমার?'

'তুই! তুই কী করে জানলি? মিঃ ধড়িয়ার কাছে গিয়েছিলি?'

উৎপল চুপ। বিপন্ন শ্যামল এপাশ-ওপাশ তাকায়। সাজানো-গোছানো সুদৃশ্য ঠাণ্ডাঘরে সাহেবসুবো আরো দু-চারজন ছিলেন। অদূরে কসমেটিকস-বিজ্ঞাপনের মনোলোভা রিসেপশনিস্ট হেডফোন মাথায় এঁটে চাখুমচুখুম ইংরেজি বলে যাচ্ছেন অদৃশ্যলোকের সংলাপে।

ভাইকে নিয়ে সে উঠে এল অন্য এক সুবিশাল ঘরে। অতি দীর্ঘ একটা টেবিল ঘিরে অনেকগুলো দামি চেয়ার। ঘরে কেউ নেই। মস্ত মস্ত জানালার পেলমেটে ভারি পর্দা। আলো জ্বলল, পাখা ঘুরল। আপাতত বিশ্রামের আরাম চেয়ে উৎপল একটা চেয়ারে বসল। বছর সাতেকের জ্যেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও অনুমোদন ছিল। সিগারেট ধরাল।

একজনকে ডেকে কফির নির্দেশ শ্যামলের। তৎসহ ওমলেট আর টোস্ট।

ভ্রাতৃসান্নিধ্যে বরং নিজেরই কুণ্ঠিত ভঙ্গি—'চিঠিটা আনলি না! তাহলে অ্যাদ্দুর ঠেঙিয়ে কেন এসেছিস?'

'তোমাদের কো-অপারেটিভের ফ্ল্যাট তো কম্‌প্লিট। কবে যাচ্ছো বলো? যেতে তো হবেই।'

শ্যামল স্থবির মূর্তি। কথা বলতেও ঠোঁট কাঁপছে তার—'কী বলতে চাস তুই?'

আলগা হাসি উৎপলের মুখেচোখে—'আমার চাকরির জন্যেই নাকি আটকে আছে তোমাদের যাওয়া? এদিকে-ওদিকে দুদিকেই তোমাদের টাকা গুনে যেতে হচ্ছে ফালতু।'

শ্যামল কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধতায়—'ঠিক আছে। আগে তুই জয়েন কর। একটা মাসের মাইনে তুলে নিয়ে আয় ঘরে...'

'মাইনে। মাইনে কী হবে? ও-চাকরি আমি আর করছি না।'

'ম্‌ম্‌মানে!' অবিশ্বাসের ভ্রূকুটি থেকে শ্যামল প্রবল ঝাঁকুনিতে—'চাকরি করবি না? কী করবি?'

'নিশ্চয়ই করব একটা কিছু।'

'সে-তো জ্ঞানের কথা হলো। ওতে কি মা বাবা কৃষ্ণা...চলবে তোদের?'

'চলবে কী? চালাতে হবে...' চেয়ারে ঝুঁকে বসে উৎপল দাঁড়িয়ে-থাকা দাদার দিকে নিরুদ্বেগ তাকাল—'তাই বলছি, অনেক ছুটোছুটি করেছ। এবার ওসব আর. এম. ও. ধড়িয়া হালিমসাহেব সব ছাড়ো। কোনো লাভ নেই...'

শুধু ওষ্ঠাধরে নয়, গোটা শরীরে থরথর তোতলাচ্ছে শ্যামল। অফিসের মধ্যে পারিবারিক উৎপাত সংক্রান্ত পরিস্থিতিটা সে কীভাবে সামলাবে, দিশেহারা ভাবনায়, কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে—'এত নীচ এত ছোট হয়ে গেছিস তোরা? এত স্বার্থপর ভাবিস আমাকে? আমি ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি, সে-শুধু আমার নিজের জন্যে? তোর জন্যে, তোর চাকরির জন্যে নয়?'

টেবিলের অ্যাশট্রেটা আরও কাছে টেনে নিয়ে, ঘাড় গুঁজে উৎপল শান্তভাবে তার নিঃশেষ সিগারেট গোঁজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ সময় নিয়ে—'আমি সে-কথা বলি নি। তুমি তোমার নিজের মতো করে ভাবছ।'

শ্যামল তার দগ্ধতায় ঘন নিশ্বাসে—'তুই যা খোকন, এখন যা...'

উৎপল বড় করে হাসল। হাসতে হাসতে দাদার সমতায় উঠে দাঁড়িয়ে—'তুমি খালি-খালি রাগ করছ কেন বলো তো! আমি কি ঝগড়া করতে এসেছি নাকি তোমার সঙ্গে? বলছি, আমার প্ল্যান আছে একটা। কেন বিশ্বাস করতে পারছ না আমাকে? এদিকটা আমি ঠিক-ঠিকই চালিয়ে যাব। গো অ্যাহেড। ফ্ল্যাটটা তো ছাড়া যায় না এ-বাজারে। ছেড়েও কোনো লাভ নেই...'

ক্রোধ বিরক্তি অস্থিরতা বাড়ে। অথচ সইতে হয়। সহোদরের দিকে তাকিয়ে থাকার অসহনীয়তায় এক সময়, শ্যামল, অনেকটা ভেঙে পড়ে চিড়-খাওয়া গলায়—'ফ্ল্যাটে যাওয়া না-যাওয়া এখন আর তোদের অনুমতির ওপর নির্ভর করছে না। যেতে আমাকে হবেই। পারলে সত্যি-সত্যি আসছে মাসেই...'

থামল। কনিষ্ঠ যখন হালকা মেজাজে নিতান্তই উদাসীন, চোখ টেরিয়ে ওর প্রতিক্রিয়ার দিকে চোখ রেখে—'লাখ দুই টাকার রিস্ক অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে। শুধু তো ফ্ল্যাট নয়, সংসার-খরচ ছাড়াও মাসে-মাসে সরকারি লোনের ইন্টারেস্ট গুনে যেতে হচ্ছে। কন্‌স্ট্রাকশন-কস্টও মেটেনি পুরোপুরি। চারদিকে ধারদেনায় ডুবে আছি। প্রচুর টাকার দরকার। নতুন করে টাকা পাবার কোনো স্কোপও নেই কোথাও। এখন পাগল...পাগল হবার পালা...'

'আরে, ঘাবড়াচ্ছো কেন বলো তো খামোকা। রিস্ক তো একটু নিতেই হবে কোথাও। ভালোভাবে বাঁচার জন্যে...' দিলখুশ মেজাজে ভরাট গলায় উৎপল ভুলেই গেছে, এটা দাদার অফিস। গোটা শরীর ঝাঁকিয়ে—'এজন্যে, ঠিক এজন্যেই তোমাকে বৌদিকে এত ভালো লাগে আমার। বাঁচতে হয় তো এই...দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে, শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতো, মানুষের মতো বাঁচো। লাইফ মাস্ট হ্যাভ এ মিশন অ্যান্ড অ্যামবিশন...'

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রশস্ত ঘরের দেয়ালে প্রতিহত ভাইয়ের দরাজ কণ্ঠস্বরে যখন অস্বস্তি শ্যামলের, তাকাচ্ছে এপাশ ওপাশ, উৎপল ভ্রূক্ষেপহীন—'আমার টাইম আমার সায়েন্স আমার টেকনলজি

আমাকে দিচ্ছে, আমি ভোগ করব না? মাজাকি নাকি? আলবৎ করব। তা নয়, শালা কতগুলো হ্যাগার্ড ভিখিরির মতো ছেঁড়াগেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে ঘরে বসে ফিলসফি আওড়াব আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ চিল্লাব রাস্তায় রাস্তায়...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে...' কফি ঢুকছে ঘরে। ডিমভাজা আর টোস্ট। যার যথাসময় প্রবেশে মুক্তি খুঁজল শ্যামল—'নে, খেয়ে নে। কতগুলো জরুরি কাজ ফেলে এসেছি টেবিলে..'

খাবারগুলোর দিকে লোভীর চোখে তাকিয়ে উৎপল ঘাড় ফেরাল দাদার দিকে—'যেখানে বসে কাজ করো, তোমার ওই টেবিলটা চৌকো না গোল, বলো তো! কাঠের তো? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। জ্যান্ত ফিউডাল চারপেয়েগুলোর চেয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল চতুষ্পদই-বা কম যায় কিসে?'

গোগ্রাসে গেলে উৎপল। হাভাতে ক্ষুধার বীভৎসায়।

এবং ভাইয়ের হালুমহুলুম অশিষ্ট ক্ষুধার দিকে তাকিয়ে থেকে শ্যামল ভয় পেল। সাইকিয়াট্রিস্ট কন্সাল্টেশন কি সত্যি জরুরি ছিল? অথচ ওকে বাঁচাতে না পারলে যে সত্যি সত্যি তার নিজের বেঁচে থাকাটাও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সিঞ্চনবারি · প্রপাত জলধারায

গোটা দুপুর বাসে বাসে অথবা হেঁটে প্রায় ষাট সত্তর কিলোমিটার চষে বেড়াবার পর ডানা গুটিয়ে দিবাশেষে মৃত্তিকার আশ্রয়ে—'পাত্তি-সে পাত্তি বোঝো? পাত্তি-সে-ফিগার? ক্রশ পাত্তি! ডাবলিং!'

'কী? কী ওগুলো? বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা!'

'সাট্টা। সাট্টার টার্ম...' দুটো হাত ডানার মতো ছড়িয়ে খোলামেলা মেজাজে উৎপল—'জানো, সাট্টা খেলে এলাম। কী! বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখো...'

বিষয়টা আমল পেল না শিপ্রার ললাট কুঞ্চনে—'উঃ, এখন আমি কোথায় যাই বলো তো? তোমরা সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দেবে?'

'কেন? কী হলো আবার তোমার?'

'দাদার কবিতা, অখিলকাকুর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, তোমার সাট্টা! তিন দিকে তিনজন পুরুষমানুষ স্বপ্ন দেখে যাচ্ছো যে-যার মতো। আমি যে শেষ হয়ে গেলাম। কোথায় পালাব? উপায়ও নেই...'

শুরু থেকেই আজ বড় ভারাক্রান্ত শিপ্রা। ঘন বিকালের তীরে পৌঁছে উৎপলও তার জীবনের মাতাল খেলায় থমকে দাঁড়াল! সারা দেহের ভার নামিয়ে বসল পাশে। অস্পষ্ট গাছের ছায়ায় লম্বা বেঞ্চিটা এখন ওদের দুজনের। তৃতীয় বা চতুর্থ কেউ এসে গেলে উঠে যেতে হবে পার্কের বাইরে রাস্তায় অথবা পার্কেই অন্য কোথাও—অন্ধকারে, ঘাসে।

'সাট্টা? হ্যাঁ, সাট্টাই তো? কী ভীষণ জুয়া...' কণ্ঠস্বরের মলিন বেদনায় যেন অনেক দূরের, নদীর ওপারের কোনো নারী—'এসব করে তুমি শাস্তি দিতে চাইছ কাকে? কার ওপর প্রতিশোধ তোমার?'

সেই হেদুয়া। আজাদ-হিন্দ-বাগ। শীতটা পড়ে নি আদৌ। তবু এরই মধ্যে কুয়াশার

চাদরমুড়ি-দীঘি ঘিরে পার্কের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছেন স্বাস্থ্যসজাগ বৃদ্ধেরা। গাছগাছালির তলায়, ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার বেঞ্চিতে অথবা ঘাসে যুগলে যুগলে আজও অসংখ্য যুবকযুবতী। 'এখানে আর আসব না কোনোদিন, কক্ষনও না...' অন্য এক ঘন কুয়াশার সন্ধ্যায় বলেছিল শিপ্রা। তবু যে আজ কেন এখানেই তাকে আসতে-বলা! দীঘির জলে শিপ্রার অপলক তাকিয়ে থাকার দিকে চোখ রেখে উৎপলও বিব্রত এবার। ভারিক্কি গুমোটটাকে সে কাঁপাতে চাইল অথবা নিজেরও কাঁপতে চাওয়া—'কী হয়েছে বলো তো তোমার? মাঝে মাঝেই এমন দিদিমণি-দিদিমণি টাইপ দিচ্ছো আজকাল। ডিস্‌গাস্টিং...'

ওদিকে প্রতিক্রিয়া নেই।

উৎপল নিজেকে গুটোয়। সিগারেট ধরাতে হয়।

'এখানে আসার সময় হেদোর মোড়ে ভাস্কর-কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হলো...'

'চুটিয়ে প্রেম করছে শালা।'

'তোমারও বাধা ছিল না...' বড় বেশি আলগা আলগা টুকরো টুকরো শিপ্রার শব্দগুলি—'ওরা ফুচকা খাচ্ছিল। একদম ইচ্ছে ছিল না আমার। তবু জোর করে খাওয়াল আমাকেও। ওদের কাছেই শুনলাম, চিঠি এসেছে আজ সকালে। ব্যাঙ্কের চাকরিটা তুমি ফিরে পেয়েছ।'

শিরদাঁড়ায় টানটান সোজা হয়ে বসল উৎপল। এবার আসল লড়াই।

'তুমি জানতে, আজ আমি স্কুলে যাইনি। তবু খবরটা অন্য কারুর কাছ থেকেই পেতে হলো।'

উৎপল ঝুঁকে বসল—'ওরা আমাকে কন্ডিশন দিয়েছে কতগুলো। হাইলি ইনসাল্টিং।'

'বাজে কথা...' মুখেচোখে বিতৃষ্ণার তিক্ততায় শিপ্রা—'ইনসাল্টিং! কেন, তুমি ইনসাল্ট করে বেড়াচ্ছ না সবাইকে?'

'আমি? আমি অপমান করছি? কী বলছ? তোমাকেও?'

'নয় কেন?' চারপাশে মানুষ। উত্তেজিত গলার স্বরকে শাসনে রাখার চেষ্টায় শিপ্রা থরথর কাঁপে—'ব্যাঙ্কের চাকরি তুমি করবে না—চিঠি পাবার অনেক আগে থেকেই সেটা ডিসিশন হয়ে আছে তোমার...'

নিরুত্তর উৎপল, নিজের অসহ্য দহনে।

'সেটা তোমার একার সিদ্ধান্ত হয় কী করে?'

'নো নো নেভার...' শক্ত শিরদাঁড়ায় সোজা হয়ে বসল উৎপল—'আই মাস্ট স্টিক টু ইট। বলতে পারো, এটা আমার চ্যালেঞ্জ। একমাত্র চ্যালেঞ্জ জীবনের...'

'চিঠিটা পাবার পর, চাকরিটা ফিরে পেয়েও বলছ এ-কথা?'

'বলছি।'

এবং যা হয়, জনসমাবেশের প্রকাশ্যে ফেটে পড়তে অক্ষম যেহেতু, শিপ্রা গোটা শরীরের কুঞ্চনে কাঁপে। ভ্রূকুটির তীক্ষ্ণতায়, দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র আক্রোশ—'এ-ও তোমার একা একা বিষ-গেলার মতো সেলফিশ ডিসিশন। যারা তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চায়, বাঁচতে চেয়েছিল, কারুর দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করলে না কোনোদিন?'

উৎপল নিজের গভীরে শান্ত। আজাদ-হিন্দ-বাগ দীঘির জলে আলোকস্তম্ভগুলি লম্বিত

ছায়ায় কাঁপছে। বিমূর্ত ভাস্কর্যের রেখাচিত্রে ছায়াচ্ছন্ন উঁচু ডাইভিংবোর্ড। জনকোলাহলের ঊর্ধ্বে আকাশ খুঁজল সে। অব্যক্ত ধ্বনিপুঞ্জ বুকের ভেতর আরো বেশি লাঞ্ছনা—গোটা দুনিয়া দাবড়ে এসে নিজস্ব কেন্দ্রে পৌঁছোনোর পর আয়নার ভেতর আরেক আয়নায় নিজেরই প্রতিবিম্ব যদি এভাবেই কৈফিয়ত চায়?

যিশুখ্রীষ্ট ভঙ্গিমায় ঘাড়টা ভেঙে বাঁদিকে এলিয়ে, সুবিধে না পেয়ে, কোমর থেকে শরীরটা উল্টো করে বাঁকিয়ে, শিপ্রা, বেঞ্চির পিঠে বুক আর দুহাতের ভাঁজে থুতনিটা ছুঁয়ে নিশ্বাসের বিলম্বিত ঝোঁকে—'আমার মা আমার দাদা তোমার জন্যে কিছুই করেন নি ঠিক কথা। করার ক্ষমতাও নেই কিছু। কিন্তু ওঁদের কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল...'

উৎপল ব্যগ্রতায় ঝুঁকে বসল আরো।

'বিলাসপুর ফিরে যাবার আগে মাসিমা যেদিন শেষবারের মতো এলেন আমাদের বাড়ি, আমি দাদা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ওঁদের প্রেস্টিজের সঙ্গে নাকি বিচ্ছিরিভাবে জড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। এক রকম জোর করেই আমাকে ওদের দমদমের বাড়িতে নিয়ে যাবেন। নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে দেখাদেখির পাটটা চুকিয়ে যেতে চান...' বুঝি ওভাবে উল্টো হয়ে থাকাটাও কষ্টকর। শিপ্রা সোজা হয়ে বসল। খুবই আস্তে, প্রায় অশ্রুত গলার স্বরে—'সেদিন মা কী করলেন জানো? ঘরে বসে কথা বলছিলেন সবাই। আমি আড়ালে কান পেতেই ছিলাম। মা তোমার ডিটেল দিচ্ছিলেন। তুমি যে এমন রাজকুমার, মা-র কথাগুলো না শুনলে বিশ্বাসই করতাম না...'

সিগারেটের ধোঁয়াটা আর নেশার জন্য নয়। আনত উৎপল।

শিপ্রার নিরুত্তাপ গলার-স্বর মন্থর শিশিরপাতের মতো—'মা-র জন্যে এত কষ্ট হচ্ছিল আমার। কান্নাই পাচ্ছিল। ইন্টারকাস্টফাস্ট বাজে। ও-কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু অমন পিউরিটান দাপটওলা বোনকে মা ফিরিয়ে দিচ্ছেন? ভাবা যায় কখনও? পুজোর সময় মাসিমা সুন্দর একটা সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্ক দিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর পর যতবার দেখা হয়েছে, একটাও কথা বলেন নি আমার সঙ্গে। আমরা এখন আরো বেশি অসহায় উৎপল। বোধ হয়, মাকেও ডোবালাম...'

ঘ্যাম-মারা এ রকম দুঃখুফুঃখু বেশিক্ষণ টিকে থাকলে রক্ত চড়ে যায় মাথায়। উৎপল মোচড় খেলো—'কী হবে এসব শুনে? আমি কি করব?'

'কিছুই করবে না। প্রব্লেমটা যে শুধু তোমার নয়, তোমার জন্যে যে চারপাশে আরো কতগুলো মানুষ ভীষণভাবে কষ্ট পাচ্ছে, বুঝবে। বোঝার চেষ্টা করবে।'

শিপ্রা উঠে দাঁড়াল। উঠতে হয় উৎপলকেও। পার্কের হট্টমেলায় দুজনেরই কথা থেমে যায়। কিংবা এখনও অনেক কথা বাকি। বোঝাপড়ার জন্য ছোট একটু নিভৃতি নেই এত বড় শহরে।

পার্ক পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছোনোর গেট পর্যন্ত একবারও পেছনে তাকাল না শিপ্রা। কিংবা দীর্ঘ বিনুনি বা খোঁপার আড়ালে আরো দুটি চোখ থাকে মেয়েদের। পশ্চাদ্‌বর্তী ছায়াকে নজরে রাখার ষষ্ঠেন্দ্রিয়। হাঁটতে হাঁটতে, জনতার ভিড়ে, আলোয়, যেখানে কান্নাকে লুকোনো যায় অনায়াসেই—'তোমার যে-গোঁয়ার্তুমিটাকে ভালো লাগত একদিন, দেখছি সেটাই

সর্বনাশ...'

নিঃশব্দ উৎপল।

ফুটপাথ ধরে এগোলে বাঁদিকে আলোছায়ার একটা গলি। ভিড়ের মানুষ এড়িয়ে শিপ্রা তার ক্ষুব্ধতায় ঢুকে পড়ল গলিটার ভেতর—'আশ্চর্য! সত্যি অদ্ভুত! আগে কতগুলো ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর মানুষ তৈরি হবে চারপাশে, তারপর তুমি চাকরি করবে, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা মারবে, ফুর্তি লুটবে? বাজে লোকজন দেখলেই যত্তো গণ্ডগোল। বাঃ, ভারি আবদার তো...'

শ্রুতিকে সতর্ক রেখে উৎপল হেঁটে যায় মন্থর শিথিল পায়ে, চুপচাপ। আবরণে আড়াল রাখতে হয় আপাতত যা তার নিজের সত্যি।

কিংবা একইভাবে ভিন্নতর সত্যিগুলি উগরে উঠতে চায় শিপ্রার তিক্ত গলার ঝাঁঝে—'গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করি। জানো, কী ইতর কত ছোটলোক ওই হেডমাস্টার আর সেক্রেটারি? কিন্তু কী করব? ভালোমানুষও তো আছেন কেউ কেউ। ও-দুটো লোকের জন্যে চাকরি ছেড়ে দেব? চাকরিটা তো ওদের নয়, আমার।'

'কথাগুলো কার?' উৎপল, খুবই আলগাভাবে।

'কার মানে? আমার কথা আর কে শিখিয়ে দেবে আমাকে?' শিপ্রা আরো বেশি তীক্ষ্ণ—'একটা ধাক্কা খেয়ে তুমি এত সুন্দর সুন্দর মহৎ সব কথা বলে বেড়াতে পারো, আমি পারব না?'

বাঁক ঘুরতেই অদূরে একটা বাড়ির রকে প্রায় জনা পাঁচ-ছয় যুবক হাসিহুল্লোড় থামিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ। চোখগুলি উৎপলের বয়স আর শিপ্রার শাড়ি ব্লাউজের দিকে সঈর্ষ মোহ। কাছাকাছি কোথায় কোন বাড়িতে টিভি বা রেডিও বা ক্যাসেটে রবীন্দ্রনাথের গান। একটা নিঃসঙ্গ লাইটপোস্টের তলায় নিজেদের ছায়া মাড়িয়ে এগোতে এগোতে শিপ্রা আর উত্তেজিত নয়। বরং তার উল্টো। উচ্চারিত শব্দগুলি বাইরে থেকে নিজের মধ্যে টেনে নেবার মতো—'ট্রামে উঠছ, বাসে উঠছ, জানো না চোর পকেটমাররা থাকে সেখানে? মাঠে-ময়দানে বদমাশ শয়তানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে? ব্যাঙ্কের ভেতরে-বাইরে ভীষণ ভীষণ সব ডাকাত। সব মেনে নিয়েই তো চাকরিটা ছিল তোমার। বেশ তো, ভুল করেছ, ভিক্‌টিমাইজড হয়েছ, তাই বলে বিষ খেতে হবে? তারপরও আবার মরবে? চাকরিটা ছেড়ে দেবে? তোমার এই জুয়ার নেশায় যদি আর কাউকে মরতে হয় এবার? যাকে তুমি পিওর সিল্ক, বেনারসী কিনে দেবে বলেছিলে একদিন! মরতে তো সত্যি-সত্যি পারব না তোমার মতো। আত্মহত্যা মানি না।'

উৎপল থমকে দাঁড়াল। যেন প্রতিরোধ—'বাঃ, সুন্দর কথা। বেশ শোনায় ভালো। কিন্তু খামোকা মরে-যাওয়া মানো? বেমক্কা মরে-যাওয়া?'

'সে-তো হতেই পারে। অ্যাক্‌সিডেন্ট।'

'হ্যাঁ, অ্যাকসিডেন্ট। নিয়তি নয়। মেশিনের গোলমাল হোক, ড্রাইভারের ভুল কি আর কারুর শয়তানি, আসলে ওটাও অ্যাকসিডেন্ট নয়। কেউ মারল তোমাকে...' সন্ধ্যায় নির্জনে বিচ্ছিরি রকমের কোনো দৃশ্য তৈরির অভিপ্রায় ছিল না আদৌ। কিন্তু কণ্ঠনালীতে ছিপি-আঁটা ক্রোধ নিয়ে আরেক ঝঞ্ঝাট—সেটা ফেটে পড়তে চায়। উৎপল সংযত আবেগে, ঠাণ্ডা মাথায়—'দেখো, গলিটা কী ভীষণ ফাঁকা। এ-মাথা থেকে ও-মাথায় কেউ নেই। ঘরবাড়িগুলোয়

কারা যেন থাকে। ভর সন্ধেবেলা দরজাগুলো বন্ধ। এই গলিগুলোই কিন্তু গুণ্ডাবদমাশ অ্যান্টিসোশ্যালদের আখড়া। এখন যদি আমাকে ভড়কি দিয়ে তোমাকে লুঠে নেয় কেউ? আমাকে দাঁড় করিয়ে আমারই চোখের সামনে তোমাকে রেপ করে ওরা...'

'উউউৎ...পল...' সর্বাঙ্গে ঘৃণার কাঁপুনিতে মুখে রক্ত তুলে আর্তনাদ শিপ্রার। স্তব্ধতা নাড়া খেলো।

উৎপল হাঁপায়—'হ্যাঁ, জানি খারাপ। খুবই খারাপ নোংরা ইতর কথাবার্তা। তবু বোঝো, বুঝতে চেষ্টা করো। তুমি রক্তাক্ত হয়ে এলে আমার কাছে...তুমি তুমিই থাকবে। উদারতা-ফুদারতা কিছু নয়, ইউ ক্যান নট সাফার ফর নো ফল্ট অব ইয়োর ওন। কিন্তু আমাকে বাঁচাতে চেয়ে তুমি যখন ওদের স্টেনগান আর পিস্তলগুলোর সামনে সারেন্ডার করতে বলো আমাকে, ওদের বজ্জাতিগুলো মেনে নিতে বলো, ভীরুতা নয় সেটা? প্রশ্রয় নয় তোমার?'

খুট করে কোথায় দরজা খোলার শব্দ হলো একটা! রাস্তায় বেরিয়ে এল কারা? মুখে আঁচল চেপে ছিটকে সরে এসেছে শিপ্রা। ছুটছে—'কথা, শুধু কথা উৎপল। কথায় বাজিমাৎ তোমার...'

'শুধু আমার নয়। গোটা দেশটার।

আর কোনো বাক্য নেই। সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসে পথ। আরো গাঢ়তর নির্জনে, দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের আড়াই হাত চওড়া গলির অভ্যন্তরে পাশাপাশি হাঁটার অবকাশ নেই যেহেতু, যেন এক নড়বড়ে বাঁশের-সাঁকো সন্তর্পণে ডিঙিয়ে যাবার উৎকণ্ঠ শ্বাসরোধে প্রতিটি পা-ফেলার ঝুঁকি। মরা-ইঁদুরের গন্ধে আক্রান্ত নিশ্বাস। সব কথা থেমে যায় পৃথিবীর। নিজের দরজায় এসে শিপ্রা থমকে দাঁড়াল।

লাইটপোস্ট খুব কাছাকাছি! বৃষ্টিশেষে ভেজা বেলফুল একজোড়া সজল চোখ স্তম্ভিত শব্দহীন।

হঠাৎ-ই বদলে যায় সন্ধেটা। বদলে নিতে হয় চতুর কৌশলে। গোটা শরীরে নাড়া খেয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে ফেলল উৎপল। উদ্দাম অঙ্গ বিন্যাসে—'ঘাবড়াও মাৎ, মাই ফেয়ার লেডি। ব্যাঙ্কের অফারটা অ্যাকসেপ্ট করছি না ঠিকই। কিন্তু কিছু একটা তো করবই। প্লিজ, আর মাস ছয়-সাত সময় দাও আমাকে। আই ক্যান প্রুভ মাই ওয়র্থ। যা আমার প্রাপ্য, যা আমার নিজের জিনিস, কেড়ে নিতে দেব না কাউকে। আই কেয়ার নান্। ইফ আই লাভ ক্লিওপেট্রা, ডু আই ফিয়ার সীজার?'

'তুমি বাড়ি যাও...'

'কাঞ্চনদার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'দাদা ফেরেনি এখনও।'

'ফিরবেন। যত রাত হোক, ওয়েট করব। দেখা আমাকে করতেই হবে এবং আজই। ইফ আই লাভ বিয়াত্রিচে, ডু আই লুক ফর দান্তে? আমাকে আটকাবার তুমি কে? হু আর ইউ?'

লাফ মেরে, কানাগলির অন্ধকারে উৎপলই টপকে ঢুকল প্রথম।

স্খলিত প্রাণের শিবিরে

ম্যাটমেটে আলোটা বারান্দায় ঝুলছিল। আশ্রম-আশ্রম মার্কা ঠাণ্ডা বাড়িটা আরো বেশি নিঝুম।

মেঘময়ী মাসিমা রান্নাবান্নার শেষে নিশ্চয়ই তাঁর ঘরে। সারাদিনের অফিস আর সন্ধেবেলার ঘরের-কাজ সেরে অণুকাকিমাও হয়তো শুয়ে পড়েছেন। কাঞ্চনদা ফেরেন নি যেহেতু, উৎপল শিপ্রাদের ঘরের দিকে পা বাড়াল না। অন্যদিকে আলতো কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে রুগ্ন কণ্ঠস্বর—'কে?'

ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল উৎপল—'আমি।'

লুঙ্গি আর ফাটা-গেঞ্জিতে হাঁটু মুড়ে অখিল জানা তক্তপোশে তাঁর পুরনো ভঙ্গিতে। নভেম্বরের শেষ। এরই মধ্যে শীতের চাদর উঠে গেছে পিঠে। পাখা ঘুরছে না। দেয়ালের বালবটা খুব চড়া আলো নয়। তবু, কিছু করার নেই বলেই হয়তো বইটই পড়ছেন একটা কিছু। চশমার ডগায় চোখ তুলে তাকালেন দরজার দিকে—'তুমি? এত রাতে!'

'কেমন আছেন?'

'আছি...' ভাঙা চোয়ালে হাসলেন অখিল জানা—'এবারের ধাক্কাটা খুবই সাংঘাতিক ছিল। আপাতত বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে...'

একই তক্তপোশে ঘন সান্নিধ্যে বসল উৎপল। ওপাশের সংক্ষিপ্ত শয্যায় বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছেন মহিলা। কেননা শব্দে বা সংলাপে কাঁপছেন না এতটুকু। পিঠ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ। ঘুমের মধ্যে কত নিশ্চিন্ত থাকতে পারে মানুষ? চওড়া কাঁধ আর ভারি স্বাস্থ্যটা এক্ষণে তাঁর নিরাপদ নিদ্রায় নিতান্তই শিথিল এবং তাঁর ঘুমের মতোই কী ভীষণ শীতল আর বিন্দুমাত্র উচ্চাশাহীন আসবাবশূন্য এঁদের ঘরসংসার! গুমোটে গরমই লাগছিল তার। বুকের বোতাম খুলে, জামার কলারটা ঘাড়ের দিকে একটু পিছিয়ে নিয়ে উৎপল কপাল মুছল—'আরো বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নিন...'

ঘাড় উঁচিয়ে তাকালেন অখিল জানা। চশমার কাচের ভেতর সূর্যাস্তের আড়ম্বরে রাজসিক সেই একজোড়া চোখ। মানুষ থেকে মানুষে বাড়ি-বদল করেও নাকি অমর থাকবে এ-অক্ষিযুগল? উৎপল কিছুটা কথা সাজাবার ভঙ্গিতেই—'কটা দিন ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন কোথাও। শরীরটা ভালো হবে।'

'কোথায় আর যাব এ-বয়সে...' ছোট করে হাসলেন অখিল জানা—'ভাঙা শরীর। তাছাড়া টাকাপয়সাও তো লাগে অনেক...'

'শুনেছি, বাইরে-বাইরেই আপনি কাটিয়েছেন অনেককাল...'

'সে-অনেক আগে। পঞ্চাশ-একান্ন সালে। ঘুরেছি মানে...পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি জেলায় জেলায়। পার্টি তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে...'

'এবার যান একবার। ওভারগ্রাউন্ডে বেড়িয়ে আসুন। যে-দেশটার জন্যে এত টানাপোড়েন এত ভোগান্তি আপনাদের...' কথাটা বলল উৎপল। অনেকটা বিড়ম্বিত ভাবনার অথৈ থেকে, আলতো করে। আসলে সে তার নিজেরই চোখের আলোয় মানুষের-কাছে-প্রতিশ্রুত অন্য দুটি জীবন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতেই পারছে না—এ-মানুষটা মরে গেলে পৃথিবীকে ফিরে পেতে পারে অন্য একজন নিষ্প্রদীপ মানুষ। যাঁর মৃত্যু হলে আজই অথবা কাল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোদ্দুর বা জ্যোৎস্না পেয়ে যেতে পারে অমাবস্যার কোনো ব্যক্তি।

'কী দেখছ?'

উৎপল টলে উঠল—'ন্‌না কিছু না।'

'ওই হয়েছে আরেক দিগদারি...' হাসলেন অখিল জানা—'তুমি আমার চোখজোড়াই দেখছ। তুমি কেন! আই-ব্যাঙ্কে নাম লেখানো আছে। যাঁদের দরকার, অনেকেই খোঁজখবর নিচ্ছেন—আমার বয়স কত? শরীর স্বাস্থ্য কেমন? মরব কিনা! মরলে কবে নাগাদ মরতে পারি...' বইটা বন্ধ করলেন পায়ের কাছে। হাসতে হাসতে—'হ্যাঁ, এবার তো বিদায় নিলেই হয়। কী বলো? পাবলিক প্রপার্টি ভোগ করে এভাবে বেঁচে থাকা অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। তাছাড়া লাভও কিছু নেই। আমি মরে গেলে নাকি একটা মহৎ কাজ হবে পৃথিবীর। বেঁচে থেকে কীঈ-বা করছি?'

ভিন্নতরভাবে একটা ঝাঁকুনি প্রচ্ছন্ন হৃদয়মনে। উৎপল সচকিত হলো।

ছোট করে খকখক কাশি আচমকা। বারতিনেকের ধাক্কায় কাশিটা ভয়ঙ্কর হলো। বুকে গলায় কণ্ঠনালীর ফুলে-ওঠা শিরায় শিরায় শ্বাসকষ্টের বীভৎসায় যখন ঘষা মার্বেলের গুলতি দুটি চোখ ঠিকরে খসে পড়তে চাইছে, ঘাবড়ে গিয়ে উৎপল দুহাতে ধরল বৃদ্ধকে কিংবা অণুকাকিমাকে ডাকবে কিনা ভাবছে যখন...শীর্ণ বুক হাতড়াতে হাতড়াতে এরই ফাঁকে এক ঝিলিক হাসলেন অখিল জানা। অনেকটাই সামলে নিয়েছেন। বুকের ঘর্ঘর শব্দ নিশুতির ঘরে স্পষ্ট শোনা যায়। দুটো পায়ের পাতায় দেহের ভর রেখে বসে থাকার ক্লান্তিই হয়তো, ডান পা-টা বিছানায় ছড়িয়ে হাত দুটো তক্তপোশে ফেলে ঝুঁকে বসলেন এবং হাঁপাতে হাঁপাতে ঘন নিশ্বাসের ঝোঁকে হাত বাড়ালেন। টেবিলের পাশে ছোট টুলে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস। উৎপল এগিয়ে দিলো।

'না, এ-কিছু না। এ-তো চলবেই এখন। ফেব্রুয়ারি মার্চ অব্দি। পুরো শীতটাই এখনও বাকি। বোসো বোসো তুমি...'

'থাক, আর কথা বলবেন না। কষ্ট হচ্ছে আপনার...'

শিয়রে, বালিশের তলায় এক গোছা ট্যাবলেট। একটা ছিঁড়লেন। সযত্নে ট্যাবলেটটা গিলে গ্লাসটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে লুঙ্গির খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে—'কোনো শ্রাদ্ধটাদ্ধ নয় আমার জন্যে! কোনো মানে নেই। একটাই দায়িত্ব তোমাদের। চোখ জোড়া যিনি পাবেন, খোঁজ করে নাম-ঠিকানা জেনে রেখো তাঁর। আমার মৃত্যুদিনে প্রতি বছর এক তোড়া লাল ফুল দিয়ে আসবে তাঁকে। তাঁর চোখে আমিই দেখব তোমাদের...'

'আপনি, আপনি আসলে ভীষণ রোমান্টিক কাকু...'

কোমর ঘেঁষড়ে তক্তপোশ থেকে নামছেন অখিল জানা।

'কোথায় যাচ্ছেন?' উৎপল ব্যস্ত হলো।

'বাথরুম যাবো...' মেঝেতে নেমে, দাঁড়িয়ে, লুঙ্গির গিঁট ঠিক করে নিতে নিতে, যেন অনেকটা স্বগত ভাষ্যে—'এটুকু স্বপ্ন না থাকলে জীবনটা কেন তবে? চোখ নিয়েই বা এত কথা কেন?'

স্যাঁতসেতে ভেজা দেয়ালের গুমোট থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হোঁচট খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন ভীষণ, ভীষণভাবে জ্যান্ত একজন মানুষ। ঝাঁ করে উঠে দাঁড়াল উৎপল।

এবং দরজা ছুঁয়ে সে-মানুষ, যেন সেই একই বাক্যের দীর্ঘকরণে—'পোলিটিকাল কালচারের মতো ও-বস্তুটাকেও আমরা একেবারে লোপাট করে দিয়েছি আমাদের রাজনীতি

থেকে। নিজেদের চোখগুলো ঘোলাটে। নতুন করে কোনো স্বপ্ন দিতেও পারছি না কেউ কাউকে।'

বুকের ঘর্ঘর টেনে অখিল জানা বেরিয়ে যাবার পর দরজায় শূন্যতার দিকে তাকিয়ে উৎপল নিশ্চল। অতি মৃদু নাক-ডাকার ধ্বনি ঘরের নিঝুমে। তাকাল অন্য প্রান্তে। সন্ধেবেলার এটুকু নিদ্রাই নাকি সারাদিনের বিশ্রাম মহিলার? একমাত্র আরাম। পৃথিবীর কাছে কোনো প্রত্যাশা না রেখে কত নিরাভরণ থাকতে পারেন একজন মানুষ!

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। এবার অন্যত্র কাঞ্চনদার প্রতীক্ষা। ওই আরেক উন্মাদ। পাগল না হবার জন্য খামোকা কবিতা লেখে লোকটা! কবিতায় বাঁচে!

রং বদলাবে পৃথিবীর! মানুষ মানুষের জন্য!

দু-জোড়া জ্যান্ত চোখের স্বপ্ন থেকে আবার দুই অগ্নিময় চোখের গোলকে ঘুরপাক খায় উৎপল—এখনই নাকি রঙে রঙে ছয়লাপ দুনিয়া? লোহালক্কড়ের পেল্লাই মেশিনই সেই রসসিক্ত আর্টিস্ট। সেখানেই ধরতে হয় বর্ণময় পৃথিবীর বাহার।

ঘাটতি বাজেটের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মাথায় বয়ে উৎপল ময়ূরাক্ষী প্রেসের দরজায় এসে দাঁড়াল। অন্ধকার গ্যারেজ ঘরের ভেতর দিনদুপুরে আলো জ্বলছিল। পেছনের দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট মেশিনে কী-একটা ছাপার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিজয় সাহার ছেলে চাঁদু। বিরক্তিকর ঘটাং ঘটাং আওয়াজ একটানা। সামনের দিকে ফুটপাথ ঘেঁষে ডজনখানেক বিবিধ রঙের কৌটা খুলে তন্ময় মানুষটা। আর্টিস্টের কালার ডিজাইন মিলিয়ে ঠিকঠাক রঙের মেশাল দেবার একাগ্র মনোযোগ। উৎপলকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন—'এসে গেছেন? তখন থেকে ভাবছি আপনার কথা। আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম কাল সন্ধেবেলা...'

'শুনেছি।'

'দাঁড়ান। হাতটা ধুয়ে নিই...' হাতের কাজ গুটোতে শুরু করেছেন বিজয় সাহা। রঙের কৌটোগুলো বন্ধ করে হাতের তেলোয় চাপড় বাজাতে গিয়ে হঠাৎ ধমক—'অ্যাই, কী করছিস তুই? যা দুটো চা নিয়ে আয়। ভালো করে বানাতে বলবি..'

'না, চা থাক এখন। আগে দেখাটেখা করে আসি...' এক কোণে একটা টেবিল এবং দুটো চেয়ার ছিল। ভাবনায় চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত উৎপল একটু বসবে বলেই টেনেছিল চেয়ারটা। বসল না—'কথাবার্তা আর কিছু হলো আপনার সঙ্গে?'

'বুড়োকত্তার ছোট ছেলে এসে গেছেন মুগলসরাই থেকে। আজ আবার শ্বশুরবাড়ি গেলেন হাওড়া। কথাবাত্রা হয়েছে। ওদের সেই এক কতা—পনের হাজার আর মাসে মাসে ঘর-ভাড়া তিনশো...'

'তিনশো! এই...এটুকু গুদোম ঘর?'

'আর বলেন কেন? পয়সার গন্ধ পেলে সবাই ছেলের বাপ, বুঝলেন কিনা। একটু নরম হয়েছেন কি মেয়ের-বাপ ঠাওরে বসবে আপনাকে...' মেশিনপত্রের আড়ালে কোত্থেকে একটা কালিঝুলি-মাখা সাবানের বাকসো টেনে এনেছেন বিজয় সাহা। ফুটপাথের দিকে পা।

উৎপল ভাবনার গভীরে। লোকটার সঙ্গে এগোয় পায়ে পায়ে—'কিন্তু বড্ড বিপদে ফেললেন তো তাহলে। পনের হাজার? পনের হাজার আমি কোথায় পাব?'

'কেন?' বিজয় সাহা থমকে দাঁড়িয়েছেন—'আপনি যে বললেন সেদিন, বারো হাজার অব্দি আছে আপনার!'

'তারপর? আরো হাজার তিনেক! তারপরও রেজিস্ট্রেশনের বাড়তি খরচ?'

'সে...সে-আমি ম্যানেজ দেব।'

'আপনি?'

ঝিমোনো দুপুরে গলিটা শান্ত ছিল। দু-চারজন মানুষের আনাগোনা। কুকুর তাড়াতে রিকশর ঠুনঠুন। ওপাশের রকে কিছু বেকার যুবক তাদের জমাটি আড্ডায়। সামনেই হাইড্র্যান্ট ছাপিয়ে উথলে উঠছে কাদাগোলা ঘোলাজল। বসে পড়লেন বিজয় সাহা—'আমার সেই ভায়রাভাইকে মনে আছে আপনার?'

'সেই যিনি দড়ির ব্যবসা করেন!'

'হ্যাঁ, বহুৎ পয়সা। চেয়ে রেখেছি হাজার তিনেক...'

উৎপল ঝুঁকে পড়ল—'পারবেন যোগাড় করতে?'

'সে-তো করব। কিন্তু...' হাতে সাবান ঘষছেন বিজয় সাহা—'চশমখোর ব্যাটা। এক নম্বরের হারামি। শতকরা পাঁচ টাকা সুদ মাসে?'

'মাসে মানে?' এত ঘোলাটে কাদাজলে কেন হাতধোয়া, কেন সাবান, স্পষ্ট নয় যদিও, উৎপল তার সহযোগীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে হিসেব সাজায়—'বছরে সিক্সটি পার্সেন্টি! আপনার ভায়রাভাই কি জেলখানায় ফাঁসির দড়িও সাপ্লাই দেয় নাকি বিজয়বাবু?'

'হেঁ হেঁ হেঁ...' হাসলেন ভদ্রলোক। কী বীভৎস! হাইড্র্যান্টের নোংরা জল আঁজলায় তুলছে! গিলবেও নাকি ওগুলো? বিজয় সাহা চোখে ঝাপটা দিতে দিতে—'শুধু ফাঁসের দড়ি কেন? হরেক দড়ির সঙ্গে গরুছাগলের খুঁটের দড়িও বেচে। টাকার গরম, বুঝলেন দাদা, ও-রকমই একটা কিছু ভাবে আমাদের।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে উৎপল তখন পাথর বনে গেছে। মাথার ওপর চড়চড়ে রোদ্দুর আর কালো পিচে তার সমকৌণিক ছায়া। ছায়াটা নড়তে পারে [illegible] সে কাঁপবে না। স্নায়ুযন্ত্রে অতিসূক্ষ্ম কলকব্জাগুলি ক্রিয়াশীল। সিক্সটি পার্সেন্টি হিসেবে [illegible]। কত টাকা বাড়তি দিতে হতে পারে বছরে? ভায়রাভাইয়ের জন্য বছরে আঠারশো টাকা গুনাগার গুনতে হলে কাবুলিওয়ালারা কাদের শালীদের বিয়ে করেন?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ঘামে ভিজতে থাকে। পনের হাজার টাকার একটা লম্বা বাজি খেলায় সাকুল্যে তার নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ চার হাজার। বড় জোর সাড়ে চার হাজারের কিছু কম-বেশি। নেহাৎ-ই রাংতার তরবারি ঘুরিয়ে যাত্রা থিয়েটারের রাজাবাদশা। কী বিচিত্র পরাক্রমলীলা! আদৌ কোনো মানে আছে কিনা, ঘোরতর সংশয় যদিও, তবু শিরদাঁড়ায় শক্ত টান—'আপনার ভায়রাভাইয়ের কাছে টাকা চাইবেন না আপনি। কোনো দরকার নেই।'

'সে-তো না চাইলেই ভালো দাদা...' সাবানের বাকসো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন বিজয় সাহা—'কিন্তু আপনিই বলেছিলেন, হাজার দু-চারের জন্যে আটকে যাচ্ছেন...'

'সে-তো যাচ্ছিই। এখনও যাচ্ছি...' এগোবার জোর কম। মন্থরতায় তবু এগোয় উৎপল। এগোতেই হয়। মগজে কম্পিউটার—দিদির বাড়ি যাওয়াটা কোনোভাবেই শুভ হলো না সেদিন! ভুজুংভাজুং দিয়ে শ্রীতাপস করগুপ্ত মশাইকে যদিও বা হাজার তিনেকে রাজি করানো গিয়েছিল, দিদি আড়ালে ডাকলেন—'নিস্ না, নিস্ না, ওর টাকা ছুঁবি না তুই। সারাটা জীবন এর জন্যে খোঁটা শুনতে হবে আমাকে। টাকা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু চেনে নাকি লোকগুলো।'

শৈলেন বা অঞ্জনের হাজার সাতেক যে-কোনো সময়ই পাওয়া যেতে পারে। ভাবনাটা ঘুরপাক খায়। এরপর যদি সত্যি সত্যি জামাইবাবুর টাকাটা নাকচ করতেই হয়, আরো সব বন্ধুরা আছে—ভাস্কর সোমনাথ মাধব সুভাষ। পাঁচশো সাতশো বা হাজার করেও যদি পাওয়া যায় কিছু কিছু! ভিক্ষে নয় দান নয় করুণা নয়। কৃতজ্ঞতা-কৃতজ্ঞতাও মানে না সে। ভালো সেন্টার দিয়েছ, গোল পেয়েছি। গোটাকয়েক ধন্যবাদ বড়জোর।

নোংরা সবুজ লুঙ্গি আর গেঞ্জির ওপর আরো একটা হতকুচ্ছিত পাঞ্জাবি চড়িয়ে তৈরি হলেন বিজয় সাহা—'নিন চলুন...'

এবং যেতে যেতে—'এখন যে আমার আপনার দুজনারই বিপদ দাদা। হাতে পায়ে ধরে বলেকয়ে ওদের আঠার হাজার টাকার খদ্দেরকে হটিয়ে দিলাম। বড় গলা করে বলেছি, আপনি আমার চেনাজানা ঘরের মানুষের মতো। আপনি কেনা মানে এ-একরকম আমার নিজেরই কেনা। এখন যদি না হয় কিছু, আমি ডুবব ত বটেই, ওনারা আর বিশ্বেসই করবেন না আমার কতায়...'

উৎপল বাক্যহীন। অন্দরমহলে সিঁড়ি দেখিয়ে বিজয় সাহাই নিয়ে এলেন দোতলার ঘরে। প্রাচীন এক পালঙ্কে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে হরীতকী চিবোচ্ছিলেন বৃদ্ধ। গলায় কণ্ঠি। দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য ঠাকুরদেবতার ছবির সঙ্গে শিয়রে শ্বেতপাথরের টেবিলে তুলসী-চন্দনে কোন্ এক গুরুজির প্রতিকৃতি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধৈর্যের ওপর একটানা রোলার চালিয়ে আত্মজীবনী শুনিয়ে গেলেন বুড়ো। ইংরেজ আমলে থ্যাকারস্পিঙ্ক-এ কাজ করতেন এক সময়। তখনই চাঁদনি চকের এক সাহেবের প্রেস থেকে মেশিনদুটো কিনে নিয়েছিলেন শস্তায়। মস্ত একটা প্রেস বানিয়েছিলেন বৌবাজারে। বইপত্তর থেকে বড় বড় কোম্পানির লেজার সবই ছাপা হতো। একে একে সবই গেছে। শেষ পর্যন্ত এই মেশিন দুটো নিয়ে কালার প্রিন্টে টিকে ছিলেন বছর কুড়ি। আর সব ছেলেরা মেয়ে-জামাইরা যে-যার চাকরিবাকরি ব্যবসা নিয়ে আছে। গত বছর বড় ছেলেটা টুক করে মরে যাবার পর এ-ও তো অনেক আগেই চলে যেত। যায় নি, বিজয় ছিল বলে।

বুড়ো জানালেন—বিজয় থাকলে এ-কারবারের মার নেই। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার বড় বড় পাবলিশার, মস্ত মস্ত সব আর্টিস সবাই বিজয়কে চেনে। দেখবেন ঘরে এসে অর্ডার দিয়ে যাবে। নেহাৎ-ই আটাত্তর পেরিয়ে আশির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন। নইলে কি আর বিজয়শুদ্ধু মেশিনদুটোকে এভাবে হাতছাড়া করেন?

সেয়ানা বুড়ো শেষ পর্যন্ত জানালেন—বিজয় বলেই তিন হাজার টাকা ছেড়ে দিচ্ছেন। আর এক পয়সাও কমানো চলবে না। বাড়ি-ভাড়া মাসে তিনশো টাকাটাও এক কথা। রেজিস্ট্রেশনের সময় পাকা লেখা হয়ে থাকবে—ভাড়ার শর্তটা তিন বছরের জন্য বহাল। রেজিস্ট্রেশনের

খরচাপাতি, মায় ট্যাকসিভাড়াও ক্রেতাদেরই গুনতে হবে। জয় গুরু জয় গুরু, মঙ্গল হোক আপনাদের...

সিঁড়ি ভেঙে নামতে প্রতিটি ধাপে পা-ফেলার ঝাঁকুনিতে গোটা শরীরে টনটনিয়ে উঠল উৎপল। করছে কী সে? যাচ্ছে কোথায়? অতি সুখকর ব্যাঙ্কের চাকরিটা নাকচ হয়ে যায় নি এখনও! অসম্মানের শর্তগুলি এখনও বাস্তব। তবু ভাবতে হয়, ভাবতেই হবে—প্রায় ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে সবল হাত পা চোখ কানের অদ্ভুত প্রতিবন্ধী আরো একজনকে নিয়ে কী ভীষণ ঝুঁকি! কোনো অন্যায় করেনি লোকটা!

রাস্তায় নেমে ভ্রূকুটিতে তাকাল সে—'এটা কী বিজয়বাবু? তিন বছরের জন্যে এ-রকম বিচ্ছিরি একটা কণ্ডিশন মেনে নিলেন আপনি? এঁদো গলিতে ভাঙা বাড়ির তলায় এক চিলতে অন্ধকার একটা ঘর? এমনিতে তো পঞ্চাশটা টাকাও ঠেকাবে না কেউ! তার ভাড়া তিনশো? তিন বছরে কত হয় জানেন? খেয়াল আছে আপনার?'

তিরস্কৃত বিজয় সাহা কুণ্ঠিত সঙ্কোচে—'কিন্তু এক্ষুনি ত ঘরটর কোথাও পাচ্ছেন না আপনি। পেলেও সেলামি অ্যাডভান্সের যা খাঁই শালাদের! বাঘের হাঁ...'

পুরো একটা সিগারেট বিস্বাদে পুড়ে যায়। পায়ে পায়ে হাঁটে দুজন। ছাপ্পান্ন আর আটাশের বয়ঃসীমায় বিস্তর ফারাক দুজন মানুষ ভরাট দ্বিপ্রহরে রাস্তায় পাশাপাশি। রাস্তায় গড়ানো ছায়ার মাপে দুজনই সমান মাথায় মাথায়। ছাপ্পান্ন কিঞ্চিৎ পশ্চাতে। আটাশ দু-কদম এগিয়ে। কেন না, সে টাকার মালিক। কেন না, টাকা স্বপ্ন বানায়।

বয়সের দোহাই নিয়ে ছাপ্পান্ন এগোল সাহসে—'ঘাবড়াচ্ছেন কেন দাদা? ব্যাঙ্কের এত্ত বড় অফিসার ছিলেন আপনি!'

উৎপল তাকাল তেরচা পলকে—'এসব কোথায় শুনলেন আপনি?'

'শুনেছি শুনেছি। চায়ের দোকানের খোকাবাবু বলছিলেন সেদিন। বড় মান্যিজন আপনি। কী ভাগ্যি আমার। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন...' হাতের তেলোয় গালের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ঘষছেন বিজয় সাহা। সবিনয় ভঙ্গি—'তা দাদা, আপনি চেষ্টাচরিত্তির করলে কী না হয়? বিশ তিরিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার লোন ত বের করে আনতে পারবেন ঠিকই। তখন না হয়...'

আরো একটা সিগারেট ধরাবে কিনা উৎপল ভাবছে যখন

'বলক তৈরির কারবারটাও খুলে ফেলব আমরা। কালার পিরিন্টিংয়ের লাইনে শুধু কি ছাপার-কাজে পয়সা আছে দাদা? দুটো এক সঙ্গে থাকলে দেখবেন কাজের ফুত্তি...'

কী সর্বনাশ! উৎপল থমকে দাঁড়াল। ড্যালাড্যালা ভয়ঙ্কর দুটো চোখের চাউনিতে সূর্য! স্বপ্নের মধ্যে ভীষণভাবে লেপটে যাচ্ছে মানুষটা? রীতিমত আতঙ্ক তার।

বিজয় সাহা সত্যি এক স্বপ্নের বিলাপে—'ওদের একতলায় আরো একটা ঘর আছে। খালিই পড়ে থাকে। বলাকওয়া করে রেখেছি। ব্লকের কারবার খুললে, কাজকম্মো বাড়লে ঘর ত দরকার হবেই আমাদের। ওটাও নিয়ে নেব। দেখবেন পড়তায় পুষিয়ে যাচ্ছে তখন। এখনই যা একটু কষ্ট পেথম পেথম...'

উৎপল তার আটাশে এখন আর ওসব স্বপ্নটপ্ন বোঝে না ঠিকমত। বিশ্বাসই করে না। সে এগোয়। ব্যাঙ্ক! ব্যাঙ্কের লোন! বিষয়টা যে মগজে নেই, তা নয়। চেনা-গরু হাতছাড়া হলেও

তাকে দোহনের প্রক্রিয়া সে জানে। বরং একটু বেশি করেই জানে। বন্ধুরাই সাহায্য করবে সেক্ষেত্রে। ব্যাঙ্কের বন্ধুরা। শহিদ হয়ে জ্যান্ত থাকার সুবিধে এই, হিরো হিরো গোছের ওম্ পেয়ে নিজেকে সেঁকে নেবার একটা উত্তাপ তৈরিই থাকে জনগণমনে।

হাঁটতে হাঁটতে ভরদুপুরে খোকাদার চায়ের দোকান। আসর জমিয়ে হৈ হৈ করে যাচ্ছে পাড়ার ছেলেরা। ওদের নিয়মিত আড্ডায় আজও সেই ফ্রিডমফাইটারদাদু। কেন যে আসে বুড়ো? ফুল-বেলপাতার লোভ নিয়ে নাস্তিকদের কাছে!

ওদিকে কোনো আমল দিলো না উৎপল। তাকাল সহযোগী বৃদ্ধের দিকে—'আপনার ভয় করছে না বিজয়বাবু?'

'কেন?'

'ঝুঁকিটা তো আপনারও কম হয়ে যাচ্ছে না খুব।'

বিজয় সাহা কুণ্ঠিত হাস্যে—'এই বাজারে পনের হাজার টাকা যোগাড় করা? চোদ্দ পুরুষেরও সাধ্যি ছিল না আমার। মায়ের ইচ্ছায় আপনাকে পেয়ে গেলাম...'

'হয়ে যাবে? কী বলেন?'

'এ-যে হতেই হবে দাদা। জেবনভর নাই-নাই নাই-নাই করে এবারে য্যাখন ধরেই ফেলেছি বাঁচনটাকে...'

'অলরাইট। লাগিয়ে তো দিই। তারপর দেখা যাবে...' উৎপল হঠাৎ মরিয়া। হাঁকল চড়া গলায়—'খোকনদা দুটো চা। একটায় দুধ নেই, চিনি কম। পারো তো লেবু...'

'চাকরি করবি না মানে? ইয়ার্কি নাকি?'

'কোথায় চাকরি? দিচ্ছে কে?'

'ব্যাঙ্ক তো বলছে না—তোর চাকরি নেই।'

'মোস্ট অব আওয়ার পিপল প্রেফার এক্সপ্লয়টেশন অন দ্য জব টু স্টার্ভেশন...'

মোটামুটি দীর্ঘ ইংরেজি বাক্য। চিবিয়ে চিবিয়েই বলল উৎপল। মারমুখো তাকাল বন্ধুদের দিকে—'যা ভালো বুঝব, করব। আই অ্যাম দ্য রাইট পার্সন টু ডিসাইড মাই ওন ফেট।'

ফার্স্ট রাউন্ডে সরাসরি হেরে গিয়ে বন্ধুবর্গ যে-যার অবস্থানে হঠাৎ দিশেহারা। উৎপলও মোচড় খেলো। খাট থেকে লাফিয়ে নেমে এগোল জানালার দিকে। রাস্তার ধার ঘেঁষে জানালার চতুষ্কোণ যেন এক কাল্পনিক দর্পণ। নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়াবার নিভৃতি। বন্ধুরা ঘিরেছে তাকে। বিদ্রোহী দমনের ব্যর্থতায় সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আমন্ত্রণে মিলিটারি কুম্বিং যেমন। নিশ্চিতই শ্রীযুক্ত সত্যসাধন দাশগুপ্ত মশাইর মোটা বুদ্ধির কাজ কিংবা গেরস্তসাহেব শ্যামলচন্দ্রের অতিসূক্ষ্ম চালাকি। শ্রীযুক্তা রেণুবালা দেবী বিস্তর কান্নাকাটি করেছেন অবশ্যই—'ওকে তোমরা একটু বোঝাও বাবা। সবাই মিলে ভূতটা ছাড়াও মাথা থেকে। তোমরা বন্ধুরা...' নইলে ওরা সবাই দল বেঁধে এক সঙ্গে সন্ধেবেলা? বাড়িতে? অ্যাবসার্ড।

'শৈলেনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিস তুই? অঞ্জনের কাছেও চেয়েছিস।'

'তোদের কাছেও চাইব। পাঁচশো সাতশো হাজার যে যা পারিস...' উৎপল ঘুরে

দাঁড়াল—'ভয় নেই। বছর দেড় দুইয়ের মধ্যেই শোধ দিয়ে দেব। আরো হাজার পাঁচেক টাকা আমার এক্ষুনি চাই।'

'এত টাকা দিয়ে কী করবি তুই?'

'করব একটা কিছু।'

অধৈর্য বন্ধুরা। সুভাষ হঠাৎ বেখাপ্পা মেজাজে—'টাকা দেব। কেউ কিছু জানতে পারব না, কেন দিচ্ছি?'

খাটের কাছে এগিয়ে এসেছে উৎপল। ঝুঁকে, হাত বাড়িয়ে ভাস্করের পাশ থেকে এজমালি সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে, আস্তে—'না, কোনো কৈফিয়ত-টৈফিয়ত নয়। দিলে এমনি দিতে হবে। নইলে ফোট্ শালা, ফোট্। শৈলেন অঞ্জন এত সব জানতে চায় নি কেউ।'

'মাসিমা মেসোমশাইকে পর্যন্ত কিছু বলছিস না। ওঁরা অন্তত এটুকু জানতে চাইতে পারেন।' সোমনাথ, বেশ দৃঢ়তায়।

'কেন? বার্থ সার্টিফিকেটে দুটো নাম খুব জরুরি ছিল বলে?'

অসম্ভব। এর পর আর কথা চলে না বেশি। বন্ধুরা যখন প্রায় সকলেই হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে নিরুৎসুক, ভাস্কর, ভিন্নতর কারণে এতটা অ্যামেচার থাকা সম্ভব নয় বলেই হয়তো, বিছানায় শরীরটা আধশোয়া ভাঁজে বাঁকিয়ে রেখে আলগাভাবে—'এদিকে শ্যামলদাও নাকি আসছে মাসে শিফ্ট্ করছেন সল্টলেকে? ডেটও ফিক্সড হয়ে গেছে শুনলাম...'

'যাবে না কেন?' উৎপল তার সিগারেটের নিমগ্নতা থেকে—'এ-কি তাজমহল নাকি? পকেটের রেস্ত খরচা করে ফ্ল্যাট বানিয়ে শালা গাণ্ডু শাজাহানটার মতো দূরে বসে নিজের কীর্তি দেখবে...'

হেসে ওঠার অবকাশ নেই। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময়ে বন্ধুরা মিতবাক। ভাস্কর তেরচা তাকাল—'তারপর?'

'কী তারপর?'

'তুই চাকরিটা নিচ্ছিস না। সাসপেনশন পিরিয়ডে যা পাচ্ছিলি সে-ও বন্ধ। শুধু মেসোমশাইর পেনশনের কটা টাকা...'

'কেন?' চকিতে উৎপল—'অনেক দিন ধরে তাল দিচ্ছিস শালা। চটপট তুই বিয়ে করে ফেলবি কৃষ্ণাকে। একটা ঝঞ্ঝাট কমে যাবে।'

বন্ধুমহলে বা পারিবারিক বৃত্তে ঘটনাটা যদিও প্রায় প্রকাশ্য গোপন, ভাস্কর অতর্কিতে বেসামাল। ঘরের অন্য চারজন যুবক পারস্পরিক চোখ চালাচালিতে মশকরায় উদ্বেল হতে পারত। কিন্তু হলো না। কেননা, বড় জটিল এবং গোলমেলে এক অঙ্ক নিয়ে খেলতে হচ্ছে তাদের।

এবং উৎপল, প্রায় আস্ত সিগারেটটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে তাকাল বন্ধুদের দিকে—'তারপর তো থাকে দুই বুড়োবুড়ি। বেকুব পাবলিক। আমি তো তোদের ওই পোলিটিক্যাল লিডার নই শালা, মিনিমাম ভাতকাপড় জোটাতে পারব না, লম্বা লম্বা বুজরুকি ঝাড়ব!'

বন্ধু অথবা সমবেত যুযুৎসবা। সোমনাথ আর মাধব ওপাশের দুটো চেয়ারে। খাটে

আধাআধিভাবে শুয়ে ভাস্কর, যার গা ঘেঁষে সুভাষ। কোনো অপরাধই হয়তো নেই এদের। কিংবা নিরপরাধেই প্রীতিকর চোখগুলি ক্রমশ উৎপাত। ভালো লাগে না চুপচাপ একা থাকতেও। উৎকৃষ্ট আর উপাদেয় খাবার দিলেও আজকাল যেহেতু রুচিতে বিস্বাদ।

মজা লাগে। মজাই তো করা যায় এখন! হাসপাতালের ঘটনার পর নতুন জীবনে এই প্রথম সে দু-পা এগিয়ে তার চাকরিলব্ধ একমাত্র শখের বস্তু স্টিরিওটার সামনে দাঁড়াল। রেকর্ড-অ্যালবাম থেকে বেছে বেছে একটা রেকর্ড।

বন্ধুরা তাকিয়ে থাকে। মানববৈচিত্র্যের জটিলতম ধাঁধা, বড়ই স্পর্শকাতর এক ব্যক্তির আচরণ-প্রক্রিয়ার দিকে সম্মিলিত চোখগুলি।

আজ প্রায় বৎসরকাল অথবা বৎসরাধিক সময়ের ব্যবধানে যন্ত্রটায় হাত পড়ে নি কারুর। অতিসূক্ষ্ম রেকর্ডে ধুলো জমে জমে হয়তো অচল কিংবা স্টাইলাসটাই ভোঁতা। উৎপল রেকর্ডটা চালিয়ে দিয়ে ঘুরন্ত চাকার দিকে তাকিয়ে থাকে। মধ্যবর্তী গোলাকার লেবেল থেকে তরঙ্গবৃত্ত, পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে ঢেউগুলি যেমন, পাক খেয়ে খেয়ে মিশে যাচ্ছে এপারের ডাঙায়। পেছনে না তাকিয়েই সে অতিথি-সুহৃদদের অনুভব করল। বিহ্বল বোকা-বোকা চোখগুলি নিশ্চিতই নিবদ্ধ তার দিকে

এবং শুরুর মিউজিকটুকু ফুরোতেই বিস্ফোরণের বিপুল চিৎকারে অকস্মাৎ গান। পুরো অর্কেস্ট্রায় ফুল ভল্যুমে ঝমঝমাঝম—'ব্যাস, আজ কি রাত হ্যায় জিন্দেগী, কাল হাম কাঁহা, তুম কাঁহা! য়াম্‌মা য়াম্‌মা...'

এক ঝটকায় খাট থেকে লাফিয়ে নামল ভাস্কর—'এটা কী? অসভ্যতা? পাগলামিরও তো সীমা আছে একটা...'

এবং স্টিরিওটার দিকে বন্ধুকে ধাবমান দেখেই উৎপলের সজোর ধাক্কা—'ভাগ্, ভাগ্ শালা। ওটা ছুঁবি তো লাথি মারব এবার...'

ভাস্কর হুমড়ি খেল। কলেজের মাস্টার সোমনাথ—'ওটা চললে আমরা কথা বলব কী করে?'

'কথা? কথা আবার কী?'

'আমাদের চলে যেতে বলছিস?'

'আমি কিছুই বলছি না। আমার পুলক জেগেছে। তোদের গান শোনাচ্ছি।'

ঘরের ভেতর তিরতির করে ঢুকে পড়ল টুনটুনি। লাল টুকটুক জামায় ডল-পুতুল গোছের বছর পাঁচেকের বাচ্চা। হাঁটা শেখাটাও রপ্ত হয়েছে কি হয়নি ঠিকমতো, হাত-পা খেলিয়ে তার নাচ নিজস্ব মুদ্রায়।

গাণিতিক নিয়মে হিসেবের গোলমাল ছিল না কোথাও। এ-গান বাজলে মেয়েটা যেখানেই থাকুক, ছুটে আসবে। আসবেই। উৎপল জানত। বরং অবাক হলো, পাক্কা একবছর পরেও কাকুর ঘরের গানের মাতলামি ভোলেনি মেয়েটা!

টুনটুনিই শুধু নয়, দরজায় কাদের ছায়া? রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছেন রেণুবালা। শ্লথ পায়ে সত্যসাধন। এমন কি টিভি বা পড়াশুনো সব বন্ধ করে সুনন্দা কৃষ্ণাও। কতদিন, কতকাল বাদে খোকনের ঘরে স্টিরিও? গান চেয়েছে মরা-ছেলেটা? জীবনে সঙ্গীত!

এবং উৎপল, চারদিকের বিবিধ প্রতিক্রিয়ার দিকে তাকিয়ে তার রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে বুঝে নিতে চাইল। ভয়ঙ্কর একটা আক্রমণে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে সবাই! আক্রমণটা আসতে পারে যে কোনো মুহূর্তে, যে-কোনো ভাবে। সমবেত বন্ধুরা হয়তো তারই পূর্বাভাষ!

গানটা বাজছে। একটা গানের সীমানা ডিঙিয়ে নতুন গানে ঢুকছে স্টাইলাস। টুনটুনি নাচে। তাল লয়ে ছন্দে মুদ্রায় ওর সব নাচই এক রকম এবং ওর নাচকে ঘিরে কৌতুকানুভবে বন্ধুরা মেতে উঠতে পারত ঠিকই, সোমনাথেৰ মুখে মৃদু হাসিটাও সত্যি। কিন্তু জটিলতম ধাঁধায় তারা দেখছিল বন্ধুকে

যখন উৎপল বাঁহাত বাড়িয়ে চিৎকৃত চড়া সুর সুখশ্রাব্যতায় নামিয়ে এনে ভাইঝির মাথায় মাথায় নিজেকে সমান মাপে খাটো করে নেবার ইচ্ছায়, হাঁটু ভেঙে বসে শুধু গানেই পরিতৃপ্তি নয়, হাতে হাতে হাততালি এবং ঠোঁটে শিস

উঠে দাঁড়িয়েছে বন্ধুরা। উৎপল ভ্রূক্ষেপহীন। যেন এ-সান্ধ্যসভায় সুধী বন্ধুজনের চেয়ে অনেক বেশি উদ্দীপক—দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত ধ্বনির তাণ্ডব। তৎসহ নিষ্পাপ শিশুর অবোধ উচ্ছ্বাস

সুরলহরীর তুমুল চিৎকার কী অশেষ লাঞ্ছনা মানুষের! কানে আঙুল গাঁথে নি কেউ। হয়তো সেভাবে অসম্মানবোধও নয়। দুঃখ-বেদনায় নিষ্পলক চোখগুলি যখন একই লক্ষ্যে নিষ্পলক স্থির

মূকাভিনয়ের সে-যুবক তার নৈঃশব্দ্যে উদাসীন—ফিরে যেতে পারো তোমরা। হাসপাতালের শয্যায় আপেল-কমলালেবুর চেয়ে আমার ফুসফুসের নিশ্বাসটা আপাতত অনেক বেশি জরুরি।

গানের হল্লা থেমে যেতেই টনক নড়ল সকলের, ধ্বনিদূষণ কী সাংঘাতিক! দুঃসহ শিরঃপীড়া। কানে আঁচল চেপে অদূরেই নিষ্পলক ছিল সুনন্দা। থেমে-যাওয়া স্টাইলাসটার মতোই স্তব্ধবাক মানুষগুলি বৌদির ইশারায় দরজার দিকে এগোল, আনত শির—নিশ্চিতই অসুস্থ তাদের সুহৃদ। মনোবৈকল্যে দুরারোগ্য সে ব্যাধি।

তালভঙ্গে টুনটুনি কেঁদে উঠল হঠাৎ। দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল সোমনাথ। ছোঁ মেরে উৎপল ওকে কোলে তুলে নিলো। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা। নিশ্চিতই দাদার ঘরে কিংবা বাবার দরবার-কক্ষে ওদের কনফারেন্স এবার। যুদ্ধপ্রস্তুতি শত্রু শিবিরে।

আরো একটি নতুন রেকর্ড চাপাল সে। রবীন্দ্রনাথের গান। টুনটুনি, শুধু টুনটুনিরই জন্য।

'জল দাও আমার শিকড়ে'

হিসেবের অঙ্কে গড়বড় ছিল না। মোটামুটি প্রস্তুতই ছিল সে। বেহালা থেকে দিদি টেলিফোন করেছিলেন দুপুরবেলা। কী নাকি সব কান্নাকাটি। তারপর থেকেই দোতলার মানুষগুলো গরম তেলের কড়াইয়ে জ্বলছে পুড়ছে। ঘরে ফেরার মুখে, নিচেই হলুদলঙ্কার-গন্ধমাখা কাকিমাদের কাছে সে আগাম খবরটা পেয়ে গিয়েছিল বিকেলে।

রাত তখন খুব বেশি নয়, ছুটতে ছুটতে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন

রেণুবালা—'কী পেয়েছিস, কী পেয়েছিস তুই? বংশের মান-ইজ্জত ডুবিয়ে চুনকালি যা ফেলার সে-তো ফেলেইছিস। এখন কি বাড়িঘরে তিষ্ঠোতেও দিবি না কাউকে?'

'আঃ, কী আবার হলো তোমাদের? চেঁচাচ্ছ কেন?'

'চেঁচাচ্ছি? আমি চেঁচাচ্ছি?' ক্রোধের চড়ায় গলাটা উঠে এসেছিল শেষ ধাপে। নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না রেণুবালা। কী করবেন, বুঝে উঠতে না পেরে, শেষপর্যন্ত যা হয়, রাগটা কান্নার সুরে গোঙানির মতো—'ওই বজ্জাত...বজ্জাতটার কাছে টাকা চেয়েছিস তুই?'

'বজ্জাত। সে কি? বজ্জাত বলছ কাকে? তোমাদের জামাই!'

'থাক থাক, আর কথা বলতে হবে না তোকে। তুই, তুই-ই তো বজ্জাত সবচেয়ে বেশি। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিলি সংসারটাকে। বলতে পারিস, আর কত মুখ পোড়াবি সব্বায়ের?'

দাঁতমুখ খিঁচানো মায়ের মুখটা বিতৃষ্ণায় শাঁকচুন্নি ডাইনির আদলে। পাঁজরায় জোর কম। টলতে টলতে বসে পড়েছেন খাটে। ছুটে এসেছিল সুনন্দা কৃষ্ণা। ধরল মাকে। এবং তখনও গোঙানি—'টাকাকড়ি ছুঁতে নেই ওই বদ লোকটার। ওতে যন্তরনা বাড়ে মেয়েটার, জানিস তুই। তবু সেই অলক্ষুণে চশমখোরের টাকাই দরকার হলো তোর?'

দরজা পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন সত্যসাধন। শান্ত মানুষ। বাইরে, বারান্দার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে, নিভৃতে, জীবনভর ভুল অঙ্ক কষে যাবার বেদনায় ব্যালেন্সশিটটা আরো একবার যাচাই করে নিতে চান।

এবং তখন, অটল ধৈর্যে ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার আগে উৎপল তার চারপাশে প্রতিপক্ষের ফিল্ডিং পজিশনগুলো বুঝে নিতে চাইল ভালো করে। জীবন এক সুমনোহর বৃহৎ ক্রীড়াঙ্গন। নির্বিকার ঠাণ্ডা মাথায়—'আমার টাকার প্রয়োজন। টাকাটা আমাকে পেতেই হবে যে-করে হোক।'

'শোন, শোন মুখপোড়ার কথা...' গলা চিরে আরো একবার ফুঁসে উঠতে চেয়ে রেণুবালা, যখন উঠে দাঁড়াতেই পারছেন না বিছানা থেকে, নেতিয়ে পড়লেন। মাকে ছেড়ে সুনন্দা স্বভাবের শিষ্টতায় অথচ তীক্ষ্ণ—'কী তুমি বলছ খোকন? তোমার টাকার দরকার, তুমি বলতে পারতে সেকথা!'

'কাকে বলব? তোমরা কেউ দিতে?'

'দেওয়া যাক আর না-ই যাক, কিছু-একটা করা যেত সবাই মিলে। কিন্তু এতে যখন শুভ্রার...তোমার দিদির কষ্টটাই বাড়ে...'

'কষ্ট বাড়ে তো আমি কী করব? আমাকে বাঁচতে হলে কষ্ট তো পেতেই হবে কাউকে না কাউকে...'

অসম্ভব। এ-জাতীয় আবোলতাবোলের সঙ্গে কোনো রকম কথাই চলে না যেহেতু, এক রাশ বিরক্তিতে সুনন্দা থেমে গেল। কৃষ্ণা মাকে সামলায়। ক্রোধের উথালপাথালে বুড়ি উন্মাদপ্রায়।

'কত টাকা? কত টাকা দরকার তোর? আজেবাজে বকে যাচ্ছিস তখন থেকে...' হঠাৎ, প্রবল বেগে শ্যামলের প্রবেশ। পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি—'ব্যাঙ্কের চাকরিটা করবি না, তার

ওপর পাঁচ হাজার টাকা চাই। এক্ষুনি চাই। বসে বসে কে তোকে মদত দেবে অত? কী ভেবেছিস? কী চাস তুই?'

'পাঁচ হাজার নয়। পনের হাজার দরকার আমার। হ্যাঁ, এক্ষুনি প্রয়োজন...'

নিরুত্তেজ শান্ত উৎপল।

'মানে! ইয়ার্কি নাকি? কে দেবে তোকে অত টাকা?'

'কাউকে তো কিছু বলি নি এর জন্যে। যোগাড় করছি। যার কাছে পাব, সেখান থেকেই নেব।'

ওদের সবচেয়ে বড় পুঁজি ভয়াবহতম ফাস্ট-বোলার এক ওভারে তিন-তিনটে চার দিয়ে হঠাৎ দিশেহারা। দাঁতে দাঁত কামড়ে প্রবল আক্রোশে—'ব্যাঙ্কের চাকরিটা তাহলে নিচ্ছিস না তুই?'

এলোপাথারি বাম্পারের যথাযথ মোকাবিলায় পিঠটান দাঁড়াল উৎপল। সূক্ষ্ম নিরীক্ষণে চারপাশের ঘনিষ্ঠ মুখগুলি দেখে নিতে যেটুকু সময়। কামড়ে খাবার বীভৎসায় মাতা এবং অগ্রজ! মা-র দুপাশে বৌদি এবং কৃষ্ণা তাৎপর্যশূন্য। চৌকাঠের বাইরে বাবা। ব্যবধান দূর থেকে দূরতর। অথচ তার ক্রোধগুলি নিস্তরঙ্গতায় কী ভীষণ শান্ত এখন! মস্তিষ্কের গুরুভার বড় দ্রুত, বড় সহজে তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছে। হালকা হচ্ছে সে। প্রার্থী চোখগুলি হিংস্র হয়ে উঠছে আরো।

'কী হলো? কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল উৎপল।

সুতীক্ষ্ণ জননী—'কী রে, বল্ একটা কিছু। চাকরিটা করবি না তুই?'

'কী চাও তোমরা? টাকা তো? যদি তাই এনে দিই? এতকাল যা দিয়েছি, যদি তারও বেশি এনে দিতে পারি...' শান্ত, নিজের মধ্যে আরো সংহত উৎপল—'আরো মাত্র মাস চার-পাঁচ সময় দাও আমাকে...'

'টাকা?' ভ্রূকুটির ত্রিশূলে শ্যামল আরো বিষধর—'টাকাই সব হলো? নিজের কেরিয়ারটা তৈরি করে নেবার বয়স এখন। তার তো বারোটা ভালোভাবেই বেজে গেছে। এরপরও, উদ্ভট কথাবার্তা। কারুর তো ঠেকা পড়েনি বসে বসে শুনবে এসব। জীবনটা কাব্যি নয়...'

'সে-তো তোমরা কবিতা পড়ো না বলে...' হাসল উৎপল। তাকাল মার দিকে—'কিন্তু কেন? ভাবতেই পারো না, আস্ত একটা মানুষ, তোমাদের ছেলে পুরো দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে কখনও! বিশ্বাস করতে পারছ না আমাকে? আমি বলছি। হ্যাঁ, বলছি তো, আমি পুরো দায়িত্ব নেব তোমাদের...'

একবার মাত্র চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ শ্যামল এক ঝটকায় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুনন্দা তার নিঃশব্দ অনুগামী। অনেকটাই স্পষ্ট করে তোলা—এসব বাচালতায় নষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত সময় তাদের নেই। রেসপনসিবিলিটি! অত শস্তা নয়। মুখের কথা নয় সেটা!

কেঁপে উঠল ঘরের বাতাস। ঝাপটানি তুলে উঠে দাঁড়িয়েছেন রেণুবালা। দাঁতমুখ খিঁচোনো অসম্ভব মাতৃমূর্তি—'দায়িত্ব দেখাচ্ছিস। দায়িত্ব দেখাচ্ছিস তুই? লজ্জা করে না? গেল-একটা-

বছর ধরে সংসারের এতগুলো মানুষের হাড়মাস জ্বালিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলছিস আবার? নিজে তো মরেই গিয়েছিলি! এখন যে বাপ মা বোনকে ভাতেকাপড়ে মারতে বসেছিস...স্বার্থপর, এক নম্বরের স্বার্থপর তুই...'

অশান্ত উৎপল খুবই শান্তভাবে দু-কদম এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসল। কোনো কিছু বলাও যদি বৃথা বাক্যব্যয়। হাঁউমাউ কান্নায় বেরিয়ে যাচ্ছেন মা। খসে পড়েছে বুকের আঁচল। সেটা জড়াজড়ি তুলে নিয়ে রুগ্ন বুড়িকে কোনোরকমে দুহাতে আগলে পায়ে পায়ে এগোয় কৃষ্ণা। উৎপল তাকিয়ে থাকে এবং যখন ওদের নিষ্ক্রান্তির শেষে শূন্যঘরে তাকিয়ে থাকার জন্যও কিছু নেই, ঘরের বাইরে গোঙানির স্বর, ভর্ৎসিত প্রলাপ তাকেই লক্ষ্য করে। চুপচাপ খাটে বসে, মাথায় হাত রেখে সে বুঝে নিতে চাইল নিজের অবস্থান।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকলেন সত্যসাধন। দেউলে জীবনের সর্বশূন্যতায় এক নিরর্থক বৃদ্ধ—'আজই তাপসকে টেলিফোন করবে তুমি। জানিয়ে দাও—ওর টাকায় কোনো দরকার নেই তোমার। হাজার পাঁচেকেই যদি চলে, সে-আমিই দেব। ওই, ওটুকুই আমার আছে...'

নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিও মাদকতা আনে না কোথাও। বৃদ্ধের উচ্চারণে ক্লিষ্ট শব্দগুলি ঘরের দেয়ালে টিকটিকি-ডাকার মতোই তাৎপর্যরহিত। মুখ তুলে, বাবার দিকে তাকাবারও দায় নেই। বরং বৃদ্ধের নিঃশব্দ বেরিয়ে যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে গৃহের শূন্যতায় সোজা হয়ে বসে নিজের কাছে নিজেই শিরদাঁড়ায় জোর চাইল নতুন করে। আবার, আবার সেই ভয়ঙ্কর রাত। লার্গাকটিলের সিদ্ধান্তের মতোই আবার তাকে একা, সম্পূর্ণ সবল সাবালক দায়িত্বে একার ঝুঁকিতেই একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হবে আজ। এবং আজই...আজ রাতে।

দরজাটা খোলা থাকে। থাক। এ-মুহূর্তে ঘরে কোনো শব্দ নেই, ধ্বনি নেই, মনুষ্যকণ্ঠ নেই। বাঞ্ছিত নির্জনতায় আস্তে আস্তে টেবিলের দিকে এগোল সে। চেয়ারটা টেনে নিল। ড্রয়ারেই ছিল ব্যাঙ্কের চিঠিটা। কাগজ চাই এবং কলম। জুতসই ইংরেজিটা মগজের রিং-এ কুস্তির জন্য উরু থাপড়ায়। পালোয়ানী প্যাঁচেই ওকে কাবু করতে হবে জেনে—টু দ্য রিজিওনাল ম্যানেজার...ব্যাঙ্কের নাম ঠিকানার পর—ডিয়ার স্যর...আঙুলের সাঁড়াশিতে বাগানো কলমটা শাদা কাগজের ওপর জুডো-ক্যারাটের প্যাঁচ কষার প্রস্তুতিতে ঘুরপাক খায়। বাঁহাতে সিগারেট পোড়ে। উড়ন্ত ঘুড়ির লাটাই ধরে থাকে মগজ—ইন রেসপন্স টু ইয়োর লেটার নং আই আই আর ডি পি ১৫ জি এন ১১০৭ ৮২, ডেটেড...আই রিগ্রেট টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট... ইংরেজি রচনা কী এক সুমনোহর সুখক্রীড়া। হংসস্বভাবে গুগলি খোঁজার মতোই মগজকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শব্দগুলো সাজাতে হয় শাদা পাতায়। যেন পরের গচ্ছিত ঐশ্বর্য আমার হেফাজতে ছিল। যথার্থই পরের ধনে পোদ্দারি। দেদার খরচে নিজেকে সম্ভ্রান্ত ভদ্দরলোক বানিয়ে তোলার আশ্চর্য যাদু—'সামাজিক অমর্যাদা থেকে অব্যাহতির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের সেবায় ভবিষ্যতে আর নিজেকে নিবেদন করতে পারছি না বলে আন্তরিক দুঃখিত...'

পেছনের দরজায় হঠাৎ ভীরু গলা—'কী রে, খাবি না? মা বসে আছেন।'

'আঃ, গোলমাল করিস না এখন। যা, যা এখান থেকে...' ঝাঁ করে পলক ঘুরিয়ে নিয়েই উৎপল তার সৃষ্টিশীল ইংরেজি মগ্নতায়—'ঢাকা দিয়ে রেখে যা এখানে। খিদে পেলে খাব।'

ঘাঁটাতে সাহস পায় না কৃষ্ণা। লঘু পায়ে ফিরে যায়। জানলও না, নির্জন গৃহের একাকীত্ব

কী সাংঘাতিক! কী সর্বনাশা সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে ছোড়দা! লার্গাকটিল ফিফটি মিলিগ্রামের বিকল্পেও সেই একই পরিণতি—জীবনের শূন্যতা।

এবং সেই শূন্যতাই বাঞ্ছিত যার, সে, ড্রাফটটা মোটামুটি সম্পূর্ণ করে নিশ্বাস ফেলল পরম স্বস্তির। ভালোভাবে টাইপ করিয়ে কালই পোস্টাপিশে চালান দেবে সকালবেলা। লার্গাকটিলের পর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে নিজেরই সপিণ্ডীকরণটা বিশেষ জরুরি ছিল। নিজেকেই উৎপাটনে এবার মুক্তি।

উৎপাটন যদি
শূন্যতা মৃত্তিকার

এবং অন্যত্র রাত এগারটার ঘরে, নিভৃতে, চারজন একাত্ম মানুষ পরস্পরকে ছুঁয়ে বা না-ছুঁয়ে অন্য এক বিভীষিকায়। এ-রকম একটা তাজা জোয়ান রোজগেরে ছেলে যদি তার স্বাভাবিক সুস্থতায় না ফিরল, তবে সংসারের আর সকলের যাই হোক, এ-ছেলের নিজের কী হবে?

কিংবা ভুল। নিজেদেরই মারাত্মক ভুলের দায়! গোড়াতেই বলেছিলেন ডাঃ ভাদুড়ী—সাইকিয়াট্রিস্ট। পাক্কা একটা বছর ঘুরতে চলল, একবার একটা চেষ্টা পর্যন্ত করল না কেউ! আবার যদি ওরকমই কিছু একটা ঘটিয়ে দেয় ছেলে?

'বাজে কথা। তোমাদের আদরফাদর ন্যাকামো সব রাখো। কিছু হয়নি ওর। সব বদমাইশি...' শ্যামল উত্তেজিত—'এখন...এখন তো কোনো মানেই হয় না এসব গোঁয়ার্তুমির। গতকাল পর্যন্ত আমার কাছে যা খবর, পানিশমেন্টটা অনেকটাই ছোট করে আনতে রাজি হয়ে যাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। খুব সম্ভব একটা ইন্‌ক্রিমেন্ট স্টপড। বাদবাকি কন্ডিশনগুলো থাকছে। সে-তো থাকবেই। খুশিমতো চাইলেই তো পাওয়া যায় না সব কিছু। নাড়ুমোয়া নয়। ওটা একটা ব্যাঙ্ক। ওদের একটা ডিসিপ্লিন আছে...'

ঘরের অন্য তিনজন, যেন বিশাল সমুদ্রতীরে রাজকীয় সূর্যাস্তের দিকে চোখ রেখে নির্বাক। গাঢ় গাঢ়তর অন্ধকার এরপর।

শ্যামল একই অস্থিরতায়—'একটা কথা কিন্তু খুব সোজাসুজি বলে দিচ্ছি মা। সে-তোমরা যাই মনে করো...'

সত্যসাধন রেণুবালা চোখ তুলে তাকালেন।

'আমার কাছে আর একটা পয়সাও নেই। তাপসের কাছে টাকা চেয়েছে। তাপস দেয় দেবে। আমার করার কিছু নেই। তোমাদের আদুরে ছেলের খেয়ালখুশি মেটাতে আমিও পাগলামি-ছাগলামিতে মেতে উঠব, সে-তো হয় না। এত টাকা দিয়ে করবেটা কী, সে-ও তো বলছে না কিছু। তারপর যদি সবটাই নষ্ট হয়, দায়িত্ব কার?'

যেন এরই জন্য প্রতীক্ষা ছিল। অন্তর্বর্তী যন্ত্রণা থেকে বিষ উগরে তোলার উদ্‌গারে এমনি একটা কিছুই হয়তো চাইছিলেন রেণুবালা। বিষাক্ত ঝাঁঝে—'তোর আর কী? বৌ মেয়ে নিয়ে তো চলেই যাচ্ছিস তুই।'

'হ্যাঁ, সেটাই...ওই ব্যাপারটাই আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই তোমাদের কাছে। সেদিনও বলেছি, আজও বলছি—এভাবে দুদিক সামলানো সম্ভব নয় আমরা পক্ষে। এখানে তোমাদের

সঙ্গে থাকার জন্যে খরচাপাতি যেমন আছে, ওদিকে সরকারি লোনের ইন্‌স্টলমেন্টও গুনে যেতে হচ্ছে মাসে-মাসে। জল ইলেক্‌ট্রিসিটি সব নিয়ে আজ মাস আড়াইয়ের ওপর ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে পড়ে আছে। সব ব্লকে সব ফ্ল্যাটেই লোকজন পজেশন নিয়ে বসে গেছে। এভাবে তো ফেলে রাখাও যায় না একটা ফ্ল্যাট...'

ভাঙা কোমরে দুহাত রেখে যন্ত্রণায় খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সত্যসাধন—'কেন, তোদের যাবার দিন তো ঠিকই করে ফেলেছিস...'

'হ্যাঁ, সে-তো টেন্টেটিভ একটা ডেট...'

'তুমি যাও। নিজের রোজগারে ঘরবাড়ি করেছ। যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যাবে। যাবার ব্যবস্থাটাই করো ঠিকমতো। সুখে থাকো তোমরা...'

তবু যেন একটা গ্লানি ভেতর থেকে। অর্ধনমিত পতাকার ভঙ্গিতেই গুটিয়ে থেকে শ্যামল, লঘু গলায়—'এটা কোনো রাগের কথা নয় বাবা...'

'আমি রাগ করেছি, বলল কে তোমাকে?'

কোমর ঘেঁষড়ে খাট থেকে নামছেন রেণুবালা। কাপড় গড়িয়ে পড়েছে গা থেকে। তুলে নেবার গরজ নেই। মেঝেতে নেমে, শাড়ির আঁচল পেছনে ছেঁচড়ে নিয়েই টলতে টলতে এগোচ্ছেন দরজার দিকে। যেন দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার ক্লান্তিতে বড় কষ্ট এই হাত দশেকের তেপান্তর ডিঙোনো।

ছোট ঘরটুকুতে হারিয়ে গিয়ে যখন একটু আশ্রয় খুঁজছেন সত্যসাধন

শ্যামল খুবই আস্তে, বিধ্বস্ত গলার স্বরে—'আমি যখন ডেটটা ঠিক করেছিলাম, আমি জানতাম, খোকন ওর চাকরিটা ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু ও যে এভাবে আবার একটা প্রব্লেম তৈরি করবে...'

'কে? কে খোকন? গোল্লায় গেছে, জাহান্নামে গেছে সে-ছেলে। অ্যানাদার লস্ট চাইল্ড। ওর কথা ভুলে যাও...' ঋজু শিরদাঁড়ায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন সত্যসাধন—'শুনেছি, আসছে মাসেই তুমি তোমার নতুন ঘরে যেতে চাইছ। তাই যেয়ো। ঠাকুরমশাইকে ডেকে একটা শুভদিন দেখে নেবে। পুজো দিয়ে গৃহপ্রবেশ করতে হয়। বাপঠাকুদ্দার নিয়ম। আমরা যাহোক করে এখানেই থাকব। ভালোই থাকব। অ্যাদ্দিন আছি...'

কৃষ্ণা আগেই বেরিয়ে গেছে মা-র সঙ্গে। সত্যসাধনও বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ নাকচ হয়ে যাবার গ্লানিতে, শূন্য ঘরে কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থেকে শ্যামলকেও পা ফেলতে হয়। আসলে তার শূন্যতা নেই। সব শূন্যতাকে ভরাট করতে কদিন আগে ক্যালেন্ডারের পাতায় হঠাৎ-ই আবিষ্কার সুনন্দার—নতুন গর্ভের সঞ্চারে তার প্রতিপদ মাত্র। টুনটুনি, শিশুকন্যা তার, এখনও প্রস্ফুটনে। সঙ্কট। সমস্যার পাহাড় নদীর ওপারেও। অথচ বলাও যাচ্ছে না এঁদের—মাকে যেতে হবে নতুন ফ্ল্যাটে, অথবা কৃষ্ণাকে। এত দিনের পুরনো স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারে না সুনন্দা। অতি বিশ্বস্ত কোনো লোকও পাওয়া যাবে না চটপট। যদি পাওয়াও যায়, এত বড় একটা ফ্ল্যাটের এত এত দামি জিনিসপত্র? সর্বোপরি টুনটুনি সারাদিন একা থাকবে একজন মাইনে করা লোকের দায়িত্বে? অসম্ভব।

যদি এই শিবিরে রাজি না হন এঁরা কেউ? তবে ভিন্ন শিবির। সুনন্দার মা আসবেন। আরেক

বিধবা বুড়ি। কথা উঠবে এদিকে। বিচ্ছিরি সব কথা। আরো বেশি দূরবর্তী অনাত্মীয় হয়ে ওঠার শঙ্কা।

স্নায়ুযন্ত্রে ভাবনাটা আঁটোসাটো। গৃহপ্রবেশ? সম্ভব নয়। গৃহত্যাগের আনন্দ যদি গৃহপ্রবেশের বেদনায় লেপটে থাকে, নিজগৃহে তাকে প্রবেশ করতে হবে কোনোরকম অনুষ্ঠান ছাড়াই। হয়তো খোকনেরই উৎসাহ থাকবে কিছুটা এবং কৃষ্ণার।

জীবন এগোয়। অনাড়ম্বর মন্থর চরণে। শশক তার ক্ষিপ্রতা হারালে কচ্ছপও নাকি জিতে নিতে পারে জীবনের বাজি!

মহানগর কলকাতা মন্থনে, দিনে রাতে ঘর্মাক্ত শ্রমে, অনিদ্রায় কাটল আরো কটা দিন। শেষপর্যন্ত দু-নম্বরি কারবারের ঘোলাটে মানুষ, পরমাত্মীয় জামাইবাবু শ্রীতাপস করগুপ্ত মশাই-ই দুর্দিনের ত্রাণকর্তা। হঠাৎ কী যে হলো মানুষটার, শুধু তিন হাজার টাকার খয়রাতিতেই নয়, সোৎসাহে এগিয়ে এলেন সাহায্যে এবং শ্রীযুক্ত সত্যসাধন-শিবিরের বিস্ফোরণটা যত প্রচণ্ডই হোক, উৎপল স্বাগত জানাল। কেন না, তার বেঁচে-থাকার সাম্প্রতিক লজিকটা প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণের বাইরে নিতান্তই বেখাপ্পা। সৃষ্টিছাড়া বেয়াদপি।

ময়ূরাক্ষী প্রেসের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হিসেবে সে ইতিমধ্যেই একজন নবাগত তরুণ ব্যবসায়ী।

আইন মোতাবেক হাতবদলের দিন শ্রীযুক্ত তাপসচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন। বলা ভালো, তিনিই ক্রেতার তরফে আইনজীবী। এত দিন পরে আঁতেল শালাকে বাগে পেয়ে উপদেশামৃতদানে বিপুল উৎসাহ ছিল তাঁর। উৎপলের দিক থেকেও সুবিধে—এতাদৃশ দুরূহ জটিল কর্মে এক সেয়ানা বুড়োর বিপরীতে যথাযোগ্য আরেক ধুরন্ধরকে জুড়ে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত ছিল সে। সব শেষে যুদ্ধজয়ের আনন্দে রাজসমীপে বিজয় সাহার সেনাপতিসুলভ হাসি—'আজ আমার একটা বিড়ি খান দাদা। মধ্যমগ্রামের 'পথের সাথী' মিঠেকড়া। যাবেন সন্ধেবেলা। লাইন দিয়ে বাণ্ডিলে বাণ্ডিলে নীল সুতো কিনছে লোকে...'

বিড়ির মৌতাত থেকে রুচিশোভন দামি ফরাসী ব্রায়ার পাইপে পৌঁছোনো যায় কিনা এবং সেটা যে আদৌ অলীকচিন্তা নয়—উৎপল তার নিজস্ব চারিত্র্যে, স্বপ্নের ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা করল নিকট-বন্ধুদের কাছে এবং গোবেচারি কাঞ্চন মুখুজ্জেকেও অযথা শ্রুতিপীড়নে নীরব থাকতে হয়—ভালো কবিতা লিখলেই যে আপনি রবিঠাকুর হতে পারবেন, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু চাল্‌কিতে খামতি না থাকলে এবং দাঁত কামড়ে লেগে থাকতে পারলে ময়ূরাক্ষী প্রেস থেকেই হয়তো কোনো একদিন চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হয়ে উঠবেন আপনি।

হাজার ষোল-সতেরর ইনভেস্টমেন্টে দশ হাজারের বেশিই ধার। সে-ও কিছু না। যুদ্ধজয় বাসনায় আস্ত একটা পর্বত মস্তকে বহনের শক্তি ধারণ করেন বলেই বজরঙ্গবলী মহাবীর পূজ্যপাদ আমাদের। মূলত দেবতার শিবির ঘেঁষেই সে আছে এখনও। অবশ্যই নাস্তিক নয়। ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার ধড়িয়ার সঙ্গে ইতিমধ্যেই দেখা করে এসেছে আরো একদিন। বহরমপুর ব্র্যাঞ্চ

থেকে বদলি হয়ে তার পরিত্যক্ত চেয়ারে এসে বসেছেন যে-ভদ্রলোক, শ্রীসুখরঞ্জন পাঠক, পরিচয় না থাকলেও, আলাপ হলো। প্যান্টশার্ট নয়, ধুতি-পাঞ্জাবিতেই গিয়েছিল সে (হীরের বোতাম ব্যতিরেকেই), প্রবেশের আগে খামোকা একটা পান মুখে গুঁজে নিয়েছিল দোকান থেকে (সুগন্ধী জর্দাসহ)। পকেটের নগদা টাকা খরচা করে সুখরঞ্জনবাবুকে তাঁর বাড়ি, এন্টালি পদ্মপুকুরে পৌঁছে দিয়ে আসার ভাবনাটা যদিও মাথায় এসেছিল একবার (অবশ্যই ট্যাকসিতে। ভবিষ্যৎ-সত্য নিজস্ব গাড়ির মহড়ায়) কিন্তু অতি-নাটকীয়তা দোষে বাতিল হলো সেটা। সুতরাং ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কিংবা ততোধিক, লাখখানেক টাকার একটা ক্ষুদ্র-শিল্প-প্রকল্প ঋণ সে অবশ্যই আশা করতে পারে। আশা করার হক আছে তার।

কলকাতা! কলকাতা! যথার্থই কী এক মজাদার মহতী রঙ্গভূমি! বিপুল অশ্বগতিসম্পন্ন তেজঃবেগে যখন সে চারপাশ দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে তাণ্ডবে ছুটতে চাইছে—দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। ভয়ভাবনা বা নিরবয়ব ভবিষ্যৎ-চিন্তায় অকারণ শৈথিল্যবিহীন টগবগ টগবগ ...

বাড়ির লোকজনরা ব্রেকডাউন বাসের অসহায় যাত্রী। থেবড়ে বসে পড়েছে মাটিতে। অমন ডাকসাইটে ব্যাঙ্কের অফিসারগিরি ছেড়ে কী এক ছাপাখানা! উন্মাদ উন্মাদ। সবই কপাল। নিয়তিবন্ধন। ডাঃ ভাদুড়ীর কথাই সত্যি হলো শেষপর্যন্ত?

রেণুবালা ভূতলশায়ী। পার্শ্ববর্তী সত্যসাধন জীবনের লম্বা দৌড় দৌড়ে এসে অকস্মাৎ পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ। ভগ্নস্তূপে, স্তম্ভিত কালস্রোত নিজেরই প্রাচীনকাল। সর্বনাশা বিষের ছোবল থেকে যদিও-বা এক ছেলেকে ফেরানো গিয়েছিল, অপর সন্তান তার জীবনসাফল্যে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

এবং উৎপল
জয়যাত্রায় সারথি
একদিন

যেদিন অস্ত্রোপচার, কিছুমাত্র বিচলিত নয় সে-যুবক। বরং নানাবিধ উদ্যোগ-আয়োজনে তার অফুরন্ত প্রাণের উৎসাহ আরো বেশি সতর্ক করল পারিপার্শ্বিকের মানুষজনকে। করছে কী ছেলেটা? এর পর যে কাঠের পায়ে ভর রেখে ওরই আজীবন?

সকালের দিকেই লরি চলে এল। প্রতাপ শিবাজীসহ পাড়ার ছেলেরা সাহায্যে এগোল। লম্বা খাটটাকে ভেঙে অংশে অংশে বিভক্তীকরণ, দু-ফুট উঁচু আঠার-গেজের পেল্লাই আয়রণ-সেফ একটি, একটি মাঝারি মাপের ফ্রিজসহ পাঁচ-বাই-সাত সাইজের দশাসই এক জাজিমকে সঙ্কীর্ণ সিঁড়িপথে দোতলা থেকে নিচে নামানো, টেবিল চেয়ার বিছানাপত্র ছাড়াই বাকসো সুটকেস ইত্যাদি লটবহরও নেহাৎ কম নয় কিছু। চার-পাঁচজন সমর্থ যুবক গলদঘর্ম। দুটি সিলিন্ডারসহ গ্যাসওভেন এবং টিভিটা নিয়ে শ্যামল ভোরেই চলে গেছে। মালপত্র পৌঁছোনোর আগেই সেখানে থাকার দরকার একজনের। টেলিফোনের ক্ষেত্রে সল্ট লেক এক স্বতন্ত্র এলাকা। সুতরাং সেটা রইল আপাতত।

এদিকে কানাই মল্লিক লেনের ভাড়াভিত্তিক বসতবাটি ফাঁকাই থাকবে এক দুপুর। কাকা কাকিমা ভাইবোনরা সকলেই নিমন্ত্রিত আজ। পাঁজিপুঁথির হিসেব কষে শুভদিনে গৃহদেবতার পুজো সম্পন্ন করে নতুন ভবনে প্রবেশ করবেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। বেদনাভারে সত্যসাধন বলেছিলেন সকালবেলা—'জম্মোকম্মো সবই তো শহরে তোদের। শহুরেবাবু! নিজের মাটির ওপর তো দাঁড়াস নি কোনোদিন! বুঝবি না নিজেদের ঘরদোর জ্ঞাতিকুটুম সংসার ছেড়ে যাওয়ার কী যন্তরণা! আজও মনে পড়ে দেশগাঁয়ের কথা। বাপঠাকুরদ্দার ভিটে...'

নাতনীকে বুকে চেপে কাল থেকেই হাঁউমাউ কাঁদছেন রেণুবালা।

প্রতিবেশীরাও গুটি গুটি এলেন অনেকেই। রাস্তায় লরি ঘিরে রীতিমত ভিড়। কানাই মল্লিক লেনের এঁদোগলি ছেড়ে সল্ট লেকে বাড়ি হাঁকিয়ে যায়—এ-হেন এক ভাগ্যবান কৃতকর্মাকে একবার চোখে দেখার পুণ্যিটাও বড় কম কথা নয়। এমনটি না হলে ছেলে! রত্নগর্ভা মা...

দাদাটা বোগাস। জনগণের সমাবেশে সাকসেসফুল ম্যান তার মুখ লুকোতে ভোর রাত থেকেই হাওয়া। আরে বাপু, যাবিই তো। তোরই তো ফ্ল্যাট। তুই-ই থাকবি। কিন্তু জনগণ তো আর পাবি না এই জিন্দিগিতে। জনগণের মালা?

উৎপল তার চারপাশে প্রকাশ্য স্তুতির আবরণে ঈর্ষা লোভ কাতরতায় গুমরোনো দীর্ঘশ্বাস এবং বাপ মা-র প্রতি বেইমানির জন্য মাৎসর্যজনিত ধিক্কারও শুনল কিঞ্চিৎ, বিভিন্ন খাঁজেখুঁজে পা ফেলে বিবিধ কৌশলে লরির পেছনে লাফিয়ে ওঠার মেহনতে পুরো ব্যাপারটাকেই একটা তামাশা মনে হলো তার। জীবন কী মনোহর, অহো...

পুরুতঠাকুরসহ বাড়ির লোকজনদের নিয়ে দুটো ট্যাকসি রওনা হয়ে যাবার পর লরিতে প্রতাপ শিবাজীকে নিয়ে উৎপল।

মজা। সত্যি মজা। জীবন এক মজাদার চলনপ্রবাহ। ধাবমান এই লরিটা যেমন।

মালপত্র-বোঝাই লরি ছুটছে দুরন্ত বেগে। পেছনের উন্মুক্ত খোলে তিনটি চেয়ারে ওরা তিনজন। ভীষণভাবে কাঁপছে চেয়ারগুলি। ভারসাম্য রাখতে টেবিল আলমারি একটা কিছু ধরে থাকতে হয়। পাড়ার চত্বরে চেনা-মানুষের ভিড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় দুপাশের প্রাসাদ-অট্টালিকা বা চলমান জনতায় যখন আর কৌতূহল নেই, উৎপল নিজেই লাফালাফিতে মশগুল। মাতিয়ে রাখে প্রতাপ শিবাজীকে। ড্রাইভারের পেছন দিকে পাশাপাশি দাঁড় করানো স্টিল-আলমারি এবং ফ্রিজ যেন জগজ্জননী দেবীপ্রতিমা। বিসর্জনের বাদ্যি নেই, তাসা নেই, ব্যান্ডপার্টি নেই, পদাতিক শোভাযাত্রা নেই। তবু ভাসান। গৃহপূজার আগেই গৃহপ্রবেশের ভাসানে চলেছে সংসার।

মহানগরীর পূর্ব প্রান্তে সম্প্রসারিত নতুন জগৎ—ইংরেজিতে সম্ভ্রান্ত নাম 'সল্টলেক সিটি', বাংলায় 'বিধান নগরী'। ডিভাইডারকে মধ্যবর্তী রেখে দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ সরলরেখার সুপ্রশস্ত রাজসড়ক দিগন্তে বিলীন। এপারে-ওপারে লাইটপোস্টের সারি ছুঁয়ে বয়োপ্রাপ্ত হচ্ছে বনস্পতিরা। ঘন সবুজের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। বায়ুদূষণমুক্ত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন কর্তারা। ধ্বনিদূষণ নেই। লম্বিত রাজপথের ডানে বাঁয়ে অত্যাধুনিক স্থাপত্যকলায় ইটকংক্রিটের অহং-ফাঁপানো প্রতিটি প্রাসাদ অট্টালিকা তার সন্নিহিত প্রতিবেশীর তুলনায় সুন্দরী প্রমাণে মনোলোভা। লরিটা এসে পৌঁছোল 'ঐক্যতান সমবায় সমিতি'র ফটকে। প্রবেশদ্বারের দুদিকে

দুটি স্তম্ভে মার্বেল পাথরে ক্ষোদিত ইংরেজি বাংলায়নাম ফলক। বাংলা ফলাকে মধ্যবর্তী 'য'-ফলাটা তুলে দেবার জন্য সাতটা ব্লকের ছাপ্পান্নটা পরিবার—একুনে দ্বিশতাধিক নারীপুরুষের মধ্যে একজনও সাহসী মাতৃভাষী নেই? প্রথম পদার্পণে ওই 'য'-ফলাতেই উৎপলের কুটিল নজর।

তিনতলায় পূজোর আয়োজন শুরু করে দিয়েছেন পুরুতঠাকুর। সাহায্য করছেন মা। হলুদলঙ্কার-গন্ধমাখা কাকিমারা যথারীতি এখানেও রান্নাঘরে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি না হলেও খুব কমও নয় নেহাৎ। জানালায় দরজায় রঙিন পর্দাগুলি ঝুলিয়ে দেবার পর নাট্যমঞ্চশোভায় ঝলমল ঘরগুলি। শিল্পনির্দেশনার সিংহভাগ কৃতিত্ব যাঁর, সুনন্দা, তখনও ব্যস্ত। সহযোগী কৃষ্ণা। হল্লায় গুঞ্জনে কথাবার্তায় তিনটে ঘর ডাইনিং-স্পেস ব্যালকনি জমজমাট! ঘরে ঘরে ঘুরে দরজায় জানালায় দেয়ালে দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে নিঃশব্দে নতুন রঙের সুঘ্রাণ চেটে নিচ্ছেন সত্যসাধন। নিচু হয়ে তকতকে মোজায়েক মেঝেয় আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর বুলোচ্ছেন ভাইদের সঙ্গে। মাত্র অর্ধেক জীবনে এত সুখ আদায় করে নিতে পারে একজন মানুষ? তাঁরই সন্তান! ভালো। সুখী হোক! জয় হোক তার।

নিঃসন্দেহে হ্যাপিয়েস্ট ম্যান শ্যামল কিঞ্চিৎ-মাত্র ফুরসৎ পাচ্ছে না দাঁড়াবার। কো-অপারেটিভের প্রতিবাসীরা শুভেচ্ছা নিয়ে আসছেন। আসছেন আমন্ত্রিত অভ্যাগতরা।

দারাপুত্র সমভিব্যাহারে 'মেশিকো' কোম্পানির মালিক সিতেশ ঘোষ গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ। লোকটাকে উৎপল তেরচা চোখে একবার পরখ করে নিল। গোলগাল চেহারায় জনৈক ব্যক্তি। সাহেবি জেল্লার শার্টপ্যান্ট জুতোয় নিজেরা খুব ঝলমলে না হলেও জনসমক্ষে উপহার দেবার জন্য এদের নিজস্ব রমণী এবং পুত্রকন্যারা থাকে। পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই ভদ্রমহিলা সূর্যাস্ত মানেন না। মেদল দেহে এখনও কটকটে লাল বেনারসী। এবং স্বর্ণসম্পদে বিশ্বাসী। গলায় একটি মাত্র জড়োয়া নেকলেস শ্যামল দাশগুপ্তের গৃহে আগত অতিথি-সমাবেশে নিজেকে কিংবদন্তি করে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিবেচনায় হাতে কানে বাহুল্য বর্জন। বরং সেক্ষেত্রে তাঁদের কন্যা—টিভির পর্দায় সঞ্চরমান বিজ্ঞাপন-যুবতী পুরোপুরিই স্বর্ণে আস্থাহীন। রাঙা ওষ্ঠাধর টশটশ লোভাতুর দুটি কমলালেবুর কোয়া, কর্ষিত ভ্রূরেখা বা চতুর আঁখিপল্লব ফরফরে প্রজাপতি। দিদির মূল্যবান কুন্তল বিন্যাসকে টেক্কা দিয়ে কেশসতর্ক ভাই, নেতান্তই কিশোর, মাথায় মোলায়েম হাত বুলিয়ে দুনিয়াময় শুধুই আরশি খোঁজে।

ভোল বদলে গেল পুরো অনুষ্ঠানের। শ্যামল বা সুনন্দার অন্য ভাবনা নেই। বুঝি এই একটি মাত্র অতিথি-দলের সম্মানে সমস্ত আয়োজন এবং সিতেশ ঘোষ, যেন তাঁরই গড়া কোনো প্রাসাদ-অট্টালিকা, ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ঘরে বারান্দায় ব্যালকনিতে অনুপুঙ্খ দেখে বেড়ালেন অজন্তা বা খাজুরাহো-মুগ্ধতায়। সুপরামর্শ দিলেন কিছু। অনুগত দম্পতি সমস্ত উপদেশকে অত্যন্ত জরুরি বিবেচনায় ঘাড় নাড়লেন প্রতিটি বাক্যের দাঁড়ি কমা ফুলস্টপে। ওজন মেপে সহাস্যে।

অন্যত্র ওদের শয়ন কক্ষে পুরুতঠাকুরের ঘণ্টাধ্বনির সহচর মা-কাকিমাদের উলুরব, কৃষ্ণার গাল-ফোলানো শাঁখ।

উৎসবের ভিড়ে কোথাও সংলগ্নতা খুঁজে না পেয়ে তিন বুড়ো ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালেন

লিভিং-রুমের কোণে দীর্ঘায়ত জানালার ধারে। যেখানে উৎপল একা। ছোট একটা টেবিলে পেতলের-টব থেকে বর্ধিত মানি-প্ল্যান্টের চারা সরাসরি উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে নকশা কাটা জানালার গ্রিল। বাবা কাকা বৃদ্ধদের চোখে বিস্ময় দেখল সে—আজ তো গৃহপ্রবেশ। রাতারাতি এত বেড়ে উঠল কী করে গাছটা? গাছ তো? না-কি প্লাস্টিক? এবং আঙুল ছুঁয়ে পরখের পর যখন নিশ্চিতই লতা, ছানির চোখে বিস্ময়—কী করে হয় এটা? কীভাবে সম্ভব? কোথায় শিকড়?

জানালার বাইরে দিগন্ত খুঁজল উৎপল। তিনতলার উঁচু থেকে মৃত্তিকা কত নিচে? কিছুটা যেন বেশিই সুদূর মনে হলো। কিন্তু সে ছিল। ভীষণভাবেই ছিল মায়াময় এ-সুখের কোলাহলে, পরিতোষে। নিশ্চিতভাবে প্রমাণের দায়—উৎসবটা পারিবারিক এবং সে এঁদেরই একজন।

উৎসবের বিচ্ছেদে একা না হয়ে যাবার প্রাণে কিছুটা নিশ্বাস ছিল তবু।

শিপ্রার নিমন্ত্রণ ছিল। কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি নিজে গিয়েছিলেন ওকে বলতে। কী কারণে স্কুলে ছুটি ছিল আজ। হালকা শীতের চাদরসহ এক রাশ জড়তা নিয়ে দুপুরেই এল। সঙ্কুচিত দেহভার ওর নিজেরই খামতি। দাদা-বৌদির দিক থেকে অন্যায় ছিল না কোথাও। ঘুরেঘুরে বারবার এসে কথা বলেছেন দাদা। সারাক্ষণ নিজের কাছে কাছে রেখেছেন বৌদি। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন নিজের বোন বলে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে বেলা গড়াল। বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটের পর যখন অস্বস্তি থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ, বলা বাহুল্য, উৎপল তার সঙ্গী। রাস্তায় নেমে, পিছু ফিরে বিশাল হাউসিং-কমপ্লেক্সকে তার সমগ্রতায় একবার দেখল শিপ্রা। কোনারক বা তাজমহলের স্থাপত্য মহিমায়—'সুন্দর। না?'

'সুন্দর তো বটেই। পকেটে রেস্ত থাকলে পৃথিবীর সব সুন্দরগুলোই তোমার হয়ে যেতে পারে!'

'এক সময় তুমিও এরকম একটা ফ্ল্যাটের কথা বলতে!'

'এখনও বলি।'

ভ্রূ তুলে তাকাল শিপ্রা।

উৎপল হেসে ফেলল—'কেন? কী হলো?'

'কিছু না। এত লোকজন তোমাদের বাড়িতে! তুমি কোথায় যাচ্ছ আমার সঙ্গে? বাসে তুলে দাও। ব্যস, বাকিটা আমিই পারব।'

সম্ভ্রান্ত পল্লির বৈশিষ্ট্য এই, রাস্তায় ফুটপাথ থাকে, ফুটপাথে দোকানপাট হল্লা কিছুই থাকে না। লোকচলাচল কম। বর্ষশুরুর জানুয়ারিতে হালকা শীতের আমেজ। দুপুরশেষের রোদে এক জোড়া যুবক-যুবতী সংলগ্নতায় হাঁটে পায়ে পায়ে। গোটাকয়েক পাখির-ডাক ছাড়া অন্য কোনো ধ্বনি নেই ; যখন ওদের নিজেদেরও কথা ফুরিয়ে যায়।

কিংবা কথা থাকে। গুমরোয় ভেতরে ভেতরে। পালস-বিটে শব্দপুঞ্জ ধরা পড়তে পারে। ফুসফুসের ওঠাপড়ায় অথবা মস্তিকের কোষে কোষে অবচেতনের নিষিদ্ধ কামনাগুলি লোকভয়ের দরজা ভেঙে বেরুতে না পেরে বিচ্ছিরি একটা চচ্চড়ি রাঁধতে শুরু করেছে মগজে,

যার কোনো মানে নেই অথবা পরস্পরকে না-ছুঁয়ে এখনও যা নিজেরাই আড়াল রাখতে চায়।

'এরপর?'

'কেন?'

'তোমাদের ঘরবাড়ি?'

'মাঝের-ঘরটা ফাঁকা আজ থেকে। কৃষ্ণা ফোকটসে পেয়ে গেল। কী নাকি একটা আলাদা ঘর দরকার তোমাদের? যুবতী মেয়েদের! কেন বলো তো? কী করো?'

'আঃ, কী বাজে বকছ? তোমার ছ্যাবলামোটা থামাবে একটু?'

হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে উৎপল দিলখোলা ফূর্তির মেজাজে—'আরে, এই তো মজাটা অ্যাদ্দিনে জমল ভালো করে। সবে শুরু...'

বুকেপিঠে জড়ানো চাদর। বাঁহাতের মুঠোয় ছোট ব্যাগ, ডান হাতে বাদামী রঙের ছাতা মাথার ওপর। ছাতাটা একটু সরিয়ে ভ্রূকুটিতে তাকাল শিপ্রা—'তোমার মজা নিয়ে তুমি থাকো। আমাকে বাসে তুলে দাও। তোমাদের এই সল্টলেকে-ফেকে কোনোদিন আসিও নি ছাই। শুধু গপপো শুনেছি। সত্যি, এত সুন্দর জায়গা! এত ভালো লাগছে আমার...'

গোলাপী রোদের রঙে বিকেলের লম্বিত ছায়া দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে সবে! ইতস্তত কাকের চিৎকারে আশ্চর্য সেই নিঝুম নগরীর শান্তি দিবানিদ্রার আলসেমিতে ঝিমোচ্ছে তখনও। দূর বিদেশে বেড়াতে-আসা অপরিচয়ের জগতে কৃষ্ণচূড়ার লাল, রাধাচূড়ার হলুদ। নয়নাভিরাম আবাস-প্রাসাদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটতে হাঁটতে যুবতী হৃদয়ে মানবেতর বিষক্রিয়া। হয়তো-বা অবেলায় অতিভোজের পরিণাম। বিচ্ছিরি লাগছে শরীরটা।

ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা পেরোচ্ছিল ওরা। একটা ট্যাকসি যাচ্ছিল ডানদিক ঘেঁষে। বেহিসেবী সেই যুবক হাত তুলে লাফিয়ে উঠল আচমকা—'ট্যাকসি, ট্যাকসি...'

শিপ্রা হতবাক—'এ-কি! ট্যাকসি কেন? বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছ। কোথায় পাও এত টাকা?'

'আরে ধ্যাৎ, আমার টাকা কোথায়? তুমি তো মাইনে পেয়েছ কদিন আগে।'

'উঃ, কী যে করো হঠাৎ-হঠাৎ! বেশি টাকা এখন নেইও আমার সঙ্গে। কেন, বাস কী দোষ করল?'

'বাসফাস নেই এখানে। একটা বাস পেতে হলে আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়াতে হবে রোদ্দুরে। পাগল নাকি? এমনিতেই মাথা ঝিমঝিম করছে আমার। নাও, চলো চলো, ওঠো...'

ট্যাকসিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে সামনে। এগোতেই হয় এবং এগোতে এগোতে শিপ্রা—'তোমার পাগলামিটা আজ এ-রকম বাড়ল কেন বলো তো হঠাৎ?'

'মেজাজ! মেজাজটা রাজাবাদশার। এক্সট্রিমলি ফিউডাল। একটা যুদ্ধু হেরে গেলেই কি দেউলে হয়ে যায় নাকি কোনো সুলতান?'

ভেতর থেকে ট্যাকসির দরজাটা বন্ধ করার প্রচণ্ড শব্দে শিপ্রা তার নিজের সঙ্গোপনে থেমে যায়। তার দুর্বোধ্য তাকে এভাবেই টেনে নিয়ে যায় যদি।

নরম গদিতে জাঁকিয়ে বসে উৎপল সিগারেট ধরিয়েছে। গাড়ি ছুটছে। শিপ্রা তার ডান দিকে চোখ রেখে বিদেশ চেনে। রূপবতী কলকাতা, কলকাতা তিলোত্তমা। দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের অন্ধকার থেকে এখানে পৌঁছোতে যদি জন্মান্তর ব্যবধান।

ভি. আই. পি. রোডের রাজসড়কে পড়ে গাড়িটা হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরতেই ক্ষেপে গেল সে—'এ-কী! কোথায় যাচ্ছো? এদিকে হাতিবাগান নয়।'

'বলছি তো, একদম কথা বলবে না। তুমি এখন ভয়ঙ্কর এক দুর্বৃত্তের খপ্পরে। তোমাকে ইলোপ করা হয়েছে।'

'আঃ, ইয়ার্কি রাখো। বাড়াবাড়িরও সীমা আছে একটা। মাকে বলে এসেছি পাঁচটার মধ্যে ফিরব। গাড়ি থামাও। আমি নেমে যাব।'

নির্বিকার উৎপল সিগারেটের ধোঁয়ায় সত্যি এক শাহানশা মেজাজে—'নামবে তো বটেই। কিন্তু কোথায় নামবে, সেটা তোমার কথায় নয়, আমার ইচ্ছেয় ঠিক হবে।'

প্রবল বিক্ষোভে শিপ্রা—'থামুন, থামুন তো একটু। গাড়িটা রাখুন...'

'না না, চলুন। চলুন আপনি...'

সম্মুখবর্তী ড্রাইভার, অনতিপ্রৌঢ় নির্বিকল্প মহাত্মা কথা বলছেন না। আজব দুই যুবক-যুবতীর কাণ্ডকারখানায় ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাচ্ছেনও না পেছনে। লোকটা কি বধির? তাই বা কেন হবে? উৎপলের নির্দেশমতো কাঁকুড়গাছির মোড়ে গাড়িটা বাঁক নিচ্ছে ডানদিকে। হয়তো-বা পশ্চাদ্‌বর্তী মঞ্চে এবম্বিধ বা আরো বিচিত্রতর নাটক উপভোগের নিত্য-অভ্যাসে লোকটা শিবঠাকুর।

শিপ্রা হাল ছাড়ল। মানিকতলার মোড় ডিঙোচ্ছে গাড়ি। আবার স্বচ্ছন্দের কলকাতা—অলিগলি ধুলো ধোঁয়া ভিড় কোলাহল জঞ্জালের স্বাভাবিক শহর। চোখ টেরিয়ে তাকাল একবার। চোখে চোখ লুকোতে উৎপল দ্রুত ওপাশের জানালায়। আশ্চর্য! সাধ করেও হিংস্র হবার মুরদ নেই যার

আঁতকে উঠল। আরো অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে বিধান সরণিরও ওপারে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত গলির ভেতর ঢুকছে গাড়ি। এবং উৎপল—'বাঁদিকে যান। সামনে লাইটপোস্টটার গা ঘেঁষে ডানদিকে...'

'গাড়ি ঢুকবে?' পেছনে না তাকিয়েই ড্রাইভার।

'ঢুকবে। বেরুবার রাস্তাও আছে আপনার।'

শেষপর্যন্ত গাড়িটা পৌঁছোচ্ছে কোথাও। এ-সব তল্লাটে যদিও সে আসে নি কখনও, শিপ্রার মনে হলো—সে তার পরিচিত কলকাতারই কাছাকাছি আছে কোথাও। ডানদিকে অলিগলি দিয়ে এগোলে বিধান সরণি নিশ্চয়ই খুব দূরে নয়। কিংবা ভয়ের খামচি। উৎপলের কাছেই শুনেছিল একদিন—এদিকেই কোথায় যেন, সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর ধারেকাছে কলকাতার বিখ্যাত বেশ্যাপল্লি!

রাস্তায় ইটের উইকেট সাজিয়ে রবারের বলে ক্রিকেট খেলছে ছেলেরা। হৈ হৈ চিৎকার। বিকেল বলেই লোকচলাচলে মুখর চারপাশ। অবশেষে থামল ট্যাকসি। রাস্তায় নেমে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে উৎপল। শিপ্রা মাটি পেল।

'আট টাকা চল্লিশ...' শব্দগুলি শোনা গেল এবং যখন ট্যাকসির দাম মেটাচ্ছে উৎপল, এপাশ-ওপাশ তাকাতেই একেবারে সামনে, ঠিক মুখোমুখি ভাঙাবাড়ির একতলায় বড়সড় নতুন সাইনবোর্ডে হলুদের ওপর কালো হরফে নীল অক্ষরমালা—'অনুচিত্রণ—উৎকৃষ্ট ছাপাখানা।'

শব্দচয়ন খুবই পরিচিত তার। দাদার দেওয়া নাম।

চড়া সেন্টিগ্রেড থেকে বরফের শীতলতায় গড়িয়ে নামতে সময় লাগে কিছুটা। রাগের ঝাঁঝটা পরিহাসেও ক্রিয়াশীল—'আর সব দলবল কোথায় তোমার? একটি যুবতী মেয়েকে ইলোপ করতে ষণ্ডাগুণ্ডা আরো তো চাই দু-চারজন!'

'ষণ্ডাগুণ্ডা বলছ কাকে? অনারেবল বিজনেসম্যান নাউ...' লাফ মেরে ভেতরে ঢুকল উৎপল—'কী বিজয়দা, নাটকের লোকজনেরা এসেছিলেন? নিয়ে গেছেন ফোল্ডারগুলো?'

বীভৎস যান্ত্রিক হট্টগোল চাপা ঘরটুকুতে। দুটো মেশিনই চলছিল। খুশিতে উচ্ছল বিজয় সাহা বাঁহাতে দেয়ালের সুইচ বন্ধ করতেই অর্ধেকটা কমে গেল। লাল লুঙ্গির মানুষটা নেমে এলেন মেশিন থেকে—'দুপুরবেলা নিয়ে গেছেন।'

'পছন্দ হয়েছে তো?'

'পছন্দ কী বলছেন? ডিপ নেভি ব্লু-র ওপর তুঁতে রঙটা জমে গেছে এমন, খুব খুশি...' সামনের টেবিলের দিকে এগিয়েও, কী ভেবে থেমে গেলেন ভদ্রলোক—না, দুটো হাতই নোংরা আমার। একটা কার্ড রেখে গেছেন আপনার জন্যে। ড্রয়ারে আছে। ওদের থেটারে যেতে বলেছেন।'

'বাংলা মঙ্গলকাব্যে সমাজতন্ত্র—পি. এইচ. ডি. সাহেবের কী যেন একটা বইয়ের মলাট ছিল?'

'গারাউন্ডের কম্‌লা রঙটা ছেপে রেখেছি। যদি শুকোয় ত সিপিয়াটা ধরব কাল...'

'সাধুবাবাদের সেই নেমন্তন্নপত্রটা?'

জোড়হাতে ললাট স্পর্শ করলেন বিজয় সাহা—'হয়ে গেছে। ওনাদের আশ্রমে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। যাব সন্ধেবেলা...'

'চাঁদু কী করছে?'

'ও ত সেই বিস্কিট কোম্পানি টেনে যাচ্ছে কাল থেকে। কম ত নয়। কুড়ি হাজার ইম্পেশন!'

এক কোণে শিপ্রা মূঢ়বাক। নাটক বিস্কুট মঙ্গলকাব্য সমাজতন্ত্র সাধুবাবা—শব্দগুলো যে এক জায়গায় এক খিচুড়িতে জড়িয়ে যেতে পারে কীভাবে, বোধগম্য নয় বলেই অনধিকারের দরজায় চুপচাপই থাকতে হয় তাকে। চারদিকের কাগজপত্র কালিঝুলির যন্ত্রপাতি সন্তর্পণে এড়িয়ে সে চাঁদুর কাছে পৌঁছোতে চেয়েছিল। মেশিনটা চলছে। এখানে বই ছাপা হয়? ছাপাখানার কাজকর্ম সে দেখেনি কোনোদিন। বিস্ময়। চারদিকেই বিস্ময় ঘনঘোর। মেঝেতে ছড়ানো একরঙা কাগজ কতগুলো। ছাপাগুলোরও কোনো মানে নেই। ধবধবে শাদা কাগজের গায়ে কমলা রঙের মাথামুণ্ডু নেই নকশা। সমস্ত এলোমেলোর মধ্যে বরং ভালো লাগছে এক জোড়া ড্যাবডেবে চোখের বুড়ো মানুষটাকে!

খুবই ঘনিষ্ঠভাবে ছিল উৎপল। কানে কানে বলল, আস্তে—'এই...এই আমার প্রেস। মাই ক্রিয়েশন। আপাতত এই...এটুকুই করতে পারি আমি।'

শিপ্রা কম্পনশূন্য। এমন কিছু তাজমহল নয়, যার জন্য দুটো লাল গোলাপ উপহার দেওয়া যেতে পারে এর স্থপতিকে। বরং তার বিপরীত, অনেকটাই দমে গেছে সে। এত বড় টিউবলাইটেও যেখানে অন্ধকার ঘোচে না, কালিঝুলিমাখা কী দুটো লোক ঘটাং-ঘটাং করে

যাচ্ছে অন্ধকার গুমটির ভেতর! দুটো লোকেরও ঠাঁই হয় না ভালোভাবে দাঁড়াবার। এ-রকম ছাপাখানা সে আবছার দেখে রাস্তায়। কী এর ভবিষ্যৎ? কতটুকু? শেষ পর্যন্ত এই...এর জন্যে উৎপল?

'আমাদের বিজয়দা। বিজয় সাহা...'

শিপ্রা ফিরে তাকাল। ছাতাব্যাগশুদ্ধু দুটো হাত বুকে তুলে নিঃশব্দ নমস্কার।

'এই যে মেশিনফেশিন এত কিছু দেখছ, এসব কিন্তু আসলে কিছু না। সব বিজয়দা। বিজয়দার জন্যেই এত অর্ডারটর্ডার কাজকম্মো...'

'হেঁ হেঁ হেঁ, কী যে বলেন দাদা...' ভাতকাপড়ের মালিকের সঙ্গিনীকে নিজের মতো করে একটা-কিছু ভেবে নিয়ে সঙ্কুচিত ছিলেন বিজয় সাহা। এবার, কন্যার বয়সী একজনকে মহিলাজ্ঞানে সম্মান দেবার আদবকায়দা ঠিকমতো জানা নেই বলেই হয়তো সহসা ব্যস্ত হলেন। ঘরে দুটি মাত্র চেয়ার। প্যাকেট-করা কাগজে দুটোই বোঝাই ছিল। নোংরা হাতেই প্যাকেটগুলো নামাতে নামাতে—'বসুন দিদিমণি, বসুন এখেনটায়। অ্যাই চাঁদু, চা বলে আয়। বিস্কিটও বলবি...'

শিপ্রা বলল প্রতিরোধে—'না না, চা না। কিছু খাব না। এত খেয়েছি দুপুরবেলা! আইঢাই করছে এখনও...'

'সে-কি হয় দিদিমণি? এলেন আমাদের এখেনে, কিছু মুখে দেবেন না?'

'ওসব চা-ফা আজ থাক বিজয়দা...' উৎপল তার স্বভাব-উচ্ছ্বাসে—'তার চেয়ে বরং একটা কাজ করুন দেখি। জানেন ইনি কে? দুর্ধর্ষ পণ্ডিত মহিলা। স্কুলে পড়ান। বহুৎ জ্ঞানের কথা বলেন ছেলেমেয়েদের। বেশ ভালো করে একটা প্যাড ছেপে দিন তো এঁর...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সে-আর এমন কী কতা।' বিজয় সাহা খুব খুশি—'নাম ঠিকানা দিয়ে যান। কাল...কালই ছেপে দেব। বাইকালারে সুন্দর করে...'

'আঃ, কী হচ্ছে এসব...' মুখচোখ কুঁচকে শিপ্রা—'ওসব কিছু করবেন না তো আপনি। কাউকে চিঠিপত্র লিখি না আমি। দরকারই হয় না লেখার। প্যাডফ্যাড দিয়ে আমি কী করব?'

'কেন? ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবে ছাত্রছাত্রীদের।'

'তার জন্যে আমি কে? সেজন্যে তো ওদের হেডমাস্টারমশাই-ই আছেন।'

'তোমাদের হেডমাস্টারমশাই বুঝি খুব চরিত্রবান?'

শিপ্রা ঠোঁট ওল্টাল। চারপাশে তাকিয়ে প্রেস ব্যাপারটাকে বুঝে নিতে যখন তার আরো বেশি মনোযোগ এবং হতাশায় গাঢ় নিশ্বাস

উৎপল চঞ্চল—'বিজয়দা এখন আমরা যাব। আমার সেই ব্যাপারটা? হলো কিছু?'

'ও-হ্যাঁ, হবে না কেন? আপনার জিনিস আপনি নেবেন...' ব্যস্ত হলেন বিজয় সাহা। ওপাশের দেয়ালে পেরেকে-ঝোলানো পাঞ্জাবি থেকে ময়লা হাতেই চাবিটা বের করে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুললেন—ওই তো, আলাদা করে রেখেছি আপনার জন্যে। নিন, তুলে নিন...'

পাঁচটা একশো টাকার নোট। দ্রুত গুনে নিয়ে প্যান্টের পকেটে গুঁজে উৎপল—'আজ তাহলে চলি। কাল সকালে আসব। দেখি নতুন কিছু টাইপফাইপ কেনা যায় কিনা। কালই আপনাকে নিয়ে একবার যাব ফাউন্ড্রিতে।'

লাফ মেরে রাস্তায় নেমেছে উৎপল। আগোছাল জিনিসপত্রের ফাঁকে-ফাঁকে সন্তর্পণে পা ফেলে এগোচ্ছিল শিপ্রা। অনুগত হাস্যে বিজয় সাহা—'আপনি কিন্তু মাঝেমধ্যে আসবেন দিদি। ভালো লাগবে আমাদের।'

'আসব, নিশ্চয় আসব। বিশ্বকর্মা পুজো হয় না আপনাদের?'

আচমকা অদ্ভুত প্রশ্নে বিজয় সাহা তাঁর সেই ভীষণ চাউনিতে থতমত—'সে-ত হত দিদি। আগের মালিক যাঁরা, এই বাড়িরই ওপরে থাকেন, নমো-নমো করে করতেন একটা। কীঈঈবা হবে? এটুকুন একটা প্রেস! আমরা বাপব্যাটায় দুজনই ত মোটে কম্মোচারী...'

'না, এবার খুব ঘটা করে হবে। খুব বড় করে। ওর বোন কৃষ্ণাকে চেনেন তো? কৃষ্ণা আসবে। আমি আসব। আমরা সবাই আসব। বেশ বড়সড় ঠাকুর আনা হবে। সাজানো-গোছানো হবে সুন্দর করে। আমরা মেয়েরা রান্নাবান্না করব। খুব মজা হবে। ওসব মাইকফাইক বাজবে না কিন্তু। রাত্তিরে আমরাই গান গেয়ে শোনাব আপনাদের। বৌদিকে, ছেলেমেয়েদের সবাইকে নিয়ে আসবেন সেদিন...'

অনেকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে উৎপল। শিপ্রা এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই।

সমুদ্র দেখার উপযোগী বিশাল দুটো চোখের বিস্তারে স্তম্ভিত বিজয় সাহা ওদের চলে-যাওয়ার দিকে অপলক—এমন সব সুন্দর মানুষও নাকি আছে সংসারে! এমন সব কতা কইবার জন?

পেছনে তাকাবার সুযোগ নেই। ওপাশে উৎপল হাঁটতে শুরু করেছে। দ্রুত ছুটে গিয়ে শিপ্রা গতির সমতা চায়।

বিকেলের আলো মুছে গিয়ে ঘরে-বাইরে আলো জ্বলেছে সবে। শীতের ধোঁয়াশায় ঝাপসা চারপাশ। রকে বসে ছেলেরা সান্ধ্য আড্ডায়। অদূরে চাদরমুড়ি বৃদ্ধও কয়েকজন। অফিস বা কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরছেন বাবুরা, দিবাশেষে গাছে গাছে যেমন পাখিরা।

আবার পাশাপাশি হাঁটা। শিপ্রা চুপচাপ। বিশ্বকর্মা পূজা-উৎসবের সম্ভাব্য রোশনাই মগজে আর কোনো উদ্দীপনা নয়। এই উৎপলের প্রেস? এইটুকু? ব্যাঙ্ক ছেড়ে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে ফুরিয়ে যাবে একজন মানুষ? সঙ্গোপনে স্খলিত নিশ্বাস থেকে সংশয় দীর্ঘতর হয়। মস্ত একটা নদী পেরোবার প্রতিশ্রুতি ছিল। নদী সমুদ্রে যাবে। ঘাটে পৌঁছোনোর পর এত ছোট আর এমন নড়বড়ে একটা শালতি? ভরসা হয় না পা বাড়াবার। যদি মাঝিতেই সংশয়!

'তোমার বাড়ির সবাই এসেছিলেন? দেখে গেছেন কী করছ তুমি?'

'ধ্যাৎ, কী সব পুজোফুজোর কথা বলছিলেন মা। হবে না, ওসব হবেটবে না এখন। ফালতু টাকা নেই আমার।'

'বাঃ রে, মাসিমা এটুকু চাইবেন না ছেলের কাছে? তোমার দাদা তো দেখি পুজোটুজো সবই করলেন আজ...'

'দাদা তো ইন্‌জিনিয়ার! মডার্ন টেক্‌নলজির লোক। উনি যা পারেন, আমি পারি না।'

শিপ্রা আঁতকে উঠল। কী ভীষণ অন্ধকার আর নোংরা একটা ঘুপচি গলির ভেতর ঢুকছে উৎপল! থমকে দাঁড়াতেই সম্মুখবর্তী ডাক—'কী হলো? থামলে কেন? এসো, চলে এসো...'

দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের মেয়ে। কোনো অধিকারই নেই কলকাতায় কোনো গলিতে ঢুকে

মুখে আঁচল চাপা দেবার। আরো মারাত্মক, পায়ের কাছে খোলা হাইড্র্যান্টের হাঁ। আদ্দিকালের পুরনো ভাঙা বাড়ির পাইপ ভেঙে নোংরা জল গড়াচ্ছে নিরন্তর। গায়ে ছিটকোবার সম্ভাবনা। পাশেই শ্যাওলা-জমা স্যাঁতসেতে দেয়ালে ছুঁয়ে যেতে পারে আঁচল। হাত বাড়িয়েছে উৎপল। সেখানে হাত রাখতে হয়—'কী মুশকিল! এখানে ঢুকলে কেন?'

'দারুণ শর্টকাট।'

কী একটা ছিল পায়ের কাছে। দুর্গন্ধটুকু ডিঙিয়ে দূরবর্তী আলোর চত্বরে পৌঁছে শিপ্রা চাপা নিশ্বাসের তলানি থেকে—'শর্টকাটই তো খেলো তোমাকে। সব কিছুতেই ফাঁকফোকর...'

'হ্যাঁ, সেটা ছিল। ব্যাঙ্কের মস্ত অফিসার ছিলাম যখন। ইউ মাইট হ্যাভ বিন প্রাউড অব মি...' সঙ্কীর্ণ গলিপথে উৎপল এগোয়। পশ্চাদ্‌বর্তী আছে একজন, নিশ্চিত জেনেই—'প্রেসটা তো দেখলে। জানি, ভরসা পাচ্ছ না খুব। তুমি কেন, কারুরই কোনো ভরসা পাবার মতো কিছু নেই...'

গলি থেকে আরো এক সঙ্কীর্ণতর গলিতে বাঁক নিয়েছে ওরা, যেখানে আরো বেশি অন্ধকার। এক হাত কি দু-ফুট আড়াই-ফুটের বেশি চওড়া নয় কিছুতেই। শিপ্রা ভয়ে কাঁপে। আশেপাশের বাড়ি থেকে কোথায় এক নবজাতকের কান্না।

'এছাড়া বিকল্পও নেই কিছু। আমি আমার নিজের মতো করে এগোচ্ছি। একেবারেই একা। দেখি যদি ব্যাঙ্কের লোনটা বের করতে পারি...'

'ব্যাঙ্কের লোন তুমি পাবে?' শিপ্রা ঝলকে উঠল—'ব্যাঙ্ক তো ছেড়ে দিয়েছ।'

'ছাড়লাম কোথায়? আরো বেশি আপন হচ্ছি। জালিয়াত বলে সাসপেন্ডেড হয়েছিলাম! নাউ অনারেবল বিজনেসম্যান।'

'টাকা পাবে?'

'এভাবে দেয় নাকি কেউ? আরো কিছু ক্যাপিটাল বাড়াতে হবে।'

'সেকি। ক্যাপিটেলের জন্যেই তো টাকা চাইছ তুমি!'

'উঃ, যা বোঝো না, মগজে ঢুকবে না...' উৎপল পিছু ফিরে আচমকা থমকে দাঁড়াতেই, শিপ্রা তার গতিবেগ সামলাতে না পেরে একেবারে বুকের ওপর। পিঠে হাত রেখে আলিঙ্গনের স্নিগ্ধতায় একটু চেপে, কৌতুকে এবং আবার ছেড়ে দিয়ে উৎপল হাসতে হাসতে—'ন্যাশনালাইজড হোক আর যাই হোক, ব্যাঙ্কও একটা ব্যবসা। দানসত্র নয় কারুর। তোমাদের মতো ফেকলু গরিবমানুষফানুষের জন্যেও নয়। ডি. আর. আই. স্কিমে ঘাস কাটার জন্যে দু-চারজন পাঁচশো সাতশো হাজার টাকা পেতে পারো বড়জোর। হাইপোথেকেটেড টু...সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ঘুরবে। ও-কিছু না। পাবলিসিটি বাজেটের ফালতু খরচ। আসল কারবারটা মস্ত মস্ত কুড়ুলের সঙ্গে...'

'কুড়ুল!' শিপ্রা ঘাবড়ে গেল—'কুড়ুল কী?'

'যার হাতে যত শক্ত আর লম্বা কুড়ুল, সে তত বড় বড় গাছের ইজারা পাবে। আমারও একটা কুড়ুল চাই।'

বিদঘুটে জটিল কথাবার্তা। শিপ্রা দ্রুত একটা 'মেড-ইজি' চাইল—'তুমি পাবে?'

'পাব। কারণ আমি পাবার কায়দা জানি।'

গলিটা যেন কারুর পরম সম্পদ। লুটেরার ভয়ে লুকোনো ধন-ঐশ্বর্যের মতোই শুধু এর বাসিন্দারা ছাড়া বাইরের মানুষ হয়তো জানেই না কেউ, প্রবেশের পর এখান থেকে বেরোবারও পথ আছে একটা। এ-মাথা থেকে ও-মাথায় মানুষজন নেই। শীতটা আজ একটু বেশিই মনে হয়। ছোট চাদরটা আরো আঁটোসাঁটো জড়িয়ে নিয়ে ব্যাগ আর ছাতা বুকে চেপে পা টিপে টিপে এগোয় শিপ্রা। ধোঁয়া আর কুয়াশার রাসায়নিক গাঢ়তায় দেখা যাচ্ছে না কিছুই। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দুপাশের ঘরবাড়িতে দম বন্ধ করে পুরো জীবনটাই ডিঙিয়ে যাচ্ছে যারা, তাদের সে চেনে। যেন দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনই এ-গলির নাম। দু কদম সামনে অভিভাবক ভঙ্গিতে উৎপল দ্বিধাভাবনাহীন। বুঝি এ-অন্ধগলিও তার অনেক অনেক কালের চেনা।

এবং এই অন্ধকারেই আরো কিছু উজ্জ্বল মানুষ, নিরাপদ জীবনের সুখস্বপ্নে সঞ্চরমান কতিপয় যুবকের চলাফেরা হাঁটা কথাবলা চোখের পর্দায় স্পষ্ট হয়ে উঠতেই, শিপ্রা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কামড়ে গায়ে আঁটোআঁটো লেপটে নেয় শীতের চাদর। আতঙ্কিত প্রতিটি পদক্ষেপ। ফ্যাসফেসে গলা—'ভাস্করের সঙ্গে আজ দেখা হলো তোমার দাদার বাড়িতে। কলকাতায়ই কোথায় নাকি লেকচারশিপ পেয়ে যাচ্ছে কোন্ কলেজে। কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে চিঠি এসে গেছে।'

'কেন, হিংসে হচ্ছে?'

'ওমা, সে-কি কথা?' শিপ্রা বিষম খেল—'আমি হিংসে করতে যাব কেন? তোমার বন্ধু, তোমাদের ঘরের হবু জামাই...'

'আমার বন্ধু! অব কোর্স মাই ফ্রেন্ড। সাম নোবল অ্যান্ড গুড পিপ্‌ল অ্যারাউন্ড মি...' উৎপল আবার পিছু ফিরে থমকে দাঁড়াল—'হাজার দেড়-দুই টাকা মাইনের চাকরি আর নরম তুলতুলে একটা বৌ! ব্যস, লাইফ কমপ্লিট...'

'এ-কি? এটা কী হচ্ছে?' শিপ্রা দিশেহারা। কিছুটা বিরক্তও বটে—'ফের, তুমি তোমার সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো কথাগুলো বলতে শুরু করলে?'

গলির নির্জনতায়, দুপাশের ঘরবাড়ির জানালায় মানুষের অস্তিত্বে সতর্ক থেকেই উৎপল তার সংযত আবেগে, ক্ষুব্ধতায়—'সব রকমে নিজেকে দেউলে করে, ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা মানুষ শুধু সুন্দর কথা বলে না। সত্যি কথা বলে।'

'আঃ, কেন বোঝো না, তোমার ও-রকম কথাগুলো কেমন সাজানো-সাজানো বইয়ের কথা মনে হয়। লোকে হাসাহাসিও করে বোধ হয়...'

'হ্যাঁ, সব সত্যি তো এখন তোমাদের টিভি রেডিও খবরের-কাগজ আর বিজ্ঞাপনের লোকেরাই বলে...'

'ঠিক আছে। নিজে যা করছ করো। অন্যকে গাল পাড়ছ কেন তাই বলে?'

'না, গালাগাল নয়। আমি কে ভদ্রলোকের ছেলেদের গালাগাল করার...' আবার পা বাড়িয়েছে উৎপল। যেন এই গলি থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়াটাই ভীষণ জরুরি এখন। দুঃসহ অন্ধকার—'এ-আমি নিজেকেই বলছি। আই ইভ্যালুয়েট মাই পাস্ট। আমিও তো দাদার মতো, বন্ধুদের মতোই ছিলাম একদিন। ব্রাইট ইয়াংম্যান হ্যাভিং এ ব্রাইট ফিউচার। কিন্তু কী করব? ফেঁসে গেছি। এখন যা করছি, জানি, এই প্রেসফ্রেস অল ননসেন্স। মানে নেই, কোনো অর্থ

হয় না। কিন্তু এর বেশি, এর চেয়ে বড় কিছু করা আপাতত সম্ভব নয় আমার পক্ষে...

নিজের মধ্যে বিধ্বস্ত শিপ্রা নিজের ভাঙনে শিথিল। শব্দগুলি স্পর্শ করে তাকে। হয়তো কোনো অর্থ আছে এসবের। কিংবা নেই। নানাভাবে হরেক আঁকিবুকি কাটাকুটিতেও যে-অঙ্ক মেলে না কখনও, তারই হিসেব গুনতে গুনতে, জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে-যাওয়া প্রায় অপরিত্যজ্য মানুষটাকে সম্পূর্ণ নতুন করে জানার ইচ্ছে তীব্র হতে থাকে। ঘুপচিটুকু পেরিয়ে কোনোভাবে আলোয় পৌঁছোনোর প্রবল আকুতি। দোতলা তিনতলা চারতলা, অন্ধকারে বোঝা যায় না কত উঁচু সব বাড়ি, যাদের একতলায় জানালায় জানালায় ইতস্তত দুপাশে ঝলকে ঝলকে যেতে থাকে সংসারের মুখ। ভেতর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর। ইতস্তত রেডিওর গান। জাল-আঁটা জানালার উঁকিতে দু-একবার টিভিও দেখল সে। এরই মধ্যে কোথায় কোন্ অদৃশ্যে সান্ধ্য-রেওয়াজের হার্মোনিয়মে কিশোরী কণ্ঠের গান—'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ...'

ঝরঝরে পুরনো বাড়ির ছাতা-পড়া স্যাঁতসেতে দেয়াল দুপাশ থেকে গা ছুঁয়ে। সামনের দিকে শাড়ির কুঁচিটা মুঠোয় ধরে একটু তুলে নিতে হয় গোড়ালির ওপর। সন্তর্পণ হাঁটায়, উৎকণ্ঠ বিষাদে ঝিমঝিম করছে মাথাটা। আলতো চাদরটা গায়ে জড়িয়েও গোটা শরীর জুড়ে ঠাণ্ডার কাঁপুনি। অনেকটাই এগিয়ে গেছে উৎপল। আরেক বিস্ময়—এই শীতেও গায়ে কোনো গরম-জামা নেই লোকটার?

ডানদিকে ছোট একটু বাঁক ঘুরতেই অদূরে গলির মুখে ওপরে নিচে আয়ত ফ্রেমে আলোকিত রাজপথের ছবি। একটা ডবলডেকার বাসের দ্রুত ছুটে যাওয়ার দৃশ্য। সেখানে পৌঁছে উৎপল থমকে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি এসে পৌঁছোনোর অবকাশ দয়িতাকে—'কী হলো? কিছু বলছ না যে?'

'কী বলব? শুনছি।'

শীতের ধোঁয়াশায় বিষাক্ত কলকাতা। নিশ্বাসে নিশ্বাসে বুকের হাঁসফাস। চোখের জ্বলুনি। গাড়ির চলাচল লোক-কোলাহলেও দেখা যাচ্ছে না রাস্তার এপার ওপার। শুধু লম্বা লম্বা স্ট্রিটলাইটের তলায় ফাটা ডিমের রঙে ধোঁয়াটে কুয়াশায় আলোর ঝালর। উপচে পড়ছে শীতবস্ত্রে উজ্জ্বল নারীপুরুষ। রঙের বিস্ফোরণে যুবক যুবতীরা।

'ঘাবড়াও মাৎ, মাই ফেয়ার লেডি, একটা কিছু হবে। হতেই হবে...' বড় রাস্তায়, জনতায় পৌঁছে উৎপল হঠাৎ চাঙ্গা—'লাইফটা হান্ড্রেড মিটার কি টু হান্ড্রেড মিটার রেস নয়। তাই যদি হতো, এই যে দেখছ এত মানুষজন, অনেকেই কেউকেটা ভি. আই. পি. বনে যেতে পারত দুনিয়ায়। ওই ছোট্ট রানটুকু কমপ্লিট করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব।'

কোনো সাড়া নেই শিপ্রার। বস্তুত আশাভরসা বা ভবিষ্যৎবাক্যে আর তার মাদকতাও নেই তেমন।

অথচ উৎপল তার দৃপ্ত ঋজুতায়—'লাইফটা আসলে, বুঝলে, ফিফটিন হান্ড্রেড মিটার রেস। ওতে ফার্স্ট ল্যাপ কি সেকেন্ড ল্যাপে কে এগিয়ে রইল, কে পিছিয়ে রইল, ব্যাপারই নয় কোনো। খেলাটা লাস্ট রাউন্ডে। প্রাত্যহিকতার ওপরে ঘাড়টা লম্বা করে তাকাও একটু। অপেক্ষা করো আর তিনটে কি চারটে বছর...'

ফুটপাতের প্রান্ত ছুঁয়ে রাস্তার ধারে এসে পৌঁছোল দুজন। রাস্তাটা পেরোবে। নিজের গভীরে

ডুবে গিয়ে শান্ত চুপচাপ শিপ্রা তেপান্তর খোঁজে। দিগন্ত নেই। ঘন কুয়াশায় কাছে-দূরের ঘরবাড়িও যখন অন্ধকারে কাঁথামুড়ি, ঝাপসা লাগে জীবনবৃত্তের চারপাশ। ভীরু শান্ত চোখে তাকাল সে। ভরাট বিষাদে—'ছোট ওটুকু প্রেস তোমার! এরই জোরে বলছ এত কথা?'

'হ্যাঁ বলছি। বলতে তো হবেই আমাকে। যদি এটাই চ্যালেঞ্জ টিকে থাকার...'

একটা ট্রাম গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তায়। ট্রামকে ওভারটেক করছে বাস। বাসের পেছনে গোটাকয়েক গাড়ি। ওদের হুড়োহুড়ি ধাতব ধ্বনির প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা। শিপ্রা বিষাদে নিশ্চল।

উৎপল কথা বলে, যেখানে তার জবাবদিহির দায়—'এই দুটো মেশিন নিয়েই যদি জীবনটা কাটাতে হয় এরপর, প্রেসটা বড় করে তুলতে হবে, প্রচুর খাটতে হবে। দিনরাত পরিশ্রম করতে হবে এর জন্যে। ইন্‌সিন্‌সিয়ার হবার সুযোগই নেই কোথাও। মানুষ হিসেবে নিজেকে ঠিকঠাক জ্যান্ত রাখার প্রসেসও তো চাই একটা। কিছুই তো নেই চারপাশে...'

রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে এলে এপার-ওপার পেরোতে পেরোতে শিপ্রা কিছুতেই আর কথা বলবে না বলে যখন নির্বাক স্থির, উৎপল, যেন সেখানেই কিছু-একটা আদায় করে নিতে চাইল—'হেরে যাচ্ছি কি জিতে যাচ্ছি, জানি না। ইঁদুরের দৌড়ে দৌড়োবার এলেমই নেই আমার। দরকারই বা কী? কাট টু দ্য সাইজ করে নেব নিজেকে। কানাই মল্লিক লেনের ওই ভাঙা বাড়িটায় যেমন আছি, তার চাইতে খারাপ থাকব না। ওই প্রেসের ব্যবসা সেটুকু নিশ্চয়ই দেবে।'

ভীষণভাবে শীতার্ত শিপ্রা ছোট চাদরটুকু আরো শক্ত করে বুকে পিঠে কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে মন্থর পায়ে চলতে চলতে নিচু মাথায় নিজের অতীত খোঁজে—ফ্রকপরা কিশোরীর অবোধ চোখে স্বপ্ন ছিল একদিন। বুক ভরে অনেক অনেক নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার সাধ জীবনের।

ডানদিকে বাঁক ঘুরল ওরা। আবার গলিপথ। শীতের সন্ধ্যায় গলিটা ভীষণ নির্জন। গাঢ় অন্ধকার। শিপ্রা চমকে উঠল। দুটো হাতের শক্ত থাবা তার কাঁধে। খোলামেলা রাস্তায় এ-কী অসভ্যতা? ঝটকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার মোচড় ছিল গায়ে। নিজেকে ছিঁড়ে নিতেও দ্বিধা।

সেই যুবক হঠাৎ এক ভিন্ন আদলে। যেন কিছু খাবলে ধরার বিপুল আবেগে হিংস্র—'আমি তোমাকে বিট্রে করেছিলাম। বিট্রেড এভরিওয়ন। আই ওয়জ অ্যান ইডিয়ট। কিন্তু আজ, আজ যদি আবার ওই লার্গাক্‌টিলেই ফিরে যেতে হয় শিপ্রা, এবার ফসকাবে না। আমি আমার এই গোটা চ্যালেঞ্জটা নিয়েই এবার ধরব সেটা...'

শিপ্রা শিউরে উঠল—'একি। এসব কথা আবার কেন?'

উৎপলও নাড়া খেল। আগোছাল চঞ্চলতাকে সংহত করতে প্যান্টের পকেটে হাত। গোটা শরীর জুড়ে তোলপাড় ঝড়ে আবার সিগারেট।

হাসল শিপ্রা—'অত ভাবছ কেন বলো তো তুমি? আমিও তো চাকরি করছি এখন। রোজগারটা খুব একটা ফালতু নয়।'

সিগারেট ধরানোর আগুনটুকু ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছেও থেমে যায়। বাহ্যত প্রকাশহীন, অনুচ্ছল প্রসন্নতায় চতুর চোখের চাউনি প্রশস্ত ভ্রূরেখায়।

শিপ্রা আরো বড় করে হাসল—'না, ইয়ার্কি না। মাস গেলে ন-শ পঞ্চাশ টাকা সাতষট্টি

পয়সা ঘরে আনি। প্রায় হাজার...'

'ইয়ার্কি মানে! মোস্ট অনারেবল লেডি ওয়র্থ রুপিজ ওয়ান থাউজ্যান্ড পার মান্থ...' সিগারেটটা ধরিয়ে প্রথম ধোঁয়ায় উৎপল স্মিতসংযমে—'বৌ করে নিয়ে চট করে বিষ গেলাতে কি পুড়িয়ে মারতে পারবে না কেউ। মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মাসিমা।'

আকাশ-ভাঙা শিশিরে শিশিরে ভিজছে কলকাতা। থকথক ভারি কুয়াশার স্তর ঠেলে উঠতে পারছে না লাখো লাখো মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির ধোঁয়া। ধোঁয়ায় কুয়াশায় মাখামাখি শহরের রাস্তায় অলিতে-গলিতে বাতাস নেই নিশ্বাসের। প্রশ্বাসে বিষ। ওরা হাঁটে। ঘনিষ্ঠ দুই যুবক-যুবতী বিশ্বকে বুকে নিয়ে মহানগরীর অণুমাত্রভাগে যেন কোনো প্রাচীন ভগ্নস্তূপে নিশ্চলতার পথে। ঘরের দিকেই পা ফেলা। ঘুরেফিরে বারবার আপন বৃত্তের সেই ঘর

ঘরের দেয়াল ভেঙে দিগন্ত খুঁজেছিল একদিন। দিগন্ত ভেঙে পৃথিবীকে ছুঁতে চেয়ে ভাঙতে পারে না রজ্জুবদ্ধ গাভীর গণ্ডি। কারা যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। ফেলে দেয় বারংবার—নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার, টিকে থাকার অলীক সীমানায়। পৃথিবী নামক অনাত্মীয় সেই গ্রহ যোজন যোজন দূরে। কলকাতাও সমুদ্রপারে যদি

ঘন কুয়াশার অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গলিটা যেখানে সত্য, একমাত্র বাস্তব জীবনের—ঘরের আঙিনায় সব কথা সব শব্দ সমস্ত বাক্য থেমে যেতে চায়। প্রাক-ত্রিশ যৌবনের কোনো সম্পন্ন অতীত নেই। নিরাকার ভবিষ্যৎ। তবু হাঁটা, তথাপি বেঁচে থাকা

ভৌতিক নির্জনে দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। নিজেদের ছায়াগুলিও তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যক্তি কেউ নয়। বেশ দূরে দূরে লাইটপোস্টের আলোগুলি জ্বলছিল। কোটি কোটি পোকার কিলবিল উর্ধ্ববর্তী আলোয়, বালবের মুখে। ছোট একটা চাদরের তুচ্ছতায় কাঁপছে শিপ্রা। বুকপিঠগলার উর্ধ্বে কুণ্ঠিত ঘোমটা টেনেও যখন নিস্তার নেই, তখনও বিস্ময়—শুধুমাত্র শার্টপ্যান্টের দুর্বিনীত স্পর্ধায় তার আপন পুরুষ, সেই যুবক, দুনিয়ার কোনো কিছু না-মানার গোঁয়ার্তুমিতে কি শাসনও মানবে না প্রকৃতির? কনকনে ঠাণ্ডাটাও মিথ্যে?

এবং একদা গৃহত্যাগী মরণকামী সেই যুবা নিরুদ্বেগ পায়ে পায়ে ঘরের দিকেই এগোয়। দয়িতাকে স্বস্থানে পৌঁছে দেবার পর আজ থেকে, বোধ হয় আজ রাত থেকেই, তার ঠিকানার সন্ধান। এবার ঘরই তো চাই একটা। পুরোপুরি নিজের ঠিকানায় আত্মনির্ভর এক ঘর। যা আমার, একান্তভাবেই আমার, কেড়ে নিতে দেব না কাউকে—অঙ্গীকার দৃঢ়বদ্ধ আরো।

ছিমছাম বাঙালি চেহারায় পেশীর হুঙ্কার নেই। রক্তে রক্তে দ্রবীভূত ক্রোধের সঞ্চারে দাহ। এই ক্রোধ এই দাহ একমাত্র সঞ্জীবনী জীবনের। বিস্তীর্ণ তেপান্তর এরপর। পরান্নভোজের করুণায় নয়, স্বস্তিহীন অনিশ্চয়ে প্রতিদিন।

প্রবেশ দরজায় এসে দাঁড়াল দুজন। মৃত্যুক্ষুধায় খকখক কাশির আওয়াজ ভেতর থেকে। ব্যাকুল আবেগে ঢুকে পড়ল শিপ্রা। উৎপল থমকে দাঁড়াল। সেই বৃদ্ধ? ইতিমধ্যেই স্মৃতি। অথবা ভীষণ, ভীষণভাবে জ্যান্ত মৃতকল্প এক মানুষ। বৃদ্ধের মৃত্যু হলে চক্ষুষ্মান হবে এই পৃথিবীরই কেউ একজন—নারী বা পুরুষ, ধনী বা নির্ধন! কিন্তু কথা ছিল, যিনি বা যাঁরা চক্ষুষ্মান করবেন গোটা দেশটাকেই।
